স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী চেতনানন্দ সম্পাদিত

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা

সংকলক ও সম্পাদক

স্বামী চেতনানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : info@udbodhan.org

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীমায়ের ১৫১ তম শুভ জন্মতিথি
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪১০/16 December 2003

৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ
মাঘ ১৪২০
February 2014
1M1C

ISBN 81-8040-463-3

মুদ্রক
নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধশতবার্ষিকী
জন্মোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরবৃন্দের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগ্রাহিগণের মনে এক অতি মহনীয় আসনে অধিষ্ঠিত। এর কারণ একাধিক। প্রথমত ঠাকুরই তাঁর দেহরক্ষার কয়েকদিন আগে রাজ্য চালাবার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে চিহ্নিত করে গেছেন এবং স্বামীজীর দেহান্তরের পর রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিচালনা ও অগ্রগতির মুখ্য দায়িত্ব তিনি যেভাবে পালন করে গেছেন তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আজ প্রায় সমগ্র বিশ্বে এর প্রসার ও ব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত ভগবদ্-প্রাপ্তির পথ স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনাদর্শ, শিক্ষা ও উপদেশের মধ্য দিয়ে যে-ভাবে সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তা-ই আজকে আমাদের অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান অবলম্বন।

আমেরিকার সেণ্ট লুইস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ 'স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা'-গ্রন্থে এইসব অমূল্য রত্নরাজি চয়ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুগ্রাহী পরিমণ্ডলের এক অশেষ উপকার সাধন করেছেন। তাঁর এই অনুপম গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। গ্রন্থশেষে আমরা একটি বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্টও সংযোজিত করেছি। নির্ঘণ্টটি প্রস্তুত করেছেন শ্রীমান দিলীপ চক্রবর্তী। আমরা তাঁর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ।

আশাকরি, এই গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কাছে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে।

উদ্বোধন কার্যালয়
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৫১-তম জন্মতিথি
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব			**১—৩৬৯**
ভূমিকা			৩
স্বামী ব্রহ্মানন্দ (সংক্ষিপ্ত জীবনী)	—	স্বামী বামদেবানন্দ	৭
স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কথাপ্রসঙ্গে	—	স্বামী শংকরানন্দ	১৬
শ্রীশ্রী মহারাজের স্মৃতিকথা	—	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	২৪
শ্রীশ্রী মহারাজের স্মৃতি	—	স্বামী যতীশ্বরানন্দ	৪১
স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা	—	স্বামী নির্বাণানন্দ	৫১
রাজা মহারাজের স্মৃতিকথা	—	স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ	৬৬
স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতিকথা	—	স্বামী অম্বিকানন্দ	৮৫
স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথাপ্রসঙ্গে	—	স্বামী অম্বিকানন্দ	৯০
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা	—	স্বামী প্রভবানন্দ	৯৩
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি	—	স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ	১০০
ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি	—	স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ	১০৯
মহারাজের কথাপ্রসঙ্গে	—	স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ	১১৫
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	স্বামী অশেষানন্দ	১১৭
মহারাজের স্মৃতি	—	স্বামী অশেষানন্দ	১৩০
ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ	—	স্বামী কমলেশ্বরানন্দ	১৩৩
মহারাজের পুণ্যস্মৃতি	—	স্বামী অচ্যুতানন্দ	১৪৯
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি	—	স্বামী বাসুদেবানন্দ	১৫৮
সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন	—	স্বামী বাসুদেবানন্দ	১৬২
শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে	—	স্বামী সারদেশানন্দ	১৬৯
পুণ্যস্মৃতি	—	স্বামী কাশীশ্বরানন্দ	১৯৮
ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি	—	স্বামী অখিলানন্দ	২১৫
মহারাজের স্মৃতি	—	স্বামী সত্যাত্মানন্দ	২২৫
স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা	—	স্বামী অপূর্বানন্দ	২২৮

সূচীপত্র

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি	—	স্বামী পরমেশ্বরানন্দ	২৩৮
কনখলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	স্বামী নিষ্কলানন্দ	২৪২
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা	—	স্বামী অনুপমানন্দ	২৪৬
স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা	—	স্বামী ধর্মানন্দ	২৫১
শ্রীশ্রী মহারাজের স্মৃতিকথা	—	স্বামী ভবানন্দ	২৫৪
ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা	—	স্বামী অজয়ানন্দ	২৫৭
মহারাজের স্মৃতিচয়ন	—	স্বামী অপর্ণানন্দ	২৬২
স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সান্নিধ্যে	—	স্বামী সম্ভবানন্দ	২৭৫
ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি	—	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	২৮৪
ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি	—	স্বামী দেবানন্দ	২৯৩
শ্রীশ্রীরাজামহারাজের পুণ্য স্মৃতিকথা	—	স্বামী জ্ঞানদানন্দ	৩০৯
স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতি	—	স্বামী বিজয়ানন্দ	৩১৬
রাজা মহারাজ-স্মৃতিকথা	—	স্বামী পুণ্যানন্দ	৩১৯
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি	—	স্বামী বিশ্বানন্দ	৩২৪
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি	—	স্বামী ওঁকারানন্দ	৩২৫
মাতৃসমীপে স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	স্বামী ঈশানানন্দ	৩৩০
মহারাজের স্মৃতি	—	স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ	৩৩১
শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি	—	স্বামী প্রণবানন্দ	৩৩২
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি	—	স্বামী তেজসানন্দ	৩৩৬
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ	৩৪৪
স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা	—	স্বামী ভূতেশানন্দ	৩৫৭

দ্বিতীয় পর্ব ৩৭১—৪৬৬

মহারাজের স্মৃতি	—	বশী সেন	৩৭৩
শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি	—	শ্রী পি শেষাদ্রি	৩৭৭
শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতিকথা	—	শ্রী পি শেষাদ্রি	৩৯২
শ্রীশ্রীমহারাজের কথা	—	শ্রী—	৩৯৭
ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দ প্রসঙ্গ	—	শ্রীকালীসদয় পশ্চিমা	৪১০
পূর্ববঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত	৪১৭

শ্রীশ্রীমহারাজের পুণ্যস্মৃতি	—	শ্রীনরেন্দ্রভূষণ পর্বত	৪২৭
শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজের স্মৃতিকথা	—	শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়	৪৩৩
ব্রহ্মানন্দ-প্রেমানন্দ স্মৃতি	—	শ্রীবাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪২
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি	—	শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ	৪৪৯
পুণ্যস্মৃতি	—	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ	৪৫৫
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিচারণ	—	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৪৬১

তৃতীয় পর্ব ৪৬৭—৫২৯

মহাসমাধি	—	উদ্বোধন	৪৬৯
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি	—	শ্রীধ্রুব	৪৭১
শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি	—	শ্রী কণ্ঠ	৪৭৬
স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি	—	শ্রীগোকুল	৪৮২
পতিতপাবন স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	তারাসুন্দরী দাসী	৪৮৮
স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণে	—	সরলাবালা দাসী	৪৯২
স্বামী ব্রহ্মানন্দের ব্যক্তিত্ব	—	শ্রীঅনন্ত	৪৯৪
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	শ্রীঅপরেশ চন্দ্র	৫০০
শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র	—	শ্রীশচন্দ্র মতিলাল	৫০৪
স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণে	—	মুসাফির	৫০৭
প্রেমিক পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১৩
রসিক পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ	—	স্বামী ভূমানন্দ	৫১৮
মহারাজের অকথিত ভালবাসা	—	শ্রীঈশ্বর	৫২৩
ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মানন্দ	—	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৫২৭

নির্ঘণ্ট ৫৩০—৫৪০

প্রথম পর্ব

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের একটা ইচ্ছা ছিল—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের যেসব উপদেশ ও সাধনপ্রণালী শিখিয়েছিলেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করা। তাতে ভাবীকালের বহু অধ্যাত্মপিপাসুর সুবিধা হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ঠাকুর তাঁর মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বহু সাধনপ্রণালী শিখিয়েছিলেন। সেসব তিনি অনেক সময় সাধু ও ভক্তদের বলতেন ও শিখাতেন। ঐ সব মূল্যবান উপদেশ এই "স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হলো।

এই গ্রন্থে আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিব্য জীবন, সাধনকথা ও তপস্যা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, গুরুভাব ও সংঘ পরিচালনা, সাধু ও ভক্তদের অধ্যাত্ম জীবন গঠনের নির্দেশ; তাঁর ঠাকুর, মা ও গুরুভাইদের স্মৃতি, তাঁর শাসন ও শোধন, ফস্টিনস্টি, তাসখেলা, মাছধরা, বাগান করা, গো-সেবা প্রভৃতি থেকে সমাধি পর্যন্ত—সব কিছুই এই সব স্মৃতিকথাতে ছড়িয়ে আছে। যাঁরা এই সব স্মৃতিকথা লিখেছেন বা বলেছেন—তাঁদের জীবন কিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সান্নিধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে—তা বিশেষ শিক্ষণীয়।

স্মৃতিকথা জীবনী বা বক্তৃতা নয়, দার্শনিক প্রবন্ধ বা তাত্ত্বিক আলোচনাও নয়। স্মৃতিকথা মানুষের সহজ, সরল ব্যক্তিগত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি। দিব্য জীবনের এসব পুণ্যস্মৃতি আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং স্মৃতিরূপে বেঁচে থাকে। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে মানুষ হাসে কাঁদে নাচে গায়, ভগবদ্ভাবের অনুপ্রেরণা পায় ও লীলা চিন্তার খোরাক পায়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন মূর্তমান ধর্ম—জমাট বাঁধা অধ্যাত্মানুভূতি। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা অনুভব করেছেন যে তিনি ছিলেন ঈশ্বরজানিত পুরুষ এবং ভগবানের নির্দেশে চলেন। তাঁর গুরুভাইয়েরা বিশ্বাস করতেন যে ঠাকুর স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভিতর দিয়ে কাজ করছেন এবং তাঁর আদেশ ও ঠাকুরের আদেশ এক। যে সব সাধু ও ভক্ত এই সব স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁরা মহা ভাগ্যবান। আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চাক্ষুষ দেখিনি সত্য, কিন্তু এসব মূল্যবান স্মৃতি আমাদের স্মৃতিকে আলোকিত করবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সাধারণত "মহারাজ" বা "রাজা মহারাজ" নামে অভিহিত করা হয়। বাংলা ভাষায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনেকগুলি জীবনী আছে। তাঁর সংগৃহীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" এবং "ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ" দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ। মহারাজের উপদেশগুলি খুবই মর্মস্পর্শী; প্রেরণাদায়ক ও সাধন জগতের অভ্রান্ত নির্দেশ। তাঁর কথাগুলি সাধকদের প্রাণে জাগিয়ে দেয় আবেগভরা উত্তেজনা, ভেঙ্গে দেয় অলসতা ও মোহ এবং দেখিয়ে দেয় মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কালে কতকগুলি ব্যক্তিগত স্মৃতি মনে পড়ল, যেগুলি আমি মহারাজের শিষ্য ও ভক্তদের কাছে শুনেছি।

১৯৭০ সালে মায়াবতী যাবার পথে আমি তিন দিন আলমোড়াতে ছিলাম। সেখানে বশী সেন ও তাঁর স্ত্রী গার্ট্রুড সেনের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের ঠাকুর ঘরে স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিস প্রভৃতি দেখলুম, যা তাঁরা সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে পেয়েছিলেন। আমি বশীবাবুকে বললুম, "আপনি রাজা মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলুন।" তিনি বললেন ঃ "আমরা মহারাজের সঙ্গে তাস খেলতুম। মহারাজ নানারকম ফস্টিনস্টি করতেন। একদিন আমি বললুম, "মহারাজ, আপনি কৃপণ।" মহারাজ ঃ "কেন কৃপণ বললি?" আমি ঃ "যার প্রচুর অর্থ আছে, কিন্তু কাউকে দেয় না—সে কৃপণ। আপনি ইচ্ছা করলে অপরকে ঈশ্বর দর্শন করিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আপনি তা দিচ্ছেন না—তাই আপনি কৃপণ।" মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বললেন, "কে চায়? এমন কি সাধু ব্রহ্মচারীরা এসে বলে, 'মহারাজ দীক্ষা দিন, ব্রহ্মচর্য দিন, সন্ন্যাস দিন। কেউ বলে না ভগবানকে পাইয়ে দিন'।" বশীবাবুর এই অপ্রকাশিত স্মৃতিটি আমার মনে চিরদিনের জন্য গেঁথে গেল।

আমি যখন মঠে যোগদান করি তখন মহারাজের অনেক শিষ্য জীবিত। তাঁদের কাছে মহারাজের অনেক কাহিনী শুনেছি। তারপর ১৯৭১ সালে যখন হলিউডে আসি, প্রভবানন্দজী ও পবিত্রানন্দজীর কাছে মহারাজের অনেক কথা শুনেছি। মহারাজ কী ভাবে যুগপৎ শাসন ও ভালবাসার দ্বারা জীবন গড়তেন তা তাঁরা বলতেন। একবার পুরীতে স্বামী প্রভবানন্দকে মহারাজ একটা কাজ ঠিক মতো করতে না পারায় খুব বকেছিলেন। তিনি কোন প্রতিবাদ না করে গুরুর সেবা করতে থাকেন। সব শুনে স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভবানন্দকে বলেন ঃ "দেখ, তিন রকম শিষ্য আছে— উত্তম, মধ্যম ও অধম। অধম গুরুর ব্যক্ত

আদেশ পালন করে। মধ্যম গুরুর ইঙ্গিত পেলে কার্য সিদ্ধ করে। আর উত্তম গুরুগতপ্রাণ। গুরুর যা প্রয়োজন তা আগে থেকে চিন্তা করে সম্পন্ন করে। তোমরা যাতে উত্তম শিষ্য হও—মহারাজ তাই করছেন।”

১৯৭৩ সালে সিয়াটেলে স্বামী বিবিদিষানন্দকে ঠাকুর ঘরে ধ্যান-জপ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, “মহারাজ আপনাকে দীক্ষা দেবার সময় কী উপদেশ দিয়েছিলেন?” তিনি উত্তরে বলেন ঃ “দেখ, মহারাজ আমাকে বলেন যে পূজা, পাঠ, জপ ও ধ্যান—এই চারটাই করবি। তাহলে অধ্যাত্মজীবন এক ঘেয়ে হবে না।” বৃদ্ধ সাধু গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি মহারাজকে হাওয়া করছেন এবং ভাবছেন ঃ দেখব মহারাজের কিরূপ প্রভাব ও শক্তি। তিনি মনে মনে একটা কুচিন্তা করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। হঠাৎ মহারাজ তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, “কী পারলি?” ঐ ব্যক্তিটি বুঝলেন যে মহারাজ অন্তর্যামী।

মানুষের ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। মহারাজ সাধু ভক্তদের দোষত্রুটি অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর দোষ শোধরাবার পদ্ধতি ছিল অপূর্ব। কাউকে তিরস্কার করতেন; কাউকে স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা নিজের কাছে রেখে শোধরাতেন; কারো মনকে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা উপরে তুলে দিতেন; কারো দূষিত মনের ভারবোধকে ফস্টিনস্টির দ্বারা লঘু করে দিতেন, কখনও বা উদাসীনতার দ্বারা শিক্ষা দিতেন।

একবার মহারাজের এক প্রিয় যুবক ভক্তের নৈতিক অবনতি ঘটে। সে ভয়ে ও লজ্জায় মহারাজের কাছে যাওয়া বন্ধ করে। একদিন দুপুরে সে বলরাম মন্দিরে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যায় এবং হঠাৎ মহারাজের সামনে পড়ে। মহারাজ খুব প্রীতির সঙ্গে তাকে বলেন, “হ্যাঁরে, বড় শিংওয়ালা মোষ দেখেছিস?” “হ্যাঁ মহারাজ।” “কত বড় শিং দেখেছিস?” যুবকটি হাত প্রসারিত করে দেখাল। মহারাজ নিজের হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, “এর চেয়ে আরও বড় মোটা মোষের শিং আছে। আচ্ছা, বলতে পারিস সেই মোষের শিং-এর উপর যদি অনেকগুলো মশা বসে, মোষ কি জানতে পারে, না তার কষ্ট বোধ হয়? আমাদেরও তেমনি জানবি।”

ভাল মানুষকে ভাল করবার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। খারাপ মানুষকে ভালবেসে যে ভাল করতে পারে সেই প্রকৃত মহাত্মা। মহারাজ ছিলেন পতিতপাবন। তিনি থিয়েটারের নটনটীদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা

তাদের মনকে ভগবানের দিকে চালিত করেছেন। দীন, দুঃখী, শোকার্ত, পতিত, ধনী, দরিদ্র, গায়ক, বাদক—সব রকমের লোক মহারাজের কাছে আসত প্রাণ জুড়াতে। তিনি আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, তাই সবাইকে আনন্দ দিতে পারতেন। আর এই আনন্দই সকল মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

পুরানো উদ্বোধন পত্রিকায় ও বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়ান সব স্মৃতিকথা আমি মালাকারে গেঁথেছি। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উৎস দেওয়া হলো এবং সব প্রকাশকদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা হলো। ভগবৎপূজায় নানাবিধ বস্তুর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে ঐ পূজায় সহায়তা করে। মহারাজের এই স্মৃতিপূজায় আমি ভক্তি-চন্দন ঘষার কাজ নিয়েছি। ভক্তগণ এই দিব্যগন্ধের আঘ্রাণ পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

স্বামী চেতনানন্দ
সেণ্ট লুইস, আমেরিকা
জন্মাষ্টমী, ৩০ আগস্ট, ২০০২

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (সংক্ষিপ্ত জীবনী)

স্বামী বামদেবানন্দ

আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের শুভ জন্মতিথি। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্য করিয়া আজ আমরা সকলে তাঁহার প্রধান লীলাক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছি। বৎসর বৎসরই এ আনন্দোৎসব আমরা করিয়া থাকি—উদ্দেশ্য তাঁহার সুমধুর জীবনের পুণ্যস্মৃতি পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে জাগাইয়া সারা বৎসরের অবসন্ন দেহ-মনকে শান্ত করিব। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র মন সংসারের নানা কাজে, নানা গোলমালে, নানা ঝঞ্ঝাটে অতি সহজেই পথ হারাইয়া বসে। সম্বৎসরেও একবার সদালোচনা, সচ্চিন্তা করিবার সময়ও যেন অনেকেরই জীবনে ঘটে না। তাই বিশেষদিনে, মহাপুরুষদের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্য করিয়া আমরা সকলে ক্লান্ত মনকে শান্ত করিতে সমবেত হই। প্রতি বৎসর মিলন উৎসবে যোগদান করি—আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে মহাপুরুষদের বাণী ও জীবনের সঙ্গে মিলাইতে। এই দুর্নিবার সংসাররূপ ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাইয়া কতটা আমরা তাঁহাদের প্রদর্শিত রাস্তায় চলিয়াছি—কতটা আমরা জীবনের উচ্চতম আদর্শের দিকে ধাবিত হইয়াছি—কতটা আমরা মানুষ জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছি—ইহাই পরিমাপ করিবার আজ উপযুক্ত সময়। তা না হইলে উৎসবানন্দের হৈচৈ শুধু হৈচৈতে পরিণত হয়—আনন্দের সার্থকতা থাকে কই? স্বামী ব্রহ্মানন্দের সুবিস্তৃত জীবনের সমগ্র ঘটনাবলী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, এত অল্প সময়ে বিবৃতি করা অসম্ভব। অতি সংক্ষেপে দুচারিটি কথায় এই মহাপুরুষের জীবনের আভাস মাত্র দিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। তারপর মহাপুরুষদের জীবনী সাধারণ মানুষের মতো এত সহজ সরল নয়। তাঁহারা জগদ্‌গুরু, জগতের শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহাদের এই পৃথিবীতে আগমন। কখন কি ভাবে, কাহাকে কি ভাবে যে তাঁহারা শিক্ষা দেন, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিভিন্ন অধিকারীকে বিভিন্নাবস্থায় তাঁহারা কি ভাবে গন্তব্য পথে লইয়া যান—তাহা আমরা কি করিয়াই বা বুঝিতে পারি? সেইজন্য যাঁহারা মহারাজের সৎসঙ্গে বাস করিয়াছেন—যাঁহারা বহুদিন তাঁহার সুবিস্তৃত জীবনের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়াছেন—তাঁহারা প্রাণে প্রাণে জানেন অদ্ভুত জীবনের বিভিন্নমুখী প্রতিভা কি ভাবে কার্য করিয়াছিল।

এই বিশাল ভাব-সমুদ্রের ঢেউ-এর প্রতিঘাত যাঁহাদের জীবনে প্রেরণা দান করিয়াছে, তাঁহারাও বুঝিয়াছেন এই অসীম আনন্দের শক্তি কতটুকু? তাহাও শুধু বুঝিয়াছেন—সেই আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন না। মহারাজের অপার করুণার যে বিমল আনন্দ প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে লাভ করিয়াছেন—তাহা কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যায়? "বুঝে প্রাণ, বুঝে মন অবাঙ্‌মনসগোচরম্—" এইরূপ একটা অবস্থা।

সকলেই জানেন মহারাজ ১২৬৯ সালে বসিরহাটে ধনী গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সুখে লালিত-পালিত হইয়া দুঃখ কাহাকে বলে—বড় একটা জানিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। ছেলেবেলায় নাম ছিল রাখাল। সুখের সংসারে যেমন হয় অতি অল্প বয়সে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে মিলিত হন—তখন তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে ত্যাগ বৈরাগ্য ও তীব্র ব্যাকুলতায় তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি পূর্ণ হইয়া উঠিল—ঠাকুর আশীর্বাদ করিলেন—"তোর সংসার ঘুচে যাবে।" ঠাকুরের প্রতি কথাই সত্য হইল। চিরকালের মতো রাখালের সংসার ঘুচিয়া গেল।

১৮৮১ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণেশ্বর আসার চার/পাঁচ মাস পূর্বে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন। দক্ষিণেশ্বর আসার পূর্বেও তাঁহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কলকাতায় একই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। খেলাধূলাও একই সঙ্গে হইত। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তাঁহাদের জীবনের পট পরিবর্তিত হইল—আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা! ঠাকুর রাখাল মহারাজের সম্বন্ধে কত কি বলিতেন। ভাবাবেশে, আবেগ ভরে পুত্রের ন্যায় কত স্নেহ করিতেন। লীলাপ্রসঙ্গে তার কিছু কিছু আভাস দেওয়া আছে। ঠাকুর বলিতেন ঃ "রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি মা একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এটি তোমার পুত্র' শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম—সে কি? আমার আবার ছেলে কি? তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়াছিলেন—সাধারণ সংসারী ভাবে ছেলে নয়—ত্যাগী মানস-পুত্র, তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।

"তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন/চার-বৎসরের বালক। আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। সহসা দৌড়াইয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত। এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন পান করিত। বাড়ি তো দূরের কথা,

এখান হইতে কোথাও এক পাও নড়িতে চাহিত না।” সত্যই ঠাকুর যেন রাখালকে আপনার পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ ভাবে পুত্রবৎ স্নেহ আর কেহ পান নাই। ঠাকুরের অসীম স্নেহে মহারাজ বাড়ির কথা একেবারেই যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু বাড়ি কেন—এই বাহিরের বিরাট দুনিয়ার সঙ্গে তাঁহার যেন কোন সম্পর্কই ছিল না। দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে আপনভোলা হইয়া তাঁর সুখের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর অতি সমাদরের সহিত রাখালের পিতাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং রাখাল যাহাতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট থাকিতে পারে তার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তির কাছে রাখালের পিতার ওজর-আপত্তি কার্যকরী হইল না। রাখাল নিশ্চিন্তে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গেলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রায় ৩ বৎসর পরে বলরাম বসুর সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন যান। বৃন্দাবনের মনোহর সৌন্দর্য রাখালের মন হরণ করিল—ব্রজের রাখালের লীলাস্থলে উপস্থিত হইয়া গভীর ভাবে তিনি আকৃষ্ট হইলেন এবং আনন্দের সহিত তিনি সেইখানে অনেক দিন বাস করিলেন। তথায় থাকাকালীন একবার তাঁহার অসুখ হইয়াছিল। অসুখের সংবাদ দক্ষিণেশ্বরে আসিল। ঠাকুর তো ভাবিয়া আকুল, রাখালের কি হইবে। পরে একদিন বলিয়াছিলেন—“বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতঃপূর্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যেখান হইতে যে আসিয়াছে সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব-কথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেইজন্য ভয় হইয়াছিল—পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন। ঐরূপ রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন, তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।”

ঠাকুরের পবিত্র সংস্পর্শে রাখালের মন ক্রমে ক্রমে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর হইয়া গেল। তখন অধিকাংশ সময়ই তিনি ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। কি আনন্দে তখনকার দিন যে অতিবাহিত হইত, কি আনন্দে এ দুনিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন—তাহা পরবর্তী জীবনে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন—“আহা! কি আনন্দেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট কাটাতাম। ...এখন যা ধ্যান ধারণায়ও অনুভব করতে পারি না—তখন যেন আপনা হতে হয়ে যেত। একটু কিছু মন খারাপ হলে

তিনি চেহারা দেখেই বুঝতে পারতেন—এবং আমার বুকে হাত দিয়ে সব ঠিক করে দিতেন। কি খোলাখুলি ভাবেই তাঁর সঙ্গে মিশতাম। একদিন ঠাকুরের ঘরের পেছন দিকের গোল বারান্দায় বসে ঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছিলাম। কোন কারণে তখন রাগ করে তেলের বোতল ছুঁড়ে ফেললাম এবং আর কখনও তাঁর নিকট আসব না বলে রওনা হলাম। দক্ষিণেশ্বর হতে বাহির হয়ে যদু মল্লিকের বাগানের নিকট এসেছি, কি জানি কেন আর চলতে পারলাম না—বসে পড়লাম। ইতোমধ্যে ঠাকুর আমাকে নিয়ে যাবার জন্য রামলালকে পাঠালেন। যখন ফিরে গেলাম—বললেন—'দেখলি? যেতে পারলি?'

আরও বলতেন—"যতদিন তাঁর সঙ্গে বাস করেছি—সকল সময়ই যেন ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম—কি এক বিমল আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকতাম।" এরূপ ঠাকুর সম্বন্ধীয় কত কথা মহারাজ বলিয়াছিলেন তা এ ক্ষুদ্র প্রবেন্ধ লেখা অসম্ভব। ইতোমধ্যে ঠাকুরের অপরাপর শিষ্যবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অর্থাৎ ঠাকুরের দেহ রক্ষার প্রায় এক বৎসর পূর্বে সকলেই আসিয়াছেন। ঠাকুর তখন তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত; কিভাবে ভবিষ্যৎ বিরাট সংঘের নেতাদের তিনি শিক্ষাদীক্ষা দিবেন—তাহাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। রাখালের মধুর শান্ত স্বভাবে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—বিশেষত নরেন্দ্রনাথ। একদিন নরেন্দ্রনাথ অপরাপর ভাইদের বলিলেন—"ওরে! আমরা রাখালকে রাজা বলব।" তাতে সকলেই সম্মত হইলেন এবং ঠাকুরও একথা শুনিয়া অতিমাত্রায় আনন্দিত হইলেন। তাই তিনি ঠাকুরের আলালের দুলাল ব্রজের রাখাল—স্বামীজীর আদরের রাজা, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের শ্রদ্ধেয় মহারাজ এবং জনসাধারণের স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

যাক—এ আনন্দের হাট বেশিদিন রহিল না। ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ কাশীপুরের বাগানে নীত হইলেন। সেখানে ক্রমেই তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইল এবং সকলেই একেবারে নিরাশ হইলেন। তাঁহার মহাপ্রস্থানের ঠিক ৪ মাস পূর্বে একদিন সকাল বেলা মহারাজ ঠাকুরের পায়ে ধরিয়া বলিলেন—"আপনার শরীর যাতে ভাল হয়—তার জন্য মাকে বলুন—আপনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।" ঠাকুর বলিলেন—"মার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" নরেন্দ্রনাথ পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন—বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা ও মার ইচ্ছা একই।" ঠাকুর বলিলেন, "মার ইচ্ছাতে আমার ভাব মিলে গিয়েছে। আমি আর পৃথক করে দেখতে পাচ্ছি না।" ইঙ্গিত সকলেই বুঝিতে পারিয়া হতাশ হইলেন—শীঘ্রই ঠাকুর মহাসমাধিতে দেহ রাখিলেন।

ঠাকুরের দেহ রক্ষার কিছুদিন পর বরাহনগরে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া গুরুভাইরা সব বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর সেখানে বাস করিয়া পরিব্রাজক জীবন অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত ভ্রমণে বাহির হইলেন। খোকা মহারাজও (স্বামী সুবোধানন্দ) সেই সময় তাঁহার সঙ্গে রওনা হইয়া প্রথমে কাশী গমন করতঃ একটি বাগানে বাস করিতে লাগিলেন এবং মাধুকরী করিয়া সেখানে কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। কিছুদিন এই ভাবে বাস করিয়া তাঁহারা পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং নাসিক, দ্বারকা প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে মহারাজ বড় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন—নিয়মিত ভাবে মধ্যরাত্রে উঠিয়া জপ-ধ্যানে বসিতেন। ইহা দেখিয়া একদিন খোকা মহারাজ বলিয়াছিলেন—"আপনার এত কঠোরতা কেন? ঠাকুর আপনাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন—আপনার কিসের অভাব?" মহারাজ বলিয়াছিলেন—"ঠিক বলেছ! ঠাকুর যা দেবার সব দিয়ে গেছেন। কিন্তু এখনও শান্তি পাইনি। এতে বোঝা যায় জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য বাকিটা আমাদের করে নিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয়তম শিষ্য উদ্ধবকে বলেছিলেন, 'উদ্ধব! যদি সম্যক জ্ঞান লাভ করতে চাও তবে হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে গিয়ে তপস্যা কর। যদি তুমি চাও তোমাকে সিদ্ধাই দান করতে পারি। কিন্তু তাতে কি হবে। ভগবানের ধ্যান-ধারণা এর চাইতে অনেক বড় জিনিস।' জপ-ধ্যান ব্যতীত ভগবানের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয় না।" পরবর্তী জীবনেও মহারাজ একথাটি বিশেষ করিয়া বলিতেন। "নিজেকে করে নিতে হয়, খাটতে হয়। না খাটলে কিছু হয় না। গুরু পথপ্রদর্শক। কোন্ রাস্তায় যেতে হবে শুধু বলে দেন। শিষ্যের কাজ গুরু-বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করে সেই পথে চলে যাওয়া।"

বৃন্দাবন হইতে পুনরায় বাহির হইয়া মহারাজ উত্তর ভারতের নানাস্থানে পর্যটন করিতে লাগিলেন। এই সময় অন্যান্য গুরু ভাইরাও নানাস্থানে পর্যটন করিতেছিলেন সুতরাং রাস্তায় স্বামীজী, তুরীয়ানন্দ স্বামী প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। অবশেষে বহুকাল ভ্রমণের পর মহারাজ ১৮৯৪ খ্রীঃ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে মঠে ফিরিলেন। মঠ তখন বরাহনগর হইতে আলমবাজারে। মঠে ফিরিয়াও মহারাজ জপ-ধ্যানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। কখন-কখনও আবেগভরে গান গাহিতেন—"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন। তলাতল খুঁজলে পাবি, পাবিরে সেই রত্নধন।"

সেই সময় কি ভাবে যে দিন অতিবাহিত হইত হুঁশ থাকিত না। সমস্ত

দিনব্যাপী তাঁহাকে শুধু জপ করিতে দেখা যাইত। কিভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ-স্তরে তাঁর মন সে সময় নিমগ্ন থাকিত কে জানে? ভগবল্লাভের জন্য যে প্রেরণা যে উৎসাহ লইয়া তখন তিনি নিমগ্ন থাকিতেন, তার সামান্য আভাস আমাদের মতো মানুষের বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়? সাধারণ মানুষ ইহার যে কোন সন্ধানই জানিতে পারে না। কিছুদিন পর স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার গুরু ভাইদের সহিত মিলিত হইলেন। স্থায়িভাবে মঠের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বেলুড়ে জমি ক্রয় করিলেন। এই সময় হইতেই তিনি দেশের এবং দশের সেবার জন্য স্থায়িভাবে যাহাতে কোন কাজ আরম্ভ হয় তার জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন। মহারাজ স্বামীজীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া আজ্ঞাবাহী সৈনিকের মতো সকল কাজেই বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। মঠের নির্মাণ কার্য শেষ হইবার পর স্বামীজী মঠের সকল কাজের কর্তৃত্ব মহারাজকে দিয়া বলিলেন—"রাজা, আজ হতে এ সমস্ত তোর। আমি কেউ নই।" কার্যের সুবিধার জন্য Trust-Board গঠন করিয়া মহারাজকে President মনোনীত করেন। সেদিন হইতে মঠের যাবতীয় কাজ, যাবতীয় খুঁটিনাটি, মহারাজ মাথায় করিয়া লইলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া মঠের কি ভাবে মঙ্গল হয় তার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামীজী যে গুরু দায়িত্বভার তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন—মহারাজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া দেখাইলেন—গুরুভাই-এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, অগাধ ভালবাসা, কাহাকে বলে। স্বামীজীর ন্যায় তিনিও গুরুভাইদের অশেষ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে অতি আপনার জন বলিয়া জানিতেন। তিনি মঠে উপস্থিত না থাকিলে মঠ যেন নীরব হইয়া পড়িত। সকলের উৎসাহ যেন কমিয়া যাইত।

গুরু ভ্রাতাদের ন্যায় তিনি শিষ্যদেরও ভালবাসায় জয় করিয়াছিলেন। সে ভালবাসা কত গভীর, সে আকর্ষণী শক্তি কত প্রবল তাহা অনুমান করা যায় না। যাঁহারা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই শুধু জানেন—গুরু শিষ্যের সম্পর্ক কতটা মধুর, কতটা গভীর। বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী চালিত করিয়া একই লক্ষ্যে লইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন—"আমি সকলকে স্বাধীনতা দেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবে অগ্রসর হোক, যেখানে পারবে না—সেখানে শুধু সাহায্য করি।" ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্, জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্—গীতার এই উপদেশ তিনি প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তিনি কর্তা ছিলেন কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল না।

শাসক ছিলেন—কিন্তু অভিমান ছিল না। যিনি একবারও তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহার গুরু গম্ভীর ভাব, শান্ত সরল স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিয়া বলিতেন—"কিছু কর, কিছু কর, না খাটলে কি কিছু হয়। তোরা ভাবছিস যে, আগে অনুরাগ ভক্তি হোক, তারপর ডাকবো! তাকি কখনও হয়, অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই প্রেমভক্তি বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে। তাঁকে আনবার জন্যই তপস্যা। তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন—তপঃ তপঃ। দেখছিস নি অবতার পুরুষদের পর্যন্ত কত খাটতে হয়েছে। কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এদের কত তপস্যা করতে হয়েছিল। কি ত্যাগ, কি তপস্যা! এই তো বয়স, বুড়ো মেরে গেলে কিছু হবে না। লাগ দেখি একবার জোর করে, দেখবি মনের সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগ লাগ, জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয় সবই সমান—একটা ধরে ডুবে যা।"

মহারাজ মধ্যে মধ্যে মঠ হইতে নানা স্থানে ভ্রমণে যাইতেন। দক্ষিণ দেশে তিনি একাধিকবার গমন করতঃ সেখানকার প্রায় সকল তীর্থাদি পরিভ্রমণ করেন। মহারাজের গম্ভীর ভাব, সহজ সরল স্বভাবে যে কি আকর্ষণী শক্তি ছিল—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ যেখানে যাইতেন সেইখানেই বহুলোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইত। নিত্য উৎসব যেন লাগিয়া থাকিত। কোন বিশেষ তীর্থাদিতে কখনও কখনও ভাবে সমাধিস্থ হইতে দেখা যাইত। পুরীতে তিনি অনেকবার গিয়াছেন। এই স্থান সাধন ভজনের সহায়ক বলিয়া বড়ই ভাল লাগিত। সেইজন্য পুরীর নিকটবর্তী ভুবনেশ্বরে একটি নির্জন স্থান দেখিয়া মঠ তৈয়ারি করিলেন। সেই মঠ আজিও মহারাজের স্মৃতিস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। তাঁহার বড় সাধের আদরের অনুষ্ঠান—ভুবনেশ্বরের এই মঠে তিনি শিষ্য সমাবৃত হইয়া কতকাল যে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন ছিলেন—তাহা যাঁহারা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন—তাঁহারাই জানেন। কত ভাবে কতদিন তিনি সকলকে আনন্দ দান করিয়াছেন—সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছেন তাহাও তাঁহারা বিশেষ ভাবে জানেন। মঠে যখন থাকিতেন—তখনও যেন নূতন উৎসাহ নূতন প্রেরণা সকলের ভিতর জাগিয়া উঠিত। বাহিরে বহুদিন ভ্রমণ করার পর যখন মহারাজ মঠে ফিরিতেন, তখন যেন সত্য সত্য রাজা মহারাজ রাজধানীতে ফিরিতেছেন। মঠের বাড়ি ঘর দোর বিশেষভাবে পরিষ্কার করিয়া সকলে রাজার আসন ঠিক করিয়া রাখিতেন।

অনেকেই ভাবে সকলে মহারাজের প্রতি কেন এতটা আকৃষ্ট হইত। বিদ্যার আড়ম্বর ছিল না—কথাবার্তাও বিশেষ ছিল না। অষ্ট সিদ্ধাই-এর কোনটাই ছিল না, তবে কেন এতটা আকর্ষণ! এ সব ছিল না সত্য! কিন্তু এমন একটি শক্তি ছিল যাহাতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকে আপনার করিয়া লওয়া যায়—উহার নাম ভালবাসা। সেই ভালবাসার কোমল ডোরে মহারাজ সকলকে বাঁধিয়াছিলেন। এ বাঁধনে কষ্ট নাই—আকর্ষণ আছে; বিরক্তি নাই—প্রীতি আছে; মোহ নাই—মোহিনী শক্তি আছে। শেষ জীবনে মহারাজকে প্রায়ই যেন ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে দেখা যাইত। তাঁহার শরীরখানি যেন ভাবময় হইয়া পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে বাহির হইতে মন সংযত করিয়া তিনি অন্তর্রাজ্যে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ ভুবনেশ্বর হইতে মঠে আসার কিছুদিন পর বলরাম বসুর বাড়িতে তিনি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ভাল ভাল ডাক্তার দেখান হইল কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অসুখ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে!" তিনি উত্তর করিলেন—

সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্বকং
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।

আমার অবস্থা এখন এইরূপ। তোমরা এইটে ধারণা কর। শেষ অবস্থায় তিনি যে সেই "ব্রজের রাখাল" তা বুঝিয়াছিলেন। মর্মকথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু! ... কৃষ্ণ এসেছ! আমাদের এ কৃষ্ণ আলাদা—এ ব্রজের কৃষ্ণ, কমলে-কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়।"

"ওরে আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের সঙ্গে নাচব। ব্রহ্ম সমুদ্রে একটি বিশ্বাসের পত্রে ভেসে যাচ্ছি—ঠাকুরের পা দুখানি কি সুন্দর দেখি দেখি।" ইত্যাদি কত কথাই সুমধুর সুরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পরদিন রাত্রি প্রায় নটার সময় মহারাজ ইহধাম হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।

সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়মুখে
চলে যাব গান গাহি।
কে রহিবে আর দূর পরবাসে।

ব্রজের রাখালের মন দূর পরবাসে আর থাকিতে চাহিল না। তিনি যেখান হইতে দু-দিনের তরে আসিয়াছিলেন আবার সেখানে চলিয়া গেলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মানন্দে লীন হইয়াছেন। পশ্চাতে রহিল তাঁহার অনন্ত

স্মৃতি—অনন্ত ভালবাসা। যতদিন নিঃস্বার্থ ভালবাসার মূল্য এ জগতে থাকিবে—যত দিন মানুষ আপন ভুলিয়া পরকে ভালবাসিতে জানিবে—ততদিন তাঁহার স্মৃতি মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনালোকে আজ নব্য ভারতে যে নবযুগের সূচনা হইয়াছে—তাহার গতি কিভাবে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিবে—কে জানে? এই অসীম ভাবের শেষ ঢেউয়ের ধাক্কা কতদূর—কে বলিবে?

কিন্তু এই নবযুগের প্রতি, এই নব প্রবর্তকদের প্রতি—আমাদের বিশেষ আকর্ষণ আছে। থাকাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা এ যুগের সন্তান—পতাকাবাহী সৈনিক। আর এই নূতন ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করিতে, যে সব মহাপুরুষ আগমন করিয়াছিলেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁদেরই অন্যতম—শ্রেষ্ঠ। বাহিরের দিক দেখিয়া আজ বিচার করিব না। যাঁহারা ফল্গু নদীর মতো অন্তঃসলিলা হইয়া ভাবের গভীরতম উৎসের সৃজন করিয়াছেন—যাঁহারা বাহ্যিক হাব-ভাব হইতে মন সংযত করিয়া অন্তরের গভীরতম খনির মাণিকের সন্ধান দিয়াছেন—তাঁহাদের আজ বাহিরের দিক দেখিয়া বিচার করিলে ছোট করা হয়। চাই অন্তর্দৃষ্টি—চাই অনুভূতি। তবেই এই মহাপুরুষদের মূল্য কতটুকু তার একটু আভাস হয় তো পাইতে পারি। নবযুগের নূতন প্রভাবে আজ আমাদের এই দৃষ্টিই ফুটুক। আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের মণির সন্ধানে যেন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি।

এই পুণ্য মিলনের মঙ্গল উৎসব সার্থক হইবে—যদি আমরা মহারাজের প্রদর্শিত পথে নিজের ক্ষুদ্র জীবনকে চালাইতে পারি। মঙ্গল উৎসব আজ সার্থক হইবে—যদি আমরা তাঁহাদের পবিত্রতা ও জীবনাদর্শে আমাদের দেহ-মনকে পবিত্র করিতে পারি। "রাজা! আজ হতে ও সব তোর। আমি কেউ নই!" স্বামীজীর করুণ কথাগুলি চিরকাল মহারাজের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। "এই সব" অর্থ শুধু বাহিরের জিনিস নয়। নূতন যুগে ঠাকুর স্বামীজীর দেওয়া যে নূতন ভাব। মঠের সেই ভাব বজায় রাখিবার জন্য মহারাজ আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন—আজ্ঞাবাহী সৈনিকের মতো ঠাকুর স্বামীজীর নূতন ভাব জনসাধারণের প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমরা? আমরাও কি তাঁহাদের পতাকাবাহী হইয়া প্রত্যেকে নিজেকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিব? আমরাও কি সেই ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র আনন্দও জীবনে অনুভব করিতে পারিব।

(উদ্বোধন ঃ ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কথাপ্রসঙ্গে

স্বামী শংকরানন্দ

(স্বামী শংকরানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং দীর্ঘদিন মহারাজের সেক্রেটারি ও সেবক ছিলেন। তিনি কোন স্মৃতিকথা লেখেন নি, তবে উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত "স্বামী ব্রহ্মানন্দ" জীবনী গ্রন্থের সব উপাদান তিনি জোগাড় করেন এবং কুমুদবন্ধু সেন উহা লেখেন। জনৈক সেবক সন্ন্যাসী স্বামী শংকরানন্দজীর সেবা করবার সময় তাঁর মুখ থেকে পুরনো দিনের কথা, ঠাকুরের সন্তানদের কথা যা শুনতেন, তা লিখে রাখতেন। সেই সব কথা পরবর্তী কালে "স্বামী শংকরানন্দের গল্পকথা" নামে একখানি পুস্তক বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। যদিও এই স্মৃতিকথাগুলি সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত, তবুও পূজ্যপাদ মহারাজের এই স্মৃতিকণাগুলি ভক্তদের কাছে দুর্লভ বস্তু। —সম্পাদক)

"১৯১২ সাল। (রাজা) মহারাজের সঙ্গে আমি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছি। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে। (রাজা) মহারাজ আমায় বললেন—"দেখ অমূল্য, মাকে আজ চপ তৈরি করে খাওয়াতে হবে।" আমি বাজার থেকে মোচা ও আলু কিনে আনলাম। সিদ্ধ করলাম। মোচার ভিতরকার পুর। আলু সিদ্ধ করে ছাড়িয়ে মাখছি, দেখলাম—থসথসে নরম। তখন আর-একটা জিনিস দিয়ে, সেটাকে শক্ত করে নিলাম। চপ তৈরি করে যখন একটি থালায় সাজিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলাম, তখন মা পূজা শেষ করেছেন। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে মা চপ-ও ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মা অন্য প্রসাদের সঙ্গে চপ-প্রসাদও খেলেন। খুব ভাল লেগেছে। গোলাপ-মাও খেয়েছেন। বেশ মচমচে চপ। খেয়ে তারিফ করলেন। বিকেলে ওপরের বারান্দা থেকে গোলাপ-মা আমায় জিজ্ঞাসা করছেন—"হ্যাঁ অমূল্য, এত চমৎকার চপ কি করে তৈরি করলে? কেমন মচমচে, খুব সুস্বাদু।" (রাজা) মহারাজও তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমায় চোখ টিপে দিলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোন উত্তর দিলাম না। মহারাজ উত্তর দিলেন, "গোলাপ-মা, তোমরা ভেবেছ তোমরাই ভাল রান্না করতে জান। এখন দেখ, আমরা তোমাদের চেয়ে ভাল রান্না করতে পারি।"

(রাজা) মহারাজ পরে আমায় তৈরি করার প্রণালী জিজ্ঞেস করেছিলেন। বললাম—যখন আলু চটকাতেই নরম চটচটে হয়ে গেল, তখন সুজি ভেজে, ওর সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। মশলা-ও ভেজে গুঁড়িয়ে পুরের সঙ্গে ঠেসে নিয়েছিলাম। মায়ের স্বভাবই ছিল—সব জিনিসকে ভালভাবে দেখা। মা তো সকলের মা।

একবার রাজা মহারাজ নিজের ঘরে ইজি চেয়ারে বসে আছেন, আমি তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ হাত থেকে স্লিপ করে খুরটা পড়ে গেল। মাটিতে পড়ার আগেই আমি এ-হাত ও-হাত করে খুরটাকে মেজেতে পড়ার আগেই ধরে নিলাম। একটুও ঘাবড়ে যাইনি। ধীর স্থির মাথায় কৃতকার্য হলাম। (রাজা) মহারাজ নীরবে সব দেখলেন। বলে উঠলেন—"বাঃ বাঃ! যেন—Juggler!"

অটল মিত্র একজন জাহাঁবাজ লোক। প্রথমে তিনি পুরী জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ভারি দুরন্ত। লোকে যমের মতো ভয় করত তাঁকে। তিনি ভুবনেশ্বরে (রাজা) মহারাজের কাছে প্রায়ই আসতেন। আমরা তখন বাক্সে ও মাটির গামলায় কপির চারা করতাম। তিনি আমাদের কাছ থেকে চারা চেয়ে নিতেন, কখনো আবার কাকেও কিছু না বলে চারার বাক্স বা গামলা তুলে নিয়ে চলে যেতেন। (রাজা) মহারাজ যে জানতেন না, তা নয়। তিনি সবই জানতেন, শুনতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। আমি মনে মনে খুবই চটতুম। একবার তো চটেমটে বলেই ফেললুম। আমাদের মহারাজ জেনে শুনে চুপটি করে থাকতেন, কিছু না বলে সব সহ্য করতেন। অটলবাবুর তিন স্ত্রী ছিল—দুটি বিবাহিতা, একটি রক্ষিতা। রক্ষিতাটি তাঁর সেবা যত্ন রান্নাবান্না করে দিত। মহারাজজীর কিছু অবিদিত ছিল না। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করতাম—তাঁর মহারাজজীর উপর কী অটল শ্রদ্ধা ও ভক্তি! অকপটে নিজের যাবতীয় দোষ-অপরাধের ও অত্যাচারের কাহিনী মহারাজজীর কাছে বলে যেতেন। ধৈর্যসহকারে মহারাজজী শুনে যেতেন। একটাও 'হ্যাঁ' বা 'না' করতেন না। ওঁর কুয়োর জলটা খুব ভাল ছিল। মহারাজজীর জন্য নিজের বাড়ির গরুর দুধ ও কুয়োর জল, রোজই পাঠিয়ে দিতেন। অটলবাবু কত রকমে যে মহারাজের সেবা করতেন, তার ইয়ত্তা নাই। একবার তাঁর পুরীর বাড়িতে মহারাজজীকে একমাস রেখে দিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়া, থাকা, ঘোরাফেরা সবই মহারাজজীর ফরমাশ মতো হতো। প্রায়ই তিনি কার্যালয় থেকে সকাল সকাল পালিয়ে আসতেন, মহারাজজীর সঙ্গ করবেন বলে। এদিকে মহারাজজীকে এত

সম্মান, এত শ্রদ্ধা, বাইরের লোকের কাছে অত্যন্ত বদমেজাজী ও সকলের চক্ষুঃশূল ছিলেন। খুব কড়া শাসন ও নির্দয় ব্যবহারের জন্য প্রতিটি লোক তাঁকে কুনজরে দেখতেন; অপ্রিয় কথাবার্তায় তিনি কেবলই অখ্যাতি ও অসম্মান কুড়িয়েছেন জনসমাজে। নিজে সর্বদা সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় থাকতেন; জীবননাশের ভয় ও আতঙ্ক তাঁকে চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছিল। তিনি ও সমস্ত গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। সর্বদা বুক ফুলিয়ে অহংকারে স্ফীত হয়ে চলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—গুরু তাঁকে সর্বদা রক্ষা করে চলেছেন।

এই কালান্তকতুল্য লোকটি মহারাজজীর কাছে মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো অবনত মস্তক, জোড়হাত, শান্তশিষ্ট—যেন কত গো-বেচারা! কয়েক বছর আগে হঠাৎ একদিন ভুবনেশ্বরের রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। (রাজা) মহারাজের কথা বলতে বলতে বুড়ো অঝোরে কেঁদে ফেললেন। তখন আর সে-মানুষ নাই। সে-তেজ, সে-সামর্থ্য, সে-দাপট যেন কোথায় লুকিয়ে গেছে। নরম তুলতুলে মানুষটি। তিনি আমায় বললেন, "আপনারা আমার বাড়ি মাঝে মাঝে গেলে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পাই। আমায় খবর দিলে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।" আমি বললাম—খবর পাঠাতেও তো একটা লোক চাই। বললেন—"আচ্ছা, আচ্ছা! আমিই ব্যবস্থা করব।" প্রায়ই গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রাণভরে সেবা করতেন। যখন ফিরে আসতুম তখন ঠাকুরভোগের জন্য কত তরিতরকারি ও বাগানের অন্যান্য জিনিস গাড়িতে উঠিয়ে দিতেন। এখন অটলবাবু ইহধামে আর নাই। মহারাজজীর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলতেন—"মহারাজই আমার সব, একমাত্র জীবনে তাঁকেই আপনার করে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে হৃদয়ে ধরে রেখে শান্তি ও তৃপ্তি পাই।"

জোয়ান বয়সে আমি একাই (রাজা) মহারাজের সেবা করতাম। ঝোঁকের মাথায় কতজনে সেবা করতে আসত। কয়েকদিন পরে ভেগে যেত। কেউ বড় একটা টিকতে পারত না। মহারাজ যাকে কৃপা করে স্থান দিতেন সেই টিকে যেত। তাঁর অশেষ কৃপা ছিল আমার উপর। বেশ কয়েক বছর আমি সেবার অধিকার নিয়েই ছিলাম। রান্নাবান্না, তাঁকে খাওয়ান-দাওয়ান, তাঁর কাপড়, চোপড়, বিছানাপত্র পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, তেল মাখান, টেপাটেপি প্রভৃতি যাবতীয় কাজ আমিই করতাম। আবার এর ভিতর বাইরের দৌড়াদৌড়ি কাজও ছিল। মহারাজ কাউকে হয়ত নিমন্ত্রণ করলেন। কি কি রান্না হবে বলে দিলেন। ঝটপট করে ফেললাম। মহারাজ

কত কাজের কথা আমায় বলে রাখতেন, কাকে কি বলতে হবে, কে কখন এলে কি কি সংবাদ জানাতে হবে, কাকে কি আদর যত্ন করতে হবে, সব আমায় একসঙ্গে বলে যেতেন, আর আমি তাঁর ফরমাশ মতো যখন যেটি, যেভাবে করা দরকার, ঠিক ঠিক করতাম। কোনদিন কোন কাজ ভুলিনি।

একবার, অনেক দিনের কথা, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তখন মঠের ঘাট তৈরি করছেন। তোর মনে আছে কি না জানি না। মঠের পুরাতন ফটকের (ইণ্ডাস্ট্রিয়ালের সম্মুখে) ডান দিকে নারিকেল গাছের সীমানার মধ্যে একটা পুকুর ছিল। ঐ পুকুরের উত্তর পাড়ে গোয়াল ঘর, পূর্ব দিকটায় পাকা বাঁধান ঘাট। পাইপ দিয়ে গঙ্গার দিকে মুখ খুলে দিলাম। পুকুরে জল ভরে যাবার পর দেখি পাইপের মুখে মাছ কলকল শব্দ করছে। এখন যেখানে মঠ অফিস ঐ ঘরে স্বামীজীর রান্নাঘর ও খাবার ঘর ছিল। ঘরের পাশেই একটা জাল থাকত। আমি ঐ জালটা নিয়ে গিয়ে পাইপের মুখে ফেলতেই বড় বড় সতেরটা ট্যাংরা মাছ পড়ে গেল। একটা বড় বালতিতে জিইয়ে রাখলাম। পরের দিন সকালে মহারাজকে বলতে মহারাজ বললেন—"পেসনের জন্যে রেখে দে, সব মাছ কটা তেলঝাল দিয়ে রান্না করে রাখিস।" তাই করলাম। খাবার সময় বিজ্ঞান মহারাজকে দিলাম, খেয়ে খুব খুশি। মহারাজ বিজ্ঞান মহারাজকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি খেতে পারতেন বলে মাঝে মাঝে তাঁকে এটা সেটা রান্না করে খাওয়াতেন।

যত কাজ আসুক না কেন, কাজকে কখন ডরাতাম না। কাজ করতে করতে এমন ধাত হয়ে গেছিল যে, অল্প সময়ে অনেক কাজ করে ফেলতে পারতাম। কাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকলে তৎপরতা বাড়ে এবং কাজ অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। খাবার নাইবার সময় পেতাম না। প্রায়ই এমন হতো যে খাবার ঘণ্টা বেজে যেত, অথচ তখন চান করা হয়নি। যে কোন একজনকে বলে দিতাম—খাবার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ভাতটাত নিয়ে রাখতে, কোন রকমে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে বসে যেতাম খেতে। অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি খেয়ে সকলের সাথে একসঙ্গে উঠতাম। খুব গরমের সময় দুপুরে ও রাতে মহারাজ যখন শুতেন তখন বাতাস করতাম। এক একবার এমনও হয়েছে যে বাতাস করতে করতে হয়ত রাতটাই কাবার হয়ে গেল। মহারাজ কখনো টের পেতেন, কখনো পেতেন না। যখন টের পেতেন, বলতেন—"যা শুয়ে পড়।" আমি "আচ্ছা" বলে, একটু থেমে গিয়ে পুনরায় পাখা চালাতাম।

"১৯১৭-১৮ সালে যখন ভুবনেশ্বরে মঠের বাড়ি নির্মাণ হয় তখন (রাজা) মহারাজ আমাকে দিয়েই করান। স্থান নির্বাচনের জন্য কত ঘোরাফেরা, পছন্দ আর হয় না। তিন-চারটে Site দেখে, শেষে মহারাজ বর্তমান জায়গা ঠিক করলেন। 'কেদার গৌরী'-র কাছে একটা ছোটখাট ঘর ভাড়া করে আমি সেখানেই থাকতুম। নিজেই রান্না করে খেতুম। সকাল আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে মঠের জায়গায় চলে আসতুম। তখনকার দিনে ভাল মিস্ত্রি পাওয়া এক সমস্যা ছিল। সাধারণ মিস্ত্রিকে শিখিয়ে পড়িয়ে কাজ চালিয়ে নিতাম। মিস্ত্রির বেতন তখন রোজ চার আনা পাঁচ আনা, মজুর ছ-পয়সা দু-আনা। মজুরগুলোকে আমাদের এলাকায় ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে দিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে তিনটে ভাগ করি। যারা বুদ্ধিমান, ভাল কাজ করে, তাদের দু-পয়সা বেতন বেশি, যারা আর একটু ভাল তাদের আরো দু-পয়সা বাড়িয়ে দিলাম। কত হাঙ্গামা হুজ্জুত করে বাড়ি তৈরি করা হয়। উৎকৃষ্ট জাতের পাথর জোগাড় করতে ওড়িশার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি, কত লোকের তোষামোদ করেছি। নিজে ছেনি হাতুড়ি ধরে পাথর dress করেছি। প্রত্যেকটি কাজ নিজে করে দেখিয়ে দিতে হতো তবে কাজ চলত, কাজ এগোত। Forester-এর সাথে আলাপ করে কত ভাল ভাল কাঠ জঙ্গল থেকে সস্তা দামে জোগাড় করেছি। ঐ পেল্লায় রাজরাজাদের মতো বাড়ি করতে তখন মাত্র পাঁচ-ছ হাজার টাকা পড়েছে। রাজপথের উপর বিরাট তোরণদ্বার। জমকালো gate দেখে সাধারণ লোক ভিতরে ঢুকতে সাহস করে না। বাড়ির place, lay-out, অর্থ সংগ্রহ, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজ দেখাশুনা, building-টিকে মজবুত ও সুরুচিসম্পন্ন করে সম্পন্ন করার দায়িত্ব মহারাজ আমায় দিয়েছিলেন। সব কাজ মহারাজকে বলে, তাঁর মতামত নিয়ে আরম্ভ করতাম।

বাড়ি নির্মাণের সময় মহারাজ দুবার বেলুড় মঠ থেকে ভুবনেশ্বরে এসে 'শরৎকুটীরে' কিছুদিন ধরে বাস করেছিলেন। আমার পরিশ্রম ও কাজের ব্যবস্থা দেখে মহারাজ এত খুশি হয়েছিলেন যে, একটা কথা পর্যন্ত বলেন নি। রোজ একবার দু-বার করে আসতেন। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতেন আর সঙ্গের সাথীদের, সেবকদের নিকট সংগত সমালোচনা করতেন। তখন ভবানী (স্বামী বরদানন্দ) মহারাজের Private Secretary। সূয্যি (স্বামী নির্বাণানন্দ), ঈশ্বর (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ) এবং গোঁসাই (রাজা) মহারাজের সেবক। সূয্যির সেবা খুব পছন্দ করতেন। তাই শেষ পর্যন্ত কৃপা করে সূয্যিকে সেবাধিকার দিয়েছিলেন। সে চুটিয়ে গুরুসেবা করে নিয়েছে। এত মুখটি বুজে, ধীর শান্তভাবে অথচ অত্যন্ত

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, একান্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করত যে, তা সবারই হৃদয় স্পর্শ করত। তার সেবার প্রত্যেকটি অঙ্গ আরাধ্য দেবতার পূজার ন্যায়। মহারাজ ওর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ওকে ব্রহ্মজ্ঞানের আশীর্বাদ করেছেন। মহারাজ নিজেই ব্রহ্ম। সূয্যি ব্রহ্মকে নিজহাতে সেবাযত্ন করেছে, খাইয়েছে, পরিয়েছে, ছায়ার মতো সর্বদা পাশে পাশে থেকে সেবা ও পূজায় জীবনপাত করেছে। এখনও গুরুদেব তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সর্বাবস্থায় তাকে প্রেরণা জোগাচ্ছেন। সে যেমন কর্মকুশলী তেমন ধ্যানজ্ঞানশীল।

* * *

ভুবনেশ্বর মঠ রাজা মহারাজের তপোবন। সাধুরা এখানে সাধনভজন করবে, শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করবে, খাওয়া থাকার কোন ভাবনা থাকবে না। উদ্বেগশূন্য মন নিয়ে প্রকৃত সন্ন্যাস জীবন যাপন করবে। বাইরের কোন ঝামেলা নাই। ভক্তদের গোলমালও কম। টাকা পয়সার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (রাজা) মহারাজ করে রেখেছেন। মনোমতো করে মঠটিকে গড়েছিলেন। রাস্তাঘাট, গাছপালা, বাগ-বাগিচা, সবই বেশ সাজান-গুছান। পবিত্র মানুষ পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে পবিত্রতর, পবিত্রতম হয়ে উঠবে—এই ছিল তাঁর মহতী ইচ্ছা। তোরা যখন ছিলি, সূয্যি অধ্যক্ষ ছিল। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তখন থাকতাম। এত ভাল লাগত যে কি আর বলব! চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম, একা পায়চারি করছি বারান্দায়, কখনো বাগানে ঘুরে এলাম। প্রতি ঘরে, বারান্দায়, বাগিচার মধ্যে মহারাজকে দেখতে পেতাম। সর্বদা মহারাজের কথা মনে ভেসে উঠত। প্রত্যেক জায়গাটিতে মহারাজের সত্তা মিশে আছে। মঠ মিশনের কত কর্মী ওখানে recruit হয়েছে। তারা সকলেই বেশ ভাল সাধু। ১৯৪৮ সালে ঈশ্বর (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ) (রাজা) মহারাজের উৎসব উপলক্ষে ভুবনেশ্বর মঠে গিছল। ইচ্ছা—নূতন নূতন জিনিস রান্না করে উৎসবের দিনে মহারাজকে ভোগ দেয়। সে তো অনেক কাল মহারাজের সেবা করেছিল। খুব ভাল রান্না করতে পারে, রান্নায় সিদ্ধহস্ত। কলকাতা থেকে বহু জিনিস, বাজারের সেরা সেরা দ্রব্য নানা জায়গা ঘুরে কিনে নিয়ে গেছিল। বিবিধ দ্রব্যের কাঁড়ি। অসময়ের আম, অসময়ের অন্যান্য ফল, অসময়ের সবজি, আর সময়ের অন্যান্য ফল, রকমারি মিষ্টি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুটি, বীট, গাজর প্রভৃতি যাবতীয় কাঁচা তরিতরকারি। বড় বড় কৈ মাছ কেনেস্ত্রা টিনে জল দিয়ে জিইয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কৈ মাছ একটা আধটা নয়, একশটা, চারটে কেনেস্ত্রা টিনে। এই সব কিনতে ঈশ্বরের

৩৫০ টাকা খরচ পড়েছিল। তখনকার দিনে সস্তাগণ্ডা। তা হলেই বোঝ কত জিনিস! ঈশ্বর মঠে পৌঁছেই মোহন্তকে বললে—(রাজা) মহারাজের উৎসবের জন্য এইসব জিনিস এনেছি। বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করতে হবে। আমি তরকারি কাটা, রান্না সবেতেই সাহায্য করতে পারি। তিথিপূজার দিনে অনেক ভক্ত এসেছে। বারটায় ঠাকুরের ভোগ উঠল। ঈশ্বর দেখে কৈ মাছ আসেনি। খোঁজ নিয়ে জানল সব জিনিস অল্প অল্প রান্না হয়েছে বটে কিন্তু কৈ মাছ আদপে রান্নাই হয়নি। ঈশ্বর তাড়াতাড়ি কয়েকটা কৈ মাছ মেরে রান্না করে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেল। তারপর ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করা হলো।

* * *

একবার এক শেয়ালের ইচ্ছা হয়েছে কাঁকড়া খাবে। তাই গর্তের কাছে গিয়ে বলছে—এং কাড়া দেং কাড়া ভাই, গর্ত থেকে বেরিয়ে এস। প্রণাম করার ইচ্ছা বড়, বারেক কাছে বস। কাঁকড়াও বড় চালাক। সে উত্তর দিচ্ছে—খেয়েছি দেয়েছি, জ্বরে জড়সড়, উথলা ভক্তি হলে, হোথেকে গড় কর। কাঁকড়া ও শেয়ালের বহু গল্প জানা আছে। শেয়াল কাঁকড়া ধরে কাঁকড়ার গর্তে লেজ পুরে দিয়ে। কাঁকড়া যেমনি লেজটা কামড়ে ধরে তেমনি শেয়াল লেজটা তুলে নিয়ে কাঁকড়াকে মেরে খায়। (রাজা) মহারাজের মুখে সেকেলের পাড়াগাঁয়ের কত ঘটনা, কত খোশ গল্প শুনেছি। তিনি এমন আসর জমাতেন, কেউ সে স্থান ছেড়ে উঠতে পারত না। তিনি ভক্তের কাছে বসে ডগমগ প্রেম নাগর। কথার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ থাকত যে, যে ভক্ত একবার তাঁর মুখের গল্প শুনেছে সে ঘরের কাজ ফেলে দিয়ে দৌড়ে আসত। আমরা তাঁকে দেখেছি সর্বদা অন্তর্মুখীন ভাবের মধ্যে, সংঘ পরিচালকরূপে, আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় গভীর ও গম্ভীর পরিবেশে।

একমাস পরে আর একটি সন্ধ্যায়। সম্পত্তি করা সহজ, রক্ষা করা মস্ত দায়। (রাজা) মহারাজের সময় মঠের খানিকটা জায়গা কেনা হলো। জায়গার সীমানা বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো। (রাজা) মহারাজ একজন পাহারাওয়ালা রাখলেন জায়গাটি পাহারা দেবার জন্য। যমের মতো চেহারা তার। যেমন লম্বা চওড়া দেখতে, তেমন মিশকালো। তার নাম বিজয় সর্দার। বিজয়ের বাপ নামজাদা ডাকাত ছিল। এখন বিদ্যামন্দিরের যেখানে রান্নাঘর সেখানে তাদের বাড়ি ছিল। কে এক সামন্ত এসে বললে—এই জায়গার মধ্যে আমার একটু জায়গা আছে। বিজয় এই খবর আমায় দেবার পর আমি বলে দিলাম—তুই সব সময় ঐ জায়গায় পাহারা দিবি। কেউ যদি এসে কিছু বলে, চেঁচামেচি

করে, দাবিদাওয়া জানায় তবে তাকে বলে দিস—বেড়ায় হাত দিয়েছ কি এই লাঠি মাথায় পড়বে। কথাগুলো হুঙ্কার দিয়ে বলবি। সামন্ত আর একদিন এলো, তম্বিতাম্বা করবার পরেই বিজয় লালচক্ষু দেখিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। সে তাই না দেখে মনে মনে ভীষণ চটে গেল। আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জুড়ে দিল। বেশ কিছুকাল মামলা চলল। শেষে সামন্ত হেরে গেল। তাই বলছিলাম, সম্পত্তি করা তেমন শক্ত নয়, রক্ষা করাই কঠিন। তাঁদের উপর বিশ্বাস থাকলে, শরীর মনে স্ফূর্তি থাকলে কোন কাজই সম্পন্ন হতে দেরি লাগে না।

*　　*　　*

একবার পুরীতে (রাজা) মহারাজের সঙ্গে মন্দিরে যাচ্ছি। যেতে যেতে মন্দিরের সিংহ দরজায় (রাজা) মহারাজ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সিংহ দ্বারের বাঁ ধারে একজন সাধু বসেছিলেন। তিনি সেই সাধুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। সেই সাধুটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে রইলেন। ফিরবার সময় বললেন—ইনি একজন মহাপুরুষ। এর পূর্বে এঁকে পুরীতে কেউ চিনত না। পরে ইনি পুরীতে নানা উৎসবাদি করে সকলের পরিচিত হয়ে উঠলেন। প্রসিদ্ধ হলেন। তখন তাঁকে নিয়ে খুব হৈচৈ, মাতামাতি। সাধুর লক্ষণই ঐ—সকলকে ভালবেসে আপন করে লওয়া।

*　　*　　*

কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দির ও ঠাকুরের মূর্তি হলো। ১৯৫১ সালে ১১ মে মন্দির প্রতিষ্ঠা আমি করলাম। আমি গিছলাম বেলুড় মঠ থেকে। মন্দিরের সমস্ত খরচ কিরণ সিংহ দিয়েছে। লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ছোট মন্দির, ঠাকুরের প্রস্তর মূর্তিটিও ছোট। অবশ্য মন্দির অনুপাতে ঠিকই হয়েছে।

মহারাজ আমায় তাঁর ব্যবহৃত একখানি কাপড় ও চাদর দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—"অমূল্য, এ দুটি রেখে দাও, পরে কাজে লাগবে।" আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। ওই শুভদিনে মন্দির ও ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলাম ঐ কাপড় চাদর পরে। মহারাজকে উপস্থিত দেখলাম ঠাকুরঘরে, ঠাকুরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজের কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। আমি এই কাপড় চাদর উপলক্ষ করে তাঁর ভাবে ভরপুর হয়ে থাকি। তিনি আমায় নানা ভাবে কৃপা করেই চলেছেন।

(স্বামী শংকরানন্দের গল্পকথা ঃ প্রকাশক—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া)

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

আমি ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে কাশী অদ্বৈত-আশ্রম ছেড়ে বেলুড় মঠ ও পুরী হয়ে অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ যাই।

শশী মহারাজ প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে মহারাজকে পুরী থেকে মাদ্রাজ নিয়ে এলেন—বস্টনের ভগিনী দেবমাতা সেজন্য পাথেয় নিবেদন করেছিলেন। সেবকরূপে মহারাজের সঙ্গে আসেন কৃষ্ণলাল মহারাজ, নীরদ মহারাজ আর উমানন্দ স্বামী। তখন মাদ্রাজ মঠে তিনজন কর্মী—রুদ্রানন্দ, বৈরাগ্য-চৈতন্য (তদ্দেশীয়) আর আমি। সে সময় মহারাজের সামান্য একটু সেবা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

শশী মহারাজ তাঁকে দেখতেন 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' এইভাবে; ঠাকুরপূজার জন্য আনা ফলমিষ্টি নির্বিকারে মহারাজের সেবায় দিয়ে দিতেন; প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দিতেন, মহারাজও কোনরকম আপত্তি না করে তাঁর প্রণতি গ্রহণ করতেন। তাঁর প্রতি শশী মহারাজের কী সুগভীর শ্রদ্ধা! একটি ছোট দৃষ্টান্ত থেকে কতকটা অনুমান করতে পারবে ঃ

মাদ্রাজ মঠের রান্নাঘরে বসে তামাক খাচ্ছি। ওদেশে সাধুদের তামাক-খাওয়া নিন্দনীয়। সে যাই হোক, সেদিন কোনও বিশেষ প্রয়োজনে শশী মহারাজ হঠাৎ রান্নাঘরে এসে পড়েন। আমার হাতে হুঁকো দেখে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুমি যে আবার তামাক খাও তা তো জানা ছিল না।" তিনি নিজে তামাক খেতেন না, কর্মীদের তামাক-খাওয়াও পছন্দ করতেন না। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মহারাজের কাছে নালিশ করলেন। মহারাজ শুনে বললেন, "শশীভাই, তাতে আর এমন কি হয়েছে! আমি তো অনেক কমবয়সেই আরম্ভ করেছিলাম। তামাক একটু খেলই বা।" বিচার শুনে শশী মহারাজ আর একটা কথাও বললেন না। কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলেন তাও নয়। মহারাজ অনুমতি করেছেন ব্যস্, আর কিছু বলার নেই। এমন-ই তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি। (*কাশী সেবাশ্রম, ২৩/১০/৫১*)

দেববাণী

স্বামীজীর Inspired Talks (দেববাণী) বইখানি ছাপানোর ব্যাপারে ভগিনী দেবমাতার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। মহারাজেরও খুব আগ্রহ। তার জন্য আলাদা হিসাবপত্র রাখা হচ্ছে। শশী মহারাজ মাঝে মাঝে সেই তহবিল থেকে টাকাও ধার নিচ্ছেন, কেননা মহারাজের আগমনে মঠের খরচ একটু বেড়েছে তো। বই-বিক্রির টাকা ও তার হিসাব রাখার ভার আমার উপর। সর্বদর্শী মহারাজ কখন যেন লক্ষ্য করেছেন যে, শশী মহারাজ আমার হিসাবের টাকা থেকে ধার নিয়ে যাচ্ছেন অথচ তার রসিদপত্র কিছু থাকছে না। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন তাঁর অনুমান যথার্থ। তখনই বললেন, "এটি ঠিক নয়; তুমি শশী মহারাজের কাছে রসিদ নিয়ে রাখবে।" আমি পড়লুম উভয়সঙ্কটে, শশী মহারাজের কাছে আবার রসিদ চাইবো কি করে? মহারাজ আমার অবস্থা অনুভব করে বললেন, "তুমি আমার নাম করে বলবে।" পরের বার টাকা দেবার সময় মহারাজের নির্দেশ নিবেদন করামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। একটু কাগজ আনো, আমি এখনই রসিদ লিখে দিচ্ছি।"

কমাস পরে যখন আমার ব্যাঙ্গালোর যাওয়া স্থির হলো শশী মহারাজকে ঐ বই-বিক্রির টাকার হিসাব বুঝে নিতে অনুরোধ করলুম। তিনি তেমন গা করেন না, বারবার বলায় শেষে একদিন বসলেন কিন্তু হিসাবের কাগজে এ্যাডভান্সের মোটা অঙ্ক দেখেই বলে উঠলেন, "অত টাকা আমি আবার কবে নিলুম! যাক, তোমার কাছে এখন যা বাকি আছে তাই দিয়ে তুমি রওনা হও, হিসাবের জন্য তোমাকে অতো ভাবতে হবে না।" আমি তক্ষুনি তাঁর সই করা রসিদগুলো বার করতেই বললেন, "ঠিক তো, ঐগুলো একবার এই কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই তো মিটে যায়।" তিনি মিলিয়ে দেখলেন আমার লেখা হিসাবের অঙ্ক নির্ভুল। বাবা, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। রসিদগুলো না থাকলে তাঁর মনে হয়ত একটা খটকা থেকে যেত, অন্তত আমি তাই ভেবে খুবই অস্বস্তি বোধ করতুম। মহারাজের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দূরদর্শিতা দেখ! তোমাদের মধ্যে যাদের টাকাপয়সা নিয়ে কাজ করতে হয় তারা আমার এই অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিখতে পারো। তাহলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবে।

Inspired Talks বইখানির বহুল প্রচারের জন্য মহারাজ খুব ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন। ওখানকার Hindu কাগজে রিভিউ করিয়ে তার press cutting রাখা হয়েছে। এবার Bombay Chronicle-এ পাঠিয়ে দিয়ে রিভিউ করানোর জন্য

শশী মহারাজকে বললেন; সেই সাথে Hindu পত্রিকার অভিমতটিও তাদের জানাতে বললেন। শশী মহারাজ বললেন, "Press cutting পাঠাবার দরকার নেই; বঙ্গের কাগজ মাদ্রাজের কাগজের মতামত দেখতে চাইবে না।" কথাটা মহারাজের একেবারেই মনঃপূত হলো না, অবশ্য তিনি মুখে কিছু বললেন না।

খানিক পরে আমাকে বলছেন, "পাঁজিখানা নিয়ে আয় তো।" পাঁজি দেখে আমাকে দিয়ে পুরীর একটি ভক্তকে চিঠি লেখালেন, "আমি অমুক দিন অমুক ট্রেনে পুরী পৌঁছুচ্ছি।" এসব শশী মহারাজের সামনে ঘটায় তিনি বুঝলেন যে, তাঁরই মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে মহারাজ মাদ্রাজ ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। চিঠিখানি ডাকবাক্সে দিতে যেয়ে দেখি শশী মহারাজ সেখানে পায়চারি করছেন, তিনি আমার হাত থেকে চিঠি নিয়ে নিলেন। চিঠি ডাকবাক্সে ফেলা হলো না, ভাবছি মহারাজকে কি বলবো! শশী মহারাজ বললেন, "যাও, তোমাকে কিছু বলতে হবে না।" বলেই সটান মহারাজের কাছে যেয়ে তাঁর পা-দুখানি জড়িয়ে ধরে নিজ অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করলেন। মহারাজ ক্ষুব্ধভাবে বলছেন, "ভাই, তোমরা বিদ্বান বুদ্ধিমান, কত বড়ো বড়ো কাজ করছো; আমরা তো অকর্মণ্য মূর্খ, আমাদের কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে!" শশী মহারাজ কাতর হয়ে বললেন, "রাজা, তুমি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করো। আমি জানি তোমার পায়ের ধুলো থেকে শত শশীর উদ্ভব হতে পারে। আমি না-বুঝে তোমার চরণে মহা অপরাধ করে ফেলেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।" মহারাজ এতক্ষণে শান্ত হন। আর পুরী যাবার কথা তুললেন না। চিঠিখানির গতি পরে আমার কাছে শুনেছিলেন।

এঁদের পরস্পরের প্রতি যে কী গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না।

মাদ্রাজ মঠে মহারাজ রোজ ভোর চারটেয় আমাকে জাগিয়ে দিতেন—সময়মতো জপ-ধ্যান করবার জন্য। সাধন-ভজনে খুব উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। এমনি করে অযাচিত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বেঁধেছিলেন।

তাঁর মুখখানি খুব উজ্জ্বল দেখাতো, আর সর্বদা অন্তর্মুখ।

শশী মহারাজ তাঁকে ঠাকুরের মতোই দেখতেন; দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেমন ছোটবড়ো দুখানি খাট পাশাপাশি ছিল ময়লাপুরে মহারাজের জন্য ঠিক সেইরকম ব্যবস্থা রেখেছিলেন। *(কাশী সেবাশ্রম, ২৪/১০/৫১)*

মহারাজের তাসখেলা

মাদ্রাজ মঠে মহারাজ আমাদের নিয়ে একদিন তাস খেলতে বসলেন ঃ একপক্ষ তিনি ও নীরদ মহারাজ, প্রতিপক্ষ শশী মহারাজ আর আমি। আমি প্রথম থেকেই খুব সীরিয়াস—মহারাজকে হারানো চাই। খেলা চলছে। দেখছি শশী মহারাজের ভুলের জন্য মহারাজ বারবার জিতে যাচ্ছেন। আমাকে বিপন্ন দেখে তিনি উৎফুল্ল হচ্ছেন দেখে আমার আরো রোখ চাপলো—শশী মহারাজকে একবারই বললুম, "মহারাজ, আপনি একটু সাবধানে খেলুন, যাতে অন্তত একদানও আমরা জিততে পারি।" বৃথাই মিনতি—সব ভালো ভালো তাসগুলো শশী মহারাজের জন্য নষ্ট হলো, আমাদের ভয়ানক হার হয়ে গেল। মহারাজের খুব স্ফূর্তি—বিশেষত আমার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে। আমিও রেগেমেগে বললুম, "একলা আমি কী করবো, মহারাজ! শশী মহারাজের কোনও সাহায্যই পেলুম না।"

খেলা সাঙ্গ হলে শশী মহারাজ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে খুব তিরস্কার করলেন, "আহাম্মক, তুমি যে রীতিমতো পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে উঠেছো দেখছি! ভেবেছ বুঝি আমি মহারাজের সঙ্গে নিছক তাস খেলতে বসেছিলাম? একবারও চেয়ে দেখনি আমাদের হারিয়ে দিয়ে তাঁর কত আনন্দ! মুখখানিতে কেমন স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠেছিল? দেবশিশুর মতন সুন্দর ও পবিত্র সে-হাসি বারবার দেখেও আমার সাধ মিটছিল না। আহাম্মক, ভালো ভালো তাস আমি তো জেনেশুনে ছেড়ে দিচ্ছিলাম। তাঁকে আনন্দে রাখাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ইনি কি সাধারণ! আমাদের কল্যাণের জন্যই এঁর শরীরধারণ। তুমি কী করে বুঝবে এঁর কত কৃপাকরুণা!"

আমি তো হতভম্ব। মহাপুরুষদের তাসখেলার মধ্যে এত গভীর তাৎপর্য থাকতে পারে কখনও তা কল্পনাও করিনি। বাবা, শশী মহারাজের কী গভীর প্রেমভক্তি!

তাঁদের অন্তরে রাগদ্বেষের স্থান ছিল না, এ-স্বীকৃতি স্বয়ং মহারাজের।

এই কাশীতে মহারাজ একদিন কোনও কারণে শুভানন্দ স্বামীকে ভীষণ বকলেন। তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখে আমি ভয়ে জড়সড়। ভারি উদ্বেগ হলো এই ভেবে যে, দোষত্রুটি তো আমাদেরও হতে পারে, আর তখন যদি তিনি এইরকম ক্রোধ প্রকাশ করেন!

কতক্ষণ পরে তাঁকে শান্তভাবে বসে থাকতে দেখে আমার শঙ্কা নিবেদন

করলুম। তিনি শুনে হেসে ফেললেন, তারপর তাঁর দক্ষিণ কর মুখের কাছে একবার ঘুরিয়ে বুকের কাছে এনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন। ঐভাবে যেন বললেন, "ওসব যা দেখছো, মুখে, ভেতরের কিছু নয়, মনে কোনও রেখাপাত করে না।" তখন কত যে আশ্বস্ত হলুম কি বলবো।

'সতের রাগ জলের দাগ' প্রবাদের মর্ম সেদিন বুঝলুম।

(কাশী সেবাশ্রম, ৩১/১০/৫১)

ব্যাঙ্গালোরে দ্বারোদ্ঘাটন

মহারাজ ময়লাপুর মঠে আসেন ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরের শেষে। কিছুদিন বিশ্রামের পর তিনি রামেশ্বরধাম ও মাদুরাতীর্থ দর্শন করেন। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের নিজ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মাদ্রাজ মঠে আমি একটানা সাত মাস তাঁর কাছে থাকার সুযোগ পাই।

দ্বারোদ্ঘাটন-উপলক্ষে দু-চারটি কথা বলবার জন্য শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কিছুদিন আগে থেকেই মাদ্রাজে তাঁকে অনুরোধ করেন। মহারাজ ভাষণ দিতে একবারেই নারাজ, আয়েঙ্গারও নাছোড়বান্দা। অগত্যা তিনি ছোট একটি ইংরিজি ভাষণের খসড়া সামনে ধরে বললেন, "মহারাজ, আপনি দয়া করে সভায় এইটি যদি একটু বলে দেন তাহলেই আমরা কৃতার্থ হবো।" ভক্তের এত আগ্রহ দেখে মহারাজ শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

তারপর খসড়াটি রোজ দু-একবার আবৃত্তি করছেন, মাঝে মাঝে আমাকে বলছেন, "তুই শুনে দ্যাখ তো ঠিক হচ্ছে কিনা।" আমি শুনে শুনে বলছি, "হাঁ মহারাজ, বেশ হচ্ছে।"

অনুষ্ঠান যত কাছিয়ে আসছে তত নার্ভাস হয়ে পড়ছেন। ব্যাঙ্গালোরের পথে ট্রেনে বলছেন, "শশীভাই, এসব আমার দ্বারা হয় না, আমি ফিরে যাই!" ট্রেনেও ক-বার আবৃত্তি করে আমাকে শোনালেন। ব্যাঙ্গালোর স্টেশনে নামলেন সকাল ৬.৩০ টায়।

দু-ঘণ্টা পরে ৮.৩০ টায় অনুষ্ঠান। আশ্চর্য, এই দু-ঘণ্টা আগে যাঁকে এত নার্ভাস দেখেছি সভাস্থলে দাঁড়িয়ে তিনিই পাকা বক্তার মতন ভাষণ দিলেন। সভার শেষে শশী মহারাজ সেকথা উল্লেখ করায় বললেন, "হঠাৎ ঠাকুরের কথা মনে পড়লো 'লোক না পোক' ব্যস, আর কোনো অস্বস্তি নেই, বুঝলে ভাই।"

দেবমাতার সেবাভাব দেখে মহারাজ তাকে বরদানের ইচ্ছা করেন। আমায় বারবার জিজ্ঞাসা করেন, "কি একটা দেওয়া যায় বলতো?" আমি ভেবেচিন্তে কিছু স্থির করতে পারলুম না। তখন নিজেই বলছেন, "পরের বার ভারতে জনম নিয়ে ঠাকুরের অনুরাগিণী হয়ে ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন করবে, এই বেশ হবে।" আমি বললুম, "আর একটা জন্ম তাকে কেন ঘোরাবেন, মহারাজ? সবই তো আপনার হাত।" তিনি বললেন, "না, না; এই সবে একটু ভাবভক্তি হচ্ছে বুঝলি না? তবে খুব সেবা করেছে আমার।"

(একটি সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, বরদানটি নিষ্পন্ন হইয়াছিল কিনা।)

নিশ্চয়! তাঁদের বরদান সম্মুখে উচ্চারণসাপেক্ষ নয়। সত্যসঙ্কল্প মহাপুরুষ যা ইচ্ছা করবেন তা-ই হবে।

(কাশী সেবাশ্রম, ২২/১১/৫১)

উইলিয়ম ভট

মাদ্রাজ মঠে থাকার সময় মহারাজ ফল-দই-মিষ্টি-পায়স বা ডাল-তরকারি প্রভৃতি একসঙ্গে মেখে একটা উপাদেয় পাঁচমিশেলি খাবার তৈরি করতেন আর সবাইকে ডেকে ডেকে প্রসাদ দিতেন। ঐ মিশ্র পদটির নাম দেন 'উইলিয়ম ভট' (William + Bhattacharya)। একদিন ঐ রকম প্রসাদের পুরো পাত্রটি দেখিয়ে বললেন, "এটি জিতেনের জন্য রাখা হলো।" সেদিন তাঁর মনে কিভাব উঠেছিল জানি না, তবে কথা বলছিলেন ছোট্ট ছেলেটির মতন। সমুখে উপবিষ্ট শশী মহারাজ হাত পেতে বারবার বলছেন, "আমাকে একটু দাও না রাজা, তোমার প্রসাদ ধারণ করি।" মহারাজও শিশুভাবে বলছেন, "না, না, তোমাকে দেবো না।" এই বলে 'উইলিয়ম ভটে'র পাত্রটি সরিয়ে সরিয়ে রাখছেন, একবার এধারে একবার ওধারে। শশী মহারাজ অনেক মিনতি করাতে আঙ্গুলের ডগায় করে তাঁকে কণামাত্র প্রসাদ দিয়ে বললেন, "এইটুকু দেবো, বেশি পাবে না।" সেটুকুই ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন শশী মহারাজ।

মহারাজকে তিনি কি-দৃষ্টিতে দেখতেন এইসব ছোটছোট ব্যাপার থেকেও কতক অনুমান করা যায়।

মাদ্রাজ মঠে শশী মহারাজের বকুনি রোজ অন্তত একবার হবেই। তাঁর কাছে থাকতে গেলে কাজকর্ম একবারে নিখুঁত হওয়া চাই। খুব সাবধানে সব করতে হতো। ঠাকুরসেবায় এতটুকু অনিয়ম বা ত্রুটি সহ্য করতেন না। কিন্তু

যতই সাবধান হই না কেন ত্রুটি একটু-আধটু হতোই, তাই বকুনির হাত থেকে রেহাই ছিল না।

কিন্তু মহারাজ মাদ্রাজ মঠে থাকাকালীন তিনি একবারে অন্য-মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন, মঠে আছেন কিনা বোঝাই যেত না।

শশী মহারাজের খুব ইচ্ছা, মাদ্রাজ মঠে মহারাজ যেন একবার নিজহাতে ঠাকুর পূজা করেন। মহারাজ আনুষ্ঠানিক পূজায় অভ্যস্ত নন, তিনি রাজি হচ্ছেন না। শশী মহারাজও ছাড়বেন না—বারবার অনুনয় করছেন, "এতদিন আমি এখানে যেমন-তেমন করে প্রাণারামের পূজা করেছি, এখন তুমি যদি একবার নিজহাতে তাঁর পূজা করো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" একদিন স্নান সেরে মহারাজ তাঁর ঘরে আসছেন, শশী মহারাজ দু-হাত তুলে তাঁর পথরোধ করে আবার নিজ মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করলেন; মহারাজ কি-ভেবে যেন আজ আর কোনও ওজর-আপত্তি করলেন না। দু-ভাই ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন আর শশী মহারাজ ভেতর থেকে দ্বার রুদ্ধ করলেন। মহারাজের ঠাকুরপূজা দেখবার জন্য আমার খুব আগ্রহ ছিল, দুঃখের বিষয় কিছুই দেখা গেল না।

পরে ব্যাঙ্গালোরে আছি। প্রয়াণের দু-মাস আগে শশী মহারাজ ব্যাঙ্গালোর এলেন হাওয়া-বদলের জন্য। তখন দুরন্ত ক্ষয়রোগে শরীর একবারে ভেঙে গেছে। বেশ কিছুদিন থেকে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল—শ্রীশ্রীমার দক্ষিণদেশ-আগমনের পূর্বেই তাঁর শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করে; তখন চিকিৎসা নিতে রাজি হননি।

উঠোনের তক্তপোশে বসে শশী মহারাজ একদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "দুটি সাধ ছিল মনে ঃ একবার মাকে আবাহন করে এনে এদেশের ভক্তদের তাঁর শ্রীচরণে সঁপে দেওয়া; আর মহারাজকে একবার নিয়ে আসা, দক্ষিণী ভক্তদের কল্যাণের জন্য। তাঁরা কৃপা করে আমার দুটি সাধই পূর্ণ করেছেন। এখন এ-শরীর থাকলো আর গেল!"

(কাশী সেবাশ্রম, ২৩/১১/৫১)

সাধুসঙ্গের লাভালাভ

শ্রীশ্রীমহারাজ ৺রামেশ্বর-দর্শনে চলেছেন। সঙ্গে শশী মহারাজ আর আমরা তিনজন—স্বামী ধীরানন্দ, নীরদ মহারাজ ও আমি। সে-যাত্রায় আমরা ভয়ানক বকুনি খেয়েছিলুম, সে কথাই আজ বলি।

শীতকাল। ট্রেনে আমার কাছে গরম-টুপি চাইলেন মহারাজ। আমি খুঁজে পেলুম না। পাশে সেকেণ্ডক্লাস কামরায় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও নীরদ মহারাজ চলেছেন—মহারাজের ব্যবহারি জিনিসপত্র তাঁদের কাছে। আমি পরের স্টেশনে নেমে তাঁদের কাছে টুপি চাইলুম। কিন্তু কৃষ্ণলাল মহারাজ চাবি হারিয়ে ফেলেছেন, টুপি বার করা গেল না। তাই শুনে মহারাজ খুব বকতে লাগলেন। এই হলো এক দফা।

মাঝপথে একটা স্টেশনে নামতে হলো—গাড়ি-বদলের জন্য। আমরা তিনজন সেখানে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে তাঁদের থেকে একটু তফাতে বসেছি। সাধুদের দেখে লোকজন ভিড় করছে, আমরাও তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় জমে গেছি। ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন বললে, "চোরদের এটা একটা বড়ো আড্ডা, খুব হুঁশিয়ার থাকবেন!" কথাটা মহারাজের কানে যেতেই আমাদের খুব ধমকে দিলেন, কেননা জিনিসপত্র তফাতে রেখে আমরা গল্পে মেতে গেছি। এই গেল দ্বিতীয় পর্ব।

সেখানে এক পান্থনিবাসে আহার ও স্বল্প-বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা দু-ভাই তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও নীরদ মহারাজকে দেখতে না পেয়ে মহারাজ আমাকে তাঁদের খুঁজতে পাঠালেন। তাঁরা স্নানাদির জন্য গেছেন শুনে একবারে রেগে আগুন—"সেকেণ্ডক্লাসে এসেছে, ট্রেনে সেরে নেয় নি কেন" বলে ভয়ানক গর্জে উঠলেন। আমি তো ভয়ে জড়সড়। এই নিয়ে তিন দফা হলো।

রামেশ্বরে তিনি রামনাদের রাজার অতিথি, রাজাসাহেব তাঁর জন্য একটা প্রাসাদ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই শশী মহারাজকে নিয়ে ধুলোপায়ে দেবদর্শনে চলে গেলেন। তাঁরা দু-ভাই ফিরে এলে পরে আমরা মন্দিরে যাবো ভেবে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছি। ওদিকে তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে করে দু-ঘণ্টা পরে মন্দির থেকে ফিরলেন। মহারাজ প্রথমেই কৃষ্ণলাল মহারাজকে নিয়ে পড়লেন, "এতক্ষণ কী করা হচ্ছিল এখানে বসে থেকে? এতখানি বয়স হয়েছে, তুমি জানো না যে তীর্থস্থানে এসে ধুলোপায়ে দেবদর্শনে যেতে হয়!" আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, "আমরা এই জিনিসপত্রগুলো একটু সাজিয়ে রাখছিলুম।" তাই শুনে বললেন, "শশীভাই, আনো তো একখানি বাতি—এগুলো এখুনি জ্বালিয়ে দিই, আপদ চুকে যাক!"

তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখে ভাবলুম, "মহাপুরুষদের সঙ্গে আর তীর্থদর্শনে যাচ্ছি

না বাবা! সেবাপরাধ তো আছেই, তার ওপর আবার ধমক খেতে খেতে প্রাণান্ত।” এ তো হলো একটা দিক; তাঁদের সঙ্গে ভ্রমণ করলে অনেক অমূল্য অভিজ্ঞতা, লাভ হয়।

পরদিন সকাল থেকে মহারাজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। শশী মহারাজ ও আমরা সবাই ব্যস্ত হলুম, কেননা মহারাজ একা কখনও কোথাও যান না। আশপাশে বৃথাই খোঁজা হলো। শশী মহারাজ তখন অনুমানে বললেন, “মহারাজ বোধ হয় মন্দিরে চলে গেছেন।” আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে যেয়ে দেখলুম শশী মহারাজের অনুমান যথার্থ।

মন্দিরে পৌঁছে যা দেখলুম তা কেমন করে বোঝাই বলো! তার একটু আভাস শুধু দিতে পারি। দেখলুম তিনি শিবসন্নিধানে ধ্যানমগ্ন, বাহ্যশূন্য, নিস্পন্দ। শশী মহারাজ আমাদের ইশারা করলেন তাঁকে ঘিরে বসে পড়তে—যাতে ভিড়ের চাপে তাঁর শরীরে আঘাত না লাগে। তিনি নিজে একটা দিক আগলে বসলেন। আশ্চর্য, বসার অল্পক্ষণের মধ্যে আমরাও গভীর ধ্যানে ডুবে গেলুম। দেখ ব্যাপার! উচ্চ আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যে আসবে প্রভাবিত হয়ে পড়বে—হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ আপনি হবে। তাই তো শাস্ত্র অবিরাম সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্তন করছেন।

যাই হোক, ঐভাবে প্রায় দু-ঘণ্টা কেটে যায়। মহারাজ ধীরে ধীরে বাহ্যলাভ করলেন, আমরাও সহজ হলুম। তিনি আরো আধঘণ্টা আসনে বসে থাকলেন। মুখভাব শান্তগম্ভীর। তারপর শশী মহারাজ খুব সন্তর্পণে তাঁকে একখানি গাড়িতে তুলে নিয়ে বাসস্থানে ফিরলেন।

সাত-আটদিন রামেশ্বর বাস হয়। মাদ্রাজী ভক্ত রামু আমাদের সঙ্গে ছিল, রামনাদের রাজার লোকজনও ছিল।

একদিন বৈকালে মহারাজের স্বগতোক্তি শুনলুম, “(ভাব) হবে না, স্বয়ং ভগবান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে!”—ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র এই ৺রামেশ্বর-শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য মা-সীতাদেবীর নামেই বেশি প্রসিদ্ধি।

তাহলে দেখ, প্রথমে বকুনির তুলনায় পরের স্বর্গীয় অনুভূতির আনন্দ কত বেশি। আমি হাজার ধমক খেতে রাজি আছি, যদি অমন দর্শন আর একবার পাই।

(কাশী সেবাশ্রম, ২৭/১১/৫১)

মাদুরাতীর্থে শ্রীশ্রীমহারাজ

রামেশ্বরধাম থেকে মাদ্রাজ ফেরার পথে মহারাজ মাদুরায় নেমে নির্ধারিত স্থানে উঠলেন। শশী মহারাজ পূর্ব হতেই সব ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছিলেন। এখানে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির। মহারাজ কিন্তু ধুলোপায়ে দেবী দর্শনে গেলেন না।

স্নান করবেন, তেল মাখছেন, কাছে আর কেউ নেই; মুখভাব গম্ভীর—হঠাৎ বলছেন, "দ্যাখ, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম এখানে প্রতি অনু-পরমাণুতে দেবীর শক্তি বিরাজ করছে।" তখনও শ্রীমন্দিরে যাওয়া হয়নি।

পরদিন আমরা তাঁর সাথে দেবীদর্শনে গেলুম, কজন মাদ্রাজী ভক্তও সঙ্গে আছেন। তিনি যখনই দেবদর্শনে যান দক্ষিণ পাণি বুকের উপর রেখে করজপ করতে থাকেন। কাপড়-ঢেকে করজপের রীতিই সাধারণত দেখা যায়। মহারাজ তেমন করেন না, কোনরকম আচ্ছাদন ব্যবহার করেন না। তিনি কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা তিন আঙুলে করজপ করেন। আজ দেবীদর্শনে যাবার সময় তার ব্যতিক্রম হলো না। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর ভাবাবেশ হলো ঃ 'মা' 'মা' বলতে বলতে ধীরে ধীরে দেবীর পানে এগিয়ে চলেছেন, বারো-চৌদ্দহাত তফাৎ থাকতে হঠাৎ থেমে গেলেন; মুহুর্মুহু অশ্রুকম্পপুলক দেখা দিলো। সে-দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসছে। তাঁর ভাবগতিক দেখে আগেই মনে হয়েছিল—মাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছেন, মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য কাতর হয়ে পড়েছেন, আর দেরি সয় না। এখন দাঁড়িয়ে পড়বার পর মনে হলো সেই তীব্র ব্যাকুলতা যেন বাঁধ মানছে না, দেহখানি মার দিকে ঝুঁকে রইলো। শশী মহারাজ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আমরাও তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালুম। মার্বেল-পাথরের মেজে, পড়ে গেলে রক্ষা নেই। কতক্ষণ পরে অশ্রুকম্পাদি ও ঝুঁকে-থাকার উপশম হলো—এখন সম্পূর্ণ স্থির, বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ। আহা কি মুখশ্রী! আনন্দ আর ধরে না, উপছে পড়ছে। ঐ দিব্যভাব প্রায় আধঘণ্টা থাকলো, আমরা দর্শন করে জীবন সার্থক করলুম। ক্রমে অনেকটা সহজ অবস্থায় নেমে এসে খুব মৃদুস্বরে বললেন, "শশীভাই, একখানি গাড়ি ডাকবে না?"

বাসস্থানে ফিরেও ভাবের ঘোর কাটে না। বেলা একটায় খোঁজ নিচ্ছেন আমরা খেয়েছি কিনা। নিজের স্নানাহার হয়নি হুঁশ নেই। শশী মহারাজ বললেন, "রাজা, তোমারও তো খাওয়া হয়নি!" তখন আমায় বলছেন, "তেল মাখিয়ে দে।" স্নানাহারের পরেও ভাবের উপশম হয়নি, সন্ধ্যার দিকে সহজ হন। তখন

শশী মহারাজ বললেন, "আজ তোমার খুব একটা দিন, কি বলো রাজা? খুব দর্শন করলে।" তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "মার কৃপা! আহা, মার কোলে কী আনন্দে ছিলাম কি বলবো ভাই!" শশী মহারাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না, সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বললেন, "রাজা, তোমার পায়ের ধুলো দাও, দেহমন পবিত্র করি।" মহারাজ বলছেন, "কি করো, কি করো ভাই।" ততক্ষণে শশী মহারাজ বলছেন, "পড় না বেটারা মহারাজের পায়ে লুটিয়ে।" আমরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে ধন্য হলুম।

দেখ, আর কিছু না হলেও এইসব মহাপুরুষকে দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। তোমরা বই-এ পড়েছো, আমরা চোখে দেখেছি!

মীনাক্ষীদেবীর ভারি সুন্দর মূর্তি—কষ্টিপাথরের, অনেকটা কন্যাকুমারীর মতন। অবশ্য কন্যাকুমারীর মতো অত সুন্দর মূর্তি কোথাও নেই—বিশেষত শৃঙ্গারের সময় মাকে দর্শন করলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, বারবার দেখে সাধ মেটে না, ছোট বালিকামূর্তি, বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা হয়। (জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করিয়া) "তুমি দক্ষিণদেশের তীর্থগুলি একবার দেখে এসো, খুব আনন্দ পাবে।"

(কাশী সেবাশ্রম, ২৮/১১/৫১)

শশী মহারাজের কথা

মাদ্রাজে সকলেই তাঁকে (শশী মহারাজকে) খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। লেকচার দিয়ে মঠে ফিরতেন—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি, গলায় ফুলের মালা—ভক্তেরা জয়ধ্বনি করছে। মঠে ঢুকেই স্বামীজীর পেন্টিং-এর নিচে মাথা রেখে বলতেন, "দেখো ভাই, আমার মনে যেন এতটুকু অভিমান না আসে।" সে কী তাঁর কাতর প্রার্থনা!

প্রথমে রাজা মহারাজকে মাদ্রাজ মঠে আনলেন। কিছুদিন পরে আনলেন মাকে। মার জন্য মঠের কাছেই একখানি বাসা ভাড়া করেছিলেন। সর্বক্ষণ সেখানে বসে থাকতেন—দ্বারীর মতন; রোজ হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করতেন, "মা, আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?" তখন তাঁর রোগের সূত্রপাত হয়ে গেছে, মধ্যে মধ্যে সর্দিকাশি জ্বর হচ্ছে—তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সর্বক্ষণ এক চিন্তা—মার যেন এতটুকু কষ্ট না হয়। মাকে ৺রামেশ্বর দর্শন করিয়ে আনলেন।

মাদ্রাজ থেকে মা পুরীতে থেমে তারপর কলকাতায় ফেরেন।

অল্পদিন পরের কথা। শশী মহারাজ অসুখ নিয়ে ব্যাঙ্গালোর এলেন হাওয়া-

বদলের জন্য। তখন বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার থুথু পরীক্ষা করে আমাকে দেখালেন—রোগের বীজাণু রয়েছে; বললেন, "এ কী করেছেন। ছটা মাস আগে এলেও হতো। এখন সাধ্যের বাইরে চলে গেছে।"

শশী মহারাজ আমাদের বললেন, "এখন শরীর থাকলো আর গেল!"

চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। রাজা মহারাজ তখন পুরীতে রয়েছেন। তিনি খুরদা রোড জংসনে এসে গাড়িতে দেখা করে বললেন, "শশীভাই, তুমি এমন করে শরীরপাত করলে? আমাদের একবার জানালে না!" শশী মহারাজ বলেছিলেন, "রাজা, মার যেন কোন কষ্ট না হয় সেদিকেই আমার লক্ষ্য ছিল।"

কলকাতায় এসে 'উদ্বোধন-বাড়ির' একখানি ঘরে মাস খানেক ছিলেন। সেখানে শরীর যায়।

(মোরাবাদী আশ্রম, ৩০/০৮/৫৩)

শ্রীশ্রীমহারাজের প্রসাদ

ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি।

নীরদ মহারাজের মা এক হাঁড়ি সন্দেশ আর কিছু ভাজা ইলিশমাছ আমার হাতে দিয়ে বললেন, "মহারাজকে দেবে; তাঁকে আগে সন্দেশ খাইয়ে তারপর কথা বলবে।"

পথে পুরীতে নেমে মহারাজকে দর্শন করলুম। তাঁকে সন্দেশ আর মাছ দিয়ে নীরদ মহারাজের মার কথা বললুম। তিনি ভারি খুশি হয়ে বললেন, "তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে হবে!" তখন সারা ঘরময় খুঁজে একটা কমণ্ডলু পেয়ে বলছেন, "তুমি এইটে নাও।" আমি বললুম, "এ নিয়ে আমি কী করবো, মহারাজ! আপনার কাছে আসল জিনিস চাই, আপনি আমাকে প্রেমভক্তি বিবেক বৈরাগ্য দিন।"

(মোরাবাদী আশ্রম, ১৩/০৯/৫৩)

অন্তর্যামী মহারাজ

কাশীতে মহারাজের গাত্রসেবা করছি। কতক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে, সাবধানে মুছে ফেলছি পাছে তাঁর গায়ে পড়ে। ভাবছি কখন বলবেন, "থাক আর নয়।" ক্রমে বেশ কষ্ট হচ্ছে, আর

যেন পেরে উঠছি না, হঠাৎ মনে হলো, "এ কার সেবা আমি করছি, ইনি ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র! আজ যদি বাড়িতে থাকতুম মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার করতে হতো না? আহা, কত জন্মের সুকৃতিবলে এবার এঁর এতটুকু সেবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে আবার ক্লান্তি!" এ-রকম মনে হতেই ভেতর থেকে একটা অসম্ভব বল পেলুম; তখন কোথায় গেল ক্লান্তি, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর সেবা করতে লাগলুম। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনিও বলে উঠলেন, "বেশ হয়েছে, থাক, আর নয়।" মহারাজ অন্তর্যামী—যেই আমার মনে ঠিক ভাবটি উঠেছে অমনি বারণ করলেন।

(মোরাবাদী আশ্রম, ২৬/০৯/৫৩)

মামনুস্মর যুধ্য চ

ঠাকুরের ওপর ভালবাসা এলেই সেবাধর্ম ঠিক ঠিক হবে।

শর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করলে, "সর্বত্যাগী সাধুদের মধ্যে আবার মনোমালিন্য কেন?" মহারাজ বললেন, "তাঁর ওপর ভালবাসা নেই বলে।"

১৯০৮ সাল। মহারাজ মাদ্রাজে। পূর্ব সেবক অসুস্থ হয়ে ব্যাঙ্গালোর যায়, সেখানে বসন্তরোগে তার শরীর যায়।

আমি সেবক। খুব আনন্দ পাচ্ছি মহারাজের সেবায়। জপ-ধ্যান করি না। গাড়িতে মহারাজের সঙ্গে শশী মহারাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ আর আমি ট্রিপ্লিকেন যাচ্ছি। কৃষ্ণলাল মহারাজ তাঁকে বললেন, "জিতেন আপনার সেবক হয়েই থাকতে চায়, অন্য কোথাও যেতে চায় না।" মহারাজ উত্তেজিত হয়ে আমাকে বললেন, "As a friend and as a brother I tell you work and worship must go together." জিজ্ঞাসা করলেন, "জপ-ধ্যান করিস?" বললুম, "না। আপনার সেবাতেই খুব আনন্দ পাই।" তিনি বললেন, "না, জপধ্যান করবি। কাজের সঙ্গে জপ-ধ্যানও চাই—তাঁর ওপর ভাব-ভালবাসা আনবার জন্য।"

মামনুস্মর যুধ্য চ।

যতীশ্বরানন্দ Prabuddha Bharata-র editor হয়ে যাচ্ছেন ; হাতজোড় করে বললেন, "আমি কী জানি! কী লিখবো?" মহারাজ বললেন, "শোন ঃ লিখবার আগে ঠাকুরকে চিন্তা করবি, মাঝে চিন্তা করবি, আর শেষে চিন্তা করবি—দেখবি কত লেখা আসে।"

তা বেশ চালিয়ে দিলেন তো।

মহারাজ গঙ্গার ধারে easy-chair-এ বসে আছেন। প্রভাসকে ডাকিয়ে বললেন, "তোমাকে বৃন্দাবনের charge নিতে হবে।" সে বললে, "আপনার আদেশ, অবশ্য যাবো! কিন্তু সেখানে আমি কী করবো?" মহারাজ বললেন, "এই একটু-একটু হোমিও ওষুধ দিবি আর কি।" প্রভাস বললে, "আমি তো হোমিও-র 'হ'-ও জানি না!" মহারাজ বললেন, "কাছে আয়, শোন ঃ রোগীদের কথা শুনবি, বই-এর সঙ্গে একবার মেলাবি, তারপর ধ্যান করবি—যে-ওষুধটা মনে flash করবে সেইটে দিবি। ... দ্যাখ দিকিন কল্যাণানন্দ, লোকে ডাক্তার ছেড়ে তাকে ডাকে।"

প্রভাস পরে বেশ ডাক্তারি করতো।

তাঁকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে।

(কনখল সেবাশ্রম, ২৫/০৫/৫৬)

এরপর ঘরে ঘরে পূজা হবে

ঠাকুরের মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বের একটি ঘটনা। তখন ক্যানসার, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত গলা দিয়ে নামছে না, কত কষ্ট। তাঁর মানসপুত্রও কাশীপুর বাগানেই আছেন। ঠাকুর তাঁকে কাছে ডেকে নিজের সমাধি-অবস্থার ছবিখানি ও কিছু ফুল আনতে বললেন।

মহারাজ ছবি আর ফুল এনে দিলেন।

ঠাকুর ছবিখানি নিজের বুকের উপর রেখে পূজা করে বললেন, "ওঁরে, মা বললে—এরপর এ-ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে।"

এই ঘটনাটি মহারাজ আমাকে বলেন ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে—ঠাকুরের উৎসবের সময়।

তখন কি এতটা বুঝতে পেরেছিলুম।

(রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং ১৯/০৩/৫৭)

বাবার দরবারে

কাশীধাম, শিবচতুর্দশী—মহারাজ ৺বিশ্বনাথ দর্শনে চলেছেন। প্রথম হতেই ভাবগম্ভীর, করজপ করতে করতে চলেছেন।

একজন ঝাড়ুদার বাবার অঙ্গনে বাসি ফুল-বেলপাতা জড়ো করছিলো।

মহারাজ তার কাছে এগিয়ে যেয়ে ঝাড়ুর দিকে হাত বাড়ালেন। সে তাঁর মুখের পানে চেয়ে একটু থতোমতো খেয়ে ঝাড়ুটি তাঁর হাতে তুলে দিলে। মহারাজ ভক্তিভরে বাবার অঙ্গন মার্জনা করে তারপর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন।

"আহা, বাবার দরবারে এই ঝাড়ুদারও যা আমিও তো তাই, বিশ্বনাথের একজন দীনহীন সেবক" এই ভাবটি তাঁর আচরণে ফুটে উঠলো। সেদিন এই ছোট্ট ঘটনা থেকে আমাদের কত শিক্ষা লাভ হলো।

তোমরা এসব ছাপা হরফে পড়েছো। আমরা চোখে দেখে ধন্য হয়েছি।

(রামকৃষ্ণ মিশন, নয়াদিল্লি ১৬/১০/৫৯)

অনির্বচনীয় স্নেহ

কোন সময়ে আমি শ্রীশ্রীমহারাজের কাছে কাছে থাকতুম, একটু সেবা করতুম।

বাইরে যাবেন। বললেন, "রান্না করতে হতে পারে, পারবি তো?" একজনকে শুধু সঙ্গে নেবেন, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করলেন। পূর্বে আমি সখ করেও অনেকদিন পর্যন্ত রাঁধিনি, কিন্তু তাঁর ঐ স্নেহমাখা কথা শুনে কিছু না ভেবেই বলে ফেললুম, "পারবো।"

মনে পড়ে আমার মাথায় তখন দিনরাত রান্নার ভাবনাই চেপে থাকতো ঃ কেমন করলে রান্নাটি ভালো হবে, কোন্ জিনিসটি রাঁধলে তিনি প্রসন্ন হবেন— এইসবই শুধু ভাবতুম। প্রভু ও মার কাছে প্রার্থনা করতুম তাঁদের আদরের ছেলের যেন কোনও অযত্ন বা ক্লেশ না হয়।

একদিন কোথাও যেয়ে খুব বেলা হলো, তাঁর আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আমি তো অস্থির হয়ে পড়লুম তাঁর ক্ষুধা পেয়েছে মনে করে; বারবার চেয়ে দেখছি তাঁর মুখখানি শুকিয়ে গেছে, তাই আমার প্রাণে ভারি কষ্ট হচ্ছে; অথচ তাঁকে তো চলে আসতে বলতে পারি না, তাঁকে ছেড়ে নিজেও চলে আসতে পারি না। ঐ দিন তাঁর কাজটি ছিল একটু জটিল।

যাই হোক, কাজ মিটে গেলে তিনি বাসস্থানে ফিরলেন এবং আমিও তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে যেয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, "নিজের মুখখানি তো দেখতে পাচ্ছিস না, আমার চেয়েও বেশি শুকিয়ে গেছে।" তিনি আমার প্রাণের কথা টের পেয়েছেন দেখে আমি লজ্জিত হলুম।

তাঁর স্নানের ব্যবস্থা করে কোনরকমে সাধারণ একটা তরকারি, কাঁচকলা-সিদ্ধ আর দুধ দিয়ে ভাত বেড়ে দিলুম। গরম ভাতে পাখার বাতাস করছি বেশ জোরে জোরে, আর কেবলই ভাবছি, "ঠাকুর ও মার আজ নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে—ছেলের খেতে বসতে এত দেরি হলো বলে।" আমাকে অন্যমনস্ক দেখে তিনি স্নেহভরে বললেন, "ওরে, তোর মনে আজ যখন রান্নার চিন্তা উঠেছিল তখনই তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে! এখন তুই রাঁধলি, তাই আবার খেতে বসলাম। নে, তুই খেতে বস দিকিন, তোর কি দেরি হচ্ছে না!"

তাঁর সমুখেই খেতে বসলুম। তিনি ব্যস্ত হয়ে তাঁর থালাবাটি থেকে বেশির ভাগ দুধ কলা আর মিষ্টি আমার পাতে তুলে দিলেন।

খাবার মুখে দিয়েই চমকে উঠলুম, একি, তরকারি কাঁচকলাসিদ্ধ, সবই যে নুনেপোড়া, অখাদ্য! তিনি বললেন, "জিতেন, তাড়াতাড়িতে নুনটা বোধ হয় বার দু-তিন দেওয়া হয়ে গেছে, তাতে কি হয়েছে! ওগুলো তুই আর খাসনি, আজ দুধকলা দিয়েই ভাত কটি খেয়ে নে।"

সে-দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসছে। আহা, তাঁর কত ভালবাসা!

(অতিথি ভবন, বেলুড় মঠ ০৫/০১/৬০)

'রচনাবলী'-মাহাত্ম্য

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী—তুমি রোজ কিছু পড়াশুনা করো তো?

সাধু—(সসঙ্কোচে) আজ্ঞে, এখন স্বামীজীর 'রচনাবলী' পড়ছি।

—"বাঃ, বেশ!

"মাদ্রাজে আদি মঠবাড়ির হলে রাত্রে বসে আমি স্বামীজীর Complete Works পড়তুম। মহারাজ তাই দেখে ধীরে ধীরে পিছনে এসে পিঠ চাপড়ে খুব উৎসাহ দিতেন।

"ঐ সময় বলেছিলেন, 'স্বামীজীর Complete Works যত্ন করে পড়লে আর এক রাশ শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রের নির্যাস স্বামীজী প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনাবলীতে সব রয়েছে।'

"আমিও বলি, তোমরা নিষ্ঠা করে স্বামীজীর 'রচনাবলী' পড়বে।"

(কাশী সেবাশ্রম, ২৬/০২/৬১)

শ্রীশ্রীমহারাজের অনুজ্ঞা

[সকালের সেবাটুকু (তলপেটের অস্ত্রক্ষতের ড্রেসিং) সমাপনে কার্যান্তরে গমনোদ্যত কর্মিসাধুকে পিছু-ডাকিয়া বলিলেন ঃ]

প্রণামটি চলছে তো? ... বেশ। ওটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাও। আমি আনন্দ পাই বলে তোমাকে বললুম। আর একটি করবে, রোজ অন্তত হাজার জপ—করে দেখ, নিশ্চয় আনন্দ পাবে।

তিনটি মন্ত্র মা আমাকে দিয়েছিলেন—ঠাকুরের, মা-কালীর আর শিবের নাম। তিনটি মন্ত্রই জপ করতে বলেন—১০৮ বার।

পরে মহারাজ আমার কাছে শুনে বললেন, "তুমি একটু বেশি করেই করো না—অন্তত হাজার বার। আমি নিজে ফল পেয়েছি কিনা, তাই তোমাকে বলছি। তুমিও করে দেখ, আনন্দ পাবে।"

সেই থেকে মহারাজের আদেশও পালন করছি।

(কাশী সেবাশ্রম, ০৪/১০/৬১)

স্মরণ মনন করবে

একবার বলরামবাবুর বাড়িতে দেখা হতেই মহারাজ বললেন ঃ "তোমরা ধ্যান-জপ কর, করে হয়তো সামান্য একটু উন্নতি করলে, তারপর আবার সব শুকনো হয়ে যায়। মনে হয় যেন তোমরা দরজা এঁটে বন্ধ করে দিয়েছ। এ সময় প্রয়োজন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তোমাদের সাধন-ভজন চালিয়ে যাওয়া। এরূপ চালিয়ে গেলে তারপর একসময় দেখতে পাবে যে বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছে। তখন সে কি আনন্দ! ধর্ম জীবনে এ রকম অনেক বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়।" একবার মহারাজ একজন ভক্তকে বলেন ঃ "তুমি যখন ধ্যান-ভজন করবে, মনে করবে ভগবান তোমার সম্মুখে পুরাণ-বর্ণিত কল্পতরুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন।" আর একদিন তিনি আরেকজন ভক্তকে বললেন ঃ "ধ্যান করতে করতে মনে করবে তুমি সাগরের মাঝখানে রয়েছ, চারদিকে পর্বতপ্রমাণ বিশাল ঢেউয়ের রাশি। আর ঈশ্বর তোমার সামনেই আছেন, তোমাকেই রক্ষা করবার জন্য।" মাদ্রাজে থাকতে একদিন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। একসময় কথা প্রসঙ্গে মহারাজ বললেন ঃ "এক কাজ করবে, সব সময় ঈশ্বরের স্মরণ মনন করবে। আমিও তাই করি।"

(যোগক্ষেম, বিমলকুমার ভট্টাচার্য ও ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। প্রকাশিকা ঃ পূরবী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, উদ্বোধন ঃ ৯০ বর্ষ ৭ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

১৯০৬ সালে কলকাতায় এফ. এ. পড়িবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের সহিত পরিচিত হই। ঠাকুরের কথামৃত ও স্বামীজীর রাজযোগ একই সময়ে আমার হস্তগত হয়। এই বই ও আরও সব বই পড়িয়া এক নূতন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করি। এই সময় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট দীক্ষা লইবার ও ধর্মজীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে সময় লাগে।

১৯০৭ সালে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া রাজসাহীতে বি. এ. পড়িতে যাই। সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া আবার কলকাতায় আসি ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মের পর। শ্রীশ্রীমহারাজ এই সময় মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া উড়িষ্যাতে ছিলেন। ১৯১০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে সর্বপ্রথম তাঁহাকে দর্শন করি। উৎসবের পর তিনি ৺পুরী চলিয়া যান। এই সময় আমি সীতাপতির সহিত বেলুড় মঠে গিয়া সাধুদের সহিত পরিচিত হই। শনি-রবিবার বেলুড় মঠেই কাটাইতে আরম্ভ করি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি মহারাজগণ আমাকে তাঁহাদের আপনার করিয়া লন। ১৯১০ সালের শেষে স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন কলকাতা আসেন তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে আমার এক অপূর্ব যোগ আছে বোধ করিতাম। তাঁহার প্রতি ভক্তি-ভালবাসায় বিহ্বল হইয়া যাইতাম। অন্য মহারাজদের বেলায় এরূপ হইত না।

কলকাতায় ও বেলুড়ে মহারাজের নিকট খুবই যাইতাম। তাঁহার দর্শন ও এক-আধটু সেবা করিবার সুযোগও পাইতাম। একদিন বিনোদবাবুদের বাড়িতে কি উৎসব; অনেক সাধুভক্ত আসিয়াছেন। আমি মহারাজকে বড় হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছি, মহারাজ হঠাৎ আমাকে বলিলেন—"দেখ, শরীর মন সংসারকে দিলে সংসার সব নষ্ট করিয়া দেয়। ভগবানকে দিলে তিনি সব—

স্বাস্থ্য, চেহারা, মন—ভাল অবস্থায় রাখিয়া দেন।” আমার সাধু হইবার ইচ্ছা খুবই ছিল। মহারাজ আদর্শটা আরও উজ্জ্বল করিয়া ধরিলেন।

একদিন আমি ও আমার একটি বন্ধু মহারাজের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বেলুড় মঠে যাই। সেখানে গিয়া শুনি তিনি বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে বলরাম মন্দিরে গিয়াছেন। তখন আমরা বলরাম মন্দিরে যাই। মহারাজ আমার বন্ধুকে বলেন—“দেখি তোর হাত।” তাহার হাত দেখিয়া বলিলেন—“তোর কামের দিক হইতে কিছু অন্তরায় আছে। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে তাহা কাটিয়া যাইবে।” বাবুরাম মহারাজ আমাকে স্নেহ করিতেন। তিনি মহারাজকে আমার হাতও দেখিতে বলেন। মহারাজ আমার হাত কিন্তু দেখিলেন না। ইহাতে আমার মন খারাপ হইয়া গেল। আমি মনে করিলাম আমার বন্ধুর সাধু হইবার সম্ভাবনা আছে, আমার হয়ত তাহাও নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বেলুড় মঠে ঢুকিতেছি, মাঠের মাঝখানে মহারাজের সেবক আমাকে দেখিয়া বলিল—“মহারাজ বলিতেছিলেন, তুমি সাধু হইবে।” আমার তখন প্রাণে বল আসিল। সময়ে আমার সাধু হওয়া হইল; কিন্তু বন্ধুটিকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইল। সে এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু খুব ঠাকুরের ভক্ত; শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য।

একদিন মহারাজ সদলবলে দুখানি নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। অপূর্বভাবে তিনি ভাবিত। বলিলেন—“দক্ষিণেশ্বরে কুকুর হইয়া থাকাও পরম সৌভাগ্য।”

শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট যখন গিয়া বসিতাম তখন স্পষ্ট বোধ করিতাম—তাঁহার চারিদিকে যেন একটি charmed circle আছে। আমরা তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। একদিন মহারাজ আমার নিকট এক নূতন ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি বেলুড় মঠে পায়চারি করিতেছিলেন। আমি দেখিলাম এক অমানব দিব্য পুরুষ।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে দীক্ষা দেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ৺পুরী চলিয়া যান। আমি মহারাজকে লিখি—আমি সাধু হইতে চাই। মহারাজ অমূল্য মহারাজকে দিয়া লেখান—মনে যদি জোর থাকে, চলিয়া আসুক না।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে আমি ৺পুরীতে মহারাজের নিকট চলিয়া যাই

এ সঙ্ঘে যোগদান করি। মহারাজ এই সময় আমাকে দিয়া অটলবাবুর বাড়িতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা করান। পূজনীয় হরি মহারাজ প্রধান তন্ত্রধারক; নীরদ মহারাজ সহকারী তন্ত্রধারক। কুমারী-পূজাও করাইয়াছিলেন। ইহাতে সাধু হইবার অব্যবহিত পরেই আমার জীবনে এক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা আনিয়া দেন।

ইহার পর শ্রীশ্রীমহারাজ শর্বানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমাকে মাদ্রাজে পাঠান। মাদ্রাজে যাইবার পূর্বে মহারাজকে আমি উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি গম্ভীর ভাবে খুব কৃপার সহিত বলেন—"Struggle! Struggle! Struggle!" —ইহাই জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া আছে। শ্রীশ্রীমহারাজের কথা এখনও কানে বাজে।

পুরীতে থাকিবার সময়কার দু-একটি কথা মনে হয়। একদিন অটলবাবু শর্বানন্দ স্বামীকে বলেন—"তোমরা কি রকম সাধু? তোমাদের কোন সিদ্ধাই নাই!" তাহা শুনিয়া মহারাজ বলেন—"সিদ্ধাই পাওয়া সহজ। মনের পবিত্রতা লাভ করা শক্ত। মনকে পবিত্র করাই আসল।"

একদিন মহারাজের শরীর খারাপ। কোমরে ব্যথা হইয়াছিল। সেদিন ৺পুরী-মন্দিরে বিশেষ উৎসব। আমরা প্রায় সকলেই—মহারাজের সেবকই মহারাজের সব দেখিবে মনে করিয়া—মন্দিরে উৎসব দেখিয়াই অনেক সময় কাটাইয়া দিই। সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিলে মহারাজ আমাদের স্বার্থপরতার জন্য খুব বকেন। অবশেষে বলেন—"আমি তোদের নিকট হইতে কিছুই চাই না। এক তোদের মঙ্গল চাই। আর তোদের মঙ্গলের জন্যই সব বলি।"

বকুনি খাইয়া রাত্রে আমি মহারাজের সেবা করিবার ভার লই। একদিন রাত্রে মহারাজ গরম বোধ করেন। আমাকে জানালার পাখি খুলিতে বলেন। আমি একে সেবাকার্যে নূতন, তারপর আমার বুদ্ধিরও অভাব। জানালা কিছুক্ষণ পর বন্ধ করিবার দরকার, তাহা মনে হয় নাই। পরদিন মহারাজের শরীর একটু ভার হয়। তাহা শুনিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হই। মহারাজ আমাকে নিজে কোন রকম বকুনি তো দেনই নাই তাছাড়া আরও অন্য সকলকে বলিয়াছিলেন—"ছেলেমানুষ, জানে না।" ইহাতে অন্য কেহই আমাকে কিছু বলে নাই। আমার এক শিক্ষা হইয়া গেল।

১৯১১ সালের শেষে মাদ্রাজ যাই। সেখানে পাঁচ বৎসর ছিলাম। ১৯১৬ সালে মাদ্রাজেই আবার মহারাজকে দর্শন করি।

মাদ্রাজ মঠের ম্যানেজারের কাজ করিতে আমাকে খুব খাটিতে হইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যানেজারের চেয়ারে আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"তোকে কি এখানে কেরানিগিরি করিবার জন্য পাঠাইয়াছি?" আমাকে খুব বকেন। শর্বানন্দ মহারাজকেও খুব বকেন। বলেন—"ছেলেটাকে পড়াশুনা প্রভৃতি করিবার সুযোগ না দিয়া তাহাকে দিয়া কেরানিগিরি করাইতেছ।"

বিশ্ব মহারাজ তখন মহারাজের সেবক। তিনি আমাকে মহারাজের জন্য ভাল তিল-তেল প্রভৃতি আনিতে বলেন। আমি সন্ধান জানিতাম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাহা পাইতাম তাহা আনিতাম। একদিন ইহা উপলক্ষ্য করিয়া বলেন—"তোকে কি আমি কোথায় ভাল তিল-তেল পাওয়া যায় না যায় তাহার সন্ধান জানিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছি?" সব বকুনি শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপার ও ভালবাসার নিদর্শন জানিয়া, প্রাণে প্রাণে তিনি আমার আপনার ও আমি তাঁহার আপনার জন, ইহা মনে করিয়া আনন্দিতই হইতাম।

এই সময় মহারাজ আমাকে বিশেষ পড়াশুনা ও সাধন-ভজন করিতে ও নিত্য বিষ্ণু-সহস্র-নাম পাঠ করিতে বলেন। তাঁহার কৃপায় মন খুব ভাল অবস্থায় থাকিত ও হৃদয়ে মহারাজের সহিত যোগ ও এক পূর্ব আনন্দ বোধ করিতাম।

মহারাজ কৃপা করিয়া তাঁহার দলের সঙ্গে আমাকে ৺কন্যাকুমারী লইয়া যান। ইহার পূর্বে আমি বিধিপূর্বক সমগ্র ৺চণ্ডীপাঠ কখনও করি নাই। দেবীর মারামারি-কাটাকাটি ভাল লাগিত না। স্তোত্রগুলি মাত্র পড়িতাম। ইহা শুনিয়া খুব বকেন, আর প্রতি পক্ষে একদিন বিধিপূর্বক ৺চণ্ডীপাঠ করিতে বলেন। তিন বৎসর বিষ্ণু-সহস্র-নাম ও ৺চণ্ডীপাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তিন বৎসরের বেশি পাঠ করিয়াছিলাম।

ব্রহ্মচারী অবস্থায় অহঙ্কারাদি হইবে মনে করিয়া আমি প্রবন্ধাদি লিখিতাম না ও বক্তৃতাদিও দিতাম না। বাহিরের লোকের সঙ্গে ধর্ম-প্রসঙ্গাদিও বিশেষ করিতাম না। ত্রিবাঙ্কুরের হরিপাদ আশ্রমে একদিন আমাকে জোর করিয়া বলেন—"আমাদের নিকট হইতে যে সব শুনিতেছিস ও শিখিতেছিস তাহাই বলবি।"

মাদ্রাজে একদিন বলেন—"পড়াশুনা করিবার এমন অভ্যাস করবি যাহাতে কোনদিন পড়াশুনা না করিলে খারাপ বোধ হয়। মন উচ্চাবস্থায় না থাকিলে অন্তত পড়াশুনা লইয়া থাকিবে। তাহার নিচে যাইবে না।"

আরেকদিন বলেন—"প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া article লেখ তো!" আমি

বলি —"কি লিখিব? কোন ভাব আসে না।" তখন বলেন—"বেশ ভাল করিয়া চিন্তা করিতে শেখ। তখন দেখবি এত ভাব আসিবে যে তাহার চোট সামলানো দায়।" এরপর গুরু-কৃপায় আমার কোন ভাবের অভাব হয় নাই।

ব্যাঙ্গালোরে মহারাজের নিকট থাকিবার সময় একদিন সকালে কয়েকটি physical exercise দেখান ও নিত্য করিতে বলেন। আমি কিছু indoor exercise বরাবরই করিতাম। মহারাজের প্রদর্শিত exercise-গুলি তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া লই।

মহারাজ একাধিকবার আমাকে বলিয়াছিলেন—Physical, intellectual, moral and spiritual সব রকম progress এক সঙ্গে চালানো দরকার।

মাদ্রাজে আসিবার পর মহারাজ নিজেই আমাকে অনেকবার suggestion দেন—আমাকে সন্ন্যাস দিবেন। সন্ন্যাসের পূর্বে অন্যান্য সাধুরা আমাকে তাঁহার নিকট গিয়া সন্ন্যাসের জন্য প্রার্থনা করিতে বলেন। আমি মূর্খের মতো গিয়া তাঁহাকে বলি—"মহারাজ, আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন তবে আমাকে কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দিন।" তাহাতে মহারাজ স্নেহের সঙ্গে বলেন—"সন্ন্যাসের উপযুক্ত একথা কেহই বলিতে পারে না। তবে আমি তোকে সন্ন্যাস দিব।"

সন্ন্যাসের দিন শ্রীশ্রীমহারাজ এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবে vibrate করিতেছেন অনুভব করিলাম। হোম প্রভৃতি হইবার পর যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া আমার ভিতর এক বিরাট সত্তার বোধ আনিয়া দেন। তিনি, আমি, জগৎ যেন এক অনন্ত সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুর যে কি স্বরূপ তাহার আভাস দিলেন। তখন "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"— ইহার সত্যতা খুবই অনুভব করিলাম।

ঐদিন সন্ধ্যার পর আমরা অনেকেই মহারাজের নিকট গিয়া বসিয়াছি। শর্বানন্দ মহারাজও সেখানে ছিলেন। মহারাজের মন খুব উচ্চ সুরে বাঁধা। আমি মনে করিয়াছিলাম খুব সাধন-ভজনের কথা বলিবেন, তাহা না বলিয়া বিশেষত আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোরা সাধন কি করবি। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব দ্বারে দ্বারে প্রচার কর। তাঁহাদের কাজ কর। দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভগবানের নাম শোনা। ইহাই মহা সাধন।" শর্বানন্দ মহারাজের নাম ধরিয়া বলিলেন—শর্বানন্দ, শ্রীরামানুজাচার্যের ভাব আজকাল আমার বড় ভাল লাগে—সকলকে ভগবানের বাণী শুনানো।"

ঐদিন শ্রীশ্রীমহারাজ আমার ভিতর এক নূতন প্রেরণা আনিয়া দেন। আমার মনটাকে এক নূতন ধারায় চালাইয়া দিলেন। সেই ভাব এখনও চলিতেছে। মাদ্রাজে এই নূতন প্রেরণার ফলে পড়াশুনা-ধ্যান্-পাঠাদিতে বেশি জোর দেই। ক্লাস, বক্তৃতাদিও করিতে আরম্ভ করি। বিশেষভাবে প্রবন্ধাদি লেখা পরে হয়।

মাদ্রাজের নূতন মঠ-বাড়ি নির্মাণও শ্রীশ্রীমহারাজের এক ঐশী শক্তির বিকাশ। পুরাতন মাদ্রাজ মঠ-বাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মঠ ভাড়াটিয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। পূজনীয় শর্বানন্দ মহারাজ ও আমরা নূতন মঠ-বাড়ি কি করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ভাবিয়াই পাই নাই। জমি পূর্বেই ক্রয় করা ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ আসিয়া বলিলেন—তিনি মঠ-বাড়ির ভিত্তি স্থাপন করিবেন। শর্বানন্দ স্বামীকে টাকা সংগ্রহ ও এমন কি কিছু ধারও করিতে বলিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থাদি আসিয়া গেল, অন্যান্য যোগাযোগও হইল। আট মাসের মধ্যে সামনের 'হল' ছাড়া আর সব বাড়ি তৈয়ার হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমহারাজ ব্যাঙ্গালোর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ও আমাদের সন্ন্যাসের কিছুদিন পর নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ঐদিন—মঠ-প্রতিষ্ঠার দিন—আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আরতি করিতেছি। শ্রীশ্রীমহারাজ আমার পিছনে একটু দূরে দাঁড়াইয়া। আরতি করিতে করিতে বোধ করিলাম—যেন এক বিরাট সত্তায় সব পূর্ণ। সব ছবিতে ও শ্রীশ্রীমহারাজের ভিতর ও সকলের ভিতরেই সেই বিরাটের আরতি করিলাম। এখনও আরতি করিতে গেলে এই ভাব আসিয়া যায়। ইহা শ্রীশ্রীমহারাজের বিশেষ কৃপা। ঐদিন সন্ধ্যার পর আমরা ভাড়াটিয়া বাড়ির ছাদে মহারাজের নিকট গিয়া বসিয়াছি। মহারাজ তখন বলিলেন—"আমি ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম—এরা ছেলেমানুষ, কি করিয়া বাড়ি করিবে? আপনি কৃপা করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিন। —তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বাড়ি হইয়া গেল।"

মাদ্রাজে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতাম। পড়াশুনা-ধ্যানাদির বিশেষ সময় পাইতাম না। আমার জীবনে একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত, তাহা মহারাজ মাদ্রাজে আসিয়াই বুঝেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—আমি মাদ্রাজ ছাড়িয়া ব্যাঙ্গালোরে যাই। আমার সেখানে যাইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহারাজ জানিতেন আমার পক্ষে কি ভাল। একদিন বলিলেন—"বোকা, নিজের interest বুঝিস না! মাদ্রাজে আর তোর থাকিয়া কাজ নাই। তুই ব্যাঙ্গালোরে যা।"

পূর্বে তুলসী মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আমাকে চাহিয়াছিলেন।

মহারাজও একরূপ রাজি ছিলেন শুনিয়াছি। যাহা হউক, মহারাজের ইচ্ছায় আমি ১৯১৭-এর গ্রীষ্মে ব্যাঙ্গালোর যাই। সেখানে এক বৎসরের উপর ছিলাম।

মহারাজ ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পুরী চলিয়া যান। আমিও ইহার কিছুদিন পর ব্যাঙ্গালোরে যাই। সেখানে খুব সাধন-ভজন-পড়াশুনা করিতাম। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে রবিবারের ক্লাসও আমি লইতাম। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের শেষভাগে আমার Enteric Fever হয়। শরীরে খুব জ্বালা বোধ করিতাম। হাসপাতালের ward-এ আছি। এই সময় খুব influenza হইতেছিল। একদিন সকালে একটি বৃদ্ধকে আমার bed-এর পাশের bed-এ আনিয়া রাখিল। বৃদ্ধের Double Pneumonia হইয়াছিল। খুব সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। সন্ধ্যা নাগাদ বৃদ্ধের সব শেষ হইয়া গেল।

আমি বিশেষ যন্ত্রণা বোধ করিতেছি। তখন আমার মন খুব পরিষ্কার। কোনরূপ মৃত্যুভয় নাই। আমার মনে হইতেছিল যন্ত্রণা আরও বেশি হইলে তাহা সহ্য করা মুশকিল। তাহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল। যেই এই কথা আমার মনে উঠিয়াছে তখন শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিলাম।

তিনি বলিলেন—"মরবি কি রে! তোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমার মন এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। চোখ দিয়া খুব জল পড়িতে লাগিল। মৃত্যু-ভয় তো ছিলই না। খুব একটা শান্তি ও শরণাগতির ভাব আসিয়া গেল। অসুখও ভালর দিকে turn লইল।

ব্যাঙ্গালোরে এক বৎসরের উপর থাকিয়া ও এক বৎসর মাদ্রাজ প্রদেশের একাধিক স্থানে সাধন-ভজনাদি করিয়া ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট ভুবনেশ্বরে যাই। সেখানে তাঁহার পূত সঙ্গে কয়েকদিন থাকিবার সুযোগ পাই। ভুবনেশ্বর মঠ নির্মাণ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে পুরীর অটল মৈত্র মহাশয় তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সহিত আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধ খুব বিষণ্ণ শোকে যেন মগ্ন। শ্রীশ্রীমহারাজ বরদানন্দ স্বামীকে গান গাহিতে বলিলেন। বরদানন্দ স্বামী—"অভয়ার অভয়পদ কর মন সার"—এই গানটি গাহিলেন। গান শুনিয়া—তাহার অপেক্ষা বেশি শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শনে ও কথাবার্তায়—বৃদ্ধের মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই এই পরিবর্তন দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

ভুবনেশ্বরে কয়েকদিন থাকিবার পর মহারাজ আমাকে অসুস্থ গোকুলানন্দ

স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় পাঠাইয়া দেন। আমি কলকাতা হইতে গিয়া কয়েক মাস বেলুড় মঠে বাস করি। এই সময় ১৯২০ সালে স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে মহারাজ বেলুড়ে আসেন। আমরা সকলে তাঁহার ঘরে গিয়া বসিতাম। ধ্যান ও স্তোত্রাদি পাঠ হইত।

শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার শেষ দর্শন ৺কাশীতে—১৯২১ সালের প্রারম্ভে, স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে। আমি তখন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট ছিলাম। মহারাজ ৺কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে ও সেবাশ্রমে এক নূতন আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত আনিয়া দেন। এই সময় তিনি আমাকেও খুব আধ্যাত্মিক প্রেরণা দেন। একদিন আমাকে তিনি সাধন-ভজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম—“আমার ভিতরটা যেন খুলিতেছে না। তাই মনে শান্তি পাইতেছি না। আমরা এমন খারাপ সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি যে সেগুলি আধ্যাত্মিকতার অন্তরায় হইয়া আছে।” মহারাজ বলিলেন—“এ রকম ভাবিস না। মহানিশায় জপ কর। পুরশ্চরণ কর। ভিতরটা আপনিই খুলিয়া যাইবে।”

আর একদিন মনে অশান্তি বোধ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছি। তিনি আমাকে আসিতে দেখিয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন। অল্প সময়ে অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন—“আমি যা চাই তা করতে চাস না বলিয়াই তোর মনে অশান্তি হয়।” মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া হৃদয় শান্তিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের ইচ্ছা, আমি মায়াবতী গিয়া ‘প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদনার’ ভার লই। আমাকে তিনি নিজে কিছুই বলেন নাই। পূজনীয় সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ একাধিকবার আমাকে মায়াবতী যাইবার সম্বন্ধে বলেন। আমি বিশেষভাবে নারাজ।

একদিন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট আছি ও তাঁহার সেবার কাজে ব্যাপৃত আছি। সকালে হঠাৎ বোধ করিলাম—আমার ভিতরে কি যেন একটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও প্রাণের ভিতর হইতে কান্না পাইতেছে। চোখ দিয়া খুব জলও পড়িতে লাগিল। চোখের জল মুছি, আবার পড়িতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর একটা খুব শরণাগতির ভাব আসিয়া যাইতেছে দেখিলাম। বুঝিলাম শ্রীশ্রীমহারাজের ইহা একটি লীলা। তিনি কৃপা করিয়া আমার মনের গোঁ ও আরও সব অন্তরায় ভাঙ্গিয়া দূর করিয়া দিতেছেন। সন্ধ্যা নাগাদ আমার মনটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সকালে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তখন তিনি আমাকে বলিলেন—"দেখ, ওদের সকলের ইচ্ছা তুই মায়াবতী যাস ও প্রবুদ্ধ ভারতের ভার নিস।" ইতঃপূর্বেই তিনি আমার গোঁ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি কোন রকম দ্বিধা না করিয়া বলিলাম—"মহারাজ আপনি যদি আদেশ করেন নিশ্চয়ই যাইব।" মহারাজ এই উত্তর শুনিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন ও আশীর্বাদ করিলেন। এরপর আমার মায়াবতী যাওয়া স্থির হইল। একদিন সকালে মহারাজকে প্রণাম করিয়া সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে তাঁহার নিকট বসি। মহারাজ আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন—"সাধন-ভজন কিরূপ চলিতেছে?" আমি উত্তরে বলি—"অনেক কাজ করিতে হয়। বিশেষ সময় পাই না।" মহারাজ বলিলেন—"কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না, এইরূপ মনে করা ভুল। মনের চঞ্চলতার জন্য ঐরূপ মনে হয়।" এরপর মহারাজের কথার বন্যা খুলিয়া গেল। তিনি খুব ভাবের সহিত বলিলেন—'work and worship' একসঙ্গে করিয়া মনকে তৈয়ার করিতে হয়। এইসব কথা 'Spiritual Teachings'-এর 'Work and Worship' Chapter-এ আছে। ইহা আমাকেই বিশেষ করিয়া বলা।

এই দিন নির্মল মহারাজের সঙ্গে ও সব সাধু ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার এক বিশেষ প্রীতির ভাব স্থাপন করিয়া দেন। বলেন—"নির্মলও যেমন আমার আপনার তুইও তেমনি আমার আপনার, এমনি সকলেই।" যখন ভাবি সকলেই তো মহারাজের আপনার, তখন সকলকে আমারও আপনার বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার নিজের শিষ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সকলকেই আপনার মনে করিতেন ও বলিতেন, সকলেই ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিতে আসিয়াছে। একদিন বিশেষত আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"কর্ম ঠাকুর-স্বামীজীর—এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন তো হইবেই না, অধিকন্তু তার through দিয়ে spiritual, moral, intellectual এবং physical সব রকম উন্নতি হবে। তাঁহাদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দে। তাঁদের গোলাম হয়ে যা।"

শ্রীশ্রীমহারাজের এই ও আরও সব উপদেশ জীবনের সম্বল হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে আমার একদিন খুব প্রাণ ভরিয়া কথাবার্তা বলিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার উপর আমার অভিমান হইয়াছিল। মাদ্রাজে ১৯১৬ সালে গিয়াই আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি ফিরিবার সময় আমাকে বাংলাদেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গে না লইয়া গিয়া ব্যাঙ্গালোরে

পাঠান। তারপর ১৯১৯ সালের শেষে ভুবনেশ্বরে তাঁহার নিকট আসিলে আমাকে সেখানে বেশিদিন না রাখিয়া বাংলাদেশে পাঠাইয়া দেন। এইসব কারণে আমার অভিমান হওয়ায় মনে অশান্তি বোধ করিতেছিলাম।

আমি কথাবার্তা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। একদিন এই সুযোগ পাই। শ্রীশ্রীমহারাজের ১৯২১ সালের জন্মতিথিতে ৺কালীপূজা হয়। প্রতিমা ভাসানোর জন্য সন্ধ্যার পূর্বে সকলেই গঙ্গাতীরে গেলে আমি তাঁহার নিকট যাইব স্থির করি। পূর্বে তাঁহাকে কিছুই বলি নাই।

আমি ঐদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী তাঁহার নিকট বসিয়া। পেতাপুরীও আছেন। আমাকে দেখিয়াই মহারাজ ছেলেমানুষের ভাবে পেতাপুরীকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখলি আমি কেমন যোগী?"

শুনিলাম একটু পূর্বেই তিনি পেতাপুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"দেখত, সুরেশ আসিয়াছে কি না।" তিনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন আমি আসিব।

এইদিন অনেক কথাবার্তা হয়। ভুবনেশ্বরে আমাকে মাত্র কয়েকদিন রাখিয়া বেলুড়ে পাঠাইয়া দেন। মহারাজ বলেন—আমার বাংলা দেশে যাইবার ইচ্ছা ছিল ও একটু ঘোরাঘুরি করিবারও ইচ্ছা ছিল, তাহা তিনি জানিতেন। আরও জানিতেন—এভাব অল্প দিনেই কাটিয়া যাইবে। এই ভাব শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে কাটিয়া যায়—সেইজন্য আমাকে বাংলাদেশে অত তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দেন। মহারাজ কত গভীর ভাব হইতে সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত হই। তিনি মনের সব খেদ দূর করিয়া আমার মনটাকে পরিষ্কার করিয়া দেন। ইহার ফলে শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহাদের সঙ্গে আমার এক নূতন মনের যোগ আনিয়া দেন।

ইহার কয়েকদিন পর তিনি বেলুড়ে চলিয়া যান। ৺কাশীতে আমার তাঁহাকে শেষ দর্শন করা। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার অমানব মূর্তি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে মাদ্রাজে ও ৺কাশীতে যে আধ্যাত্মিকতার আভাস এবং ধর্ম ও কর্ম জীবনের গতির ধারা দেখাইয়া দেন তাহার জের আজও চলিতেছে। তিনি কৃপা করিয়া সূক্ষ্মভাবে আরও নূতন আলোক ও নূতন প্রেরণা আনিয়া দিতেছেন। যতই দিন যাইতেছে ততই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার মর্ম বুঝিতেছি। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন।

(উদ্বোধন : ৬৮ বর্ষ ২ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা*

স্বামী নির্বাণানন্দ

॥ ১ ॥

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)কে আমার প্রথম দর্শন করার সৌভাগ্য হয়। এই সেবাশ্রম একটি হাসপাতাল। রাস্তাঘাট থেকে অসহায় দুঃস্থ রোগী কুড়িয়ে এনে এখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীরা নারায়ণজ্ঞানে এই সব রোগীদের সেবা ও শুশ্রূষা করে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এইরূপ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি সাধু হওয়ার জন্য কাশী সেবাশ্রমে যোগদান করি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরও দুজন শিষ্য—স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকেও এইখানে প্রথম দর্শন করি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই তিনজন শিষ্যকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে, তাঁদের ভেতর একটা জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিকতা সব সময় বিরাজ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র শ্রীমহারাজকে দর্শন করার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার পত্রবিনিময় ছিল। সুতরাং প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি আমার নিকট একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং আরও নানা সূত্র থেকে তাঁর সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল। তাঁর সকরুণ অপার্থিব—ঠাকুরের ভাষায় ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি—যেন ডিমে তা দিচ্ছে, তেজোদীপ্ত সহাস্য বদন এবং সহজ সরল বালকভাবের কোমল মাধুর্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

সেবাশ্রমের শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সব সময় মনে হতো কখন মহারাজের নিকট যাব। কর্তব্য কর্ম সেরে সুযোগ-সুবিধা পেলেই মহারাজের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎভাবে একটু সেবা করার জন্য তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকতুম। তিনি দয়া করে কখনও খাবার তৈরি করতে, কখনও বা গা-হাত-পা টিপে দিতে বলতেন। অল্প সময়ের জন্য হলেও এই সেবার অধিকার

* প্যারিস রামকৃষ্ণ বেদান্তকেন্দ্রে প্রদত্ত ভাষণ

পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতুম এবং বিপুল আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতুম। এইভাবে কিছুদিন সেবা করার পর আমার দৃঢ় ধারণা হলো যে, এই আনন্দময় মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করা একান্তই আবশ্যক; নতুবা ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তু বুঝবার বা ধারণা করবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

কিছুদিন কাশীতে বাস করার পর মহারাজ অন্যত্র চলে গেলে তাঁর সঙ্গ লাভ করার জন্য তখন প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি। অন্তরের প্রার্থনায় ভগবান সব সময়েই সাড়া দেন; তিনি সে বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।

হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন, "মহারাজ যেখানে থাকেন, তার চারপাশে তিনি এমন একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেন যে—তার মধ্যে যে কেউ যাবে, তাকেই সেইভাবে ভাবিত হতে হবে।" কতলোক জীবনের নানারূপ কঠিন সমস্যা নিয়ে মহারাজের নিকট আসত; কিন্তু তাঁকে দর্শন করার পর আর কেউ কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করত না। তাঁর সান্নিধ্যে আপনা থেকেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এবং সকলেই তাদের অহমিকা-বিজড়িত স্বাধীন সত্তা ও জাগতিক সুখদুঃখের স্মৃতি সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে একটা অপার্থিব নিবিড় আনন্দ অনুভব করত।

ঠাকুর রাখালকে লক্ষ্য করে ভক্তদের নিকট বলেছেন, 'এইসব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক; ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে।' মহারাজ জাগতিক ব্যাপারের বহু ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে নিরন্তর বিচরণ করতেন। ঠাকুরের নির্দেশমতো স্বামীজী এই সঙ্ঘের ভার তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। স্বামীজীর অন্তর্ধানের পর তিনি সঙ্ঘকে সুপরিচালিত করার জন্য দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সঙ্ঘ দিন দিন পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। সঙ্ঘ-পরিচালনায় নিয়ত ব্যাপৃত থাকলেও তাঁকে দেখে মনে হতো না যে তিনি এত কাজে জড়িত আছেন। কর্মজনিত আশার উন্মাদনা, বিষাদের রেখা, নেতৃত্বের অভিমান ও কর্তৃত্ব-প্রকাশের চেষ্টা তাঁর ভিতর কখনও প্রকাশ পায়নি। এই সকলের বহু ঊর্ধ্বে এক শান্তিময় রাজ্যে তিনি অবস্থান করতেন। বনেই হোক বা লোকালয়েই হোক, মহারাজ খুব সাদাসিধেভাবে জীবনযাপন করতেন; কিন্তু যেখানেই থাকতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন 'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে' সেইরূপ কত সাধু ভক্ত পাপী তাপী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। এই আনন্দময় পুরুষের সঙ্গলাভে সকলেই নতুনভাবে, নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠত। যারা একবার তাঁর নিকট আসত, তারা মহারাজের পবিত্র প্রেম ও

নিঃস্বার্থ ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ফিরে যেত। দর্শন এবং স্পর্শন-মাত্রে অপরের মন উচ্চভূমিতে তুলে দিয়ে তিনি তাদের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারতেন। দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই এ কথা সহজে বোঝা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর গৃহী ভক্ত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঠাকুরের মহাসমাধির কয়েক বৎসর পর তিনি একটি এস্টেটে ম্যানেজারের কার্যভার গ্রহণ করেন। এর পর অনেক দিন আর ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হয়নি; একদিন হঠাৎ গঙ্গাধর মহারাজের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়, তিনি পূর্বের ন্যায় আপনার বোধে কথাবার্তা বলে তাঁকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন। মহারাজ তখন মঠে ছিলেন। বহুকাল পরে দেবেনবাবুকে দেখে তিনি খুব আদরযত্ন করেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দেবেনবাবু চলে গেলে মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে বললেন, "ওহে গঙ্গাধর, তোমার দেবেন কি হয়ে গেছে হে! তার চালচলন, হাবভাব, সব যে বদলে গেছে। ঠাকুরকে এবং আমাদের সব ভুলে গেল নাকি?"

এর কিছুদিন পর দেবেনবাবুর সঙ্গে দেখা হলে গঙ্গাধর মহারাজ সরলভাবে মহারাজের সব কথা তাঁকে বলেন। মহারাজের এই কথাগুলি শুনে তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া আসে এবং মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে একদিন মঠে আসেন। আমি তখন মহারাজের ঘরের দরজার সামনে বসে ছিলুম। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ কোথায়? আমি বললুম, আপনি একটু বসুন, মহারাজ ঘরে আছেন—খবর দিচ্ছি।

দেবেনবাবুকে দেখে মনে হলো তাঁর ভেতরে খুব অশান্তি—যেন স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না—মহারাজের ঘর থেকে বেরুতে দেরি হচ্ছে দেখে ছটফট করছিলেন। তারপর "কই হে আসছেন না?" বলেই ঘরে ঢুকে পড়লেন। মহারাজ তখন বেরুবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। দেবেনবাবুকে দেখে তাঁর বুকে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "কি হয়েছে দেবেনবাবু? সব ঠিক হয়ে যাবে—ঠাকুরকে স্মরণ করুন।" এর পরেই দেবেনবাবুর আমূল পরিবর্তন দেখলুম। মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ, আমার সব অশান্তি দূর হয়ে গেছে। আমি কি হয়ে গেছলুম। আপনার আশীর্বাদ ও দয়ায় আমার দুঃখ-দ্বন্দ্ব এখন আর কিছুই নেই।" মহারাজ দেবেনবাবুকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে প্রসাদ দিতে বললেন। সেদিন অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে তিনি ফিরে গেলেন। তারপর দেবেনবাবু প্রায়ই মহারাজের নিকট আসতেন।

মহারাজের অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে "ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ" পুস্তক যখন ছাপা হয়, তখন দেবেনবাবুকে মহারাজের একটি ছোট জীবনী লিখতে অনুরোধ করি। প্রবন্ধ আনতে গেলে, প্রথম দিক থেকে তিনি এই অংশটি পড়ে শোনান ঃ "যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন, মহারাজ অমিত-ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত; কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত—তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। বিদ্যুদ্বাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে অন্তর্নিহিত। শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বোঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন।" তারপর বললেন, "মহারাজের নিকট যেদিন যাই, সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে? তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় স্পন্দন অনুভব করলাম এবং আমার পূর্বের সেই ভগবদনুরাগ ও ব্যাকুলতা ফিরে এলো—শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার সব স্মৃতি জেগে উঠল। তার ফলে আমার জীবনের গতি ফিরে গেল।"

মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের তাৎপর্যের ওপর খুব জোর দিতেন। তিনি অনেক সময় আমাদের বলতেন, "ঠাকুর যুগাবতাররূপে এসেছিলেন। যুগাবতার যখন আসেন, তখন শক্তির বিকাশ হয়। তখন সাধারণের পক্ষে ভগবান লাভ করা সহজসাধ্য হয়; সামান্য একটু খাটলেই, একটু সাধন-ভজন করলেই মানুষের চৈতন্য হয়।"

একদিন তিনি কথামৃত-প্রণেতা মাস্টার মশায়কে বলছেন, "দেখুন মাস্টার মশায়, ঠাকুর এবার এসে জীবলোকে এবং শিবলোকে একটি Bridge (ব্রীজ) তৈরি করেছেন। এখন দেখুন তো সাধারণের পক্ষে ভগবান লাভ করা কত সহজসাধ্য হয়েছে।" আমাদের সম্বোধন করে বলতেন, "তোমরা এ সুবর্ণ সুযোগ হারিও না, উঠে পড়ে লেগে যাও। এই সুযোগ হারালে পরে খুব পরিতাপ করতে হবে। তিনি ছিলেন সত্যের প্রতিমূর্তি; সেই আদর্শে জীবন গড়ে তোল। যারা হাসপাতালে কাজ করছ, তারাও নিষ্কাম কর্ম অভ্যাসের দ্বারা সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে ও সত্য বস্তু লাভ করতে পারবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "রাখাল আমার ছেলে—মানসপুত্র।" দক্ষিণেশ্বরে

পিতাপুত্রের অপূর্বলীলা—যাঁরা কথামৃত বা তাঁর জীবনী পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন। তাঁর শরীর যাওয়ার পরেও যে তাঁদের এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল, নিম্নে বর্ণিত ঘটনা থেকে তা বুঝতে পারা যায়।

বলরাম মন্দিরে একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মহারাজ যখন বিশ্রাম করতে যাবেন, তখন একজন বিধবা মহিলা তার ভাইকে সঙ্গে করে মহারাজকে দর্শন করতে আসে। আমি মহারাজের ঘরের দরজার পাশে একটি বেঞ্চিতে বসেছিলুম। সেই ভদ্রমহিলা আমাকে খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করে, "রাখাল মহারাজ কোথায়? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে চাই—শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।" আমি বললুম, "এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে না। তিনি এখন বিশ্রাম করতে যাবেন।" আমার কথা শুনে মহিলাটি খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আমি তার সেই ভাব দেখে মহারাজকে গিয়ে তার কথা জানালুম। তিনি খুব স্নেহভরে আমায় বললেন, " দেখ, খাওয়া-দাওয়ার পরে, এই বুড়ো বয়সে আর কথাবার্তা বলতে পারি না। ঘণ্টা দুই বাদে আসতে বলো।" এই কথা শুনে মহিলাটি নীরবে অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। পরে কাতরস্বরে আমায় বলে, "দেখুন, আমি শুধু প্রণাম করে চলে যাব—এরূপ একটু ব্যবস্থা আমায় করে দিন।" তার এই ব্যাকুল ভাব দেখে পুনরায় মহারাজকে গিয়ে জানালুম, "শরৎ মহারাজ এই মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন, শুধু একবার প্রণাম করে যেতে চায়।" এইবার শরৎ মহারাজের নাম করাতে আর কোনরূপ আপত্তি না করে বললেন, "বেশ যদি শুধু প্রণাম করে যায়, তা হলে আসতে বল।"

সে তখন খুব আনন্দে সন্ত্রস্তভাবে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করল। প্রণত অবস্থায় মহিলাটি ভাবোচ্ছ্বাসে কাঁদতে লাগল। মহারাজও হঠাৎ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন। আমার তখন মহারাজকে দেখে মনে হলো, তিনি কোন এক ভাবরাজ্যে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভাব একটু প্রশমিত হলে সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওঠ মা ওঠ, কি হয়েছে বল।" মহিলাটি তখনও কাঁদছিল। মহারাজের স্নেহপূর্ণ সম্বোধনে উঠে দাঁড়াল; কিন্তু ভাবাবেগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারছিল না। পরে মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, "ইনিই আমায় আপনার নিকট আসতে আদেশ করেছেন।" তার এই কথা শুনে চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে, বলতো মা?"

মহিলাটি তখন নিঃসঙ্কোচে বলতে লাগল ঃ "আমার চৌদ্দ বৎসর বয়সে

বিয়ে হয়, শ্বশুরবাড়ি বহরমপুর। বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই স্বামী মারা যান। তখন ভগবানের নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম, 'ঠাকুর, সারাটা জীবন কি করে কাটাব? তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও!' প্রায় এক বৎসর পর একদিন রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, 'দুঃখ করো না, বাগবাজারে আমার ছেলে রাখাল আছে, তার নিকট যাও—সে তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে!' কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, কে রাখাল, তখন কিছুই জানি না। আমি কি করেই বা একলা বাগবাজারে যাব?

"শ্বশুরবাড়ির কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি। আমার মা থাকেন কলকাতায় টালিগঞ্জে। শ্বশুরবাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে মা-র কাছে এসে সব বললুম। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে জানতেন। তাঁর কাছে খবর নিয়ে আমার ভাইকে সঙ্গে করে বাগবাজারে যাই। সেখানে খোঁজ খবর করে উদ্বোধন কার্যালয়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলতে তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে মহারাজ আমায় ডেকে বললেন, "দেখ, এই মেয়েটি এখনও উপবাসী রয়েছে। এর একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।" ইতোমধ্যে তার দীক্ষাদি হয়ে গেছে। মহারাজের আদেশ পেয়ে তাকে বলরামবাবুদের অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম এবং কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললুম। মেয়েটি যখন মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাকে দেখে মনে হলো সেই শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার লেশমাত্রও তার ভিতরে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখালরাজের কৃপা-কটাক্ষে এমন একটা কিছু ঘটেছিল—যার ফলে সে এখন আনন্দে ভরপুর।

এর পর সে প্রায়ই মহারাজকে দর্শন করতে আসত। মহারাজের মহাসমাধির পর দু-একবার তাকে মঠে আসতে দেখেছি। তারপর বহুকাল তার আর কোন খোঁজ খবর জানতুম না। প্রায় ২০ বৎসর পরে খোঁজ নিয়ে বেলুড় মঠে একবার সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তখন তার গেরুয়া-পরিহিত সন্ন্যাসিনীর বেশ। এই দীর্ঘকাল কোথায় ছিল—জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "মহারাজের নির্দেশে কাশী, বৃন্দাবন এবং হরিদ্বারে তপস্যায় কাটিয়েছি। তাঁর কৃপায় বেশ আনন্দেই বৎসরগুলি কেটে গেছে। এখন কলকাতায় টালিগঞ্জে থাকি।" তার তপস্যাপূত শান্ত পবিত্র জীবন, বিনয়নম্র ব্যবহার এবং অল্প কথাবার্তায় আমার ধারণা হয়েছিল যে, সত্যের কিছু সন্ধান না পেলে এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এর

প্রায় তিন বৎসর পর তার শরীরত্যাগ হয়। এই তপস্বিনীর শরীরত্যাগ এক বিস্ময়কর ঘটনা। হঠাৎ একদিন তার পেটের অসুখ করে, কয়েকবার দাস্ত হয়। সেইদিনই তার সঙ্গিনী মেয়েদের (শিষ্যাদের) সকলকে সম্বোধন করে বলে, "আগামী পরশু আমার নশ্বর দেহের অবসান ঘটবে, তোমরা ভয় পেওনা—দুঃখ করো না।" এই নিদারুণ কথাগুলি শুনে সকলে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে গেল। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়; ধীরে ধীরে সেই নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হলো। সেদিন পূর্বাহ্ণে ইষ্ট ও গুরুর নাম স্মরণ করতে করতে সেই তপস্বিনী তার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁর মানসপুত্রের মধ্যে এই যে লীলা—সাধারণের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব।

॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য একদিন আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের মঠবাটীর পূর্ব দিকের উপরের বারান্দায় মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ, ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।"

শুনিয়া মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন; একটু পরে বলিলেন, "তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।" বলিতে বলিতে অন্তর্মুখী হইয়া গেলেন, আরও কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তোমরাও তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই বুঝিয়ে দেবেন।"

* * *

মঠবাটীর পূর্ব দিকের উপরের বারান্দায় কথাবার্তা হইতেছিল, মহারাজ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন, আশে-পাশে ৮/৯ জন সাধু ব্রহ্মচারী বসিয়া। তাঁহাদের মধ্যে একজন নির্জনে শুধু ধ্যান-ধারণা করিবার জন্য তপস্যায় যাইতে চায়, মহারাজের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি বলিলেন, "এ রকম করতে পারলে তো ভাল, তা ক-জনে পারে? যদি একান্তই ইচ্ছা হয়; তবে দু-চার-ছ-মাস এভাবে কাটাতে পারো, তোমাদের শরীর-মন তপস্যার নয়; কর্ম ও উপাসনা এক সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে।"

* * *

কাশী থেকে মহারাজকে চিঠি লিখেছি, তাতে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, "ঠাকুর

কি সত্যই আছেন?” কিছুদিন পরে পত্রোত্তরে তিনি লিখলেন, “পত্রপাঠ মঠে চলে এস।” মঠে এসে দোতলায় তদানীন্তন অফিস-ঘরে (স্বামীজীর ঘরের পাশে) মহারাজকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই বললেন, “তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? তিনি সত্যি আছেন, তা নইলে আমরা আজীবন কি নিয়ে পড়ে আছি?”

* * *

মহারাজের দৃষ্টি সব দিকেই ছিল, তরকারি কোটা হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, আর বলছেন, “বিভিন্ন তরকারির কুটনো কোটা আলাদা। সুক্তোর কুটনো, ঝোলের কুটনো, চচ্চড়ির কুটনো—সব আলাদা। কোটা তরকারি দেখেই রাঁধুনিরা বুঝে নেবে কি কি রাঁধতে হবে।”

* * *

ভুবনেশ্বরের মঠে ছাদে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রামলাল-দাদা মহারাজকে একটু দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা যখন ঠাকুরের কাছে ছিলেন, তখন তো কত সাধন-ভজন করেছিলেন, তারপরও ধ্যান-ধারণা কি ভীষণ ভাবে চলেছিল, কই, আজকাল ছেলেদের তো সেই রকম কিছু দেখতে পাই না।”

মহারাজ এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, “দেখ রামলাল-দাদা, তুমি জানো না, এই সব ছেলে সৎ হবার জন্য কত চেষ্টা করছে। অন্তরে যারা সৎ হবার যত চেষ্টা করে, সাধনা করে, বাইরের জগৎ থেকে তাদের তত বেশি ধাক্কা আসে; শুধু তাই নয়, সূক্ষ্ম জগৎ থেকেও অসদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন সূক্ষ্ম শরীর তাদের মনের ভেতরে প্রবেশ করে। তুমি কি জানো দাদা, এরা কে কি করছে, না করছে? এরা যদি ঠাকুরের নাম নিয়ে পড়ে থাকতে পারে তো গুরুকৃপায় সব হয়ে যাবে।”

* * *

ভুবনেশ্বর মঠে হল-ঘরে মহারাজ বসে আছেন; রামলাল-দাদা উপস্থিত, মহারাজ জনৈক সাধুকে বলছেন, “দেখ্, গুরুকৃপায় তোদের সব হয়ে যাবে। তবে এ জীবনে যদি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সম্ভোগ করতে চাস, তবে দীন হীন কাঙাল হয়ে, অকিঞ্চন হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।”

* * *

বলরাম মন্দির, ১৯১৮ খ্রীঃ। মঠ হইতে জনৈক সাধু আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন, মহারাজও তাঁহার ও মঠের কুশল জিজ্ঞাসা

করিলেন, পরে তাহার বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্—একটু চেপে চুপে থাক্! ঠাকুর যুগাবতার হয়ে এসেছেন, তাঁর নামে কত মঠ-মন্দির হবে, কত টাকা-পয়সা আসবে, তার ইয়ত্তা নেই, তোদের যদি ত্যাগ-সংযম না থাকে, তা হলে তোরা আসল জিনিস হারিয়ে ফেলবি।"

* * *

বলরাম মন্দিরে ছোট ঘরে—অন্তর্ধানের কয়েকদিন পূর্বে। মাস্টার মশাই (শ্রীম) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কেমন আছেন? একটু ভাল বোধ করছেন?"

মহারাজ এ কথার কোন জবাব না দিয়া বলিলেন, "মাস্টার মশাই, ঠাকুর এবার এসে জীবলোক আর শিবলোকের মাঝে একটি ব্রীজ (bridge = সেতু) তৈরি করে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে ভগবানের কাছে যাবার কত সুবিধা হয়েছে।"

কিছুক্ষণ পরে মাস্টার মশাইকে আবার বলিলেন, "যখন যুগাবতার আসেন, তখন প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়, তাতেই মানুষের সহজে চৈতন্যের উদয় হয়।"

* * *

কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, "মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহারাজ ছিলেন আমাদের পরিচালক, কিন্তু মঠের অধ্যক্ষ-পদের কর্তৃত্ব দ্বারা নয়, তিনি আমাদের পরিচালনা করতেন—তাঁর প্রেমের বশীকরণ-শক্তি দ্বারা।"

॥ ৩ ॥

মহারাজের গায়ে জোর ছিল খুব। ঠাকুরের গায়েও বেশ জোর ছিল। জোয়ান মহারাজকে একদিন ঠাকুর কাঁধে তুলেছিলেন। মহারাজ খেতেও পারতেন বেশ। দুপুরে খাওয়ার পর একবার দশটা ল্যাঙড়া আম খেয়ে ফেললেন। তবে খাওয়ার ব্যাপারে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের তুলনা মেলা ভার। একদিন মহারাজ, ত্রিগুণাতীত স্বামী ও আরও দুজন গুরুভাই রাত্রে বাইরে খেয়ে বলরাম মন্দিরে ফিরেছেন। তাঁদের খাবার রাখা ছিল। তখন বলরামবাবু জীবিত। না খেলে রাখা খাবার নষ্ট হবে, তাই বলরামবাবুর ভয়ে মহারাজ একটু চিন্তিত।

ত্রিগুণাতীত স্বামী মহারাজের চিন্তা দেখে বললেন ঃ "ওতে কি হয়েছে? আমি খেয়ে নিচ্ছি সব।" পুরো রাত্রের খাবার খেয়ে আসার পরে চারজনের খাবার তিনি অক্লেশে খেয়ে নিলেন। একবার ত্রিগুণাতীত স্বামী জয়রামবাটী থেকে ফিরছিলেন। পথে একটি ছোট হোটেলে দুপুরের আহারের জন্য যান। বারবার ডালভাত চেয়ে হোটেলের সব ডালভাত ফুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। খাওয়ার পরে পয়সা দিতে গেলে হোটেলের মালিক হাতজোড় করে বললেন ঃ "আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। তবে দয়া করে আর আমার হোটেলে আসবেন না।" একবার কোথাও যাবার সময় রাস্তায় সরষের তেলের পোলাও রান্না করে খেয়েছিলেন। মহারাজ বলতেন, একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ত্রিগুণাতীত মহারাজের—যখন-তখন যত খুশি খাওয়ার, আবার দিনের পর দিন কিছুই না খেয়ে জপ-ধ্যান করার।

একদিন মঠে মহারাজের ঘরের লাগোয়া ছাদে মহারাজের হাতে মুখধোবার জল দেব। তখন বেশ গরম। বেলা তিনটে হবে। আমার ও মহারাজের খালি পা। পায়ে খুব গরম লাগছে—ছাদে পা রাখা কষ্টকর। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। মহারাজ জল নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু দেখলাম ভাবস্থ অবস্থায় তাকিয়ে আছেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। তাঁর পা খুব কোমল ছিল, কিন্তু দেখলাম তিনি অবলীলায় ঐ গরম ছাদের ওপর একভাবে দাঁড়িয়েই আছেন। এদিকে আমি গরমে পা বদলিয়েই চলেছি। কত সময় তাঁকে তামাক সেজে দিয়েছি। তামাক পুড়ে যাচ্ছে, তিনি বসে আছেন ভাবস্থ অবস্থায়। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোন হুঁশই তাঁর নেই। পুড়ে যাচ্ছে দেখে তামাকটা আমরা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আড়ালে নিজেরাই খেয়ে নিতাম অনেক সময়। একদিন শীতকালে তামাক খেতে গিয়ে লেপ পুড়িয়ে ফেলেছি। কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দের) কাছে নালিশ করলেন। বাবুরাম মহারাজ সব শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বাবুরাম মহারাজ চুপ করে আছেন দেখে কেষ্টলাল মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন মহারাজের কাছে নালিশ করবেন বলে, তখন বাবুরাম মহারাজ বলে উঠলেন ঃ "ও কেষ্টলাল! ওকথা মহারাজকে বলো না। ব্যাটারা এখন হুঁকোয় তামাক খায়, মহারাজকে বললে ওরা গড়গড়ায় খাবে!" কেষ্টলাল মহারাজ আর মহারাজের কাছে যাননি।

মহারাজের এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে, যখন যেখানে থাকতেন চারপাশে একটা বিশেষ 'অ্যাটমস্ফিয়ার' বা পরিবেশ সৃষ্টি হতো। খুব হাসি-তামাসা চলছে,

কিন্তু যেই মহারাজ গম্ভীর হলেন অমনি ‘পিনড্রপ সায়লেন্স’; মহারাজ হাসলে সবাই সহজ হতে পারত, চুপ করলে সেখানে তৎক্ষণাৎ নেমে আসত গম্ভীর নিস্তব্ধতা। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। তাঁর উপস্থিতি বা সান্নিধ্যের প্রভাবে সকলেই বোধ করতেন, মনটা একটা উঁচু স্তরে উঠে আছে। রামলালদাদার (ঠাকুরের ভাইপো—রামলাল চট্টোপাধ্যায়) বিষয়বুদ্ধি ছিল খুব। ভারি হিসাবী ছিলেন। কিন্তু যখন মহারাজের কাছে আসতেন ও থাকতেন, তখন তাঁকে মনে হতো বাস্তবিকই এক মহাপুরুষ। মহারাজ ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন।

একবার মজফ্ফরপুরের এক ভক্ত অসময়ের কিছু লিচু মহারাজের কাছে পাঠান। তিনি জানান যে, ঐ লিচু ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সাধুরা প্রসাদ পেলে তাঁর খুব আনন্দ হবে। সেই লিচু ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হলো। মহারাজের পেট খারাপ থাকায় প্রসাদী লিচু তাঁকে দেওয়া হয়নি। মহাপুরুষ মহারাজ প্রসাদের পেঁপে থাকলে একটু নেন, বাবুরাম মহারাজ একটু নিয়ে অন্যকে তুলে দেন—নিজে বিশেষ খান না। পরের দিন গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে মহারাজ বলছেন ঃ "বাবুরামদা, তুমি লিচু খেয়েছ? বাবুরাম মহারাজ বললেন ঃ "কই না তো?" মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তারকদা, আপনি খেয়েছেন?" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন ঃ "না"। মহারাজ তখন আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কই, আমাকে লিচু দিসনি তো?" আমি বললাম ঃ "কাল আপনার শরীর ভাল ছিল না, তাই দিইনি।"—"আজ দিসনি কেন?" আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ইতঃপূর্বে মহারাজের কাছে কেউ নালিশ করেছে যে, আমি সাধুদের না দিয়ে লিচু অন্যদের দিয়ে দিয়েছি। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি দেখে মহারাজ রেগে গিয়ে "কথা বলছিস না যে" বলেই আমায় এক চড়! আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই আছি। বাবুরাম মহারাজ পিছন দিক থেকে আমাকে টানছেন আর বলছেন ঃ "চলে আয়।" আমি শান্তভাবে বললাম ঃ "কেন যাব! আমি তো কিছু অন্যায় করিনি।" পরদিন সকালে বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে গিয়ে বললেন, আমার সম্বন্ধে যিনি তাঁকে নালিশ করেছেন তিনি ঠিক কথা বলেননি। শুনে মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে বললেন (বাবুরাম মহারাজের কাছে শোনা) ঃ "বাবুরামদা, দেখলে ছেলেটা কেমন নির্বিকার!" তারপর মহারাজ আমায় ডেকে বললেন ঃ "কাল একটা অন্যায় করে ফেলেছি, কিছু মনে করিস না।"

একবার বিকালে মহারাজের জন্য একটা তরকারি করেছি। মহারাজ সন্ধ্যার

আগেই খেতেন। একজন রুটি, তরকারি, দুধ মহারাজকে দিয়ে এসেছে। মহারাজ খেতে গিয়ে দেখেন, তরকারির মধ্যে একটা দেশলাই কাঠি। যে খাবার দিতে এসেছিল তাকে মহারাজ খুব ধমকাচ্ছেন। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি গিয়ে মহারাজকে বললাম ঃ "ওর কোন দোষ নেই, তরকারি আমি করেছি।" মহারাজ বললেন ঃ "তরকারিতে দেশলাইয়ের কাঠি দেখতে পাসনি?" আমি বোকার মতো বলে ফেললাম ঃ "দেখতে পেলে কি আর দিতাম মহারাজ?" মহারাজ চটে গিয়ে তরকারি ফেলে দিলেন। আর খেলেন না। উত্তেজিতভাবে মহাপুরুষ মহারাজকে গিয়ে বললেন ঃ "তারকদা, দেখেছেন, এরা আমার খাবারে 'পয়জন' দিচ্ছে!" মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ "ওকি বলছ মহারাজ! ওকি হয়! তুমি পাগলের মতো কি বলছ?" মহারাজ ঘরে ফিরে এসে শুধু ফল আর দুধ খেলেন। রুটি-তরকারি ছুঁলেন না। পরদিন আর কোন কথা নেই—চুপ! আমি মহারাজের ঘরে যাচ্ছি, কাজকর্ম করছি, কিন্তু আমার সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। তবে শুনছি, একে ওকে বলছেন ঃ "আমার ঠাকুর আছেন, কেউ সেবা নাই বা করল!" এভাবে একদিন গেল। পরদিন সকালে সোজা চলে এসেছেন আমার ঘরে। বললেন ঃ "কি করছিস?" আমি বললাম ঃ "কিছু না, মহারাজ।" মহারাজ বললেন ঃ "একটা দরকার ছিল।" আমি বললাম ঃ "যাচ্ছি মহারাজ।" তাঁর ঘরে যেতে মহারাজ বললেন ঃ "দেখ, তখন রেগে গিয়ে কি বলেছি, কিছু মনে করিস না।" আমি বললাম ঃ "আপনি ঠিকই বলেছেন মহারাজ। আমার তো আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তরকারিটা তো আমিই করেছিলাম। ওর মধ্যে দেশলাই কাঠি রয়ে গেল, সে তো আমারই দোষ।"

মহারাজের জলখাবার এক-এক দিন এক-এক রকম করতাম। দেখতাম, অনেক সময় যে খাবারটি আমি তৈরি করেছি, মহারাজ সেটিই খেতে চাইতেন। আমার কিরকম একটা হয়ে গিয়েছিল—আমার মনে হঠাৎ উঠত যে, মহারাজ আজ এটাই খেতে চাইবেন। রাত্রে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়তাম। মনে হতো, মহারাজ বোধ হয় এখন উঠবেন। উঠেই দেখতাম, দু-চার মিনিট পরেই মহারাজও উঠেছেন। বাথরুমে যাবেন। আমি মহারাজের ঘরে অথবা লাগোয়া বারান্দায় শুতাম। বাথরুমে যেতে হলে মহারাজকে বারান্দা দিয়েই যেতে হতো। কখনো কখনো ঘুম ভেঙেছে, শুয়ে আছি। দেখছি, মহারাজ উঠেছেন, আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে যাচ্ছেন যাতে আমার ঘুম না ভাঙে। কিন্তু আমার ঘুম আগেই ভেঙে যেত। মহারাজ বলতেন ঃ "আমার ঘুম ভেঙেছে, সুয্যির ঘুম ভাঙেনি—এমন কখনো হয়নি।"

একটা ব্যাগে মহারাজের টাকাপয়সা থাকত। একদিন আমি বাইরে গেছি। মহারাজের কাউকে পনেরো টাকা দেবার ইচ্ছা হয়েছে। মহারাজ জানতেন, তাঁর ঘরে ব্যাগটা কোথায় থাকে। অবশ্য ব্যাগ থেকে টাকাপয়সা মহারাজের আদেশমতো বা মহারাজের প্রয়োজনে আমিই খরচ করতাম। সেদিন ব্যাগ থেকে নিয়ে মহারাজ টাকাটা দিতে পারতেন, কিন্তু তা না দিয়ে মহারাজ সেই লোকটিকে পরদিন আসতে বললেন। আমি ফিরে এলে আমাকে বললেন ঃ "হ্যাঁরে, টাকা আছে কি? অমুককে পনেরো টাকা দিতে হবে। কাল আসতে বলেছি।" আমি বললাম ঃ "ব্যাগ থেকে আপনি দিয়ে দিলেই তো পারতেন। আপনারই তো টাকা।" মহারাজ বললেন ঃ "নারে, তা কি হয়? ও তো তুই দেখাশোনা করিস। তোকে না বলে কি হয়?"

মহারাজ একবার কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আছেন। রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছি। ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা লোক শেষ সিঁড়ি থেকে ছাদে উঠে মহারাজের ঘরের দিকে চলে গেল। ছিপছিপে সুন্দর চেহারা। লোকটা মহারাজের ঘরে না ঢুকে বা ডানদিকে না গিয়ে আলসে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, ওদিকটা তো খোলা, কোন রাস্তা নেই—কিভাবে লোকটা ওদিকে গেল! তখন আমি তাড়াতাড়ি উঠে এসে একটু অস্বাভাবিক স্বরে জিতেন মহারাজকে (স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে) ডাকলাম। আমি খেতে গিয়েছিলাম বলে জিতেন মহারাজ মহারাজের কাছে ছিলেন। আমার ডাক শুনে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন ঃ "কি সুয্যি, ডাকছ কেন?" আমি বললাম ঃ "মহারাজের ঘরে কি কেউ ঢুকেছে?" জিতেন মহারাজ বললেন ঃ "কই না তো" আমি তখন নিঃসন্দেহ হলাম, আমি যাকে দেখলাম সে কোন প্রেত বা অশরীরী আত্মা। মহারাজকে গিয়ে বললাম ঃ "একটা সংশয় হচ্ছে, 'কাশীখণ্ডে' আছে, কাশীতে মারা গেলে মুক্তি; কিন্তু এইমাত্র একজনকে দেখলাম—ভূত। তাহলে কাশীতে মরলে কি সকলের মুক্তি হয় না?" মহারাজ বললেন ঃ "ঠিকই দেখেছিস। অনেক মহাপুরুষ সূক্ষ্ম-শরীরে ভাগবৎ কথা শুনতে বা পবিত্র স্থানে বা সাধুর সান্নিধ্যে এভাবে আসেন। আমিও তাঁকে দেখেছি—সেদিন রাত্রে। ওঁরা মৃত নন, জীবিতই, সূক্ষ্মশরীরে আসেন।"

মহারাজের ব্যক্তিত্বই ছিল অপূর্ব। তাঁর হাঁটাচলা, কথাবলা সবকিছুর মধ্যেই ছিল একটা দৈবী ভাব। একদিন গঙ্গার ধারের নিচের বারান্দায় প্রবীণ সাধুরা বসে আছেন। মহাপুরুষ মহারাজও আছেন। বাবুরাম মহারাজ ঘাটে নেমেছেন।

একটা নৌকা যাচ্ছে ঘাটের পাশ দিয়ে। নৌকার লোকেরা বলছে ঃ "ব্যাটারা বেশ আছে!" ওদিকে মহারাজ কদমগাছটার তলায় পায়চারি করছেন। নৌকা সেদিকে এলে তাঁর দিকে তাকিয়ে ঐ লোকেরাই বলছে ঃ "কিন্তু যাই বলো, এদের দেখলে মনে হয়—যেন দেবতা চলে বেড়াচ্ছে।" সত্যিই, তিনি এবং তাঁর গুরুভাইরা তো মানুষ ছিলেন না, তিনি এবং তাঁরা ছিলেন দেবতা।

মহারাজের মুখে শুনেছি, ঠাকুরের কতরকম সমাধি হতো। কখনো ব্যুত্থিত হয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেন, কখনো মাথায় কপালে হাত বুলোতেন, কখনো বা নাকটা হাত দিয়ে ঘষতেন। কখনো বলতেন ঃ "জল খাব" অথবা "পান খাব"। কিন্তু হয়তো জল বা পান দেওয়া হলে তা ছুঁলেনই না। এসব কি শাস্ত্রে পাওয়া যাবে? তাই ঠাকুর বলতেন ঃ "এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে।"

কাশীতে মহারাজ একদিন বাগানে ফুল দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি পিছনে পিছনে আসছি। মহারাজ তন্ময় হয়ে ফুলের সঙ্গেই যেন আনন্দ করছেন। আমি অবাক হয়ে দেখছি, মহারাজ হাঁটছেন, কিন্তু মাটিতে পা পড়ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার! আমার নিজের চোখে দেখা।

ভুবনেশ্বর মঠে একদিন মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। হঠাৎ তাঁর গায়ে এবং পাশে ওপর থেকে আবির এসে পড়ল। ডাক্তার রতিকান্ত পিছনেই ছিল। মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আজ কি দোল নাকি?" ডাক্তার ছিল ভক্ত এবং মজার লোক। সে সেই আবির দুহাতে তুলে মাথায় মাখছে। আমাদের খেয়াল ছিল না। জানা গেল, সত্যিই সেদিন ছিল দোল। ছাদের ওপরে কেউ ছিল না যে, ওপর থেকে আবির দেবে—থাকলেও কার সাহস ছিল মহারাজের গায়ে ঐভাবে আবির ছুঁড়বে! মহারাজ সেদিন দোল শুনে আবির কিনে আনতে বললেন। আবির আনা হলে মহারাজ ঠাকুরের পায়ে দিলেন। আমরাও ঠাকুরের পায়ে দিয়ে মহারাজের পায়ে দিলাম। তারপর আবির খেলা হলো।

কে এসবের মীমাংসা করবে? কিভাবে এসব হলো? লোকে বলবে অলৌকিক, কিন্তু এসব আমাদের নিজের চোখে দেখা।

মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রমুখকে দেখে, তাঁদের সঙ্গে থেকে আমরাও 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক' (aristocratic—অভিজাত) হয়ে গিয়েছি। আর কোন সাধু দেখতেও ইচ্ছা করে না—চোখেও লাগে না! আমাদের চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছে!

মহারাজের মুখে শুনেছি, দক্ষিণেশ্বরে মহারাজ ঠাকুরকে প্রায়ই বলতেন তাঁকে দর্শনাদি করিয়ে দেওয়ার কথা। ঠাকুর শুনে শুধু হাসতেন, কিছু বলতেন না। একদিন কালীমন্দিরে মহারাজ গিয়েছেন মাকে প্রণাম করতে। প্রণাম করে যেই উঠেছেন, দেখছেন—মায়ের মুখ থেকে একটা জ্যোতি এসে তাঁকে যেন ছেয়ে ফেলছে। মহারাজ ভয় পেয়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে পালিয়ে এলেন। ঠাকুরকে তিনি কিছু বলেননি, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে বললেন ঃ "কিরে? এতো যে বলিস, এখন পালিয়ে এলি যে বড়?" মহারাজ বলতেন ঃ "আমার তখন অল্প বয়স, অত কি বুঝতাম? আধ্যাত্মিক অনুভূতি ধারণ করার শক্তি অর্জন করতে হয়।"

মহারাজের কৃপায় তাঁর সান্নিধ্যে সময়-সময় মন কত উঁচুতে উঠে থাকত, কিন্তু ধারণ করার শক্তি না থাকায় মন আবার নেমে আসত। তবে মন একেবারে ঐকথা ভুলতে পারত না। এখনো সেসব মনে পড়ে। তখন মন হাঁসফাঁস করে। এও তো মহারাজেরই কৃপা, তাঁরই প্রভাব।

(উদ্বোধন ঃ ৬০ বর্ষ ১ সংখ্যা, ৬৫ বর্ষ ১ সংখ্যা ও ৯৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা)

রাজা মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

॥ ১ ॥

আমি মঠে এসেছি তার মাস দশেক পরে—একদিন বাবুরাম মহারাজ চায়ের টেবিলে এসে বললেন—"আমি মহারাজকে আনতে কাশী যাচ্ছি। তিনি এলে আর আমাকে তোমাদের ভাল লাগবে না। একেবারে বালগোপাল মূর্তি।" তাঁর যাঁরা অনুগত তাঁরা বললেন—"সে কি মহারাজ, আপনাকে ভালবাসব না!" বাবুরাম মহারাজ বললেন, "সত্যিই তাঁকে দেখলে আর আমাকে ভাল লাগবে না। এমনই তাঁর আকর্ষণী শক্তি। ঠাকুরের মানসপুত্র তিনি। ঠাকুর তাঁর এই বালগোপালের ভিতর দিয়েই সঙ্ঘের মধ্যে বিরাজ করছেন।" মহারাজ বহুদিন মঠে আসেন নি তাই বাবুরাম মহারাজ নিজে যাচ্ছেন তাঁকে আনতে। তাঁর আসার কথায় আমাদের সাধুব্রহ্মচারীদের মধ্যে নানা ধরনের আলাপ আলোচনা আরম্ভ হলো। কেউ কেউ বললেন, "মহারাজ একবার একজনকে দেখেই তাঁর ভেতরের সব টের পেয়ে যান।" কথাটা আমার একটু কেমন লেগেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তাদের, "আমাদের এই সমস্ত আলোচনাও কি শুনতে এবং বুঝতে পারছেন?" তাঁরা একথাও সত্য বললেন। যাই হোক্, নির্দিষ্ট দিনে মহারাজ এলেন।

একদিন সকালবেলা মহারাজের ঘরে ভজন শেষ করে এসে আমি ঠাকুরঘরের কাজ করছি হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ আমাকে এসে বললেন—"চল বেটা।" আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। কারণ ঠাকুরের কাজের সময় বাবুরাম মহারাজ কখনও অন্য কোথাও যাওয়া পছন্দ করতেন না, অথচ এখন নিজেই ডাকছেন। তিনি আবার বললেন—"চল বেটা, আজ তোকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই। আমি তাঁকে জানালুম যে আমি সকালে মহারাজকে পেন্নাম করে এসেছি—এখন আর যাব না। কিন্তু বাবুরাম মহারাজ, সেকথা শুনলেন না, আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। স্বামীজীর ঘরের দোতলার সিঁড়ি দিয়ে আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ওপরে নিয়ে গিয়ে মহারাজের পায়ের কাছে

আমার মাথাটা গুঁজে দিলেন এবং মহারাজকে বললেন—"মহারাজ, এই বেটা বড় রাগী, ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে, এমন কি আমার সঙ্গেও ঝগড়া করে। মহারাজ, যাতে ওর রাগের শান্তি হয় তাই করুন, ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন। মহারাজ নিজের হাতটা এপিঠ ওপিঠ ঘুরিয়ে দেখে বললেন—"আজকে আমার হাতটা ঠিক নেই বাবুরামদা, তুমিই আজ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।" বাবুরাম মহারাজ বললেন—"মহারাজ, তুমি ওরকম বললে হবে না। এ-বেটা বড্ড রাগী, তুমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।" একথা বলে তিনি আমার মাথাটা মহারাজের পায়ে বেশ করে গুঁজে দিলেন। মহারাজের ঠাট্টা তামাশা সব এক নিমেষে কোথায় চলে গেল। মহারাজ স্থির নিশ্চল হয়ে গেলেন এবং ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তখন বাবুরাম মহারাজ যত জোরে আমাকে মহারাজের কাছে ঠেলে দিয়েছিলেন ঠিক তত জোরেই আমাকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিজের মাথাটি মহারাজের কোলে গুঁজে দিয়ে বললেন, "মহারাজ, ওদের কোন দোষ নেই, আমিই বকে বকে ওদের মাথা গরম করে দেই। আর বুড়ো হয়েছি, মঠের কাজকর্ম করতে করতে নিজের মাথাটাই গরম হয়ে যায়। তাই ওদের বকাবকি করি; মহারাজ, আমারও মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।" মহারাজও ঠিক একইভাবে বাবুরাম মহারাজের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বাবুরাম মহারাজ মঠের যত সাধুব্রহ্মচারী, কর্মী সকলকেই ডেকে বললেন—"ওরে, তোরা আয়রে, মহারাজ আজ কল্পতরু হয়েছেন।" বাবুরাম মহারাজের আহ্বানে যে যেখানে ছিল এমনকি সোনা ও কেনা নামে দুজন উড়ে চাকর—সকলেই এসে মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করলেন। মঠের একজন ডাক্তার—বিপিন ডাক্তার—পায়খানা থেকে বেরিয়ে হাতে মাটি দিচ্ছিলেন—তাঁর সেজন্য আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে বাবুরাম মহারাজ তাঁকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন খোঁড়া ও ট্যারা, তায় আবার হাতে মাটি দিচ্ছিলেন—তাঁর সেজন্য আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে বাবুরাম মহারাজ নিজে নেমে এসে তাঁকে নিয়ে যখন মহারাজের ঘরে উঠলেন মহারাজ তখন আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন। সকালে তিনি exercise করতেন, Freehand exercise করতেন বেশি। ছোট খেলার ডাম্বেল এবং মুগুরও তাঁর ছিল। বাবুরাম মহারাজ যখন বিপিন ডাক্তারকে নিয়ে এসে মহারাজকে অনুরোধ করলেন ডাক্তারকে আশীর্বাদ করতে তখন মহারাজ বললেন—"যো আয়েথে সো চলা গিয়া।" ডাক্তারের আর সেই আশীর্বাদ পাওয়া হলো না।

১৯১৭ সাল। হরি মহারাজ ও মহারাজ পুরীতে আছেন। তখনও হরি মহারাজের অসুখ হয়নি। গাড়ি বারান্দার সামনে দুখানা আরামকেদারা পাতা থাকত। একখানিতে হরি মহারাজ ও আরেকখানিতে মহারাজ বসতেন। মহারাজের দুপুরবেলার আহার শেষ হয়ে গেছে। মহারাজের হাতে জল দেবার জন্য আমি তখন প্রস্তুত। মহারাজ বললেন, "চল, কাল যে গাছটি লাগান হয়েছে সেই গাছটার গোড়াতে আঁচাব।" বলেই তাড়াতাড়ি তিনি বাইরের বাগানের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর সেই গাছের কাছে গিয়ে আঁচাতে আরম্ভ করলেন। খুব কড়া রোদ উঠেছে। হরি মহারাজ বারান্দা থেকে মহারাজকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে মহারাজের মাথায় ছাতা ধরলেন আর আমাকে বললেন—"দেখতে পাচ্ছ না, মহারাজের মাথায় রোদ্দুর লাগছে?" আমি তখন খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি। মহারাজ হরি মহারাজের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি ওটা (ছাতাটা) ওর হাতে দিন, আপনি কেন ধরছেন? আপনি খালি পায়ে এ রকম করে এসেছেন, পায়ে কাঁকর টাঁকর ফুটিয়ে একটা কাণ্ড করবেন দেখছি।" শশীনিকেতনের রাস্তাগুলি সব কাঁকরে ভরা ছিল। মহারাজ খুব ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে উঠে পড়লেন।

পুরীতে শশীনিকেতনে মহারাজ আছেন। হরি মহারাজও এসেছেন পুরীতে। মহারাজ তাঁকে বললেন, "আপনি রয়েছেন, একটু ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করলে হয় না?" হরি মহারাজ অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, "বেশ তো, হোক না, তা পাঠ কে করবে?" মহারাজ বললেন, "ঈশ্বরই পাঠক হোক।" বিকেল বেলায় পাঠের আসর বসত। স্বয়ং মহারাজ আসনে বসে সেই পাঠ শুনতেন। অষ্টাদশ জন শ্রোতা। বাইরের ভক্তরাও দুই একজন পাঠ শুনতে আসতেন। দুরূহ স্থানগুলি হরি মহারাজ ব্যাখ্যা করে দিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের আদি থেকে রাসলীলার কিয়দংশ পর্যন্ত পাঠ হয়েছিল। পরে হরি মহারাজের অসুখ হওয়াতে পাঠ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১৭ সাল, দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে মহারাজ পুরীতে শশীনিকেতনে আছেন। একদিন তিনি হরি মহারাজকে বললেন, "ঈশ্বর সুন্দর স্তব পাঠ করে, কিন্তু সংস্কৃত ভাল জানে না বলে মানে ঠিক বুঝতে পারে না, আপনি যদি একটু বুঝিয়ে দেন।"

মহারাজ পুরীতে থাকাকালীন হরি মহারাজ প্রায়ই পুরীতে মহারাজের সঙ্গে থাকতেন। একবার পুরীর শশীনিকেতনে হরি মহারাজ অসুস্থ তাঁর পায়ে ঘা

হয়েছে, অস্ত্রোপচার হবে। মহারাজ সেকথা শুনে ভীত হলেন। বালকের মতো চঞ্চল হয়ে একবার ঘরে আসছেন একবার বাইরে যাচ্ছেন, হলঘরে পায়চারি করছেন। আবার হরি মহারাজের কাছে ছুটে গিয়ে মাথার পাশে দাঁড়াচ্ছেন। অস্ত্রোপচার আরম্ভ হয়েছে। হরি মহারাজ নীরব, ধীর, স্থির হয়ে শুয়ে আছেন। মহারাজ তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, "খুব কষ্ট হচ্ছে, না হরি মহারাজ?" হরি মহারাজ একগাল হেসে বললেন, "না মহারাজ, আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। পিঁপড়ে কামড়ালে যে ব্যথাটুকু হয়, তাও আমি বোধ করছি না। আপনি এ ঘরে থাকবেন না। আপনারই কষ্ট হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি।" এই বলে হরি মহারাজ, মহারাজের হাতের ওপর হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, "আপনি ভাববেন না। সত্যই আমি কষ্টবোধ করছি না।" তারপর মহারাজ নিজের ঘরটিতে এসে ছোট খাটটিতে বসে পড়লেন—বললেন, "আমাকে একটু তামাক দে তো।" মহারাজের চোখ দুটি দেখলাম জলে ভরা।

মঠে যোগদান করার সময় ঠাকুরের সন্তানদের সকলকে আমি পাইনি। কয়েকজন আগেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শশী মহারাজ। শুনেছি শশী মহারাজ ছিলেন সাক্ষাৎ ঠাকুর। আরও শুনেছি মহারাজকে তিনি অদ্ভুত ভালবাসতেন। ঠাকুরের সন্তানদের ভেতর মহারাজকে যাঁরা বুঝতে পারতেন শশী মহারাজ তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু আমি জানি না, তবে একটি ঘটনা তাঁর সম্বন্ধে শুনেছিলুম মঠে থাকাকালীন, সেইটিই বলছি। উমানন্দ নামে মহারাজের এক শিষ্য ছিলেন। বেলুড় মঠে তিনি মহারাজের সেবক ছিলেন। প্রথমবার মহারাজ যখন দাক্ষিণাত্যে যান উমানন্দ তখন মাদ্রাজ মঠের কর্মী। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি হাসপাতালে আছেন। অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে ওঠে। শশী মহারাজ রোজ সকালে হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন। মৃত্যুর দুই তিন দিন আগে মহারাজকে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, "জানি মহারাজ হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে আসতে নার্ভাস হতে পারেন। আমি তাঁকে ভেতরে আসতে বলব না। গাড়িতেই থাকবেন তিনি, আমি একটিবার জানলা দিয়ে তাঁকে দেখব।" শশী মহারাজের মুখে সেকথা শুনেই মহারাজ বলে উঠলেন, "বল কি শশী? কত রকম রোগী সেখানে—আমার অসুখ হবে না?" পরপর দু-তিন দিন অনুরোধ করেও একই উত্তর পেলেন শশী মহারাজ। তাঁর খুবই কষ্ট হলো। উমানন্দর শরীর চলে গেল। সকালবেলা ঘর থেকেই মহারাজ তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। শারীরিক কুশল জানিয়ে শশী মহারাজ আবেগভরে বলতে লাগলেন, "তুমি কি নিষ্ঠুর

মহারাজ! উমানন্দও এখানকারই ছেলে। অন্তিমকালে একটিবার দেখতে চাইল, আর তুমি দেখা দিলে না?” বলতে বলতে তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং খানিক পরে আস্তে আস্তে বললেন—“শশী, চোখের দেখাটাই কি সব? আমি কি তার কাছে যাইনি?” সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করে বললেন শশী মহারাজ, “মহারাজ, তোমাকে আমরা বুঝতে পারিনি।”

মঠে এসে যদি মহারাজের কৃপা এবং স্নেহ না পেতুম তাহলে মঠ ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়তুম। মহারাজকে দর্শনের লোভটি সামলাতে পারিনি বলেই আমার দীর্ঘকাল সেখানে থাকা হয়ে গিয়েছিল। তিনি অশেষ কৃপা করে তাঁর সেবক নিযুক্ত করে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর কাছে থাকার অধিকার পেয়েছিলুম—না হলে আমার নিজের তো কোন গুণই ছিল না। কাজেই মহারাজের কথা ছাড়া আর কি-ই বা বলব। কত ঘটনাই মনে পড়ে একে একে। ১৯১৫ সাল। মহারাজ তখন বেলুড় মঠে আছেন। তখন মুষ্টিমেয় সাধুব্রহ্মচারী আমরা মঠে ছিলুম। কেষ্টলাল মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজকে বললেন, “অল্প বয়স্ক ব্রহ্মচারীরা তামুক সেবন করে, এটা বন্ধ করতে হবে।” বাবুরাম মহারাজ বললেন, “মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁকে গিয়ে তুমি বল।” কেষ্টলাল মহারাজ মহারাজের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন, “অল্প বয়স্ক ব্রহ্মচারীরা তামাক যাতে না খায় আপনি তাদের ডেকে বলে দিন।” কেষ্টলাল মহারাজ ধূমপান করতেন না। তিনি যখন মহারাজের কাছে অভিযোগ করছিলেন মহারাজ তখন তামাক সেবন করছিলেন। মহারাজ একটু হেসে বললেন, “স্বামীজী তাঁর নিয়মাবলীতে লিখেছেন ‘তামাক ব্যতীত অন্য কোন নেশা ...’ ” তারপর একটু হেসে বললেন, “আমিও তো তামাক খাই। এ বুড়ো বয়সে আমাকে তামাক খাওয়া বন্ধ করাবে?” তখন কেষ্টলাল মহারাজ বললেন, “না মহারাজ, অল্প বয়স্ক ব্রহ্মচারীরা যাতে না খায় সেই কথাই আমি বলছিলাম।” তিনি একটু হেসে কৌতুকের সঙ্গে বললেন, “দেখ কেষ্টলাল, আমি চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তামাক খেতে আরম্ভ করি। আমি কি করে বলব তোমরা তামাক খেও না!”

মহারাজ যখন বেলুড়ে থাকতেন, আমরা দেখেছি সকাল বিকেল অনেক সময় মঠ প্রাঙ্গণময় ঘুরে বেড়াতেন। এই ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি কখনও কখনও সব্জি বাগানে ঢুকতেন। হয়ত সেখানে দেখলেন কর্মীদের মধ্যে দু-একজন গাছপালা দেখছেন, তদারক করছেন। কিভাবে কোন্ গাছে সার দিতে

চাপে, কীটাদি থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে সে বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতেন। দেখেছি কখন-কখন নিজে তাদের কাজে সাহায্য করতে অগ্রসর হতেন। বেগুন গাছে অনেক সময় পোকা ধরে গাছ নষ্ট করে দেয়। পোকা-লাগা ডালগুলিকে ছেঁটে দিতে বলতেন। বেগুন গাছে ও লাউ কুমড়ো গাছে পোকা লাগলে হুঁকোর জল ও ছাই দিলে পোকা লাগা বন্ধ হয়—বলতেন।

এই রকম করে হয়ত এলেন তিনি পুষ্পোদ্যানে, দেখলেন কোন ব্রহ্মচারী হয়ত ফুল তুলছেন ঠাকুরের জন্য। তাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "গাছের সমস্ত ফুল তুলো না—গাছের উপরিভাগের ফুলগুলি রেখে পাতার আড়ালে আবডালে যে ফুলগুলি ফুটেছে সেগুলি ঠাকুরের জন্য নাও।" তোড়া বাঁধবার জন্য কতকগুলি গোলাপের প্রয়োজন। কতকগুলি বোঁটাওয়ালা গোলাপ ব্রহ্মচারী তুলেছেন, মহারাজ তার সাজির দিকে চেয়ে দেখলেন সেগুলি, বললেন—"এ কি করেছ? এই গোলাপের সঙ্গে যে ছোট কুঁড়ি দুটি রয়েছে, এগুলি থাকলে কদিন বাদে ফুটে উঠত। তুমি কি করে ফুল নিতে হয় জান না।" তাকে কেউ শিখিয়েও দেয়নি বলে হয়ত ভর্ৎসনা করলেন এবং শিখিয়ে দিলেন কিভাবে পুষ্পচয়ন করতে হয়। কত স্নেহ-প্রীতি ও দরদ দিয়েই না মহারাজ বৃক্ষলতাদির যত্ন করতেন। সেটা তখনকার সাধুব্রহ্মচারীদের ভেতর অনেকেই লক্ষ্য করেছেন।

এইরকম একটা সময় একদিন আমি জঙ্গলের ভিতর একটি গাছ থেকে ওষুধের জন্য ছাল তুলছিলাম, মহারাজ তখন অনেকটা দূরে পাদচারণা করছিলেন, আমি গাছের আড়ালে বসে কাজ করছিলাম। হঠাৎ পেছনে মহারাজের সাড়া পেলাম, "কি করছ ওখানে?" আমি বললাম, "মহারাজ, বাবলা গাছের ছাল তুলছি।" প্রশ্ন করলেন—"কেন তুলছ?" বললাম, "মহিমবাবু (স্বামীজীর ভাই তখন মঠে) কবিরাজী ওষুধ খাবেন, অনুপান বাবলার ছালের রস। তিনি আমাকে বলেছেন বাবলার ছাল আনবার জন্যে।" শুনে মহারাজ বললেন, "তুমি আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা না করে কেন ছাল তুলছ? আর কখনও এ রকম না জিজ্ঞাসা করে তুলো না।" আমি মনে মনে তখন ভাবছিলাম, সামান্য একটা বাবলার ছাল, তার জন্য এত কি বলার আছে! মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "মঠের যা কিছু দেখছ, সব ঠাকুরের। মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই নিজের মতে করো না, ঠাকুর শুধু মন্দিরে বসে নেই। তাঁরই সব, তিনি নিজে সব দিতে পারেন।"

দেখেছি, এই পাদচারণার সময় হয়ত গরুদের কাছে গেলেন, তাদের গায়ে

হাত বুলোলেন, এক একটি গরুর নাম ধরে তাদের আদর করলেন—কখনও হাত দিয়ে, কখনও লাঠি দিয়ে। এর ভিতরে দেখে নিলেন, কোন্ গরুটি কেমন আছে। গোয়ালের ভার ছিল তখন কেনা চাকর ও রজনীবাবুর উপর। মহারাজকে দেখে তারা ছুটে এলো। রজনীবাবুকে বললেন—"নাগরীটা এত রোগা হলো কেন? ওর একটু ভাল করে ব্যবস্থা করবেন। চন্দ্রির তো বাচ্চা হয়েছে, ওকে কলাই-সেদ্ধ দিচ্ছেন তো? এতে দুধ ভাল হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। আর দেখুন, ফুলকপির পাতা আর বেশি খাওয়াবেন না গরুকে। ওটা সব গরুর পক্ষে ভাল নয়।" এ রকম করে মহারাজ রান্না ডিপার্টমেণ্ট, কুটনো ডিপার্টমেণ্ট, অফিস ডিপার্টমেণ্ট, ঠাকুরের ভাঁড়ার প্রভৃতি সকল স্থানে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন। একদিন ঠাকুর ভাঁড়ারে আমি কাজ করছি, মহারাজ ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, "কি করছ?" আমি তখন পুষ্পপাত্রে ঠাকুরের পুজোর জন্যে নানারকম ফুল পৃথক পৃথকভাবে সাজিয়ে রাখছিলুম। ছোট বাটিতে রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, দূর্বাদল ও তুলসীপাতা এবং বেলপাতাও সেই পাত্রে সাজিয়ে রাখছিলুম, তা দেখে মহারাজ ভারি খুশি হলেন, বললেন, "বেশ, বেশ, যখন কাজ করবে তখন ঠাকুরের নাম জপ করবে। ঠাকুরের জন্য মালা করবার সময় ঠাকুরকে স্মরণ করে তাঁর নাম করে করে মালা গাঁথবে।" তারপর বললেন—"তোমার কাজ শেষ হয়েছে তো, এইবার আমার এই কোমরটা একটু টিপে দাও তো—বড় ব্যথা হয়েছে।" ঠাকুরের ভাঁড়ারের চৌকাঠটা ধরে তিনি দাঁড়ালেন, আমি কোমরটা টিপে দিচ্ছিলুম, একটু পরেই বললেন—"বা, বেশ হয়েছে। এবার তুমি কাজ কর, আমি যাই।"

কথা প্রসঙ্গে মহারাজ একদিন বলেছিলেন, "ভোগীরা তাদের সঞ্চিত অর্থ ও সম্পদ সন্ন্যাসীদের দান করে হয় ত্যাগী আর ত্যাগীরা তাদের অর্থ নিয়ে হয়ে যায় ভোগী।" আমাদের সাধুদের লক্ষ্য করে তিনি আরও বললেন—"ষোল থেকে ত্রিশ বছরের ভেতরে যা কিছু করবার করে নিতে হবে। ত্রিশের পর আর কিছু হয় না। ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে যেমন মানুষের সুদের টাকা বাড়ে তেমনি এই সময় কিছু করে নে, এখন তোদের ছেলেমানুষ বয়েস। এরপর আর কিছু হবার আশা বিড়ম্বনা। আমরা থাকতে থাকতে যা করবার করে নে, শেষ বয়সে মজায় থাকবি, আনন্দে থাকবি। তোদের এখন অল্প বয়স, রক্তের জোর আছে, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম একটু চেষ্টা করলেই সহজে হয়ে যায় এবং সাধন-ভজন করলে মন তরতর করে তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। জানবি, সাধুদের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস থেকে ষাট বছর বয়েস পর্যন্ত বড় খারাপ

সময়। দেখা যায়, সাধু হতে এসে কতকগুলি হয়ে যায় পাগল, কতকগুলি হয় চরিত্রভ্রষ্ট, কতকগুলি সেজে বসে মোহন্ত বা ঐশ্বর্যের পূজারী আর কতকগুলি করে আত্মহত্যা। মাত্র দু-একজন ত্যাগ, সংযম ও বৈরাগ্যের পথে থেকে শান্তিলাভ করে ও বহুজন হিতায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হয়ে যায়। এই বয়সে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি কমে যায়। মনেরও জোর থাকে না—এই সময়ই সাধুদের চরিত্রভ্রষ্ট হবার ভয় বেশি। তাই বলি, অল্প বয়সে করে নে। সহজেই জ্ঞান ভক্তি লাভ হবে।"

শ্রীশ্রীমহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে আছেন। স্বামী অমৃতানন্দ বা নলিন মহারাজের ভ্রাতা নরেন দেব ও তাঁর সঙ্গে আরও দু-একজন সাহিত্যিক পুরী, কোনারক ও ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য বিষয়ক পুরাতন স্থানগুলি দর্শনের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা সন্ধ্যার পর মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তখন মহারাজের কাছে বসেছিলুম। দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে মহারাজ তামাক খাচ্ছেন। নরেন দেব প্রভৃতি যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা মহারাজকে প্রণাম করে মেঝেতে বসলেন। মহারাজ সাময়িক কুশল প্রশ্নাদির পর ভুবনেশ্বরে যে সকল পুরাতন মন্দিরাদি আছে সেগুলি তাঁরা দেখেছেন কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, "মুক্তেশ্বর মন্দির, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দির প্রভৃতি এখানে দেখবার মতো।" তাঁরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ, আমরা এসব দেখেছি" এবং কোনারক প্রভৃতি স্থানের স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। পরিশেষে একথাও তাঁরা উত্থাপন করেছিলেন—অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে ধর্মের দিক থেকে দেশের হয়ত কিছুকালের জন্য খুবই উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত দেশটা যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল তখন থেকেই সৈন্যশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। এই অহিংসাবাদের পরিণতি আমাদের হাজার বছরের দাসত্ব স্বীকার নয় কি মহারাজ? মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, কতকটা বলতে পার, বিরাট উত্থানের পর বিরাট পতনের সূচনা দেখা যায়। এই উত্থান পতনের ভিতর দিয়েই জগৎ এগিয়ে চলেছে মহাজাগরণের পথে। নরেন দেব প্রভৃতিরা চলে যাবার পর আমি মহারাজকে প্রশ্ন করলুম, "অশোক প্রথম অবস্থায় তো দারুণ নিষ্ঠুর ছিলেন, দয়ামায়ার লেশমাত্রও তাঁতে ছিল না।" তাঁর ভ্রাতৃহত্যা ও কলিঙ্গের অত্যাচার কাহিনী যখন বেশ দুঃখের সঙ্গে বলছিলুম তখন তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন ও খুব গম্ভীর হয়ে দৃঢ় কণ্ঠে আমাকে বললেন, "অশোক কে জানিস? অশোক স্বয়ং বুদ্ধ, তিনি নিজে অশোকরূপে এলেন তাঁর ধর্মকে establish করার জন্য।

মহাপুরুষদের জীবনে প্রথম অবস্থায় এইরকম দেখা যায়।" এই বলে তিনি তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাকে গল্পের ছলে বললেন।

রামলাল দাদা যখন মহারাজের কাছে আসতেন, তখন মহারাজ বড় সহজে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে দিতেন না। দু-চারদিন থেকে আট-দশ দিন পর্যন্ত মহারাজ তাঁকে রেখে দিতেন। ঠাকুরের সময়কার অনেক সব ভজন, গীত, কীর্তন ও তাঁর নৃত্যাদি, এমনকি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাদূতী সাজে কীর্তন শুনতে শুনতে মহারাজের অপূর্ব ভাবান্তর আমরা নিরীক্ষণ করেছি। একদিন যখন রামলাল দাদা ঐ রকম সাজে গাইতে আরম্ভ করলেন—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর
দিনেক দুয়ের মতো,
ও তোর মন মানে তো থাকবি সেথা
নইলে আসবি দ্রুত ॥

যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধুলো লাগিবে
না হয়, ব্রজগোপীর নয়ন জলে
চরণ পখালিবে ॥

বললে বলতে পার, আগে রাখাল ছিলে
এখন রাজা হয়েছ
ব্রজে যেতে চরণেতে ধুলো লাগিবে
জল বেড়েছে হে, শ্রীযমুনার জল বেড়েছে হে,
ব্রজগোপীর নয়ন জলে, জল বেড়েছে হে,
আগে ছিল এক হাঁটু জল
এখন যমুনা অতল
সাঁতার দিতে হবে ...

মহারাজ প্রথম কীর্তন শুনে রঙ্গরসের ভাবেই রামলাল দাদার সঙ্গে নৃত্যের ভঙ্গিতে শরীরটিকে দোলাচ্ছিলেন, রামলাল দাদারও ঐ কীর্তন গাইবার সময় ভাবান্তর হয়েছে দেখলুম, তাঁর ভাবে-ভোলা নয়ন দুটি ছলছল করছে। রামলাল দাদা গান গাইতে গাইতে বিহ্বল হয়ে মহারাজকে উপলক্ষ্য করে—যেন মহারাজই ব্রজেশ্বর—এইভাবে নৃত্য করতে লাগলেন—আর রামলাল দাদা যেন বৃন্দাদূতী। এই সময় মহারাজের পানে চেয়ে দেখি, তিনি হঠাৎ গম্ভীর ও ধীর স্থির হয়ে গেছেন। নয়ন দুটি তাঁর ঈষৎ মুদিত। ব্রজগোপিকাদের বিরহব্যথায় হৃদয় উদ্বেলিত, বেদনাকাতর তনুটিও তাঁর মৃদুভাবে দুলছিল।

১৯১৮ সাল। মহারাজ তখন বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। একদিন ইচ্ছে হলো গোলকধাম খেলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোলকধাম খেলত। একজনকে বলে বাড়ির ভেতর থেকে গোলকধাম আনান হলো, যে ঘরে মহারাজ শুতেন, সে ঘরের মেঝেতে গালচে পাতা ছিল। মহারাজ গোলকধাম পেতে নিজে বসলেন। আমাকে মহামায়া ও চিনিকে ডাকতে বললেন। মহামায়া ও চিনি তখন খুব ছোট ছিল। তাদের দুজনের মধ্যে আবার সই পাতান ছিল। তাদের শিশুসুলভ দুষ্টুমি, ছোটাছুটি, হুটোপাটি ও আনন্দোচ্ছ্বল হাসিখুশিতে অন্দরমহল ও বহির্মহল মুখরিত থাকত। আবার অল্পেতেই বিবাদ বিসম্বাদেরও অন্ত ছিল না। আমি তাদের কাছে ডেকে নিয়ে এলুম। তারা খুব আনন্দের সঙ্গে মহারাজের সঙ্গে গোলকধাম খেলতে আরম্ভ করল। মহারাজ আমাকে বললেন—"তুইও খেলবি আয়।" মহারাজ গোলকধামের কড়ি নিয়ে যেমন দান চাললেন, সাত চিৎ হলো। মহারাজ গোলকধাম প্রাপ্ত হলেন। খেলা চলতে লাগল। সেবক, চিনি ও মহামায়া। মহারাজ আমাকে দান দেখিয়ে দিতে লাগলেন। মহারাজ আমার হয়েই খেলা দেখাতে লাগলেন—যাতে আমি তাড়াতাড়ি গোলকধাম প্রাপ্ত হই। সে দিকে নজর রেখে মাঝে মাঝে দরকার মতো কড়ি চিৎ করে দিচ্ছিলেন আবার উল্টে দিচ্ছিলেন। মহারাজকে এইরকম করতে দেখে খুব রাগ করে মহামায়া বললে—"আপনি বেইমানি করছেন মহারাজ, তাহলে খেলব না।" মহারাজও ছেলেমানুষের মতো রেগে উঠে বললেন, "তুই খেলতে পারিস না আর আমি বেইমানি করছি? ও ভাল খেলছে তাই দেখিয়ে দিচ্ছি।" মজার এই, মহারাজ চার পাঁচ চালেই আমাকে গোলকধামে নিয়ে গেলেন।

১৯২০ সাল। মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে আছেন। আমি মহারাজ আর গোঁসাই মহারাজকে তেল মাখাচ্ছিলুম। হঠাৎ মহারাজ প্রশ্ন করলেন গোঁসাইকে—"খানেকো মজা হ্যায়?" গোঁসাই হঠাৎ তাঁর কথা ধরতে পারছিল না। মহারাজ তখন বললেন—"এখানে খাওয়া থাকার সুবিধে হচ্ছে তো?" গোঁসাই বললে, "এখানে খাওয়া দাওয়ার মোটেই সুবিধে নাই মহারাজ।" কচু, কুমড়া আর খাম-আলুর একটা ঘ্যাঁট হতো আমাদের জন্য। তরিতরকারি বাজারে বিশেষ কিছু পাওয়া যেত না। মাছ কালেভদ্রে মিলত। সে মাছগুলি ছোট ছোট আর বালিতে ভরা। এ ছাড়া চালে ও ভাতে কাঁকর ভর্তি। এই সবের জন্য গোঁসাই-এর বিশেষ মনঃপূত হচ্ছিল না তখনকার খাওয়া।

গোঁসাই-এর কথা শুনে মহারাজ একটু যেন দুঃখিত হলেন বলে মনে হলো।

একটু চুপ করে থেকে মহারাজ গোঁসাইকে বললেন—"সাধুর এর চাইতে আর বেশি খাবার কি দরকার? কেমন নির্জন স্থান—সাধন-ভজনের অনুকূল স্থান আর কোথায় পাবে? খাওয়ার দিকে লক্ষ্য যদি এত থাকে তাহলে সাধু হলি কেন? কোথায় ধ্যান-জপে ডুবে যাবি, না ভালমন্দ খাওয়াপরার দিকে নজর রাখবি? আমরা সাধন-ভজনের সময় কত কষ্ট করেছি। শুকনো বাজরার রুটিও কখনও কখনও একখানার বেশি দুখানা জোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু কই খাবারের কথা তো একবারও মনে হতো না!" গোঁসাইয়ের মুখখানা ছিল হাসিমাখা, সর্বদাই সে হাসিমাখা মুখ নিয়ে কথা বলত। মহারাজের কথা শুনে তার হাসি কোথায় যেন লুকিয়ে গেল। বেদনা ও দুঃখে মুখখানি মলিন হয়ে গেল।

মহারাজ তখন মঠে আছেন। রবিবার, ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব। কালীকীর্তনের আসর বসবে; মঠ-প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ। ঠাকুরের পুজো হয়ে গেছে, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরঘর থেকে নেমে এসে আমাকে বললেন, "এখানে (যে ঘরটিতে নিত্য খাওয়া-দাওয়া হতো) যেন কেউ না খেতে বসে। ঠাকুর ঘরের ভেতরে অনেক সময় মেয়েরা ঢুকে পড়ে, সেদিকেও নজর রাখবি, যেন কেউ না সেখানে বসে খায়।"

ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে একটা টুলে বসে আছি, সুধাংশু দত্ত তখন বালক, এসে বলল—"ঈশ্বর মহারাজ, শিগগির চলুন, ওপরে ঠাকুরঘরে বসে কয়েকটি মেয়ে প্রসাদ খাচ্ছে।" সুধাংশুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ওপরে গেলুম ও মেয়েদের বললুম, "আপনারা কেন ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন আর ঠাকুরের ঘরে বসে খাচ্ছেন?" আমার রাগতভাব দেখে সেই দলের কমবয়সের একটি বিধবা মেয়ে উত্তেজিত হয়ে বললেন—"আমরা এখানে বসে খাচ্ছি, বেশ করছি, তুমি বলবার কে?" আমারও তখন কম বয়স। গোঁফদাড়ি গজায়নি, রেগে বললুম, "তোমরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।" "জান আমরা কে?" মেয়েটি বলল। "ঢের জানি", আমি উত্তর দিলুম। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের আমার ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়নি। আমার রূঢ় ব্যবহারে তারা অবশিষ্ট খাবার ফেলে রেখে, "তোমাকে দেখে নেব" ইত্যাদি কথা উত্তেজিতভাবে বলতে বলতে চলে গেল। আমি ঠাকুরঘর পরিষ্কার করে নিচে এসে ঠাকুর ভাঁড়ারের কাজ করতে লাগলুম। মনে একটা গর্বও হয়েছে যে খানিকটা ঠাকুরের কাজ, বাবুরাম মহারাজের আদেশ পালন করতে পেরেছি।

কালীকীর্তন জমে উঠেছে। এই ঘটনার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টাদুই কেটে গেছে। হঠাৎ ভূমানন্দ এসে বললেন, "চল, মহারাজ তোমাকে ডাকছেন।" আমি বললুম, "কাজটা সেরে আসি।" ভূমানন্দ আমার হাত ধরে বললেন, "এক্ষুনি চল। কি করেছ জান তুমি!" আমাকে নিচেকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণের ঘরটিতে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। কয়েকজন ঠাকুরের সন্তান ও রামলাল চট্টোপাধ্যায় সেই ঘরে বসে আছেন—হিমালয়ের গাম্ভীর্যে ভরা একটি গুহার ভেতর ঢুকলুম মনে হলো। ক্রুদ্ধস্বরে শরৎ মহারাজ বললেন, "তুমি কি করেছ? আমাদের মাথা কাটা গেছে।" মহাপুরুষ প্রভৃতি সকলেই সেই কথায় সায় দিলেন। মহারাজ অতি বেদনার সঙ্গে ধীরে ধীরে বললেন, "ইষ্টবংশের অপমান করেছ।" রামলাল দাদা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "আমার মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল মহারাজ, আমি বুঝিয়েও তাদের রাখতে পারলুম না।"

এতক্ষণে আমার অপরাধ সম্বন্ধে ধারণা হলো। শরৎ মহারাজ বললেন, "তোমাকে এক্ষুনি মঠ থেকে চলে যেতে হবে।" মহাপুরুষ বললেন, "হ্যাঁ, এক্ষুনি মঠ থেকে চলে যেতে হবে। তুমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছ।" মহারাজ উঠে পড়লেন, বললেন—"তোমাকে এক্ষুনি দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে ওঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে। ওঁরা যদি ক্ষমা করেন তাহলে ফিরে আসবে, তা না হলে ওখান থেকে চলে যাবে। এস আমার সঙ্গে।"

মহারাজ আমাকে দোতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। অমূল্য মহারাজকে ডেকে বললেন, "এক কাজ কর তো, সমস্ত প্রসাদ চেঙারিতে করে সাজিয়ে নৌকায় তুলে দাও, ঈশ্বর নিয়ে যাবে।" আমাকে বললেন, "এই প্রসাদ নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীদির হাতে দেবে, আর তাঁকে তোমার অপরাধের কথা বলবে। এই টাকা পাঁচটি দিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে। যে মেয়েটিকে বকেছ তার কাছে ক্ষমা চাইবে। সে যদি ক্ষমা করে তবে সেই মর্মে তাঁদের চিঠি নিয়ে আসবে। আর এই প্রসাদ তাঁদের পরিবেশন করে খাওয়াবে। আগামী বৃহস্পতিবার এখানে এসে ওঁরা সবাই প্রসাদ পাবেন, এই কথাও বলে আসবে।"

রামলাল দাদাও আমার সঙ্গে চললেন। তাঁর তখনও রাগ পড়েনি, যেতে যেতে তিনি বলতে লাগলেন, "আমার মেয়ে কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করবে না। মঠ ছেড়ে তোমাকে যেতেই হবে।" দুঃখ ও গ্লানিতে আমার মন তখন পরিপূর্ণ, অপরাধের সীমা নেই যেন। যদি ক্ষমা না পাই, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতেই দেহ বিসর্জন দেবো—এই প্রতিজ্ঞাও মনে মনে করলুম।

লক্ষ্মীদেবী আমাকে "এস বাবা" বলে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁকে প্রণাম করে সব কথা নিবেদন করলুম। আমাকে দেখে সেই মেয়েটি সরে গেল। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করলুম কিন্তু সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। লক্ষ্মীদেবী তাকে তিরস্কার করে বললেন, "তোরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলি? ও তো ছেলেমানুষ, তোদের জানবে কি করে? তুইও তো রেগেমেগে অনেক কথা বলেছিলি।" লক্ষ্মীদেবী তাকে অনেক করে বুঝিয়ে নিয়ে এলেন। আমি তাকে প্রণাম করে আবার ক্ষমা চাইলুম, চোখ দিয়ে আমার তখন জল ঝরছে। লক্ষ্মীদেবী বললেন, "দেখ দিকিনি, ছেলেটি কাঁদছে, তোর এতটুকুও দয়ামায়া নেই?" তখন সে বললে, "আমি ক্ষমা করেছি।"

আমি তখন পাতায় প্রসাদ পরিবেশন করে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করলুম। লক্ষ্মীদেবী অপর একখানি পাতায় সমস্ত রকমের প্রসাদ রেখে আমাকে ডাকলেন এবং ছোট ছেলেকে যেমন করে খাওয়ায় সেইভাবে আমাকে খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, "বাবা, এই হাতে আমি ঠাকুরকে খাইয়েছি, তোমাকেও খাওয়াচ্ছি।" তাঁকে খেতে অনুরোধ করলে বললেন, "হাতটা ধুয়ে আসি। আমরা তোমাদের ইষ্টবংশ কিনা, তা না হলে তোমার এঁটো মানতুম না।"

সেইদিন তিনি আমাকে মঠে ফিরতে দিলেন না, নিজের কাছে রাখলেন এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঠাকুরের কথা শোনালেন। মহা আনন্দে সময় কাটলো। পরদিন সকালবেলা মহারাজের নামে পত্র লিখে তিনি আমার হাতে দিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা যখন প্রসাদ পেতে মঠে এলেন, মহারাজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরঘরে গেলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করবার পর বললেন, "লক্ষ্মীদি, একে ক্ষমা করেছ তো? এ বড় বোকা, কিছু বোঝে না।" লক্ষ্মীদি বললেন, "হ্যাঁ, আমি ক্ষমা করেছি, আর এ তো তেমন কিছু করেনি।" তাঁকে প্রণাম করতে মহারাজ আমাকে বললেন। বিকেলবেলা তাঁরা যখন রওনা হবেন মহারাজ আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকার কাছে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন। মহারাজ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, "লক্ষ্মীদি, একে একটু আশীর্বাদ কর।" লক্ষ্মীদেবী আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "তোমার খুব ভক্তি হোক।"

কুসুম ও হরিমতি চিৎপুরে বাস করত। হরিমতির থেকে কুসুম বয়সে বড় ছিল। তাদের প্রথম জীবন ভালভাবে কাটেনি। কুসুম পরে কীর্তন গান করে জীবিকা নির্বাহ করত আর তারা দুজনে শান্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়াত।

কোনরকমে তারা মহারাজের সন্ধান পেয়ে একদিন বলরামভবনে তাঁকে দর্শন করতে এলো এবং তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করল। মহারাজ কোন বাধা দিলেন না বা কোনরকম সঙ্কোচও দেখালেন না। তারা কিছু ফল-মিষ্টি এনেছিল, মহারাজের আদেশে চাকরদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেওয়া হলো।

কয়েকদিন পরে তারা আবার মহারাজকে দর্শন করতে আসে। মহারাজ খাটের ওপর বসেছিলেন, হরিমতি তাঁকে প্রণাম করে দূরে বসল। কিন্তু কুসুম গেল না, মহারাজের পায়ে হাতটি রেখে নিচে বসল এবং সুখদুঃখের কথা বলতে লাগল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল মেয়ে বাবার কাছে এসেছে। যেন দুঃখিনী মেয়ে কত দুঃখভোগের পরে দুঃখের বোঝা লাঘব করতে পারেন যিনি সেই আপনজনকে খুঁজে পেয়েছে। চক্ষু ছলছল। মহারাজ বললেন, "কুসুম, তুমি তো কীর্তন কর। আমাকে তোমার গান শোনাবে না? একটা গান গাও।" কুসুম গান ধরল—"কেন বঞ্চিত হব চরণে? আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে।" দু-এক পংক্তি গেয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল মহারাজের পায়ে মাথাটি দিয়ে—আর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মহারাজ তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। হরিমতির চোখেও জল দেখা গেল। তারা প্রণাম করে চলে যাবার পর মহারাজ বললেন, "হরিমতি মেয়েটি খুব ভাল। কেন যে ওদের এমন জীবন হলো বোঝা যায় না।"

টাবু (মতীশ্বর) প্রায় প্রতিদিনই মহারাজের কাছে আসতেন। তাঁর শরীর টিপে বা তাঁকে তেল মাখিয়ে দিতেন। মহারাজও তাঁকে স্নেহ করতেন। সময়ে সময়ে তিনি শোবার কষ্ট অগ্রাহ্য করেও বলরামভবনে রাত্রিবাস করতেন। ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনে একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটে গেল এবং স্বভাবতই তিনি মহারাজের কাছে আসতে সঙ্কুচিত হতে লাগলেন। মহারাজের অগোচরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যেতেন। একদিন চুপিসাড়ে এসে উঁকি মেরে দেখছিলেন মহারাজ ঘরে আছেন কিনা। মহারাজ তখন অন্দর থেকে বাইরে আসছিলেন, দেখতে পেয়ে বললেন, "আরে টাবু যে! হঠাৎ এ সময়ে?" তিনি কাছে আসতেই সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে টাবু পিছিয়ে যেতে লাগলেন। বেঞ্চে বসে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "বড় শিঙওয়ালা মোষ দেখেছিস?" "হ্যাঁ, মহারাজ।" "কত বড় শিঙ দেখেছিস?" টাবুও হাত প্রসারিত করে দেখালেন। "এর-চেয়ে আরও বড়—মোষের শিঙ আছে।" মহারাজ হাত দিয়ে দেখালেন ও বললেন, "এত মোটা, ইয়া বড় শিঙ!" আবার বললেন—"আচ্ছা বলতে পারিস সেই

মোষের শিঙের ওপর যদি অনেকগুলি মশা বসে, মোষ কি জানতে পারে, না তার কষ্ট বোধ হয়? আমাদেরও তেমনি জানবি।"

ভুবনেশ্বরে মঠে তখন মহারাজ আছেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন—"তোরা ভাল করে তপস্যা করছিস না, ভজন করছিস না, তাই ভাঁড়ার খালি। তপস্যা করলে সব আপনা থেকেই এসে যায়। ভাল খেলে-দেলে ব্রেন-সেল খোলে।" তখন আমাদের তরকারির মধ্যে ছিল কেবল 'আরু-সারু-ককারু'।

থালার চারিদিকে রকমারি খাবার দেখে মহারাজ ছোট ছেলের মতো খুশি হতেন, কিন্তু মুখে দিতেন একটু-আধটু। প্রায় সবই পড়ে থাকত। তিনি বলতেন—"যখন খাবার বয়স ছিল, জুটত না। তপস্যার সময় কুসুম সরোবরাদি স্থানে শুকনো বাজরার রুটি শুধু নুন দিয়ে খেতে হতো। তাও পেটভরা জুটত না, জল খেয়ে পেট ভরাতে হতো। এখন খেতে পারি না কিনা, তাই এত জুটছে।"

আহারান্তে মহারাজ উদ্বৃত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি থেকে কিছু কিছু নিয়ে একটা বাটিতে মিশিয়ে রাখতেন। নাম দিয়েছিলেন 'গালগপ্পা।' আমরা সকলেই সেই প্রসাদ খেতুম। কখনও বা কাউকে ডেকে নিয়ে নিজেই দিতেন। উদ্বৃত্ত ফল দুধ মিষ্টি আরেকটি বাটিতে মেশাতেন, কখনও একটু মুখে দিয়ে চেখে দেখতেন কেমন হয়েছে। এই বস্তুটির নাম দিয়েছিলেন, 'উইলিয়ম ভট'।

শীতের সময় সকালে এক-এক দিন 'গোপালগপ্পা' তৈরি করাতেন সকলের জন্য। তাতে সোনামুগের ডাল, আতপচাল, কড়াইশুঁটি, ধনেপাতা, আলু, বীট, গাজর—কখনও কখনও খোয়াক্ষীর থাকত এবং ঘিও থাকত। অতি উপাদেয় খিচুড়ি, নিজেও একটু খেতেন। নইলে সকালে তিনি প্রায় কিছুই খেতেন না। 'গোপালগপ্পা'র সঙ্গে কখনও কখনও একটা চাটনিও থাকত। মনাক্কা বা কিশমিশ, খেজুর, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, তেঁতুল, চিনি ও নুন একসঙ্গে বেটে সেই চাটনি তৈরি হতো, দেখতে চ্যবনপ্রাশের মতো।

ফুটন্ত দুধে পরিমাণ মতো গরম মশল্লা, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি নেকড়ায় বেঁধে সেদ্ধ করা হতো। কখনও আখনির জল আগে করে নিয়ে দুধে মেশানো হতো। আলাদা চায়ের জল তৈরি করে সেই দুধে ছাড়া হতো। সবশেষে তাতে জাফরান ও চিনি মেশানো হতো। মহারাজ নাম দিয়েছিলেন "মোগলাই চা"। শীতকালে বিশেষত উৎসবাদিতে মোগলাই চা করিয়ে সকলকেই খাওয়াতে ভালবাসতেন।

বালগোপালের উপাসিকা কয়েকজন মারহাট্টি মহিলা মাদ্রাজের এক বাড়িতে থাকতেন। কোন মহাপুরুষের দর্শন পেলে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ গোপাল বুদ্ধিতে পূজা করতেন নতুবা তাঁদের ভজনালয়ে বাড়ির কর্তা ছাড়া অপর কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। একদিন বাড়ির কর্তার সঙ্গে এসে ঠাকুরকে তাঁরা ভজন শোনালেন ও মহারাজকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। শরীর অসুস্থ বলে মহারাজ যেতে চাইলেন না। তাঁদের পীড়াপীড়িতে তিনি মহাপুরুষকে পাঠালেন। মহাপুরুষের সঙ্গে গিয়েছিলুম আমি, রামলাল দাদা, স্বামী শর্বানন্দ ও মাদ্রাজ মঠের কয়েকজন ব্রহ্মচারী। মহারাজ আমাদের মুখে সবই শুনলেন। মেয়েরা জনে জনে ঠাণ্ডা জলে পা ধুইয়ে দেয় শুনেই বললেন—"ওরে বাবা, আমি যাব না।" তিনি স্নানের সময় ছাড়া পায়ে জল দিতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতেই হলো। তাঁদের একান্ত প্রার্থনা তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। মহারাজের সঙ্গে গিয়েছিলুম আমি ও শর্বানন্দ। আমার যাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না। সেদিনকার ব্যাপার আমার ভাল লাগেনি। মহারাজ বললেন—"নারে, তুইও চল। ওরা নানারকম করে, তুই বারণ করবি, যাতে বারবার পা না ধোয়ায়।"

সিংহাসনে বালগোপালের অপূর্ব-সুন্দর পটমূর্তি স্থাপিত। আরেকটি দিকে একটি সুসজ্জিত আসনে তাঁরা মহারাজকে বসালেন। সামনে পূজার উপকরণ—ফুলচন্দন, ধূপদীপ, নৈবেদ্য, রূপোর ভৃঙ্গারে জল, ছোট ছোট ভৃঙ্গারগুলিতে সুগন্ধি জল, রূপোর অনেকগুলি কেঁড়েতে দুধ, প্রত্যেকটি কেঁড়ের মুখে একটি করে সোনার ছোট গেলাস। প্রথমত মহারাজকে প্রণাম করে তাঁরা গুরুবন্দনা গাইলেন। তারপর গোপালকে পূজা করে গোপালের মুখের কাছে দুধের গেলাস ধরে মানসে দুধ খাওয়ালেন। মেয়েরা দেখতে দেবীর মতো। তাঁদের পরিধানে নানা রঙের শাড়ি আঁটসাঁট করে পরা। মাথায় এলো চুল। মহারাজকে প্রণাম করে তাঁরা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ালেন।

জলচৌকির ওপরে রূপোর পাত্রে মহারাজের পা দুখানি রেখে ও নিজে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁদের একজন পা ধোয়াবার উপক্রম করতেই আমি বলে উঠলুম—"মহারাজের পায়ে জল দেবেন না।" আমার দিকে তাঁদের লক্ষ্যই ছিল না, এই কথায় সকলেই বিমূঢ়ভাবে আমার দিকে তাকালেন। মহারাজ বললেন, "আচ্ছা! একদিনই তো, আমার কিছু হবে না, তুই আর বারণ করিস না।" আশ্বস্ত হয়ে মেয়েরা পুজো শুরু করলেন।

প্রথমত বড় ভৃঙ্গারের জলে ও পরে পরে ছোট ভৃঙ্গারগুলির সুগন্ধি জলে মহারাজের পা ধুইয়ে মেয়েটি নিজের চুল দিয়ে পা মুছিয়ে নিলে। তারপর একটা ভেলভেটের গদির ওপর পা দুখানি স্থাপন করে তাতে ফুল চন্দনাদি দিলেন ও একগাছি মালা রাখলেন। এইভাবে পর পর প্রত্যেকটি মেয়ে—তাঁদের সংখ্যাও দশ-বারজন হবে—পা-ধোয়ানো, পা-মোছানো ও পা-পূজা সম্পূর্ণ করলেন। পা-ধোয়ানো জলে কাঁধ উঁচু পাত্রটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। পূজান্তে তাঁরা পাত্রটি সরিয়ে নিলেন। তারপর প্রত্যেকে এক একটি দুধের কেঁড়ে বগলে ও গেলাস হাতে নিয়ে মহারাজকে ঘিরে গান ও নৃত্য শুরু করলেন—নামদেব রচিত গান—

দুধ পিও মেরে রাজগোপালা, দুধ পিও
মেরে নন্দ দুলালা।
কালারে বাছোরা কপিলা গাই, দুধ দোহয়ন
নাম লাগি ॥
সোনেকা কছুয়া দুধ ন ভবিয়ো, পিও নারায়ণ
আগে ধরিয়ো।
পাষাণকী মূরত দুধ নহি পিওত, শির পছারত
নাম দেবানি ॥
শির পছারত নামা রোয়ে, শির পছারত
নাম দেবানি ॥
এ্যায়সা ভকতি হাম কভি নহি পায়ো।
নামদেবানে দুধ পিলায়ো ॥

—গাইতে গাইতে এক-একজন করে যেমন সামনে আসছেন অমনি কেঁড়ে থেকে গেলাসে দুধ ঢেলে মহারাজকে খাওয়াচ্ছেন। গানও সাথে সাথেই চলছে। এইভাবে এক-একজন কতবারই যে দুধ খাওয়ালেন। মহারাজ তখন ভাবমগ্ন, তাঁকে জীবন্ত গোপালবিগ্রহ মনে হয়েছিল। একটা দিব্যভাবে ও সুগন্ধে ঘরটি ভরে গিয়েছিল। মেয়েদেরও দেহে হুঁশ ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। আমি তো মহারাজের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। তাদের শাড়ির আঁচল ও চুল তো আমার গায়েও এক-একবার লাগছিল। আমারও পুরুষবুদ্ধিটি তখনকার মতো লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কেবলই মনে হচ্ছিল—এই কি বৃন্দাবন? ইনিই কি ব্রজের গোপাল? আর এরাই কি ব্রজবালা? আর গোপালকে নিয়ে এই কি তাদের বাৎসল্য রসের সম্ভোগ?

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিল বলতে পারি না। সময়ের হুঁশ কারোরই ছিল না। মেয়েদের কেঁড়ের দুধ যখন নিঃশেষ হলো, তাঁদের নৃত্যগীত থামল। মহারাজের ভাবের গাঢ়তাও কমে আসল। মহারাজকে প্রণাম করলেন তাঁরা। হঠাৎ একটু উত্তেজিতভাবে মহারাজ বলে উঠলেন—"ঈশ্বর, তুই একটা গান গা।" অদ্ভুত ভাবাবেগে দেশকাল পাত্রের বিচার না করেই গান ধরলুম, "ডমরু হরকর বাজে বাজে।" ভাবান্তর হয়ে গেল, মহারাজ প্রকৃতিস্থ হলেন। এইদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে শরৎ মহারাজ বলেছিলেন—"এখানেই মহারাজের স্বরূপ স্মৃতি উদ্দীপিত হয়ে গিয়েছিল।"

মহারাজ যে আমাদের এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন আমরা বুঝিনি। তাহলে হয়ত আরও ভাল করে তাঁর সেবা করতুম, তাঁর কাছে থাকতুম। হাসিঠাট্টা, খেলা, কৌতুক করতেন আমাদের সঙ্গে আর ভাবতুম আমাদের বোধহয় এই ভাবেই জীবন কাটবে। কিন্তু তা তো হলো না। প্রবল বিসূচিকা রোগে তিনি আক্রান্ত হলেন বলরাম ভবনে এসে। খবর পেয়ে শরৎ মহারাজ উদ্বোধন থেকে এলেন। চিকিৎসাদির কোন ত্রুটি হলো না। কিন্তু তাঁকে আর ধরে রাখা গেল না। দেহরক্ষার দিনদুই আগে শরৎ মহারাজকে বললেন—"শরৎ, তুমি থাকতে আমায় যেতে হলো?" শরৎ মহারাজ হতবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন তাঁর মুখের দিকে। এই রোগের প্রকোপ একটু কমলে আবার বহুমূত্র রোগের উপসর্গ দেখা দিল। এই রোগ আগে হতেই ছিল কিন্তু এই দুর্বল শরীরে ঐ রোগ—ডাক্তাররা আশা রাখতে পারলেন না। এই অবস্থায় শরৎ মহারাজ কবিরাজি চিকিৎসার প্রস্তাব করলে তিনি সকৌতুকে বললেন—"হাকিমিটাই বা বাকি থাকে কেন?" রসরাজ তিনি, তাই অন্তিমকালেও রস পরিবেশন করে গেছেন। দেহরক্ষার দিন গভীর রাত্রে আমাকে এবং সীতাপতি মহারাজকে ডেকে পাঠালেন। আমাদের দুজনেরই জ্বর আসায় আমাদের শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রে আমরা দুজনেই এলুম, সঙ্গে শরৎ মহারাজ। তাঁকে দেখে মহারাজ বলে উঠলেন—"ভাই শরৎ, এসেছিস—ওরে, আমার ব্রহ্মবস্তু গোল হয়ে গেল! তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, আমায় একটু ব্রহ্মজ্ঞান দে না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার।" শরৎ মহারাজ বললেন—"ভাই, তোমাকে ঠাকুর যা কিছু দেবার সব নিজেই দিয়ে গেছেন। তোমার আর কি কিছু বাকি আছে?" মহারাজ বললেন, "আমি প্রায় গিইচি, কেবল একটু পাচ্চিনি, ব্রহ্মাতিমির।"

তিনি লেমনেড খেতে চাইলেন, অল্প হেসে বললেন—"আচ্ছা, একি হলো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলচি, আবার লেমনেড লেমনেডও করচি।" তারপর বলতে লাগলেন—"ফাদার ইন হেভেন—দেখ, এও সুন্দর, এও ভগবানের এক ভাব।" শরৎ মহারাজ তাঁকে লেমনেড খেয়ে ঘুমোতে বললেন। মহারাজ বলে চলেছেন—"মন যে ঐ ব্রহ্মালোক থেকে নাবতে চায় না—দে লেমনেড ব্রহ্মে ঢেলে।" এক ঢোক লেমনেড খেলেন ও আবার বলতে লাগলেন—"আহা হা, ব্রহ্মবস্তু! ব্রহ্ম সুমুদ্দুর। বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে চলেছি। ওঁ পরব্রহ্মাণে নমঃ, ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।"

এই অন্তর্মুখীন অবস্থা থেকে একটু যেন নামলেন। শিষ্যসেবকদের কাউকে কাউকে অভয়বাণী শোনালেন। আমি তাঁর কাছে বসে তাঁর একখানা হাত নিজের হাতের ওপর রেখে মৃদুভাবে হাত বুলোচ্ছিলুম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুই কে রে?" শরৎ মহারাজ বললেন—"ও ঈশ্বর।" "ঈশ্বর—ঈশ্বরা? তোর ভয় কি? তুই আমার সেবা করেছিস।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"আমাদের কষ্টের কেষ্ট নয় রে, আমাদের কেষ্ট আলাদা।" আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমিষ্ট স্বরে যে প্রণামমন্ত্র তিনি নিজেই শিখিয়েছিলেন, সেইটি আওড়ালেন—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণমীশ্বরন্বা, তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥

কয়েকবার ঈশ্বরা ঈশ্বরা বলে আস্তে অতি মিষ্টি কণ্ঠে বললেন—"আমাকে একটু ভালবাসিস।"

(স্মৃতিকথা—স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ
প্রকাশক ঃ শ্রীফনীন্দ্রনাথ ঘোষ, কলকাতা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী অম্বিকানন্দ

আমার বাবা-মা দুজনেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত। তাঁরা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। গর্ভাবস্থায় মা সঙ্কল্প করেন, প্রথম পুত্র-সন্তান হলে তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় সমর্পণ করবেন। ভগবানের কৃপায় আমিই মায়ের প্রথম পুত্র-সন্তান। যখন আমি মাত্র কয়েক সপ্তাহের মা তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে ইচ্ছা করলেন। একদিন তিনি আমাকে একটি চাদরে জড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চললেন। বাবাও সঙ্গে ছিলেন। যখন তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন তখন দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে একাকী ভাবাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমার বাবা-মাকে দেখামাত্র মাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "ওগো, আমার জন্যে কি এনেছ?" মা তখন আমাকে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে রেখে বললেন ঃ "আপনাকে দেবার জন্য এই জিনিসটি এনেছি।" শ্রীরামকৃষ্ণ আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন ঃ "বাঃ কি সুন্দর ছেলেটি! তুমি এটি আমাকেই দিচ্ছ? বেশ!" তিনি আমাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে তাঁর ডান হাতখানি আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলে বললেন ঃ "ছেলেটিকে খুব সাবধানে রেখ, এটি আমারই রইল। সময় হলেই আমি একে ফিরিয়ে নেব।" বহু বছর বাদে আমি যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিই তখন আমার মা-ই সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল—শ্রীরামকৃষ্ণই আমাকে গ্রহণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তখন নরদেহে জীবিত ছিলেন না।

ছোটবেলায় বাবা-মায়ের সঙ্গে আমি আলমবাজার মঠে যেতাম। তখন বেলুড় মঠ হয়নি। মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে) খুব রাশভারী ও কড়া মেজাজের মনে হতো। তাই আমি তাঁকে সযত্নে এড়িয়ে যেতাম। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমি নিঃসঙ্কোচে থাকতাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর মহারাজ ও তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে যান। কিছুকাল পরে বাবার সঙ্গে আমিও সেখানে যাই। তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে আমার

বিশেষ পরিচয় থাকায় তাঁর কাছেই বেশির ভাগ সময় কাটাতাম। মহারাজ তাঁর পাশের ঘরটিতে থাকতেন। আমি তুরীয়ানন্দজীর ঘরে গিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতাম। তারপর ধীরে ধীরে মহারাজের ঘরের দরজাটি খুলে দরজা থেকেই তাঁকে প্রণাম জানাতাম। তাঁর সামনে যেতে কেমন ভয় হতো। তাই ঘরের ভেতর গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করা হতো না। আমার এই আচরণ লক্ষ্য করে একদিন তুরীয়ানন্দজী বললেন ঃ "এ কি ব্যাপার! ভেতরে যা, মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, আর ওঁর পাদস্পর্শ করে আশীর্বাদ প্রার্থনা কর।" কম্পিত-হৃদয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম, উনি যেমন বলেছেন সেভাবে প্রণাম ও প্রার্থনা করে নীরবে মহারাজের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন ঃ "বাবা, আমার পা-টা একটু টিপে দে তো।" একথা বলেই মহারাজ শুয়ে পড়লেন। প্রথমে বেশ বিব্রত বোধ করলেও আমি সসঙ্কোচে তাঁর পা টিপতে লাগলাম। তিনি বুঝতে পেরে বললেন ঃ "ভয় কি খোকা?" এরপর তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন। তাঁর এই স্পর্শে আমার ভেতর যেন একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। আমি বিবশ হয়ে অসহায়ভাবে তাঁর পায়ের উপর শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদে মহারাজ কৌতুক করে বললেন ঃ "আঃ, পা টিপতে গিয়ে তুই দেখি পা দুটোকে বালিশ বানিয়ে ফেললি!" আমার মনপ্রাণ এক অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। আমি উঠে বসে বললাম ঃ "আপনি আমাকে কিছু তুক করেছেন।" তারপর ভেতরের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে হাসতে লাগলাম। আমার ভয় দূর হলো। এই প্রথম আমি মহারাজের কাছ থেকেই ভগবৎপ্রেমের আস্বাদ পেলাম।

সেদিন থেকে মহারাজের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম। তাঁকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছাই হতো না। বাবার সঙ্গে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন কেবল ভাবনা হতো কতক্ষণে আবার তাঁর দেখা পাব। আমার ব্যবহারে পরিবর্তন এসে গেল। এরপর মঠে গেলে তুরীয়ানন্দজীকে কেবল প্রণাম করেই তাড়াতাড়ি গিয়ে মহারাজের কাছে যতক্ষণ সম্ভব বসতাম। আমার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে মহারাজ একদিন সরলভাবে তুরীয়ানন্দজীকে বলেছিলেন ঃ "ভাই, তোমার চেলাটি আমারই হয়ে গেল দেখছি।" তুরীয়ানন্দজী একথা শুনে হেসে বললেন ঃ "আমি তো এই-ই চাইছিলাম।"

স্বামী প্রেমানন্দের একান্ত অনুরোধে মহারাজ বৃন্দাবন থেকে বেলুড় মঠ রওনা হন। বাবা ও আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। বেলুড় যাবার পথে মহারাজ

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এলাহাবাদে একদিন থেকে যাবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু এলাহাবাদে পৌঁছেই মহারাজ বিন্ধ্যাচলে মায়ের মন্দির দর্শনে আগ্রহী হলেন। বিন্ধ্যাচল-নিবাসী ভক্ত যোগীন্দ্র সেনকে চিঠি দেওয়া হলো ওখানে তিন দিন থাকার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা জানাবার জন্যে। পত্রোত্তরে যোগীন্দ্র সেন তাঁরই অতিথি হবার জন্যে সাগ্রহে অনুরোধ জানালেন। একদিন সকালবেলায় আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। মহারাজ তখন তপস্যা করতেন, তাই আমাদের সঙ্গে একত্রে খেতেন না। তাঁর সারাদিনে খাদ্য ছিল মাত্র একবার দুধ-ভাত।

প্রথম রাতে মহারাজ, বাবা, আমাদের গৃহস্বামী ও আমি এক ঘরেই শুয়েছিলাম। প্রায় মাঝরাতে একটা মৃদুস্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, মহারাজ পোশাক পরে একটা মোটা কম্বলে শরীর ঢেকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে বললেন ঃ "ওঠ, গরম পোশাক পরে নে। আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে।" ইতস্তত না করে তাঁর কথামতো কাজ করলাম। আমরা কোথায় যাচ্ছি একথা তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করার কথাও মনে আসেনি। মহারাজ এক হাতে একটা লণ্ঠন অন্য হাতে একখানা লাঠি নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর পিছনে পিছনে আসতে আদেশ করলেন। আমরা বাইরে এলাম। সেটা ছিল অমাবস্যার রাত—ঘোর অন্ধকার। উঁচুনিচু পথে হোঁচট্ খাচ্ছি দেখে মহারাজ আমার হাতে লণ্ঠনটা দিয়ে আমাকে একহাতে ধরে চলতে লাগলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "আমরা কোথায় যাচ্ছি?" তিনি বললেন ঃ "দেবীদর্শন করতে।"

মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাম—বহু দর্শনার্থী সেখানে আগে থেকেই সমবেত হয়েছেন। কেউ বা মালা জপ করছেন, কেউ বা মায়ের নামকীর্তন করছেন। সেখানে বেশ একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। মন্দিরের দরজা তখনও খোলেনি। পূজারীরা বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মায়ের মূর্তিটি অলঙ্কার ও বেশভূষায় সাজাচ্ছিলেন। মন্দিরদ্বার খোলা হলে দর্শনার্থী ভক্তেরা দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং মাতৃদর্শনের জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় পূজারীরা মহারাজকে দেখতে পেলেন। তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা অন্য যাত্রীদের পথ বন্ধ করে মহারাজকেই প্রথম মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলেন। তিনি তখনও আমার হাত ধরে ছিলেন। মহারাজ দেবীমূর্তির সামনে গিয়ে বিস্ময়ভরে বললেন ঃ "আহা! কী সুন্দর! কী সুন্দর!"

পরমুহূর্তেই তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন। মন্দিরে তখন অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছিল। পূজারী ও ভক্তেরা বিস্ময়ে মহারাজের সেই ভগবদ্ভাবে ভাব-বিহ্বল অবস্থা দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজ ভাবাবস্থায় থেকেই আমাকে একটি মায়ের গান গাইতে বললেন। আমি গান করবার সময় তাঁর দুচোখের কোণ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। সে এক অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! আমাকে উনি আরও একটা গান গাইতে আদেশ করলেন। গানের শেষে আমরা দেবীপ্রতিমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বাইরে এলাম। মহারাজ মন্দিরচত্বরের এক কোণে জপ করার জন্য বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন। "আমি কি করব?" জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেন ঃ "মায়ের উপস্থিতি চিন্তা কর।"

বিন্ধ্যাচলের কাছে পাহাড়ের নিচে একটা গুহামন্দির আছে। একদিন আমরা কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে এই মন্দিরের কাছে বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। ভক্তেরা কেউ তরকারি কাটছিলেন, কেউ বা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় মহারাজ আমাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন। খানিকটা পাহাড় চড়াই করে আমরা সেই গুহামন্দিরে উপস্থিত হলাম। ভিতরে খুব অন্ধকার। আমরা গুহায় ঢুকে ধীরে ধীরে বিগ্রহের কাছে উপস্থিত হলাম। চারদিক খুব নির্জন, শান্ত। এমনকি কোন পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছিল না। দেবীমূর্তির কাছে মহারাজ বসলেন, আমিও তাঁর কাছে বসলাম। খানিকক্ষণ বাদে তিনি আমাকে মায়ের ভজন শোনাতে বললেন। গান শুনতে শুনতে মহারাজ আগের দিনের মতোই ভাবস্থ হলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ একটু কেঁপে উঠল এবং শরীরের লোমও খাড়া হয়ে উঠল। তাঁর দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। এরপর তিনি একেবারে নিথর হয়ে গেলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান একেবারে ছিল না। আমি তাঁর এ ভাব দেখে চিন্তিত হইনি, কারণ আমি শুনেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এ রকম সমাধিস্থ হতেন। মহারাজ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। আমরা বাইরে এলাম। কিন্তু এরপর চড়ুইভাতির জায়গায় না ফিরে গিয়ে মহারাজ পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে মহারাজ একখণ্ড পাথরের উপর যোগাসনে বসলেন। আমাকেও তিনি এভাবে বসতে বললেন। আসনে বসে ভাবতে লাগলাম, মহারাজ আমাকে বসতে আদেশ করলেন, কিন্তু আমাকে এরপর কি করতে হবে তাতো কিছু বললেন না। তাঁর কাছে গিয়ে কিভাবে কোন বিষয়টি ধ্যান করব জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন ঃ "ভগবানের যেরূপটি তোর ভাল লাগে তাই ধ্যান কর। "আমি—রূপটির ধ্যান করব কি?" "হ্যাঁ, তাই কর"—তিনি উত্তর দিলেন।

আমি খুশি মনে একটা পাথরের উপর বসে ধ্যান করতে চেষ্টা করছিলাম। আমার বয়স ছিল অল্প, তাই পাঁচ মিনিটেই চঞ্চল হলাম। কাছেই একটা ছোট ঝরনা ছিল। ধ্যান ছেড়ে উঠে পাহাড়ের গায়ে যেসব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছিল সেগুলে তুলতে লাগলাম। ফুলগুলোর চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছিল—ঠিক যেন ধূপ ও চন্দনের গন্ধ মেশানো। আমি ফুলের গন্ধ শুঁকছিলাম, মহারাজ আসন থেকে কখন তা লক্ষ্য করেছেন। চেঁচিয়ে বললেন ঃ "ওগুলোর গন্ধ শুঁকিসনি; বুনো ফুলের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়বি।" আমি কতকগুলো ফুল নিয়ে তাঁকে দেখালাম। তিনি গন্ধ নিয়ে খুশি হলেন, তারপর বললেন ঃ "মার পুজোর জন্যে এই ফুল একটু তুলে সঙ্গে নে।" আমি কিছু ফুল নিলাম। এরপর আমরা চড়ুইভাতির জায়গায় ফিরে গেলাম। আমাদের খাবার তৈরি করাই ছিল। আমরা খেতে বসার আগে মহারাজ আমাকে কয়েকটি ভজন শোনাতে বললেন। ভজনের পর আমাদের ভোজনপর্ব শুরু হলো।

আরও একদিন মহারাজের সঙ্গে আমরা অন্য পথে ঐ পাহাড়টির উপর চড়েছিলাম। সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখা গেল। মহারাজ তখন আমাকে এই গানটি গাইতে বলেছিলেন ঃ

দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়া মন
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন?
আয়ু-সূর্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেবতায়
ভুলিয়ে রয়েছ মোহ-মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান॥

তাঁর কথামতো গানটি গাইলাম। গান শুনতে শুনতে মহারাজ ভাবস্থ হলেন। গান শেষ হবার পরও তিনি কিছুক্ষণ এভাবে রইলেন। অন্ধকার হয়ে আসায় আমরা বাসায় ফিরে গেলাম। সেবারে বিন্ধাচলে মাত্র তিনদিন থাকার কথা থাকলেও মহারাজ ওখানে দীর্ঘ একুশদিন কাটিয়ে তারপর বেলুড় মঠে ফিরেছিলেন।

(উদ্বোধন ঃ ৯১ বর্ষ ৬ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথাপ্রসঙ্গে

স্বামী অম্বিকানন্দ
(সংগ্রাহক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ)

১

মঠে স্বামীজীর ঘরে যেখানে আয়নাটা সেখানে মহারাজ ধ্যান করছেন। আমিও বিপরীত দিকে বসে ধ্যান করছি। শশী মহারাজ মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। তিনি ধুলোপায়ে ঠাকুর ও মহারাজকে প্রণাম না করে জামা খুলবেন না, মুখ হাত পা ধোবেন না। বসে আছেন মহারাজ বেরুলে প্রণাম করবেন। মহারাজ ১০:৩০টায় বেরুলেন। শশী মহারাজ এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, "রাজা, তোমার আবার এত ধ্যানট্যান কেন?" মহারাজ হেসে বললেন, "আরে ভাই, এই একটু কিছু করতে হবে তো।"

*　　*　　*

মহারাজের শখ ফুলের বাগান। আর স্বামীজীর পোষা ছিল ছাগল, কুকুর, হাঁস, সারস এসব। ফুলের বাগানে এরা সব গেলে স্বামীজী ও মহারাজের ঝগড়া লাগত। জমি ভাগাভাগি করে উভয়ে বলতেন, "এদিক তোমার, ওদিক আমার।" মজার রগড়। স্বামীজী উঠানে ক্যাম্পখাটে শুয়ে থাকতেন, আর ছাগলটা লাফিয়ে লাফিয়ে খাটের উপর উঠত।

*　　*　　*

পুরীতে ভক্ত অটলবাবুর বাড়িতে দুর্গা পূজা। অষ্টমীর দিন কালীকীর্তন হচ্ছে। মহারাজ বসে। খুব জমেছে। পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে বসে মেয়েরা। হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার, অটলবাবু ভিতরে গেলেন। ফিরে এসে মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, এ কি রকম হলো? একটা লাল কস্তা পেড়ে কাপড়পরা, সর্বালংকারভূষিতা একটা মেয়ে ঝম ঝম করতে করতে পাশের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। দেখতে পেয়ে এক মহিলা তাকে ডাকাত মনে করে উপরে দেখতে

গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। তখন সে ভূতের ভয়ে চিৎকার করে। মহারাজ হেসে হেসে বললেন, "ওরকম হয়। কি জানেন—আজ মহাষ্টমী। সাধুরা সব মনপ্রাণ দিয়ে মায়ের কীর্তন করছে। মা নিজে শুনতে এসেছেন।

২

মহারাজ কাশীতে। তেল মাখছেন। আমি, নিজের দাড়ি কামাচ্ছি। এক গাল কামিয়েছি। এমন সময় একজন এসে বললে, "মহারাজ এখুনি ডাকছেন।" সেই অবস্থাতেই ছুটে গেলুম। মহারাজ দেখে হেসে বললেন, "এই মেয়েটি এসেছে। দীক্ষা চায়। তোর কি মনে হয় বল দেখি।" আমি তো অবাক। মহারাজ আমায় জিজ্ঞসা করছেন। তিনি ঐরকম করতেন। আমি যতটা বুঝি বললাম মেয়েটির মন্ত্রবিষয়ে। তখন মহারাজ বললেন, "দ্যাখ, ঐ মেয়েটিকে দেখে আমারও ঐরূপই মনে হয়েছিল।" কী আশ্চর্য ব্যাপার! মহারাজ আমায় কোন কাজ করতে দিতেন না। অভিষেকাদি কর্ম করবার সময় আমাকে সব জোগাড়াদি করতে বলতেন, আর ভজন।

* * *

বৃন্দাবনে বাবা ও আমি, মহারাজ ও হরি মহারাজের কাছে গেছি। বাবা প্রণাম করে হরি মহারাজের কাছে বসে। মহারাজ আমাকে নিয়ে সরে পড়লেন। বলে গেলেন, "আমরা একটু ঘুরে আসছি।" নিয়ে গেলেন রাধারমণের মন্দিরে। সেখানে ভগবানের সামনে খুব ভজন ও কীর্তন হয়। মহারাজ বললেন, "এ ছেলেটি গাইবে।" তারা অমনি রাজি, গান ধরলুম। সকলে ভারি খুশি। আসার সময় মোহন্ত এক থালা ভাল প্রসাদ একটা লোক দিয়ে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আসবার সময় মহারাজ বললেন, "দেখলি, তুই গাইলি, তাই এলো।"

* * *

কাশীতে দেখলুম মহারাজের কী গুরুভাবের বিকাশ! (১৯২১ সালে কাশীতে সাধুদের মনোমালিন্যের কালে) সকলের কথাই শুনলেন, কিন্তু নিজের মতামত কিছুই বললেন না। বুঝলেন গোলটা কোথায় এবং সেটা কেমন সরিয়ে দিলেন। শরৎ মহারাজ পর্যন্ত শিষ্যের ন্যায় মহারাজকে প্রশ্ন করছেন। মহারাজের সে চাউনি দেখে বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগল। এত penetrating! স্বামীজীর চোখেও আমি ঐ চাউনি দেখেছি। মহারাজের দেহত্যাগের সময় কাছে দাঁড়িয়ে আছি। মহারাজ ঃ "কে?" "আমি নীরোদ।" "আয় বাবা," বলে মহারাজ তাঁর

বুকের উপর আমার মাথা রেখে পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন আর বললেন, "ভয় কি বাবা! (হাতের মুঠ দেখিয়ে) আমি তোকে এমনি করে ধরে আছি।"

৩

শরৎ মহারাজ বা কেউ একটা কাগজে সাক্ষরের জন্য নিয়ে আসছেন। আর মহারাজ আজ না কাল করে করে ৭/৮ দিন ঘুরালেন। শেষে একদিন জোর করে মহারাজকে ধরাতে যে আজ আপনাকে সই করতেই হবে। মহারাজ বললেন ঃ "আচ্ছা, নিয়ে এস।" কাগজ আজ আনা হলো। মহারাজ কলম ধরলেন। পরে বলছেন, "দ্যাখ, বানানটা (নামের) মনে করতে পারছি না। আজ থাক। আর একদিন হবেখন।" মনের অবস্থাই মহারাজের এমন ছিল যে নিচে ব্যবহারভূমিতে আনতে পারছেন না।"

* * *

মহারাজের ডায়াবেটিস। ডাক্তার মিষ্টি খেতে বারণ করেছে। একজন ভক্ত বলল, "মহারাজ, শুনছি diabetes-এর জন্য আপনার মিষ্টি খাওয়া বারণ।" মহারাজ ঃ "শুধু তাই নাকি? মিষ্টি কথা পর্যন্ত বলা বারণ।" এমন রসিক তিনি ছিলেন।

* * *

আলমবাজার মঠে দেওয়ালে এইসব লেখা থাকত ঃ "মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।" "ধ্যান করবে মনে, বনে আর কোণে।" এসব দেখে আর মহারাজদের প্রবল তপস্যা ও সাধনভজন দেখে মনে কেমন একটা উৎসাহ, জোর আসত। আর এখন?

* * *

আমি একবার মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে যাকে তাকে মিশনে সাধু করে নেওয়া কিসের জন্য? মহারাজ বললেন ঃ "দ্যাখ, স্বামীজী নানা কাজের পত্তন করে গেছেন। সেই কাজের জন্য আমায় নানারকমের লোক নিতে হবে। তবে এর মধ্যে ২/১ টা উতরে যাবে। যাদের চিত্তে যথার্থ ধর্মভাব জাগ্রত হবে, তারাই সাধন ভজন করে মুক্তি লাভ করবে।

(স্বামী ধীরেশানন্দের ডায়েরি)

ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা

স্বামী প্রভবানন্দ

(অনুবাদিকা ঃ সান্ত্বনা দাশগুপ্ত)

আমি মহারাজকে প্রথম দর্শন করি বলরামবাবুর বাড়িতে। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা দূর থেকে আমি তাঁকে দেখেছিলাম। অনেক লোক ছিল, আমি আর ভিতরে যাইনি। দ্বিতীয়বার তাঁকে দর্শন করি বেলুড় মঠে ১৯১১ কিংবা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। আমি তখন ১৭/১৮ বছরের তরুণ। একদিন সকালবেলায় তাঁকে দর্শন করেছিলাম। আমি মঠের দোতলায় বারান্দা-সংলগ্ন স্বামীজীর ঘর দেখছি—এইরকম ভাব করে দাঁড়িয়ে আছি। আসলে আমার দৃষ্টি ছিল পাশের দিকে—আমি মহারাজকেই দেখছিলাম। সোজা আমি তাঁর কাছে যাইনি, পাছে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন। একটু পরে তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ "বাবা, এদিকে আয়।" আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। মহারাজ বললেন ঃ "তোকে কি আগে দেখিনি? তুই কি যোগীন ঠাকুরের দলের (এই দলটি ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত একটি বিপ্লবী দল) লোক?" আমি বললাম ঃ "না, আমি তাঁকে চিনি না।" তখন আমি কোথায় পড়ি ইত্যাদি কয়েকটি প্রাথমিক পরিচয়-সূচক কথার পর মহারাজ আমাকে তাঁর পায়ের মোজা খুলে রোদে দিতে বললেন। আমার এখনো মনে আছে মোজার রঙ ছিল ঘোর লাল। তারপর আমাকে তাঁর পা টিপে দিতে বললেন। আমিও তাই চাইছিলাম। এই হলো আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের ইতিহাস।

তারপর থেকে আমি প্রায়ই তাঁর নিকট যেতাম। কিন্তু আমি কখনো তাঁর কাছে কোন ধর্মোপদেশ চাইনি, তাঁর সঙ্গ পেয়েই আমি সুখী ছিলাম।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমাদের বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমায় বলেন তাঁকে মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে। আমি একদিন তাঁকে নিয়ে মঠে গেলাম। তিনি মহারাজের নিকট ধর্মোপদেশ চাইলেন। মহারাজ যখন তাঁকে কি করে ধ্যান করতে হয় এসম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। মহারাজ তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা। আমি বললাম ঃ "না"।

বাড়ি ফেরবার পথে শিক্ষক মহাশয় আমায় বললেন ঃ "তুমি কোন উপদেশ চাইলে না কেন?" আমি বললাম ঃ "আমার খুব লজ্জা করছিল।" তখনই আমি স্থির করলাম পরদিন মহারাজের কাছে যাব এবং সাধনোপদেশ চাইব। পরদিন সেই শিক্ষক মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। মহারাজ আমাদের দেখেই বললেন ঃ "এই যে তোমরা দেখি আবার এসেছ!" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ মহারাজ, আমি কিছু উপদেশ চাই।" মহারাজ তখন শিক্ষক মহাশয়কে সরে যেতে বললেন এবং আমাকে ধ্যানাভ্যাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রাথমিক নির্দেশ দিলেন। কলকাতায় কোথায় জপের মালা পাওয়া যায় তা তিনি আমাকে বলে দিলেন। তারপর একটি ঘণ্টা কিনে এনে দিতে বললেন। বললেন, সেটি তাঁর প্রিয় পোষা গরুটির গলায় ঝুলিয়ে দিতে চান।

কয়েক মাসের মধ্যে আমি কলেজ ছেড়ে মহারাজের কাছে গিয়ে থাকবার সঙ্কল্প করলাম। আমি আমার বাবাকে এক চিঠিতে জানিয়ে দিলাম যে, আমি মঠে যোগদান করছি। এটা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। মহারাজ তখন কনখলে ছিলেন। আমি কনখল রওনা হলাম। সেখানে যাবার পথে আমি কাশীতে নামলাম এবং কাশী অদ্বৈত আশ্রমে উঠলাম। সেখানকার সাধুরা কেউই আমাকে চিনতেন না। তবুও তাঁরা আমাকে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করলেন। আমি কনখল যাচ্ছি একথা তাঁদের বলাতে তাঁরা জানতে চাইলেন, আমি মহারাজের কাছে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছি কিনা। আমি তাঁদের বললাম, আমি যে যাচ্ছি তা মহারাজ জানেন না। শুনে তাঁরা বললেন ঃ "না জানিয়ে যাওয়া, মহারাজ আদৌ পছন্দ করেন না।" তাই তাঁরা আমাকে যাওয়ার সঙ্কল্প থেকে বিরত হতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় আমি নিরস্ত না হয়ে কনখল চলে গেলাম।

পরদিন সকালে আমি হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছালাম। যখন আমি আশ্রমে গিয়ে পৌঁছেছি তখন ভোর চারটে। তখনো অন্ধকার রয়েছে। আশ্রমে আমি কতকগুলি ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পেলাম। তারই কোন একটায় মহারাজকে পাব আশা করলাম এবং সোজা বারান্দায় উঠে একটি দরজার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাজ ঠিক সেই দরজা দিয়ে এবং তাঁর প্রধান সেবক স্বামী শঙ্করানন্দ অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। মহারাজ তখন শুধু বললেন ঃ "এই যে তুই এখানে এসেছিস!" তারপর তিনি শঙ্করানন্দ মহারাজের দিকে ফিরে বললেন ঃ "এই ব্রহ্মচারীটির জন্য একটি জায়গা করে দাও, ও এখানে থাকবে।"

মহারাজ কনখল আশ্রমে দুর্গোৎসব করবেন। কয়েকজন ভক্ত তাই কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে দিয়েছেন। মহারাজের একজন সেবক পূজা করবেন বলে স্থির হয়েছে। পূজার কয়েকদিন মহারাজ আমাকে তাঁর সেবকের কাজ করতে বললেন। আমার পক্ষে তো এটি অভাবনীয় আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। সেই কয়েকদিন এবং তার পরেও কয়েক সপ্তাহ আমি তাঁর সেবা করেছিলাম।

কনখলে আমরা চারজন একঘরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে একজন হলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নবম সঙ্ঘগুরু স্বামী মাধবানন্দ। একদিন মহারাজ আমাদের ঘরে এলেন। চারটি শয্যা দেখে বললেন ঃ "এক ঘরে তোমাদের তো বড় ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়।" তারপর মন্তব্য করলেন ঃ "তোমরা জানো তো দুজন রাজা কখনো একই রাজ্যে থাকতে পারে না, কিন্তু পঞ্চাশজন সাধু একটা কম্বলের নিচে থাকতে পারে।"

আমি মঠেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহারাজ আমাকে বললেন কলেজে ফিরে যেতে এবং লেখাপড়া শেষ করে আসতে। দু-বছর বাদে আমি সঙ্ঘে যোগ দিলাম। মহারাজ আমার ভবিষ্যৎ ভাল করেই জানতেন, কারণ কনখলে থাকতেই তিনি আমাকে 'ব্রহ্মচারী' বলে অভিহিত করেন।

যখনই মহারাজকে দেখেছি, মনে হয়েছে তিনি যেন সর্বদা ঈশ্বরকে নিয়ে ঘর করছেন, চলছেন, ফিরছেন—কিন্তু তাঁর সত্তা যেন ঈশ্বরে ওতপ্রোত হয়ে আছে। সমাধি অবস্থা তাঁর পক্ষে খুব সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। অনেক সময়ই মঠের অধ্যক্ষতা করা, সকলকে শিক্ষা দেওয়া—এইসব কর্ম করবার জন্য তাঁর মনকে জোর করে নামিয়ে আনতে হতো। নিচের ঘটনাটি তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ঘটনাটি আমাকে বলেন স্বামী অম্বিকানন্দ—মহারাজের অন্যতম সেবক।

আইনসংক্রান্ত একটি কাগজে মহারাজের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। তিনদিন হয়ে গেল, মহারাজ সই করছেন না। একদিন সচিব কাগজপত্র নিতে এসে দেখলেন মহারাজ কলম হাতে কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। একজন সেবক বললেন ঃ "মহারাজ, দয়া করে ওটা সই করে দিন।" মহারাজ উত্তর দিলেন ঃ "জানি, জানি। আমি চেষ্টা তো করছি। কিন্তু দেখ, নাম কি করে লিখতে হয় তা আমি ভুলে গিয়েছি।" সাধকপুরুষের মন অতীন্দ্রিয় চেতনায় ডুবে যাবার পূর্বে কয়েকটি প্রাথমিক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। অনেকবার আমি দেখেছি মহারাজ কিভাবে মনকে সমাধিভূমি হতে জোর করে নামিয়ে রাখছেন। একবার চেয়ার থেকে উঠছেন, একবার ঘরের বাইরে গিয়ে পায়চারি করে আসছেন।

আমাদের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছেন না বলে আমি একবার তাঁর কাছে অনুযোগ করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ “সব সময় আমি কি করে শিক্ষা দেব? আমি যখন দেখি ভগবান তোমাদের মধ্য দিয়ে কিভাবে লীলা করছেন তখন আমি তোমাকে কি করে শিক্ষা দিই বল?” পরে অবশ্য কয়েকবারই তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছেন।

যদিও মহারাজ খুবই সহজ স্বাভাবিক আচরণ করতেন, তাহলেও এক-এক সময় তাঁর পক্ষে ভাব গোপন করা শক্ত হয়ে পড়ত। একবারের কথা মনে পড়ছে। শ্রীশ্রীমা তখন কাশীতে আছেন, মহারাজও আছেন সেখানে। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর দেশের ভানুপিসিও ছিলেন। ভানুপিসি শ্রীশ্রীমায়ের বিয়ে দেখেছেন। তাঁর খুব সুন্দর গানের গলা ছিল। তিনি ঠাকুরকেও গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছেন। একদিন মাকে প্রণাম করে উঠে মহারাজ ভানুপিসিকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর সঙ্গে রঙ্গরস করতে লাগলেন। একটু পরে ভানুপিসি কৃষ্ণ বিষয়ক একটি গান ধরলেন। গান শুনে মহারাজের খুব উদ্দীপন হলো, তিনি ভাবসমাধিতে মগ্ন হলেন। শ্রীশ্রীমা সমস্ত দৃশ্যটি দেখলেন। মহারাজ চলে গেলে মা ভানুপিসিকে বললেন ঃ “তুমি তো কম নও, তুমি রাখালের মনে উদ্দীপনা এনেছ! রাখাল যে সাগর গো!”

মহারাজ প্রতি বছর খ্রীস্ট-উৎসব পালন করতেন। ঐদিন মঠে যিশুর পূজা হয়। একবার মঠে খ্রীস্ট-উৎসবের দিন মহারাজ ও তাঁর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দ গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ আনুষ্ঠানিক পূজা করছিলেন। শুনেছি, মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দ উভয়েরই সেদিন যিশুর দর্শন লাভ হয়েছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দের কোন দর্শন না হলেও তিনিও অনুভব করেছিলেন যেন মন কত উচ্চে উঠে গেল, এবং সেবার তিনি পূজায় খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

একজন প্রকৃত সাধুকে চিনতে পারা সহজ নয়। এ বিষয়ে স্বামী নির্বাণানন্দ আমাকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বলেছিলেন। ঘটনাটি মহারাজের অন্যতম সেবক হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঘটনায় উল্লিখিত সেবক তিনি নিজে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ‘কথামৃত’ পাঠ করে মহারাজের কথা জানতে পারেন। মহারাজ কত বড় মহাপুরুষ তা জেনে তার ইচ্ছা হলো মহারাজকে দর্শন করবেন। মহারাজ তখন বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবু মঠের পরম ভক্ত। তিনি মহারাজের জন্য একটি ঘর নানান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করে রেখে দিয়েছিলেন। মহারাজকে খুব সুন্দর একটি রেশমের পোশাকও তিনি দিয়েছিলেন।

একদিন যখন মহারাজের সেবক নিকটে নেই, তখন পূর্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয় এসে কাউকে না জানিয়ে মহারাজের ঘরে ঢুকে পড়েন। মহারাজকে বিলাসবহুল উপকরণের মধ্যে বসে হুকো করে তামাক খেতে দেখে মনে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। এই রামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র' যাঁকে তিনি কঠোর তপস্বী ভেবে এসেছিলেন! তিনি মহারাজকে আর নিজের পরিচয় না দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বারান্দায় বসে নিজের অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। সেবক ফিরে এসে অধ্যাপককে বারান্দায় বেঞ্চের ওপর উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। দর্শনার্থী ব্যক্তিটি যে ইতোমধ্যেই মহারাজের ঘর হয়ে এসেছেন একথা তিনি জানতেন না। তাই অধ্যাপকের কাছে এসে তাঁকে বললেন ঃ "আপনি কি মহারাজকে দর্শন করবেন?" অধ্যাপকটি মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "করব"। সেবক তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। মহারাজ তাঁকে স্বাগত জানালেন। ঘণ্টাখানেক পরে মহারাজের ঘর থেকে বাইরে এসে তিনি সেবককে বললেন ঃ "আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করতে বসেছিলাম। ধর্মের সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত ধারণানুযায়ী বাহ্য ব্যাপার দিয়ে মহারাজকে বিচার করতে যাচ্ছিলাম। এখন আমি দেখছি আমার জীবনের কঠিনতম সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।" পরে তিনি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেদিন পরে কি হয়েছিল, যাতে মহারাজ সম্পর্কে তাঁর ভুল ভেঙেছিল, তা অবশ্য তিনি সেবকের কাছে বলেননি।

মহারাজকে বোঝা খুবই শক্ত ব্যাপার ছিল। তিনি নিজে না বুঝিয়ে দিলে বোঝা প্রায় অসম্ভব ছিল। একবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নাট্যকার গিরিশ চন্দ্রকে লেখেন ঃ "রাখালকে কেউই বোঝেনি।" উত্তরে আত্মদীপ্ত গিরিশচন্দ্র লেখেন ঃ "খুব সত্য কথা। খুব কম লোকই রাখালকে বোঝে। রাখালকে যে বুঝতে পারবে, তাঁকে যে ভালবাসতে পারবে, সে তো তখুনি মুক্ত হয়ে যাবে। রাখালকে ভালবাসা আর ভগবানকে ভালবাসা একই কথা।"

দিনের পর দিন মহারাজের উপস্থিতিতে আমি একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। আমরা তাঁর কাছে নীরবে বসে থেকেছি। হয়তো সমস্যা বা দুশ্চিন্তা পীড়িত মন নিয়ে কাছে গিয়েছি। কোন কথা কেউ বলিনি, শুধু চুপ করে বসে রয়েছি। কিন্তু যখন তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছি তখন মনে হয়েছে, আমাদের মন তিনি এত উঁচুতে তুলে দিয়েছেন যে, আমাদের চিত্তের সমস্ত মালিন্য দূর হয়ে গিয়েছে। মহারাজের সান্নিধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরে চলে যেত। তাঁকে

আর ধর্মোপদেশ দিয়ে কথা বলে দিতে হতো না। আমরা তাঁর কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদ বা দর্শন শিক্ষা করিনি। মহারাজ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং তাঁকে অনুভব করা যায় এবং তাঁর উপস্থিতি দিয়েই নীরবে তিনি আমাদের সম্মুখে সেই সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

অবশ্য সব সময়ই যে তিনি চুপ করে বসে থাকতেন তা নয়। এক-এক সময় এক-এক ভাব ছিল তাঁর। কখনো ছোট বালকের মতো লীলাচঞ্চল হয়ে উঠতেন। তখন তিনি রঙ্গরস করতেন, মজার মজার গল্প বলতেন আর আমরা উচ্চরবে হেসে ফেটে পড়তাম। তিনি শেখাতেন ধর্ম খুব আনন্দের ব্যাপার। অন্য সময় আবার তাঁর অন্য ভাব। তখন তিনি গম্ভীর প্রশান্ত। তখন তিনি যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করতেন সমস্ত মঠবাড়ি যেন তার দ্বারা স্পন্দিত হতো। পাছে তাঁকে বিরক্ত করা হয়, এই ভয়ে আমরা তাঁর নিকটে পর্যন্ত যেতে সাহস পেতাম না।

যেখানে মহারাজ যেতেন, সেখানেই যেন সারাক্ষণ উৎসব লেগে থাকত। অপরিচিত কোন ব্যক্তিও এই পরিমণ্ডলে এসে পড়লে একই অনুভূতি লাভ করতেন। যখন মহারাজ আমাদের তিরস্কার করেছেন, তখনো আমাদের এই অনুভূতি অব্যাহত থেকেছে। কখনো কখনো আমাদের নিজেদের চোখে বিনা অপরাধে বা সামান্য দোষ-ত্রুটির জন্য তিনি আমাদের তীব্র তিরস্কার করেছেন। অবশ্য আমরা কখনো মহারাজের সঙ্গে এনিয়ে তর্ক বা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইনি। কারণ তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যা প্রতীয়মান তার চেয়ে গভীরতম কোন কারণ ঐরূপ শাসনের পশ্চাতে কাজ করছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও সঙ্গোপনে আনন্দের ফল্গুধারা ঠিক বয়ে যেত। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ "মা যখন ছেলেকে ধরে মারে, ছেলে তখনো 'মা মা' বলেই ডাকে।"

মহারাজের ভালবাসার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সকলেই মনে করত যে, মহারাজ বুঝি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। সেই অনন্য ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসা ছাড়া আর কি হতে পারে?

মহারাজ তাঁর শিক্ষায় সহজযোগ বা সহজে ঈশ্বরের কৃপালাভের উপায়ের ওপরে খুবই জোর দিতেন। সেই সহজ উপায়টি হলো, সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন। তিনি বলতেন ঃ "জপ কর, ভগবানের নাম কর। যাই করনা কেন, ঈশ্বরের নাম যেন সারাক্ষণ অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মতো সবসময় চলতে থাকে।"

মহারাজ আমাকে দুটি বস্তুর জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। সে-দুটি বস্তু হলো—শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান। তিনি আমাদের সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করে নিষ্কাম কর্ম ও ধ্যানকে যুক্ত করতে বলতেন। তিনি আমাদের সর্বদা বলতেন ঃ "কর্মই উপাসনা। কর্মই উপাসনা।"

তাঁর নীতিশিক্ষায় মহারাজ পবিত্রতা ও সত্যাচরণের প্রতি খুব জোর দিতেন—বিশেষ করে সত্য আচরণের ওপর। তিনি বলতেন ঃ "মানুষের সব অপরাধের জন্য তাকে ক্ষমা করা চলে, কিন্তু মিথ্যাচারের ক্ষমা নেই।"

মাঝে মাঝে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করতাম—মহারাজ কি হিন্দু, না খ্রীস্টান, না বৌদ্ধ? তাঁকে এভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। তিনি সোজাকথায় একজন ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ ছিলেন।

শাস্ত্র বা দর্শন অধ্যয়ন করে ভগবানকে জানা যায় না। যখন আমরা এমন ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ দেখি যিনি শাস্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা, তখনই আমরা ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারি। আলোর স্পন্দন তো সর্বত্র আছে, এমনকি অন্ধকারের মধ্যেও। কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক বাল্বের মধ্য দিয়ে আলো দেখতে পাই, কারণ বাল্বটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। অনুরূপভাবে যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করেছেন, তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় সত্য আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

মহারাজ কে ছিলেন? মহারাজ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ; তিনি দিব্যভাবে আরূঢ় লোকগুরু; একটি মহান ধর্মসঙ্ঘের মহান নায়ক। কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজস্বরূপ সম্বন্ধে কি বলেছেন?

আমরা ধর্মীয় ইতিহাসে সর্বকালেই দেখি যে, মানবকুলের মহান নায়কেরা অতি দুর্লভ মুহূর্তে ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের নিকট নিজস্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। বুদ্ধ বলেছেন ঃ "আমিই বুদ্ধ, জ্ঞানী।" খ্রীস্ট বলেছেন ঃ "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। যে কেউ পিতার (ঈশ্বর) নিকট যেতে চায়, তাকে আমার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।" মহারাজ যখন সমাধি ও বাহ্যাবস্থার মাঝামাঝি থাকতেন তখন বলতেন ঃ "জানা ও অজানার মধ্যে, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে আমিই সেতুস্বরূপ।" তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণ এই যে, যে-ঈশ্বরীয় শক্তি তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, তা দিয়ে তিনি যাঁদের জীবনে রূপান্তর এনে ধন্য করেছিলেন, তা তাঁদের মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে।

(উদ্বোধন ঃ ৯৩ বর্ষ ১ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

১৯০৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, সরস্বতী পূজার দিন আমি শ্রীশ্রীমহারাজের চরণ দর্শন করি। সেবার অর্ধোদয় সূর্যগ্রহণের দিবস গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বহুযাত্রীর সঙ্গে আমি ঢাকা থেকে ৭/৮ দিনের জন্য কলকাতায় আসি। একদিন শ্রীমকে তাঁর বাড়িতে দর্শন করি এবং তিনি আমাকে শ্রীমা ও মহারাজকে ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করতে বলেন। সরস্বতী পূজার দিন খেয়ার নৌকায় বাগবাজার থেকে বেলুড় ঘাটে নামি। তখন গেটের পূর্বদিকে কেবল একতলা গিরিশ মেমোরিয়াল তৈরি হয়েছিল এবং স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের একতলায় তাঁর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেলুড় মঠের পুরনো মঠ বাড়ি (যেখানে স্বামীজী থাকতেন) এবং তাঁর উত্তর পশ্চিমে দোতলায় ঠাকুর ঘর, নিচের তলায় রান্নাঘর ও খাবার ঘর ভিন্ন আর কোন ইটের তৈরি বাড়ি ছিল না। সবুজ ঘাসে ঢাকা মঠের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আমি পুরনো মঠবাড়ির দিকে এগিয়ে লক্ষ্য করলাম—মহারাজ খোলা বারান্দায় গেটের দিকে মুখ করে বসে আছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে আমি বেলুড় মঠে প্রথম দর্শন করি।

আমি নত হয়ে মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করলুম। তিনি স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?" আমি বললাম ঃ "আমি কলেজে পড়ি। ঢাকা থেকে আসছি। যে বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন সেই বাড়িতে থেকে আমি পড়াশুনা করি। সেখানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অধিবেশন হয় এবং কথামৃতপাঠ, সদালোচনা ও সংকীর্তন হয়। আমি যথাসাধ্য ঐ কাজে সহায়তা করি।

১৯০১ সালে স্বামীজী যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন আমি ৩ দিন তাঁকে দর্শন করি। আমার ধারণা ছিল মহারাজও স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন, কারণ আমি আরও কয়েকজন গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীকে তখন দেখেছিলাম। আমি আমাদের প্রতিবেশীদের বিষয় মহারাজকে বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বাধা দিয়ে বললেন, "না, আমি কোনদিন ঢাকায় যাইনি।" আমি ঃ "আপনি ঢাকায় যান নি?" মহারাজ ঃ "না, তুমি আমায় নিয়ে যাবে?" আমি ঃ "হ্যাঁ, মহারাজ।"

মহারাজ ঃ “কেমন করে?” আমি ঃ “স্বামীজীকে যিনি নিমন্ত্রণ করে সব ব্যবস্থা করেছিলেন, আমি তাঁকে বলব। তিনিই আপনার যাত্রার সব ব্যবস্থা করবেন।” মহারাজ হেসে বললেন ঃ “ও—তুমি আমাকে এমনি করে নেবে!”

তারপর মহারাজ আমাকে ঠাকুর ঘরে যেতে বললেন এবং স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। যখন আমি মন্দির থেকে উঠানে নেমে এলাম তখন আমাকে কিছু প্রসাদ দেওয়া হলো। প্রসাদ পেয়ে আমি গঙ্গায় হাত ধুতে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় আমি এক সৌম্যকান্তি পুরুষকে নিচে নামতে দেখলাম। আমি তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, “স্বামী প্রেমানন্দ কোথায় থাকেন?” তিনি নিজের বুকে আঙুল দিয়ে বললেন, “এখানে।”

তারপর আমি মহারাজের কাছে বিদায় নিতে গেলাম, কারণ ঐদিন বিকালে আমি দক্ষিণেশ্বর যাব ঠিক করেছিলাম। মহারাজ আমাকে পিছনের দরজা দিয়ে নিকটস্থ খেয়াঘাটের পথ বলে দিলেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে তা দেখিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু যথাসময়ে খেয়া নৌকা না পাওয়ায় হেঁটে বালী যাই। সেখানেও নৌকা না পেয়ে কোন্নগরে যাই। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নৌকায় পার হই। তখন রাত হয়ে গেছে। তাই দক্ষিণেশ্বর দর্শন হলো না। হেঁটে কলকাতায় ফিরি, কারণ শেয়ারের গাড়ি পেলাম না। তারপর ঢাকায় ফিরি।

তারপর ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি আবার কলকাতায় আসি। এবার আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করি এবং দক্ষিণেশ্বর গিয়ে মন্দিরাদি ঠাকুরের লীলাস্থল দর্শন করি। একদিন নৌকাযোগে কলকাতা থেকে বেলুড় যাই। মহারাজ মঠবাড়ির নিচের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলে তিনি পূর্বপরিচিতের ন্যায় স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেন। তখন বেলা ১১টা। এমন সময় এক প্রৌঢ় ব্যক্তি এলেন। মহারাজ উঠে তাঁকে প্রণাম করলেন। আমি বিস্ময়ে ভাবলুম—ইনি কে? মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এঁকে চেন?” আমি ঃ “হাঁ। এনাকে দক্ষিণেশ্বরে মা কালীকে পূজা করতে দেখেছি।” মহারাজ ঃ “তুমি ঠিক ধরেছ। ইনি ঠাকুরের ভাইপো—রামলালদাদা।” তারপর মঠে প্রসাদ পেয়ে বিকালে আমি কলকাতায় ফিরি। এবারও আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন ইনস্টিটিউটের বাড়ির তেতলায় মাস্টার মশায়কে দ্বিতীয়বার দর্শন করি।

১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে মহারাজ বাবুরাম মহারাজ-এর সঙ্গে কামাখ্যা দর্শন করে মৈমনসিং হয়ে ঢাকায় আসেন। তাঁদের সঙ্গে আরও দশ জন সাধু

ছিলেন—স্বামী শংকরানন্দ, অম্বিকানন্দ, মাধবানন্দ, হরিহরানন্দ, বরদানন্দ প্রভৃতি। ট্রেন ঢাকায় পৌঁছুতে দেরি হয়। আমি একজন ধনীলোকের ল্যাণ্ডো গাড়ি নিয়ে তাঁর ছেলের সঙ্গে স্টেশনে অপেক্ষা করি। তারপর মহারাজদের সকলকে নির্দিষ্ট বাড়িতে নিয়ে যাই। সেবার মহারাজ স্বামীজীর উৎসব পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন। প্রতিদিন বহু ভদ্রলোক তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। এক ভদ্রলোক বললেন ঃ "মহারাজ আমরা সংসারী লোক। আমাদের এত কাজকর্ম ও সংসারের এত বাধা বিঘ্ন যে আমাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব মনে হয়।" মহারাজ তাঁকে বললেন ঃ "শ্রীভগবানের কৃপা হলে পর্বতপ্রমাণ বিঘ্ন ভস্মের মতো উড়ে যায়। যত পারুন তাঁকে ডাকুন এবং তাঁর কৃপার জন্য প্রার্থনা করুন।"

সেই বাড়িতেই রামনাম সংকীর্তন ও কালীকীর্তনের ব্যবস্থা হয়। মহারাজের সঙ্গে কয়েকজন গায়ক ও বাদক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাছাড়া স্থানীয় ভক্তেরাও সেই সংকীর্তনে যোগ দিতেন। আমাকেও মহারাজ কালীকীর্তনে যোগ দিতে বলেন। একদিন প্রসিদ্ধ ভগবান ওস্তাদের সেতার বাদ্যের ব্যবস্থা হলো। তার ছোট ভাই তবলা বাজাল। মহারাজ তন্ময় হয়ে শুনে মন্তব্য করলেন, "ঠিক যেন নারদ ঋষির বীণাবাদ্য শুনছিলাম।" মহারাজের আগমনের কিছু আগে ঢাকায় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য স্থায়ী জমি কেনা হয়েছিল। মহারাজ ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং বাবুরাম মহারাজ মিশনের বাড়ির ভিত্তিস্থাপন করেন। তাঁর নির্দেশ মতো পূজাদি ও চণ্ডীপাঠ হয়। তারপর মহারাজ নারায়ণগঞ্জ ও নাগমশায়ের বাড়ি দেওভোগ ঘুরে মঠে ফেরেন।

১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমি কিছুদিন মঠে এসে বাস করি। মহারাজ অনেক সময় বলরাম বাটিতে থাকতেন। আমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তাঁকে দর্শন করতাম। তারপর তিনি মঠে এলে আমি একদিন দীক্ষার কথা বললাম। তিনি আমাকে কয়েকটা প্রারম্ভিক উপদেশ দেন এবং দীক্ষা পরে হবে বললেন। একদিন মহারাজ বললেন ঃ "দেখ, এখানে যত পার আসবে, এতে তোমার ক্ষতি হবে না।"

যখন তিনি আমাকে preliminary instruction দেন, আমি সাধু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। আমার বাড়ির অবস্থা শুনে মহারাজ বললেন, "বর্তমানে তোমার মায়ের সেবা করা কর্তব্য। এখন সত্যকথা ও ব্রহ্মচর্য পালন কর।"

১৯১৬ সালের গ্রীষ্মাবকাশে মৈমনসিং-এর বিনোদ নামে এক যুবক মঠে এসেছিল। সে বাবুরাম মহারাজকে খুব ভালবাসত এবং তাঁর সঙ্গে ঘুরত।

মহারাজ তা লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন বিনোদ মহারাজকে প্রণাম করে বলল, "আমার ছুটি শেষ হতে চলল। আমাকে বাড়িতে ফিরতে হবে।" মহারাজ ঃ "তুমি বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করেছ?" "না। এখন যাব।" মহারাজ ঃ "দেখ, বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করবার একটা মন্ত্র আছে। তুমি সেই প্রণাম মন্ত্র জান?" বিনোদ ঃ "না, আমি জানি না।" মহারাজ ঃ "তুমি এই প্রণাম মন্ত্র শিখে নাও—'গৃহে ফিরে যেতে মন নাহি চায় আমার। ইচ্ছা হয় ওই চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার॥'" তারপর মহারাজ দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে প্রণাম করতে হবে এবং মন্ত্রটি বলতে হবে।

একটু পরে বাবুরাম মহারাজ বারান্দায় চায়ের টেবিলের কাছে বেঞ্চিতে বসলেন। বিনোদ সেখানে বাবুরাম মহরাজকে প্রণাম করবার জন্য গেল। মহারাজ আমাকে বললেন, "তুমি যেয়ে দেখ ও কি করে।" আমি যেয়ে দেখি বিনোদ বাবুরাম মহারাজকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বিড় বিড় করে কি বলছে। বাবুরাম মহারাজ ঃ "কি বলতে চাস—বল না।" সে আর কিছু বলতে পারল না। তখন আমি হেসে ফেলি। বাবুরাম মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি জান ও কি বলছে?" আমি ঃ "হাঁ, জানি। মহারাজ ওকে একটি প্রণাম মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন।" তখন আমি প্রণাম মন্ত্রটি বলি। তখন বাবুরাম মহারাজ হেসে আকুল। বললেন, "মহারাজ ফস্টিনস্টি করতে খুবই অভ্যস্ত।"

সেইবারই পাঁচজন যুবক ভক্ত বাবুরাম মহারাজের অনুমতিক্রমে জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষার জন্য যাচ্ছিলেন। তাদের দেখে আমারও মায়ের কাছে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হলো। বাবুরাম মহারাজও আমাকে অনুমতি দিলেন। আমরা সকলে মহারাজকে প্রণাম করে ও অনুমতি নিয়ে রওনা হলাম। মাঝ পথে আমার খুব রক্ত আমাশয় হয়। আমার এক বিশেষ সঙ্গী বন্ধু জয়রামবাটি যেতে নিষেধ করলেন, কারণ তাতে মাকে খুব বিব্রত হতে হবে। বন্ধুর কথায় আমি কলকাতায় ফিরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হলাম।

তারপর বেলুড় মঠে গিয়ে বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি। তিনি এর মধ্যে আমার সব সংবাদ পেয়েছেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "দীক্ষার সময় না হলে হয় না।" তারপর আমি মহারাজকে দর্শন করতে যাই। আমার ভয় ছিল যে মহারাজ হয়ত আমাকে বকবেন। আমাকে দেখামাত্র মহারাজ বললেন, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" শুনে আমার ভাবনা দূর হলো এবং প্রাণে একটু শান্তি পেলাম।

তখনও আমার মনে দ্বিধা ছিল যে শ্রীশ্রীমা সকলের চেয়ে বড়। তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া উচিত। মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে দ্বিধা ছিল। সে সময় মহাপুরুষ মহারাজ গঙ্গার ঘাটে পাদচারণা করছিলেন। আমি ঐকালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেউ কেউ শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে দীক্ষা নেয়, আর কেউ কেউ মহারাজের নিকট থেকে দীক্ষা নেয়। এতে কি কোন প্রভেদ আছে?" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন ঃ "আমি তো কোন প্রভেদ দেখি না। একই গঙ্গার জল দুটি নলের মধ্য দিয়ে আসছে। একই ঠাকুরের কৃপা শ্রীশ্রীমা ও মহারাজের মধ্য দিয়ে আসছে। আর দেখ, দীক্ষা নেয় একি কথা বলছ—দীক্ষা পায়।" একথা শুনে আমার ভিতরে একটা মহা পরিবর্তন হলো। আমি দীক্ষা নেবার কে—দীক্ষা কোথায় পাই সেটাই দেখতে হবে। আমি তখনই মহারাজের কাছে গিয়ে দীক্ষার কথা বললাম। মহারাজ বললেন, "অপেক্ষা কর। আমাকে পাঁজি দেখতে হবে। আমি তোকে যা বলেছি তা পালন করতে থাক।"

১৯১৭ সালে মহারাজ দক্ষিণদেশ থেকে পুরী হয়ে কলকাতায় ফিরলেন স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে। হরি মহারাজ-এর অস্ত্রোপচার হয় পুরীতে। তিনি তখন খুব অসুস্থ। উদ্বোধনে উপরের তলায় শরৎ মহারাজের ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হলো, আর মহারাজ থাকতেন নিচের অফিস ঘরে। আমি কৃষ্ণলাল মহারাজের সঙ্গে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসি এবং উদ্বোধনে মহারাজকে দর্শন করতে যাই। তাঁকে প্রণাম করবার কালে কৃষ্ণলাল মহারাজ বললেন, "মহারাজ, এর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।" আমার বাস্তবিক জিজ্ঞাস্য বিশেষ কিছু ছিল না। মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "সাধুকে দর্শন করলি, প্রণাম করলি, স্পর্শ করলি—আর কি জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে?"

মহারাজ প্রতিদিন উদ্বোধন থেকে বলরাম মন্দিরে এসে বৈঠকখানা ঘরে বসতেন। একদিন আমি তাঁর সামনে বসে আছি, এমন সময় ললিতবাবু (মহারাজ একে কাইজার বলতেন) এলেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা তো খুব ভক্ত। জয়রামবাটিতে মায়ের মন্দির হবে, তোমরা টাকার জোগাড় করতে পার কি?" মহারাজ বললেন, "এ ওসব পারবে না।" আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ললিতবাবু মহারাজের মনোযোগ divert করার জন্য মহারাজের পিছনে দেওয়ালের ওপর ঠাকুরের যে painting ছিল, সে দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "মহারাজ, ঠাকুর কি দেখতে এরূপ ছিলেন?" তিনি ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এই অবস্থা দেখে ললিতবাবু ও

আমি নির্বাক হয়ে গেলুম। মহারাজের অবস্থা দেখে মনে হলো তাঁর ভিতরের ভাব এত গভীর যা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

আর একদিন আমি মহারাজকে দর্শন করবার জন্য উদ্বোধনে গিছলাম। শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের শারীরিক অবস্থা সবিস্তারে মহারাজের কাছে জানান। সেই সময়েতে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ) স্বলিখিত রামানুজ নাটকের পাণ্ডুলিপি মহারাজের কাছে পড়তেন। মহারাজ মাঝে মাঝে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উপদেশ দিতেন।

একদিন মহারাজ এক ভক্তকে বললেন ঃ "আজ বিকালে তোমার মোটর গাড়িতে যদি দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যেতে পার তবে ভাল হয়।" এর পূর্বে মহারাজ যখন দক্ষিণ দেশ হতে আসেন, তখন একখানি সুন্দর মাদ্রাজী শাড়ি মা ভবতারিণীর জন্য আনেন। উহা তিনি মাকে পরাবার জন্য দক্ষিণেশ্বর পাঠিয়েছিলেন। পরে তিনি সংবাদ পান যে শাড়ি মাকে পরান হয়েছে। সেজন্যই মহারাজের বিশেষভাবে মাকে দর্শনের ইচ্ছা হয়েছিল।

মহারাজ দক্ষিণেশ্বর যাবেন শুনামাত্র আমি ঠিক করলাম যে ঐ সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত থাকব। বিকালে মহারাজের মোটর দক্ষিণেশ্বরে পৌছানর আগে আমি পূর্ব দিকের প্রবেশ দ্বারের কাছে ভিতরের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাজ গাড়ি থেকে নেমে আমাকে দেখে বললেন, "তুমি কি করে আসলে?" আমি ঃ "ফেরি বোটে এসেছি।" মহারাজ ঃ "যাবার সময় স্টীমারে যাবে। স্টীমার মঠ থেকে সাধুদের নিয়ে আসছে, তাতে ১০০ লোক ধরে।" তারপর আরও দুখানা মোটর এলো—একখানাতে শরৎ মহারাজ এবং অপরটাতে গঙ্গাধর মহারাজ। কিছুক্ষণ পরে মঠ হতে স্টীমারে সাধুরা আসলেন। সব শুদ্ধ প্রায় ১০০ জন সমবেত হলো।

মহারাজের অনুসরণ করে আমরা মা-কালীর মন্দিরে গেলাম। গর্ভমন্দিরের দক্ষিণদ্বার দিয়ে সাধারণত দর্শন হয়, সেদিন পশ্চিম দ্বারও খোলা হয়েছিল। তাতে মায়ের মুখ খুবই স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গঙ্গাধর মহারাজ মা-কালীর সামনে বসে কিছুক্ষণ স্তব পাঠ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল ভক্তি ও ভাবে রক্তিম।

তারপর মহারাজ বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দির দর্শন করে ঠাকুরের ঘরে গেলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। প্রণামাদির পর মহারাজ পঞ্চবটী ও বেলতলা দর্শনের জন্য গেলেন। আমরাও গেলাম। ইতোমধ্যে মহারাজ ও

ভক্তগণ মায়ের ভোগের জন্য যে সন্দেশ ও ফল এনেছিলেন, সেই প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হলো। সমস্ত সময়ের মধ্যে মহারাজ একটা কথাও বললেন না, আমরা ভেবেছিলাম মহারাজ অনেক পুরানো কথা বলবেন। তার হৃদয় যেন গভীরভাবে পূর্ণ ছিল। তারপর মহারাজ ও শরৎ মহারাজ একই গাড়িতে কলকাতায় ফিরলেন এবং আমরাও মঠে ফিরলাম।

এরপর একদিন মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, "মহারাজ তোমাকে তাঁর নিকট যেতে বলেছেন।" ওই দিনই বা পরের দিনই মহারাজের দর্শনের জন্য যাই। সেবার মহারাজ আমাকে বলরাম মন্দিরে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেদিন এক বিশেষ পর্ব দিন ছিল। স্বামী শংকরানন্দের নির্দেশ মতো আমি কিছু ফল এনে মহারাজকে দক্ষিণা দেই এবং পরে একখানি কাপড়ও দিয়েছিলাম।

দীক্ষার সময় আমি মহারাজকে বললাম, 'ইষ্টের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?" তিনি বললেন ঃ "সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ওটা কালে তোমার ভিতর প্রকাশ পাবে। ...তিনিই তোমার যথাসর্বস্ব।" তারপর আমি মন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ "মন্ত্র ও ইষ্টের মধ্যে কোন পৃথক অর্থ নেই। উভয়েই একই জিনিস বোঝায়। তিনিই তোমার সব।" যে সাধন প্রণালী তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে অভ্যাস করতে নির্দেশ দিলেন। দুবার তিনি আমাকে পুরশ্চরণ করতে বলেছিলেন।

আর একদিন আমি উদ্বোধনে মহারাজকে দর্শন করতে যাই। সেদিন মহারাজ ক্ষুদুমণিকে একটা জপের মালা আনতে বললেন। সেই মালা নিজে জপ করে মহারাজ আমাকে দেন। সেই মালা আমি এখনও ব্যবহার করি।

মহারাজ একদিন বলরাম মন্দিরে বৈঠকখানায় বসে আছেন। তিনি আমাকে কাগজ-কলম আনতে বললেন এবং একখানা চিঠি লেখার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি বলছি তুমি লেখ ঃ To the Abbot, Belur Monastery..." তিনি চিঠিখানা ইংরাজীতে dictate করে শেষে বললেন যে প্রয়োজন মতো ইংরাজী সংশোধন করে নিতে। চিঠির মর্ম এরূপ ঃ আমরা এক দল সন্ন্যাসী ক্রিসমাস উপলক্ষে বেলুড় মঠে আসছি। আপনারা চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী অবশ্যই খ্রীস্ট উৎসব করবেন। আপনাদের আতিথেয়তা সুবিদিত। আমরা অবশ্যই বিরাট ভোজ আশা করি। আমরা কিন্তু আমিষাশী। আপনাদের খ্রীস্ট উৎসব সফল হউক।

আমি চিঠিখানা মহারাজের হাতে দিলাম। তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর না করে প্রেমানন্দ নামে সই করলেন এবং চিঠিখানা বাবুরাম মহারাজকে দেখাতে বললেন। আমি চিঠিখানা বাবুরাম মহারাজ-এর হাতে দিলাম। তিনি তখন অসুস্থ। বাবুরাম মহারাজ চিঠিখানাতে নিজের নাম স্বাক্ষর দেখে বললেন, "মহারাজের ছেলে মানুষের ভাব।"

সে সময় স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠের in-charge ছিলেন। আমি আবার মহারাজের কাছে গেলে, তিনি আমাকে বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠিখানা দিতে বললেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি যে উহা লিখেছেন একথা যেন তাঁকে না বলা হয়। আমি মঠে গিয়ে চিঠিখানা মহাপুরুষ মহারাজকে দিলাম। তিনি চিঠিখানা পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহারাজ লিখেছেন—না?" আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন ঃ মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। এ বিষয়ে একটা লক্ষ্য করবার বস্তু হলো যে বাবুরাম মহরাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ উভয়েই নিরামিষাশী ছিলেন।

মহারাজ একবার আমাকে লঘু পুরশ্চরণ করবার উপদেশ দেন। প্রতিমাসে অষ্টাহ নিয়মিত পুরশ্চরণ করতাম। মহারাজ আমাকে একাহার, নিরামিষ ভোজন ও রাতে দুধ, ফলমিষ্টি খেতে বলেন। এক বছর আমি মহারাজের কথামতো চলি। তারপর আবার ঢাকা থেকে যখন আসি, তিনি আমাকে দীর্ঘ পুরশ্চরণ করতে বলেন। সে বারও আমি স্বপাক হবিষ্যান্ন করেছিলাম।

একদিন সকাল বেলায় মহারাজ বেলুড় মঠের জমির এক পাশে শ্লেড়ার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু দূরে কয়েকটা গরু ঘাস খাচ্ছিল। এর মধ্যে লক্ষ্মী নামে একটি গরু মহারাজের খুব প্রিয় ছিল। মহারাজকে দেখে গরুটি ছুটে এলো। মহারাজ তাকে আদর করতে লাগলেন। আমি কাছেই ছিলাম। মহারাজ বললেন, "এ কলা খেতে খুব ভালবাসে।" কলা নিয়ে আসব কিনা জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, "তাহলে খুব ভাল হয়।" আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে বাজার থেকে প্রায় ১ ডজন কলা নিয়ে এলাম এবং মহারাজের হাতে দিলাম। তিনি গরুটিকে সমস্ত কলাগুলি খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করেন।

১৯২০ সালে আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তীর্থ করতে যাই এবং কনখল, হরিদ্বার প্রভৃতি দর্শন করে ক্রিসমাসের সময় কাশীতে আসি। সে সময় শুনলাম যে মহারাজ কাশীতে আসছেন। আমি চন্দ্র মহারাজের অনুমতিক্রমে অদ্বৈত আশ্রমে থাকতে পাই। রোজ হরি মহারাজের কাছে যেতাম এবং তাঁর অমৃততম

কথা শুনতাম। ১৯২১ সালে স্বামীজীর জন্মতিথির পূর্বে শরৎ মহারাজ কাশীতে আসেন এবং স্বামীজীর জন্মদিনে বক্তৃতা করেন। মহারাজ কাশীতে এসে অদ্বৈত আশ্রমে উঠেন। বহু সাধু সমাগম হয়। সাধন ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ চলতে থাকে। মহারাজ অনেককে সেবার সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য দেন। কাশীতে তখন মহারাজ একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেন।

কিন্তু সেই সময় আমি ঢাকা থেকে একটা চিঠি পাই যে আমার মা খুব অসুস্থ। তাই মহারাজ ও শরৎ মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমি ঢাকায় যেতে বাধ্য হই। এর পরে আমার আর মহারাজকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়নি। মহারাজের অসুখের সময় আমি কলকাতায় যাবার জন্য টিকিট কেটেছিলাম এবং গাড়িতে উঠবার সময় ঢাকা মঠ থেকে একজন সাধু টেলিগ্রাম নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, “মহারাজের শরীর গেছে।”

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ

(অনুবাদিকা ঃ সান্ত্বনা দাশগুপ্ত)

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে মহারাজের দর্শন লাভে আমি ধন্য হই। সে সময় আমি ছাত্র। একদিন আমি সংবাদপত্রে পড়লাম, মহারাজ মাদ্রাজে এসেছেন। কৃষ্ণমেনন (স্বামী ত্যাগীশানন্দ) এবং আমি তাঁকে প্রণাম করতে যাব স্থির করলাম। আমরা আগেই জানতাম যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। যেহেতু আমরা দূরে থাকতাম, সেজন্য মাদ্রাজের শহরতলী মায়লাপুর যাবার জন্য আমাদের শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। যেদিন তাঁর দর্শন পেলাম তার আগের দিন আমি তাঁকে পলকের জন্য দেখতে পেয়েছিলাম। সমুদ্রতীরে একটি ঘোড়ার গাড়িকে আমি দক্ষিণ দিক অভিমুখে যেতে দেখেছিলাম। গাড়ির আরোহিগণ গেরুয়া পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন। এদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই মহারাজ হবেন এই ভেবে আমি গাড়ির পেছনে পেছনে যতদূর সম্ভব দৌড়ে গিয়েছিলাম। পরদিন মহারাজকে ঐ গাড়ির আরোহীদের মধ্যে অন্যতম বলে চিনতে পেরেছিলাম।

পরদিন আমি ও কৃষ্ণমেনন মহারাজকে দর্শন করবার জন্য মায়লাপুর গেলাম। আমাদের বলা হলো উনি এক্ষুনি বারান্দায় আসবেন। আমরা একঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। এমন সময় একটি গাড়ি এসে সামনে থামল। তখন একজন রাজোচিত আকৃতির সাধু সাঙ্গোপাঙ্গসহ বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তিনি মহারাজ ছাড়া আর কেউ নন ভেবে নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ "মহারাজ আমরা ছাত্র, আমরা আপনাকে দর্শন করতেই এসেছি।" তিনি মৃদু-মধুর কণ্ঠে বলেন ঃ "তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে? তাহলে তো তোমাদের আর একদিন আসতে হয়।" আমরা বললাম ঃ "পরের শনিবার আসব কি?" মহারাজ সম্মতি জানালেন।

পরের শনিবার আমি ও কৃষ্ণমেনন আবার মায়লাপুর গেলাম। অন্য অনেক দর্শনার্থী থাকায় আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। অবশেষে আমাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের বসবার জন্য ঘরে মাদুর পাতাই

ছিল। আমরা মহারাজের মধুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করলাম। কোন বাক্যালাপ না করে আমরা নীরবেই বসে রইলাম। মহারাজ তখন হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন ঃ "তোমরা কি চাও?" আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের পথনির্দেশ চাই। মহারাজ তখন এমন অন্তর্মুখী ও ধ্যান-সমাহিত হয়েছিলেন যে আমাদের ভয় হতে লাগল, হয়তো আমরা তাঁকে বিরক্ত করছি। তিনি আমাদের বলেন ঃ "সর্বদা সত্য বলবে এবং ব্রহ্মচর্য পালন করবে।" আমরা তখন বিখ্যাত পালোয়ান রামমূর্তির বক্তৃতায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করতাম। সেজন্য আমি বললাম ঃ "আমরা প্রাণায়াম অভ্যাস করছি। মহারাজ, আমরা কি প্রাণায়াম করব।" মহারাজ বললেন ঃ "না, প্রাণায়াম করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তোমরা ওসব এক্ষুনি ছেড়ে দাও। আমি যখন মূলতানে ছিলাম, একজনকে দেখেছিলাম যে ঐসব করতো, তার ফলে সে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তোমাদের প্রাণায়ামের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের নাম জপ করলেই তোমাদের যথেষ্ট হবে। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য হলো শ্বাস-সংযম করা। সে-উদ্দেশ্য তোমরা জপ ও ধ্যান করলেই সিদ্ধ হবে। মনঃসংযোগ হলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে থাকে। তারপর স্বাভাবিকভাবেই শ্বাস-সংযম হয়।"

আমি জানতে চাইলাম ঃ "ভগবানের কি নাম জপ করব।" মহারাজ বললেন ঃ "একদিন ভোরের আগেই এসো, আমি তোমাকে মন্ত্র বলে দেব।" আমি বললাম ঃ "কোন্ দিন আসব?" মহারাজ একটুখানি চিন্তা করলেন। তারপর 'ঈশ্বর' নামধারী কাউকে ডাকলেন। একজন তরুণ ব্রহ্মচারী এলেন। মহারাজ তাঁকে বাঙলা ভাষায় যেন কি বললেন। ব্রহ্মচারীটি একটি বই নিয়ে এলেন, দেখে মনে হলো যেন পঞ্জিকা। মহারাজ আমাদের আসবার দিন তারিখ স্থির করে দিলেন। আমরা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মন্ত্র নেওয়া যে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার তা আমরা বুঝতেই পারিনি। একজন স্বামীজী আমাদের সঙ্গে খুব স্নেহের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমি পরে জানতে পেরেছিলাম তাঁর নাম স্বামী শঙ্করানন্দ। আমরা অপর একজন ব্রহ্মচারী (পরে স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দের) সাক্ষাৎও পেলাম। তাঁর কাছেই আমরা সর্বপ্রথম 'দীক্ষা' কথাটি শুনলাম। তিনি বললেন মহারাজ আমাদের দীক্ষা দেবেন।

মালাবারের লোক আমরা দীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমরা ব্রাহ্মণও নই আর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের সংস্পর্শে ইতঃপূর্বে কখনো আসিওনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে মহারাজের স্থান কত উচ্চে সেকথা আমাদের বলা হয়েছিল। ব্রহ্মচারীটি বললেন যে, কিশোর বালকরূপে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখেন যে জগন্মাতা মহারাজকে তাঁর মানসপুত্র রূপে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এই সকল কাহিনী আমাদের মনে তাঁর কাছে দীক্ষা লাভের জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি করল। কিন্তু কোন কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠানটি ঘটল না। এজন্য আমরা দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম। একদিকে পরীক্ষা এসে যাচ্ছিল, অপরদিকে মহারাজেরও মাদ্রাজ ত্যাগ করবার সময় এগিয়ে আসছিল। অবশেষে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন আমি মহারাজের কাছে দীক্ষা লাভ করে কৃতার্থ হলাম। সেই দিনটি থেকে আমি নিয়মিত মঠে যেতাম, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ তখন শেষ হতে চলেছে। ততদিনে আমি অবনী মহারাজের (স্বামী প্রভবানন্দের) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তিনি মাঝে মাঝে জানতে চাইতেন জীবনে আমার কি করার পরিকল্পনা, আমি তাঁকে বলেছিলাম ঃ "মঠে যোগ দেব।"

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে আমি মহারাজের চিঠি পেলাম যে তিনি শীঘ্রই দক্ষিণদেশে আসছেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্বামী প্রভবানন্দ আমাকে লিখলেন ঃ "কলকাতায় দুজন তোমার বয়সী ছেলে সংসার ত্যাগ করেছে, তারা এখন মঠে রয়েছে। তোমার ব্যাপার কি?" তাতেই কাজ হলো, আমি স্থির করলাম—বাড়ি ছাড়ব, এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল মঠে যোগদান করলাম। আমার বাড়ি ছাড়বার প্রধানতম আগ্রহ ছিল—মাদ্রাজে মহারাজের দর্শন পাব। কিন্তু তাঁর দর্শন পাবার জন্য আমাকে এক বছর অপেক্ষা করতে হলো। যদি আমার ঠিক মনে থেকে থাকে, তাহলে তিনি পরের বছর মে মাসে মাদ্রাজে এলেন। এই সময় আমি বাংলা বেশ বুঝি এবং বাংলা কথাবার্তা শুনে উপকৃত হবার ক্ষমতা অর্জন করেছি। মহারাজ মাদ্রাজে এসে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করলেন, তা বর্ণনাতীত। ধর্ম সম্বন্ধে একটিও কথা না বলে তিনি শুধু তাঁর উপস্থিতির দ্বারা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন, তিনি ছিলেন যেন অধ্যাত্মশক্তির বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র। তাঁর স্বভাব ছিল অন্তর্মুখ হয়ে থাকা, অধ্যাত্ম বিষয়েও কথাবার্তা তিনি কম বলতেন। কিন্তু যখন তিনি কথা বলতেন, আধিকারিক পুরুষের ন্যায়ই বলতেন। আমি এ রকম একটি ঘটনার সাক্ষী। মহারাজ সেদিন প্রায় দুঘণ্টা একাদিক্রমে কথা বলেছিলেন। তিনি একজন শিষ্যকে সেদিন কর্ম ও সাধনভজন সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং তার দ্বারা তার জীবনে সম্পূর্ণ এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিচ্ছিলেন।

মহারাজের শিক্ষাদান-প্রণালী অনন্যসাধারণ ছিল। অনেক সময় তাঁর শিক্ষাদান খুব কঠোর মনে হতো। অন্যদের চোখে তা হয়তো অকারণ মনে হতো। মহারাজ একবার কয়েকমাস ধরে একজন নবীন সাধুকে এইভাবেই শিক্ষা দিচ্ছিলেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য মহারাজ এ রকম করতেন। শিষ্যের অন্তরের ভাবকে তিনি এইভাবে শুদ্ধ করে দিতেন। শিষ্যটি তাঁর নির্দেশমতোই চলতে চাইছিল। কিন্তু মনে তার নৈরাশ্য আসছিল।

পরিশেষে বারবার তিরস্কারে হতাশ হয়ে শিষ্যটি মহারাজকে বলল, সে মঠ থেকে চলে যাবে এবং দক্ষিণ ভারতের কোন তীর্থে গিয়ে তপস্যাদি করবে। মহারাজ তার এই পরিকল্পনায় খুব আগ্রহ দেখালেন, নিজেই কয়েকটি অনুকূল স্থানের নাম প্রস্তাব করলেন। দু-তিন সপ্তাহ পর একটি স্থান নির্বাচিত করা হলো এবং মহারাজ তার যাত্রার জন্য একটি শুভ দিন দেখে দিলেন। তখন প্রায় তিনটা হবে। মহারাজ একটি আরামকেদারায় বসেছিলেন। যাবার জন্য শিষ্যটি তাঁর বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্র বেঁধে তৈরি হয়ে মহারাজের নিকট বিদায় নিতে এলো। আমার তার সঙ্গে স্টেশনে যাবার কথা। শিষ্যটি যখন তাঁর চরণে প্রণত হলো, তখন তিনি বিপুল স্নেহের সঙ্গে বললেন ঃ "তুমি কোথায় যাবে? ...যাও শিবানন্দ স্বামীকে এখানে ডেকে আন।" শিবানন্দ স্বামী এলেন এবং মহারাজের খুব কাছে বসলেন। শিষ্যটি দরজার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্যটি ভাসছে—যেন এই গতকালের ঘটনা। স্বামী শিবানন্দকে মহারাজ বললেন ঃ "দাদা দেখ, এই ছেলেটি এখান থেকে চলে গিয়ে তপস্যা করতে চায়। আমাদের ছেলেদের মন এভাবে কাজ করে কেন বুঝতে পারি না। এই মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কি জীবন যাপন করে গিয়েছেন, তিনিই তো পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর দিব্যজীবনের মধ্যে এই মঠ পুণ্যতীর্থ হয়ে রয়েছে। আর ছেলেরা সেই সুযোগ নেবে না? এই মঠের মতো আধ্যাত্মিক পরিবেশ এরা আর কোথায় পাবে? কথা হলো এরা নিজের মন নিজেরাই জানে না।" মহারাজ তারপর শিষ্যটিকে বললেন ঃ "তুমি যতক্ষণ মনে করছ ভগবান অন্য কোথাও আছেন, ততক্ষণ তোমার অশান্তি যাবে না। যখন তুমি জানবে, তিনি এখানে আছেন (নিজ বক্ষঃস্থল দেখিয়ে), তখনই তুমি শান্তিলাভ করবে। এখানে সেখানে ঘুরে কি হবে? তুমি কি হাজার হাজার ভবঘুরে সাধু দেখনি? তুমি কি তাদের একজনের মতো হতে চাও? স্বামী বিবেকানন্দ এক মহান উদ্দেশ্যে এই সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন। সেকথা চিন্তা করে নিজেকে গড়ে তোলবার চেষ্টা কর। তুমি এর চেয়ে ভাল জায়গা আর

কোথায় পাবে? একজনের তপস্যাই একটি মঠকে পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে পারে।

"দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর ছিলেন, তখন সেখানকার সে কি আধ্যাত্মিক পরিবেশ! আমরা নৌকা করে গিয়ে সেখানে নামামাত্র মনো হতো আমরা যেন স্বর্গধামে এসেছি। আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে কি অসীম ভালবাসাই না ছিল। তোমাদের পরস্পর সে ভালবাসা নেই। সাধুর স্বভাব হবে মাধুর্যে ভরা, সে কখনও রূঢ় কথা বলবে না। আমার মনে পড়ছে বৃন্দাবনে আমি একজন সাধু দেখেছিলাম। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন মন্দিরে দর্শন করতে যেতেন। একবার কয়েকদিন তিনি এলেন না। আমি তাঁর অনুপস্থিতি বেশ অনুভব করেছিলাম। কয়েকদিন পর যখন তিনি এলেন, আমি তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ 'আমার পায়ে একটি ক্ষত আছে, একদিন ভিড়ের মধ্যে সেই ক্ষতে একজনের পদস্পর্শ লাগে। আমি চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ি।' যেভাবে সাধুটি ঘটনাটি বর্ণনা করলেন তা আমার মনকে নিদারুণভাবে স্পর্শ করল। পদদলিত হয়েছেন বলে সাধুটি কোন অভিযোগ করলেন না। তাঁর কাছে প্রত্যেক পা-ই যেন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম এবং তাঁর ভাব যেন ঈশ্বরই তার অঙ্গে পদস্পর্শ দিয়েছেন।

"যদি তোমরা সকলে মধুর স্বভাবের হও এবং অন্তরে তোমাদের প্রেম থাকে, তাহলে প্রত্যেকের সঙ্গে মিল হবে। ঈশ্বরকে তোমার ভালবাসার কেন্দ্র করতে হবে। সব সময় তো তুমি ধ্যান করতে পারবে না। এই মঠে স্বামীজীর কাজ করবার তোমাদের কত সুযোগ রয়েছে। সেই সকল কাজ আনন্দের সঙ্গে করবে। তা না করে তোমরা কেবল ঝগড়া-বিবাদ করে বেড়াচ্ছ। তোমরা যা করছ, কলকাতায় সত্যেন (স্বামী আত্মবোধানন্দ) সেই একই কাজ করছে, কিন্তু তার ভাবটি ঠিক আছে। তোমরা তার মতো হবার চেষ্টা কর না কেন? এই তো তোমাদের সাধন করবার সময়। বুড়ো হলে কি আর কিছু করতে পারবে? হৃদয়ে প্রেম আনো, তাহলে সব পাবে। কেন তোমরা সকলে এত শুষ্ক হয়ে গেলে? মঠে যখন তোমরা প্রথম যোগ দিয়েছিলে, তখনকার সে প্রেরণা তোমাদের কোথায় গেল? তোমরা যে অবস্থায় আছ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সাধনার পথে এগিয়ে যাও। সেই যে চন্দন কাঠ কাটতে গিয়েছিল তার কাহিনীটি তোমাদের কি মনে পড়ে না? থেম না, যতক্ষণ-না হীরের খনিতে পৌঁছচ্ছো, ততক্ষণ এগিয়ে যাও। তুমি ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছ। তোমার অল্প বয়স, তুমি

পবিত্র। তোমার সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনা। কেন তোমরা আমাদের উপদেশ নিতে পার না এবং ভালবাসতে শেখ না, আমরা যা করতে বলি, তা কেন কর না? স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মঠ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' আমরা ঐ সাধারণ ভবঘুরে সাধুদের থেকে কত আলাদা তা কি তোমরা দেখতে পাও না? এ মঠ যদি ছেড়ে দাও তোমাকে খাওয়া পরার জন্য কত ভাবতে হবে একবার ভেবে দেখো দিকি?"

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ উক্তি উদ্ধৃত করলেন ঃ "মনমুখ এক কর।" শিষ্যটি তখন বলল ঃ "মহারাজ আপনি আমাদের এই সব করতে বলছেন। কিন্তু আপনি কেন আমাদের সাহায্য করছেন না? ঠাকুর তো আপনাদের সব করে দিয়েছিলেন। আমরা যে দুর্বল মানুষ।" মহারাজ তখন আবেগের সঙ্গে বললেন ঃ "তুমি কি মনে কর যে আমরা তোমাদের জন্য কিছু করছি না? আমরা যে সাহায্য তোমাদের করতে চাচ্ছি তোমরা কি তা নিচ্ছ? দিনের মধ্যে তুমি কবার ধ্যান-জপ কর? তুমি কি সব সময় তোমার মনকে ঈশ্বরের স্মরণ-মননে নিযুক্ত রেখেছ? ঠাকুরের কথা মনে রেখ, 'একহাতে ভগবানের চরণ ধরে থাকবে, অন্য হাতে কর্ম করবে'। উপাসনার বুদ্ধিতে কর্ম করলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে।" সেই শিষ্যটিকে সম্বোধন করে যে-কথাগুলি তিনি বলেছিলেন তা তখন উপস্থিত প্রত্যেকের মনেই চিরস্থায়ী রেখাপাত করেছিল। কিন্তু যখন মহারাজ কথা বলছিলেন, তখন যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুমাত্রও ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

(উদ্বোধন ঃ ৯০ বর্ষ ৯ সংখ্যা)

মহারাজের কথাপ্রসঙ্গে

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ

(সংগ্রাহক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ)

একদিন কোথাও রেলে যাবার সময় বেশি মাল কম বলে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মহারাজ শুনে ভীষণ চটে গেলেন। আবার মাল ওজন করে ন্যায্য ভাড়া দিয়ে তবে যাওয়া হলো।

*   *   *

মাদ্রাজ মঠে রামনামের দিন মহারাজ আমাকে শিখিয়ে দিলেন যে ছাত্রাবাসের ১০০ ছেলে যেন রামলালদাদা আসামাত্র সব দাঁড়িয়ে "Good evening, Sir" বলে। ছেলেরা তাই বলল। রামলালদাদা বুঝলেন এ সব মহারাজের কীর্তি।

*   *   *

স্বামী করুণানন্দের খুব লেকচার দেওয়ার শখ। লেকচার হবে ঠিক হলো। করুণানন্দ মাথায় পাগড়ি বেঁধে তৈরি। মহারাজের ঘরের সামনে বারান্দায় সব সমবেত। মহারাজ বললেন, "I propose Swami Vijnananandaji to the chair." বিজ্ঞান মহারাজ অমনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "I dissolve the meeting." খুব হাসি। আর লেকচার হলো না।

*   *   *

একদিন অবনী মহারাজকে খারাপ মাছ আনায় (কেউ পাঠিয়েছিল, তাই তার দোষ ছিল না) খুব বকছেন। অবনী মহারাজ নির্দোষ। হরি মহারাজ বললেন, "অবনী নির্দোষ তবে মহারাজ মিছামিছি গাল দিচ্ছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু মহারাজ যখন ওরূপ করছেন তখন কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে যা আমরা বুঝতে পারছি না।" কী অদ্ভুত বিশ্বাস ওদের সবার ছিল মহারাজের উপর।

*   *   *

আগের দিন অবনী মহারাজ আট আনা দিয়ে গরুর ঘাস কিনেছেন। পরদিন আমি কিনেছি ছয় আনা দাম দিয়ে। মহারাজ দাম জিজ্ঞাসা করায় বললুম ছয় আনা। শুনে তিনি বললেন, "ডাক তো ঐ বিষ্ণুপুরের ছোকরাকে। কাল ও আট আনায় কিনেছে—মূর্খ।" তাকে কি বকুনি। বেচারার কি দোষ। সে তামিল ভাষা জানে না। কিন্তু মহারাজ ছাড়লেন না। যাদের বেশি ভালবাসতেন, তাদের বেশি বকতেন।

* * *

মহাপুরুষ মহারাজ মাদ্রাজে মহারাজকে বলছেন, "রাজা, মঠে চল। গরুগুলোর কষ্ট হচ্ছে। সেখানে গোয়াল ঘর করতে হবে। কোথায় হবে তুমি দেখিয়ে না দিলে তো হবে না। চল! হয় তুমি ধ্যান রাজ্যে ডুবে থাকবে নতুবা হাসিঠাট্টা নিয়ে থাকবে।" এঁদের শ্রদ্ধা দেখে আমরা মহারাজকে কিছু বুঝেছি। নইলে কি বুঝতুম।

* * *

আমাকে দিয়ে "একটা পাখি চিঠি মুখে করে আনছে" এরূপ একটা monogram আনিয়ে আমাকে বললেন, "ভবানীকে দেখা।" ভবানী মহারাজ বললেনঃ "মহারাজের কাণ্ড! ও তো প্রেমপত্র।" মহারাজ পরে শুনে গম্ভীর হয়ে বললেনঃ "No it is a message from the heaven to the world."

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী অশেষানন্দ

(অনুবাদক ঃ স্বামী বলভদ্রানন্দ)

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ। আমি আর আমার বন্ধু নীরদ (পরবর্তী কালে স্বামী অখিলানন্দ) তখন কলকাতার সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে পড়ি। নীরদ একদিন আমাকে বলল ঃ "আজ তোমাকে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তিনি যে পবিত্রতার কথা মুখে খুব বেশি বলেন তা নয়। ...কিন্তু পবিত্রতাই তাঁর জীবন।"

সেই সময় আমি খুব পাশ্চাত্য-অনুরাগী ছিলাম। আমি সেজন্য কোন হিন্দু কলেজে পড়তে যাইনি। স্বামী প্রভবানন্দ আর স্বামী বিবিদিষানন্দও তা-ই—ওঁরা গিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের কলেজে। আমি যে কলেজটা বেছে নিয়েছিলাম, সেণ্ট পলস কলেজ—সেটা ছিল আবাসিক কলেজ। সেখানে ফাদাররা পড়াতেন, তাঁদের প্রতি আজও আমি কৃতজ্ঞ। ছাত্ররা একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম। অধ্যাপকদের সঙ্গেও নিঃসঙ্কোচে মিশতাম। তা সত্ত্বেও সেখানে কঠোর শৃঙ্খলা ছিল। কলেজে প্রথম প্রথম ভাবতাম, একটা কৃতী ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলব। এছাড়া ক্রিকেট আর টেনিস খেলতে আমি খুব ভালবাসতাম; ফুটবল আর হকিও ছিল। কাজেই, কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার পরিকল্পনা কখনই আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন অখিলানন্দ ঐ প্রস্তাব করলেন। তখন টেনিস খেলছিলাম। বললাম ঃ "এখন তো খেলছি, তবে খেলা শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।" অখিলানন্দ ধৈর্য ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করলেন। খেলার পরে অখিলানন্দর সঙ্গে বলরাম বসুর বাড়ি গেলাম। সেখানেই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আমার প্রথম দর্শন।

তাঁর মতো একজন মহাপুরুষকে দর্শন করবার ফলেই আমি ত্যাগের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে অনুপ্রাণিত করলেন এই জীবনযাপন করতে—যাতে আমি ঈশ্বর উপলব্ধি করতে পারি। সেসব দিন কী

সুন্দর কেটেছে। বলরাম মন্দিরে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমায় একবার তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘরে বসে ধ্যান করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেকথা আমি কখনও ভুলব না। মহারাজের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা বড় হলঘর ছিল। সেখানে রামনাম হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আসতেন ঐ ঘরেই কলকাতার ভক্তদের দর্শন দিতেন। এই কারণে ঘরটির বিশেষ মাহাত্ম্য। মহারাজের সেবক ছিলাম না বলে সাধারণত আমি মহারাজের কাছাকাছি যেতে পারতাম না। মহারাজের ব্যক্তিগত সেবার কাজ যাঁরা করতেন, কেবল তাঁদেরই সুযোগ হতো মহারাজের সঙ্গে ধ্যান করবার। সূয্যি মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ), ঈশ্বর মহারাজ, ভবানী মহারাজ, গোঁসাই মহারাজ—এঁরা সব মহারাজের সেবক ছিলেন এবং বলরাম মন্দিরেই থাকতেন। কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) আমাকে স্নেহ করতেন, আমিও তাঁকে খুব ভালবাসতাম। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "আমি কি মহারাজের সঙ্গে ধ্যান করতে পারি?" উনি বললেন ঃ "তুমি আসতে পার ধ্যান করতে; তবে খুব ভোরে আসতে হবে।" এখন আমার ঠিক মনে নেই কটার সময় পৌঁছেছিলাম ধ্যান করতে—পাঁচটা—সাড়ে পাঁচটা হবে সম্ভবত। গিয়ে দেখলাম, মহারাজ তাঁর ঘরে ধ্যানস্থ!

মহারাজকে চোখে দেখাই ছিল এক দুর্লভ সৌভাগ্য। এ যেন বিশ্বহিতে ধ্যানস্থ শিবের দর্শনলাভ। মহারাজের মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করা যেত। তাঁকে দেখামাত্রই যে-কেউ পবিত্র হয়ে যেত। অখিলানন্দ তাঁর দীক্ষিত ছিল। এ রকম অনেক সময় হতো যে, আমি আর অখিলানন্দ হয়তো গেছি, মহারাজ বারান্দায় পায়চারি করছেন কিন্তু আমাদের দিকে তাকাচ্ছেনই না। তিনি তখন আর এক জগতে রয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ মহারাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠতেন ঃ "আরে, কখন এলি তোরা?" মহারাজ বলতেন যে, আমি নীরদের (অখিলানন্দের) ছায়া।...

অখিলানন্দকে খুব স্নেহ করতেন মহারাজ। একটা ঘটনা বললে সেটা বোঝা যাবে। আমি আর অখিলানন্দ দুজনেই ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলাম। তাই আমরা মুরগীর ডিম এবং আরও কয়েকটা জিনিস আগে কখনও খাইনি। কিন্তু হস্টেলে দেখলাম, অখিলানন্দ রোজ একটা করে মুরগীর ডিম খায়। আমি বললাম ঃ "তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণ। হিন্দু-রীতি অনুযায়ী তোমার কিন্তু মুরগীর ডিম খাওয়া চলে না। তুমি একেবারে সাহেব বনে গেছ।" অখিলানন্দ বলল যে, মহারাজ তাকে আদেশ করেছেন মুরগীর ডিম খেতে। মহারাজ বলেছেন ঃ "তোমার

স্বাস্থ্য ভাল নয়; প্রোটিন দরকার। তুমি মাছ খেতে পারতে, কিন্তু মাছ তো আর কেউ সকালবেলার খাবারের সঙ্গে খায় না। তুমি বরং একটা করে মুরগীর ডিম খেও।" আমি তখন বললাম ঃ "ও, মহারাজ বলেছেন বলে খাচ্ছ!" আর কিছু বলতে পারলাম না।

এক সময় বলরাম বসুর বাড়িতে রামনাম হতো। স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ আর আমি তাতে যোগ দিতাম। আমরা তখনও ছাত্র। আর সেখানকার প্রসাদটাও খুব ভাল ছিল! আমি প্রসাদ পছন্দ করতাম। খুব শক্তসমর্থ ছিলাম তো; খেতেও পারতাম বেশ। ... যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন মহারাজ (রামনামে) এলেন। তিনি যে সব সময়ই এ রকম আসতেন, তা নয়। কয়েকজন সন্ন্যাসী সেদিন একসঙ্গে গান করছিলেন; আমরাও সঙ্গে যোগ দিয়েছি। মহারাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে খুব উৎসাহভরে বললেন ঃ "চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও।" কিন্তু একটু পরেই স্বামী নির্বাণানন্দ লক্ষ্য করলেন যে, মহারাজ তাঁর নিজস্ব জগতে চলে গেছেন। তাঁর আর বাইরের কোন হুঁশ নেই। নির্বাণানন্দ মহারাজকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। মহারাজ সেখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভাবস্থ হয়ে রইলেন। আমি অবশ্য এটা দেখতে পাইনি, আমাকে হস্টেলে ফিরে আসতে হয়েছিল। পরে অন্য সন্ন্যাসীদের মুখে শুনেছিলাম যে মহারাজ সেদিন বলেছিলেন ঃ "রামনাম আমাদের মনটাকে একটা উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছে।"

মহারাজের সাহচর্য পেয়ে স্বভাবতই আমি তাঁকে খুব ভালবেসে ফেললাম। শেষ পর্যন্ত একদিন গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ "আমার কিছু নির্দেশের প্রয়োজন।" মহারাজ বললেন ঃ "ঠিক আছে, এসো একদিন।" সেই অনুযায়ী একদিন গেলাম, কিন্তু সেদিন তিনি বললেন ঃ "আমার শরীরটা আজ ভাল বোধ হচ্ছে না; আর একদিন এস।" এই রকম কয়েকবার হলো। শেষ পর্যন্ত মহারাজ নিজেই একটা দিন ঠিক করে দিয়ে আমাকে বললেন খুব সকাল করে যেতে। নির্দিষ্ট দিনে ভোর পাঁচটার সময় তাঁর কাছে যেতে হলো। মহারাজ সেদিন আমাকে বললেন ঃ "সত্য এবং ব্রহ্মচর্য—এই দুটো জিনিস অভ্যাস কর। এর ফলে তোমার অন্তর্জীবন দৃঢ় হবে। তোমার জীবন ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত হবে।"

১৯২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে আমি স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে ছিলাম। আমি ছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত সেবক ও সচিব। স্বামী সারদানন্দই আমাকে একদিন বললেন ঃ

"তুমি মহারাজের কাছে গিয়ে বল না তোমায় ব্রহ্মচর্য দিতে।" আমি বললাম ঃ "মহারাজ, কি করে তা বলব? আমি সঙ্ঘে যোগ দিয়েছি সবে ১৯২১-এ। সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ, যিনি সেই সময় সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং পরবর্তী কালে সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন) চান ব্রহ্মচারীরা আগে তিনবছর অপেক্ষা করুক, তারপর গিয়ে মহারাজের কাছে (ব্রহ্মচর্যের জন্য) বলুক।" স্বামী সারদানন্দজী বললেন ঃ "না, না, না। শুদ্ধানন্দ ওরকম নিয়ম করতে চাইতে পারে; কিন্তু আমাদের কাছে মহারাজই সব। মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমাকে ব্রহ্মচর্য দিতে পারেন। সেইজন্যই আমরা কোন রকম নিয়ম করিনি। একটা জিনিসই কেবল প্রয়োজন...মহারাজের অনুগ্রহ। তোমায় মহারাজের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে।"

আমি অন্য জায়গায়[১] বলেছি যে, আমি যখন মহারাজের কাছে গিয়ে ব্রহ্মচর্য প্রার্থনা করলাম মহারাজ মজা করে বলেছিলেন ঃ "আমাকে একশ আট টাকা দাও।" কিন্তু আমাকে কিছুই দিতে হয়নি। স্বামী সারদানন্দ এসে পড়েছিলেন— তিনি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন।

যাদের ব্রহ্মচর্য হবে মহারাজ একদিন তাদের বেলুড় মঠে ডেকে পাঠালেন। আমাদের আচার্য ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে মহারাজ আমাদের বললেন ঃ "এই মন্ত্রগুলো তোমরা শুধু মুখে উচ্চারণ কর, অথচ কাজে কিছু কর না। তোমরা যে বারোটা ব্রত নিচ্ছ, সবগুলোর অর্থ তোমাদের জানা দরকার।" এই বলে যাদের, যাদের ব্রহ্মচর্য হবে তাদেরকে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে গিয়ে মন্ত্রের অর্থ জেনে নিতে বললেন।

অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে মহারাজ ব্রহ্মচর্য-দীক্ষার্থীদের সবাইকে একসাথে ডাকলেন। আমাদের মধ্যে একজন এসেছিল শিলেট থেকে, সে গান গাইতে পারত। মহারাজ তাকে একটা গান গাইতে বললেন। সে "অরূপ সায়রে লীলালহরী" এই গানটা গাইল। গানটিতে বলা হয়েছে যে, সেই পরমতত্ত্বের জগৎ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। মহারাজের খুব ভাল লাগল গানটা। সেখানে গোবিন্দ নামে একজন ছিল—এর পরে তার পালা এল। মহারাজ তাকে বললেন ঃ 'আমি তোকে ব্রহ্মচর্য দেব যদি তুই নাচ করিস আর তার সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গায়করা যেভাবে গান গায় সেভাবে একটা উড়িয়াগান করিস।' এখন, উচ্চাঙ্গ রীতি অনুযায়ী গান আর নাচ কখনও

১ দ্রষ্টব্য ঃ Glimpses of a Great Soul—Swami Asheshananda, pp. 72-73

একসঙ্গে হয় না। বঙ্গদেশে যদিও এটা দেখা যায়, তথাপি একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীর নাচ করা উচিত নয় এবং একজন উচ্চাঙ্গ নৃত্যশিল্পীরও গান করা উচিত নয়। যাই হোক, আমার যতদূর মনে আছে, গোবিন্দ নাচ-গান দুটোই একসাথে করেছিল। ব্যাপারটা একটু উদ্ভট—তাহলেও সে ভালই করেছিল। মহারাজ খুব মজা পাচ্ছিলেন আর হাসছিলেন। অন্য সময়ে মহারাজ সাধারণত গম্ভীর থাকতেন, উচ্চতর বিষয়ে ডুবে থাকতেন।

স্বামী নির্বেদানন্দকে[১] স্বামী সারদানন্দ একবার বলেছিলেন ঃ "আমি যদি কোন কিছু বলি, তোমরা সেটা করতে চেষ্টা কর এবং প্রয়োজন হলে পালটাতেও পার। কিন্তু মহারাজ যদি কোন কিছু বলেন, একদম তা পালটাবে না। মহারাজ অভ্রান্ত। আমি বুদ্ধি-বিবেচনার স্তর থেকে কথা বলি—মহারাজ বলেন তার চেয়েও উঁচু স্তর থেকে। তিনি সমাধিমান পুরুষ, ঈশ্বর-উপলব্ধি করা মানুষ। সব সময় ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার স্তরে বিরাজ করেন। তাঁর প্রতিটি কথা সমাধিভূমি থেকে আসে।" শ্রীরামকৃষ্ণের সব শিষ্যেরই মহারাজের সম্বন্ধে এমন একটা শ্রদ্ধা ছিল যে, মহারাজ যা-কিছু বলতেন তাকেই তাঁরা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেই মনে করতেন।

আমার প্রতি মহারাজের কত দয়া! আমার মনে আছে একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে তিনি আমাকে তাঁর পদসেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। হঠাৎই বললেন ঃ "ম্যাসাজ কি-করে করে জানিস?" আমি ম্যাসাজ করতে শুরু করে দিলাম। একটু পরে তিনি বললেন ঃ "আর একটু জোরে; আর একটু জোরে।" আমি তা করতে পারতাম, কারণ সে সময় আমি খুবই শক্ত-সমর্থ ছিলাম। কিন্তু আমার ভয় হলো আমি যদি আরও জোরে টিপি তাঁর হয়তো গায়ে লাগতে পারে। কারণ তাঁর শরীর ছিল খুবই নরম। আমি পাছে তাঁর শরীরের কোন হাড় মচকে ফেলি, তাঁকে ব্যথা দিয়ে ফেলি, এই ভেবে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে নিজেকে তাঁর খুব কাছের বলে মনে হচ্ছিল। আমি এই কাজে দক্ষ না—তবু যে তিনি আমায় তাঁকে স্পর্শ করতে, তাঁর পদসেবা করতে দিলেন, সে তাঁর কৃপা। সেই স্পর্শের মধ্যে দিয়ে আমি এমন কিছু পেয়েছিলাম যা বর্ণনা করতে পারি না। সেই স্পর্শে আমার মন পবিত্র ও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। তার ফলেই সম্ভব হয়েছে অবিচল ভালবাসায় সম্পূর্ণ নিবেদিত-প্রাণ হয়ে এই ত্যাগের জীবনযাপন করে চলা।

---

১ স্বামী নির্বেদানন্দ একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা এখন 'রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোম, বেলঘরিয়া' নামে পরিচিত।

আমাদের ব্রহ্মচর্য দেওয়ার পর মহারাজ কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে চলে এলেন। তারপর এপ্রিল মাসে তাঁর কলেরা হলো; তার পরেই হলো ডায়াবেটিস। স্বামী সারদানন্দ প্রতিদিন তাঁকে দেখতে যেতেন; কখন-কখন দিনে কয়েকবারও যেতেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা থেকে হোমিওপ্যাথিক, তারপর হোমিওপ্যাথিক থেকে আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করা হলো। মহারাজ মজা করে বলেছিলেন ঃ 'হাকিমিটা আর বাকি থাকে কেন?' 'হাকিমি' হলো আরব দেশের একরকম চিকিৎসাপদ্ধতি। শেষকালে তাঁকে তাঁর ঘর থেকে বড় হলঘরে নিয়ে যেতে হলো। কয়েকজন সন্ন্যাসীর দরকার হলো তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে। মহারাজ তখন মন্তব্য করেছিলেন ঃ "মরা হাতি লাখ টাকা।" এটা তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন। বোঝাতে চাইছিলেন যে, তাঁর আয়তন ও ওজন একটুও কমেনি; কাজেই তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা কথা না। আমি কিন্তু এর এই অর্থ করেছি যে, একজন উপলব্ধিমান পুরুষের প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরও শত শত বৎসর ধরে থাকে।

অসুস্থতার সময় তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে চলল, কিন্তু মন ছিল অত্যন্ত সবল। সব সময় মহারাজ ভাবস্থ হয়ে থাকতেন, আর মাঝে মাঝে উচ্চারণ করতেন—কমলে কৃষ্ণ, কমলে কৃষ্ণ। এই কথাগুলোর পেছনে একটা ইতিহাস আছে ঃ স্বামী সারদানন্দ একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছিলেন যে, রাখাল কৃষ্ণসখা। পরে, তাঁর বই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'তে মহারাজের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি এর উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী সারদানন্দকে বললেন ঃ "ঠাকুর যদিও বলেছেন মহারাজ 'কৃষ্ণসখা', তবুও তোমার এটা উল্লেখ করা উচিত নয়। মহারাজ এটা পড়লে তাঁর শরীর ছেড়ে দিতে পারেন।" এই শুনে স্বামী সারদানন্দ তাঁর বইতে এটা আর ছাপালেন না। যোগীন-মা স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন ঃ "মহারাজ যদি একবার নিজের স্বরূপ চিনতে পারেন, তোমরা তাঁকে আর রাখতে পারবে না।"

এই কারণে মহারাজ কখনও গয়া যাননি। শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও গয়া বা পুরী যাননি। তিনি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ দুজনেই অবশ্য কাশীতে গেছিলেন। যদি তাঁরা সেখানে যেতেন তবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের পুরনো পরিচয়ের স্মৃতি মনে পড়ে যেত এবং তাঁরা তাঁদের স্থূল শরীর ছেড়ে দিতেন। আমাদের কল্যাণের জন্যই তো তাঁদের জীবন ধারণ!

মহারাজের এই অসুখের সময় আমি তাঁর খুব কাছে যেতে পারতাম না,

তাঁর সেবকরা যেতে দিতেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজ বলে উঠলেন ঃ "আমি শরৎকে দেখতে চাই।" একজনকে দিয়ে বলে পাঠানো হলো, স্বামী সারদানন্দ এলেন। মহারাজ তাঁকে বললেন ঃ "তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছ আমাকে এখানে রাখবার, কেননা তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ চাইছেন আমি তাঁর নিজস্বলোকে ফিরে যাই। তাঁর আদেশ আমাকে অবশ্যই মানতে হবে।" এর আগে মহারাজের একবার টাইফয়েড হয়েছিল। তখনও তিনি ঠিক এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সেবার স্বামী সারদানন্দ মায়ের মতো যত্নে তাঁর সেবা করেছিলেন, টাইফয়েড সেরে গিয়েছিল। সেইবারেই প্রথম মহারাজ শরৎ মহারাজকে বলেছিলেন ঃ "তুমি আমাকে রাখতে চেষ্টা করছ; কিন্তু যদি ঠাকুর চান, আমি যেতে প্রস্তুত।" ঐ একই কথা আর একবার বলে মহারাজ এবার বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি শরৎ মহারাজের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি এবারও ঠিক একই জিনিস করছেন, তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। আসলে মহারাজ ইঙ্গিত করছিলেন ঃ এইবারে ডাক এসে গেছে—কেউই এখন তাঁকে ধরে রাখতে পারবে না। স্বামী সারদানন্দের উপর স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু দৈবী আহ্বান এসে গেছে; সেই আহ্বান তাঁকে শুনতেই হবে।

এই মারাত্মক অসুখের শেষের দিকে স্বামী সারদানন্দ একদিন মহারাজকে বললেন ঃ "সব ঠিক আছে; তুমি একজন ব্রহ্মজ্ঞানী।" এর পরে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে ডাকা হলো। অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ, পরে যিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়েছিলেন) মহারাজের একেবারে কাছে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলেন। দুজনের মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ শঙ্করানন্দের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করানন্দের সমস্ত মনঃকষ্ট দূর হয়ে গেল—সূর্য উঠলে যেমন কুয়াশা দূর হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, কখন-কখন গুরু কিন্তু খুব শক্ত এবং কঠোর হন। কারণ তাঁর প্রকৃতিই হলো ঃ "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"—বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। এ থেকে বোঝা যায়, গুরুর মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটো সত্তা থাকে—রুদ্ররূপ আর শিবরূপ, ভয়ঙ্কর রূপ এবং মধুর রূপ। শিবরূপের প্রকাশে গুরু শান্ত, করুণামূর্তি। রুদ্ররূপের প্রকাশে গুরু প্রদর্শন করেন রূঢ়তা, নিরুত্তাপ কঠোর উদাসীনতা। খ্রীস্টীয় তাত্ত্বিকরা বলেন যে, মোজেস দিয়েছেন অনুশাসন আর

যিশুখ্রীস্ট দিয়েছেন প্রেম। কিন্তু সেই প্রেমিক খ্রীস্টও বলেছিলেন যে, "I have not come to bring peace, but a sword."[৩] (আমি শান্তি আনয়ন করতে আসিনি; এসেছি তরবারি আনতে।) শ্রীরামকৃষ্ণ দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ নরেনের সঙ্গে কথা বলেননি। নরেন্দ্রকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র তবুও আসত। শেষকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "আমি তোর সঙ্গে কথা বলিনা, তবুও তুই আসিস! কেন?" নরেন উত্তর দিয়েছিল ঃ "আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আসি। আপনি আমার সঙ্গে কথা বললেন কি বললেন না তাতে কিছু যায় আসে না।" ভালবাসার প্রকাশ ঘটে করুণার রূপে, মাধুর্যের রূপে, আনন্দের মধ্যে এবং সর্বশেষে আনুগত্যের মধ্য দিয়ে, আর সেটাই হয় স্থায়ী। যদি কেউ প্রকৃতই কাউকে ভালবাসে তবে সে স্বাধীন থাকবে—আর তার ভালবাসার পাত্রও থাকবে স্বাধীন।

আমি যখন মাদ্রাজে ছিলাম আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। আমার মনে আছে মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দজী—আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে আমাকে তিনি 'পাহারাওয়ালা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। 'পাহারাওয়ালা' অর্থাৎ শরৎ মহারাজের দেহরক্ষী আর মায়ের বাড়ির নজরদার। তিনি বলতেন ঃ "তুই আমার নাতি।" চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন ঃ "তুমি ভাল হয়ে যাবে; আমি নিশ্চয় করে বলছি তুমি ভাল হয়ে যাবে।" ঐ চিঠি পেয়ে আমি প্রচণ্ড জোর পেয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, দিব্যলোক-প্রাপ্ত এইসব মহাত্মারা যদি কিছু বলেন, তবে তা ঘটতে বাধ্য। আর বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

মহারাজ তাঁর শেষ দিনগুলিতে বহু ভক্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন। স্বামী নির্বাণানন্দকে তিনি বলেছিলেন ঃ 'সোনা-রূপা কিছুই আমার নেই; আমি যে সন্ন্যাসী! জাগতিক বিষয়-আশয় আমার কিছুই নেই। কিন্তু তোর সেবায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোর ব্রহ্মজ্ঞান হোক, তোর নির্বাণলাভ হোক।'

এর কিছু আগে মহারাজ আমাদের আরও বলেছিলেন ঃ "বাবারা! ঠাকুর সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য। তাঁকে ধরে থাকিস, তোদের জীবন আনন্দে ভরে যাবে।"

আমি মহারাজের মহাসমাধির মুহূর্তে উপস্থিত ছিলাম না। মহারাজের শরীর বলরাম বসুর বাড়ি থেকে নৌকা করে বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বামী

৩ The New Testament, St. Mathew 10/34 (Revised Standard Version, Thomas Nelson and Sons, 1957)

সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন মঠে যাবার জন্য। রাস্তায় স্বামী শিবানন্দ আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন ঃ "ঐ যে কিরণ।" তিনি আমাকে তাঁদের সঙ্গে আসতে বলেন। একটু ইতস্তত করছিলাম। যাই হোক, তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে বরানগর এলাম, সেখান থেকে নৌকায় বেলুড় মঠ।

মহারাজ চলে গেলেন, আর কখনও তাঁকে দেখতে পাব না, আর কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারব না! দাহর কাজ যখন চলছে, তখন এইসব ভাবতে ভাবতে আমার মন দুঃখে ভরে উঠল। তিনি আমার ব্রহ্মচর্য-গুরু। আমি ভাবতে লাগলাম, "কি হবে আমার? কি হবে আমাদের সঙ্ঘের?"

কিন্তু যিশুখ্রীস্ট যেমন তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকব, ঠিক তেমনি এইসব মহাত্মারা বাইরের জগৎ থেকে বিদায় নিলেও ধ্যানের গভীরে প্রকট হয়ে ওঠেন। ধ্যান করলে তাঁদের উপস্থিতি অন্তরে উপলব্ধি করা যায় ভগবানের প্রতি ভালবাসা গড়ে তোলবার জন্য জপ-ধ্যানের অভ্যাস করা দরকার। তার ফলে ঈশ্বরকে দর্শন করবার তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠবে। মহারাজ বলতেন ঃ "নাম কর আর হৃদপদ্মে ইষ্টের ধ্যান কর।" তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন ঃ "জপ-ধ্যান করবি; জপ-ধ্যান করবি।" জপ মানে ভগবানের নাম উচ্চারণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানসচক্ষে ইষ্টমূর্তিকে দেখা। কেন? ব্যাকুলতা গড়ে তোলার জন্য। ব্যাকুলতা মানে ভগবানের দর্শন লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই কারণেই মহারাজ আমাদের সঙ্ঘে রামনাম প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি আমাদের কাছে মহাবীর বা হনুমানকে নিয়ে এলেন কেন? কারণ, মহাবীর হচ্ছেন ব্রহ্মচর্য বা সংযমের প্রতিমূর্তি। ব্রহ্মচর্য অভ্যাসের ফলে শুদ্ধ চিত্তে ধ্যান করা সম্ভব হয়। ভগবানের জন্য ছটফট করা, তাঁর দর্শন লাভের জন্য জ্বলন্ত ইচ্ছা জাগা—তার জন্য প্রয়োজন নির্মল চিত্তে ধ্যান। পবিত্র অন্তঃকরণ অরুণোদয়ের মতো ঘোষণা করে দেয় যে, প্রকৃত জ্ঞানের সূর্য উদিত হতে চলেছে।

মহারাজ ছিলেন মূর্তিমান "নিত্যোৎসব"। যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই তিনি একটা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। ধ্যান-জপও সকলের ভাল হতো। ভাল খাবারও আসত। বেলুড় মঠে যে রকম খাবার ছিল, তাতে কোন রকমে শরীরটা বাঁচিয়ে রাখা চলত। উদ্বোধন বা অন্যান্য ধর্ম-কেন্দ্রগুলিতে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বেলুড় মঠে ছিল না। কিন্তু মহারাজ মঠে এলে ভাল ভাল খাবার জিনিসও আসত।

মহারাজ আমাদের সবাইকে বলতেন ঃ "বাবারা, তোমরা এখানে বক্তা বা লেখক হতে আসনি, তোমরা এসেছ ঈশ্বর উপলব্ধি করতে। সেই অনুযায়ী সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর।"

যদিও মহারাজকে কারও সঙ্গেই তুলনা করা যায় না তবুও আমার তাঁকে যিশুখ্রীস্টের সবচেয়ে কনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য জনের সঙ্গে তুলনা করতে ভাল লাগে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। তিনি যেন সেই পিটার যাঁকে লক্ষ্য করে যিশুখ্রীস্ট বলেছিলেন ঃ 'On this rock I will build my church' (এই পাথরের উপরে আমি আমার ধর্মসঙ্ঘ গড়ে তুলব)।

একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে এনেছিলেন গোটা জগতের জন্য, অদ্বৈত প্রচারের জন্য—কারণ অদ্বৈততত্ত্বের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ এনেছিলেন তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর প্রধান শিক্ষা ঈশ্বর-ভক্তি প্রচারের জন্য।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মহারাজের কাছে কি শিখেছি? এর উত্তর দিতে হলে আমি বলব ঃ "গুরুভক্তি, গুরুভক্তি।"

স্বামী প্রভবানন্দ এবং স্বামী বিবিদিষানন্দদের[৪] মহারাজের প্রতি কিরকম ভক্তি ছিল আমি দেখেছি। একবার স্বামী বিবিদিষানন্দ অসুস্থ অবস্থায় ট্রেনে করে পোর্টল্যাণ্ডে আসছিলেন। মহারাজ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন, "ভয় পাস না, ভয় পাস না। সবচেয়ে বড় বৈদ্য ঠাকুর। আমাদের বৈদ্য ঠাকুর।" আমি তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন যে একটা অপারেশন করতে হবে। একটা জায়গা বেড়ে গেছে, সেটা কেটে বাদ দিতে হবে। স্বামী বিবিদিষানন্দ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি খুবই ভয় পেয়ে গেছিলেন। তখন মহারাজ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন ঃ "ভয় পাস না। ঠাকুর আমাদের বড় বৈদ্য। ঠাকুরই তোকে রক্ষা করবেন। তুই ঠাকুরের কাজ করতে এসেছিস; তিনি তোর হাত ধরে থাকবেন এবং তোকে চালাবেন। তিনিই তোর শক্তির উৎস, আনন্দের গোমুখী, চিরকালের সঙ্গী।" স্বামী বিবিদিষানন্দ বলেছিলেন যে, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর ভয় সম্পূর্ণ চলে গেল। অফুরন্ত শক্তি ও আনন্দে তিনি ভরপুর হয়ে উঠলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে আলো এনে দিয়েছেন বলে মনে মনে তিনি মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

---

৪ স্বামী প্রভবানন্দ এবং স্বামী বিবিদিষানন্দ দেহত্যাগ পর্যন্ত যথাক্রমে হলিউড এবং সীয়াটলের বেদান্ত সোসাইটির প্রধান ছিলেন। দুজনেই মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন মহারাজের কাছে।

আমার নিজের ক্ষেত্রে যখনই আমি 'গুরুভক্তি'র প্রসঙ্গ ভাবি, শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে এসে যায়। কিন্তু মহারাজই যেন আমায় শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী সারদানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মায়ের দেবীত্ব সম্পর্কে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দ। আমি প্রথমে মাকে বুঝতে পারিনি। আমি তাঁর মানবী দিকটাই শুধু দেখেছিলাম—একজন অশিক্ষিতা মহিলা, এইটুকুই। আমি তখন এম. এ. বা ডক্টরেট ডিগ্রীকে খুব গুরুত্ব দিতাম; কিন্তু শ্রীশ্রীমার তো কোন স্কুলের বিদ্যা ছিল না। অবশ্য স্বামীজীর খুব অনুরাগী ছিলাম আমি। তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা, শক্তি-গর্ভ চিঠি আর চমৎকার কথোপকথন—এগুলির খুব অনুরাগী ছিলাম। আমি সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলাম স্বামীজীর জন্মতিথিতেই। গত বৎসর স্বামীজীর জন্মতিথির দিন—১৯৮৫-র জানুয়ারিতে—আমাদের হলে যাবার পথে তাঁর ছবিটা দেখে তাঁকে বলেছিলাম ঃ "স্বামীজী, আমি আপনাকে দেখিনি কিন্তু আপনার জ্বলন্ত দেশপ্রেমের জন্য আমি সবসময়ই আপনাকে যৌবনের বীর হিসেবে পূজা নিবেদন করে এসেছি। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আপনার বেলুড় মঠে এসেছিলাম একজন অতিথি এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য। কিন্তু আপনার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, আপনি আমাকে আপনার সঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসী হিসেবে স্থায়িভাবে সেখানে রেখে দিলেন। আমাকে এখন আপনি আশীর্বাদ করুন, যাতে আপনি যেভাবে খুশি হবেন, ঠিক সেই ভাবে আমি এই পাশ্চাত্যের মানুষের সেবা করে যেতে পারি। কারণ, আমার আমেরিকাবাসের জীবনে আপনার আশীর্বাদ আমার প্রধান অবলম্বন।"

শ্রীশ্রীমা এবং মহারাজ সম্বন্ধে আর একটা ঘটনা আছে, যেটা আমি অন্য কোথাও বলিনি। একবার শ্রীশ্রীমা, মুড়ি আর বেগুনভাজা খেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ তাঁকে তা খেতে দিতে চাননি কারণ মায়ের তখন কালাজ্বর হয়েছে, ঐসব খেলে তাঁর শরীরের খুব ক্ষতি হবে। সরলাদেবী, পরে যিনি প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা হয়েছিলেন, মায়ের সেবা করতেন। তিনি স্বামী সারদানন্দকে এসে খবর দিলেন যে, মা বাচ্চা মেয়ের মতো ঐ জিনিসগুলো—মুড়ি আর বেগুনভাজা—লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। স্বামী সারদানন্দের তো দায়িত্ব আছে, কাজেই মাকে তাঁর বলতেই হবে ওগুলো না খেতে। তিনি মায়ের ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে মাকে বললেন ঃ "মা, আমি খুব খুশি হব, যদি আপনি পেছনে যা লুকিয়ে রেখেছেন সেটা আমাকে দিয়ে দেন।" মা তখন তা-ই করলেন। স্বামী সারদানন্দ তখন ভেবেছিলেন যে, মা সুস্থ হয়ে উঠলে মাকে মুড়ি-বেগুনভাজা খাওয়াবেন। কিন্তু হায়! তা আর কখনই হলো না।

মায়ের মহাসমাধির পর স্বামী সারদানন্দের মনে হলো মাকে যা খেতে দেওয়া হয়নি, মহারাজ যদি উদ্বোধনে এসে তা গ্রহণ করেন তবে তিনি মহারাজের মধ্যে মায়ের উপস্থিতি অনুভব করে খুশি হবেন। তিনি একদিন মহারাজকে উদ্বোধনে আসতে নিমন্ত্রণ করলেন। মহারাজ এলেন। স্বামী সারদানন্দ উপরে গিয়ে মায়ের ঘরে মায়ের ছবির সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর যে সন্ন্যাসী পুজো করছিলেন তাঁকে বললেন মাকে ঐ মুড়ি-বেগুনভাজা নিবেদন করতে—যা মাকে স্থূলশরীরে খেতে দেওয়া হয়নি। এরপর তিনি সেই জিনিসগুলিই প্রসাদ হিসেবে মহারাজকে দিলেন। মহারাজ খুব সম্ভবত নিচের তলায় চেয়ারে বসেছিলেন। মহারাজ সেগুলি একটু একটু করে খাচ্ছেন আর মজা করে বলছেন ঃ "ও, খুব সুস্বাদু, খুব সুস্বাদু ...অমৃত, অমৃত।" এরপরে প্রত্যেকেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। যখন মহারাজ খাচ্ছিলেন, স্বামী সারদানন্দ অনুভব করলেন যে, শ্রীশ্রীমা-ই মহারাজের মধ্য দিয়ে খাচ্ছেন। স্বামী সারদানন্দের মনে মহারাজের জন্য কতটা শ্রদ্ধা-ভক্তি জমাট ছিল, তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমি এখানে আর একটা ঘটনা বলতে ভুলে গেছি। কাশীতে একবার শ্রীশ্রীমা স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দকে একটা করে সূতির কাপড় দিলেন; কিন্তু মহারাজকে দিলেন একটা সিল্কের কাপড়। রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) মাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজকে এ রকম বিশেষ জিনিস দেওয়া হলো কেন। মা উত্তর দিলেন ঃ "ছেলে যে, ছেলে যে।" রাখাল হচ্ছে ছেলে, কাজেই তাকে সব সময়ই বিশেষ কিছু দিতে হবে। শিষ্য আর ছেলে দুয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। শিষ্যকে ভালভাবে আদর-যত্ন করা যেতে পারে; কিন্তু সন্তানের প্রতি উৎসারিত হয় বাৎসল্য ও ভালবাসাপ্রসূত বিশেষ স্নেহ।

মায়ের সম্বন্ধে একটু বলি। পাশ্চাত্যে এসে আমি অনেক বদলে গেছি। আমি উপলব্ধি করছি যে, আমার গুরু শ্রীশ্রীমা সমস্ত বিপদ-আপদ দুঃখকষ্টের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর অপরিসীম কৃপায় আমাকে আমার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অনুগ্রহ করে চালিত করছেন। আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব যদি তিনি তাঁর দৈবী করকমল আমার মাথায় রেখে আমায় আশীর্বাদ করেন যাতে আমার অচলা বিশ্বাস হয়। আমি যেন কখনও তাঁকে না ভুলি। আমার প্রার্থনায় আমার ধ্যানে আমি যেন তাঁকে আমার গুরুরূপে, ইষ্টরূপে, আমার সর্বস্বরূপে সর্বদা স্মরণ করতে পারি। তাঁর কাছে সর্বান্তঃকরণে এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতবাদী হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরাগী। তিনি যে বলেছেন, নির্বিকল্প সমাধির পর থেকে ধর্মজীবনের সূচনা হয়, এটা বলেছেন তাঁর নিজস্ব অনুভূতি থেকে। সেইজন্যেই আমি বলি যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতী। কিন্তু সেই অবস্থায় পৌঁছনোর উপায় হিসেবে তিনি ইষ্টভক্তির উপরে জোর দিয়েছেন। ভক্তি পাকলে ধর্ম তার চরমে পৌঁছয় অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টরূপে চিন্তা করলে মানুষ তাঁর কৃপা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং শেষকালে উপলব্ধির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। সেই চরম শিখর হলো—জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একত্ব।

বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) যখন মহাসমাধিতে প্রবেশ করতে চলেছেন, তখন মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "ভাই, ঠাকুর কি সত্যি? ঠাকুর কি সত্যি? তুমি কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ?" বাবুরাম মহারাজ তখন কোন ওষুধ খেতে চাইছিলেন না। বলছিলেন, "আমি শুধু চরণামৃত খাব, ঠাকুরের চরণামৃত।" মহারাজ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। সেবক যখন মহারাজকে বললেন যে, বাবুরাম মহারাজ কোন ওষুধ খাবেন না তখন মহারাজ এসে তাঁকে বললেন ঃ "শরীর কিন্তু তোমার নয়—ঠাকুরের।" তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন ঃ "তুমি ঠাকুরের প্রতিনিধি; আমাকে বল কি করা উচিত।" মহারাজ তখন বললেন ঃ "আগে চরণামৃত খাও; তারপরে ওষুধ খেও।" বাবুরাম মহারাজ রাজি হলেন। মহারাজ তখন বাবুরাম মহারাজকে বললেন ঃ "আমাদের ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস হবে।" আমাদের শেখানোর জন্য তিনি বললেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য; তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের চালাচ্ছেন, প্রেরণা দিচ্ছেন; হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন। বাবুরাম মহারাজ একটু ধ্যান করলেন, তারপর চোখ খুললেন—মুখে হাসি। বললেন ঃ "আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি; খুব স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখছি। খুব স্পষ্টভাবে!" এর একটু পরেই বাবুরাম মহারাজ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। মহারাজ ছোট শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। এত বড় উপলব্ধিমান পুরুষ, এত বড় মহাশক্তির মানুষ, হিমালয়-প্রমাণ ব্যক্তিত্ব—তিনিও গুরুভাই-এর প্রতি ভালবাসায় কাঁদছেন! এই ভালবাসা শ্রীরামকৃষ্ণের সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের সব সন্তানরা সুসমঞ্জসভাবে গ্রথিত হয়ে গঠন করেছিলেন অভিন্ন এক আত্মা, অভিন্ন এক দেহ—যে দেহ অতীন্দ্রিয়, মানবজাতির কল্যাণার্থে যা বিশ্বজনীন ভালবাসার বাণী প্রচার করে চলেছে।

(উদ্বোধন ঃ ৮৯ বর্ষ ১ সংখ্যা)

মহারাজের স্মৃতি

স্বামী অশেষানন্দ

(অনুবাদিকা ঃ সান্ত্বনা দাশগুপ্ত)

(আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ নবতিপর সন্ন্যাসী স্বামী অশেষানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে তিনি ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিচারণে তিনি দেখিয়েছেন, মহারাজ কিভাবে রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, মহারাজ কি বিচিত্রভাবে দেবমানবের জ্ঞান আর শিশুসুলভ চপলতা প্রকট করতেন। মূল স্মৃতিকথাটি ইংরাজীতে লেখা।)

১৯২২ খ্রীস্টাব্দ আমার জীবনে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বছর শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজার দিন আমি মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভ করলাম। আমি তখন মহারাজের গুরুভাই স্বামী সারদানন্দের সেবক হয়ে উদ্বোধন কার্যালয়ে বা 'মায়ের বাড়ি'তে থাকতাম। সারদানন্দজী মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমি কয়েকটা দিন মঠে কাটাতে এসেছিলাম। যখন মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যের জন্য প্রার্থনা জানালাম, তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "সারদানন্দ তো খুব বড়লোক। তুমি তাঁর সেবক। তুমি আমাকে ১০৮ টাকা দক্ষিণা দেবে। তা না হলে আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিতে পারব না।"

মহারাজের ঐকথা শুনে আমি তো অবাক। উত্তরে আমি শুধু বললাম ঃ "মহারাজ, আমার তো কোন টাকাপয়সা নেই। আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আপনি যদি দয়া না করেন আমার আর কোন উপায় থাকবে না।" মহারাজ গম্ভীরভাবেই বললেন ঃ "আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি, তাতে তোমার সমস্যার সমাধান হতে পারে। তুমি স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিয়ে এসো।"

আমি সারদানন্দ মহারাজকে কথাটা জানাতে তিনি খুব আন্তরিকতা ও তৎপরতার সঙ্গে একটি পত্র লেখালেন এবং তাতে সই করে আমাকে সেটি মহারাজের নিকট নিয়ে যেতে বললেন। পত্রে লেখা ছিল ঃ "পূজ্যপাদ মহারাজ,

উদ্বোধনের সবকিছু আপনার, এমনকি আমিও আপনার দাস। আপনি কি চান বলুন, এখুনি দিয়ে দেওয়া হবে।"

আমি ব্রহ্মচর্য পেলাম, কোন টাকা দিতে হয়নি। সবটাই রসিকতা করেছিলেন মহারাজ। সমাধিমান পুরুষ লীলা করতে চান। তিনি ঈশ্বরলীলার অনুবর্তন করেন। তিনি লীলা উপভোগ করতে পারেন, কারণ তাঁর কোন বাসনা নেই। অথচ আমরা সবকিছু গুরুগম্ভীরভাবে নিই এবং কষ্ট পাই, কারণ আমরা মায়ায় আবদ্ধ।

এই ঘটনাটি আমার পক্ষে বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ, এই ঘটনাটিই আমাকে মহারাজের খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে দিল। ইতঃপূর্বে আমি তাঁর কাছে গিয়েছি এবং ভক্তিভরে প্রণাম করেছি, কিন্তু কিরকম যেন ভয় ও শঙ্কার ভাব ছিল। মহান লোকগুরু মহারাজ জানতেন, এই ভয় ও দূরত্ববোধ অধ্যাত্মবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ। ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসার মাধ্যমেই বাধা অপসারিত হয় এবং নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেদিন থেকে আমি মহারাজের নিকট খুব সহজ বোধ করতাম এবং ভোরবেলায় ধ্যানের সময় তাঁর ঘরে যেতাম। এ সময় মহারাজের মুখখানি অবলোকন করা একটি আনন্দের বিষয় ছিল। ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করত এবং মহারাজ আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁর উপস্থিতিতে মন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে আসত। ঠাকুরের একটি কথা আমার মনে পড়ত, মনে হতো কথাটি খুব সত্য—"তুমি যদি আগুনের কাছে গিয়ে বস, তাপ লাগবেই।" তেমনি আত্মদীপ্ত মানুষের সঙ্গ করলে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আনন্দলাভ হবেই।

ধ্যানের পর মহারাজ গঙ্গার ধারের বারান্দায় আসতেন এবং একটি আরাম কেদারায় বসতেন। কখনো কখনো গান হতো, কখনো নানা বিষয়ে কথাবার্তা হতো। একদিন মহারাজ বললেন ঃ "ভগবানের নিকট ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। তাঁকে সোজা বল যে, তুমি তাঁকেই চাও, আর কিছুই চাও না। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় রেখ না। দীনহীন ভাব যার আছে সে শীঘ্রই ভগবানের দর্শন লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। যদি তুমি ভক্তিভরে তাঁর কাছে যাও তিনি দেখা দেবেনই। তুমি ভুল করেছ বা তাঁকে এতদিন ডাকনি বলে লজ্জা পেও না। তোমার দোষত্রুটি নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। তাঁর নিকট শিশুর মতো সরলতা নিয়ে যাও, তিনি তোমাকে নেবেনই নেবেন। সরল ও নিষ্পাপ হও। শিশুর মতো সরলতা ও বিশ্বাস ছাড়া কেউ তাঁকে জানতে পারে না।"

আর একদিন মহারাজ কর্মের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি বললেন ঃ "সর্বদা মনে রেখ তুমি কর্মের দ্বারা ঈশ্বরেরই সেবা করছ। তাঁকে ভক্তির দ্বার দিয়ে দেখা যায়। যদি মানুষের প্রীতির জন্য কর্ম কর, নিরাশ হতে হবে; যদি ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর, তাহলেই একমাত্র শান্তি ও সুখলাভ করতে পারবে। যদি তিনি প্রীত হন, সমগ্র-জগৎ প্রীত হবে। সম্পদে বিপদে তিনি ছাড়া তোমার কেউ নেই—একথা মনে রেখ। তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম নিষ্ঠাভরে পালন করে তাঁরই সেবা করছ।"

মহারাজের মধ্যে একাধারে শিশুর মতো সরলতা ও ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞান ছিল। একদিন তিনি বলরামবাবুর নাতিদের ভয় দেখাবার জন্য বাঘের মুখোশ পরেছিলেন। ভয়ে প্রথমে চিৎকার করবার পর একটি শিশু বলে উঠল ঃ "ও, এতো মহারাজ! তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।" তারপর মহারাজ মুখোশ খুলে ফেলে বাচ্চাগুলিকে কোলে তুলে নিলেন। আমাকে দিয়ে মিছরি আনিয়েছিলেন, সেই মিছরি ওদের দিলেন।[১]

পরমুহূর্তেই মহারাজ এমন চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন যে, আমি তাঁকে যে-প্রশ্ন করতে এসেছিলাম তা আর করতে পারলাম না। তিনি এত গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন যে, আমি কথা বলতে সাহস পেলাম না। নীরবে বসে থেকে মনে মনে প্রণাম করে আমি সেদিন চলে এলাম।

আমরা মহারাজের মহত্বের শতাংশের একাংশও বুঝতে পারিনি। তাঁকে চিনেছিলেন তাঁর গুরুভাইরা। স্বামী সারদানন্দ বলতেন ঃ "মহারাজ ও ঠাকুরের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।" মহারাজ আমাদের সকলকে শাসন করতেন, কিন্তু তা করতেন রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে পদাধিকার বলে নয়, তাঁর ভালবাসার অমোঘ শক্তির দ্বারাই তিনি আমাদের শাসন করেছেন।

(উদ্বোধন ৯৪ বর্ষ ১ সংখ্যা)

---

১ বস্তুত, যখন মায়ার পারে সত্যকে আমরা দর্শন করি, তখনই আমাদের ভবভয় দূর হয়।

ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

ভাবরাজ্যের রাজা মহারাজ ছিলেন শ্রীশ্রীপ্রভুর বড় আদরের সন্তান। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে যে 'বর্ণচোরা' আম বলতেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য! তিনি বর্ণচোরাই বটে! চোরার সাথী তিনি—যিনি ব্রজবাসীর মনচোরা, ক্ষীরচোরা, ননীচোরা সেই জীবের প্রাণচোরার সাথী তিনি। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন এতে আর আশ্চর্য কি! প্রাণ চুরি করে, প্রাণের মধ্যে বাস করেও ধরা দেবেন না এতে আর আশ্চর্য কি! লুকোচুরি খেলতে তিনি যে বড় মজবুত! পাছে ধরা পড়ে তাই তাঁর ভাব কত চেপে চেপে রাখতেন—কত ঠাট্টা, কত আমোদ নিয়ে থাকতেন! বাহিরে থেকে কি কিছু বোঝা যেত তাঁকে? তবুও সেই স্বর্গীয় জ্যোতি, সেকি ঢাকা যায়?—মেঘের পাশ দিয়ে যেমন সূর্যের কিরণছটা বেরিয়ে পড়ে, চাঁদনী রাতে চাঁদের ছটা যেমন মেঘের পাশে শোভা বিস্তার করে, সেই রকম শ্রীশ্রীমহারাজের অন্তর্নিহিত বিমল কিরণ আপনি ফুটে বেরোত। যাঁরা তাঁর সঙ্গ ক্ষণেকের জন্যও করেছেন সেই সব ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই তাঁর অন্তর্নিহিত অমৃতের আস্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন—সে কথা আর বলে বোঝানর বিষয় নয়। সেসব ধ্যানের বিষয়—তিনি ধ্যানমঙ্গল পুরুষ ছিলেন। তাঁর লীলা ধ্যান করলে আমাদের মঙ্গল। এতবড় মঠ-মিশনের একচ্ছত্র সম্রাট কিন্তু তিনি কিনা সামান্য ফষ্টিনষ্টি, আমোদ প্রমোদ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন—এ রহস্য, এ তত্ত্ব কে বুঝবে? বোঝা তো যায় না! বোঝাবুঝির পারের মানুষের তত্ত্ব বুঝতে যাওয়াই বাতুলতা। কেবল ধ্যানের বিষয় তিনি। তাঁকে ধ্যান করলে আমাদের কল্যাণ, পরম কল্যাণ—ঐহিক কল্যাণ, পারত্রিক কল্যাণ।

স্বামীজী মহারাজ বুঝেছিলেন বলেই তো বলতেন, "ও আমাদের রাজা মহারাজ।" তাইতো যত আবদার তাঁর মহারাজের উপর ছিল—সবচেয়ে বেশি আবদার। পূজ্যপাদ স্বামীজী তাইতো বলতেন, "যদি সবাই আমায় ছাড়ে, রাজা আমায় স্থান দেবে।" যত জোর কি মহারাজের ওপর ছিল তাঁর! পত্রে

লিখতেন ঃ "অভিন্নহৃদয়েষু।" বুঝতেন পূজনীয় শশী মহারাজ, তাই মহারাজ মাদ্রাজে অবস্থান কালে যখন ২/১ দিনের জন্য একটু গম্ভীরভাবে শশীমহারাজের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তখন তিনি তল্পি গুটিয়ে শ্রীশ্রীমহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মহারাজ হেসে বললেন, "কি শশী ভায়া, কি খবর?" পূজনীয় শশী মহারাজ আর নিজেকে সামলাতে না পেরে বলে ফেললেন, "রাজা তুমি কি বোকা, তুমি কি জানো না তোমার প্রশ্বাসে শত শশী ভেসে যায়? তুমি কিনা আমার উপর রাগ কর?" সেসব কথা তো আমরা বুঝি না। বোঝবার সাহস রাখি এমন ধৃষ্টতাও হৃদয়ে স্থান দিই না। প্রভুর বড় আদরের ছেলে ছিলেন তিনি। তাঁর মর্যাদা আমরা কি বুঝি? প্রভু সতত তাঁর সঙ্গে—সঙ্গে শুধু নয়, প্রভু তাঁর মূর্তিতে এই সঙ্ঘে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর দর্শনে প্রভুর দর্শন। এ সকল আমার মনের কল্পনা নয়, প্রলাপ নয়। একদিন পূজনীয় হরি মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠলে ঢাকার বীরেন বসু যিনি কাছে ছিলেন তিনি স্পষ্টই বলে ফেললেন, "একি মহারাজ, আপনারা ওঁর গুরুভাই, তবে আপনারা ওঁর ভিতর কি দেখলেন যে অমন করে প্রণত হলেন?" উত্তরে পূজনীয় হরি মহারাজ বলেছিলেন, "কি দেখি জান, ঠাকুরকেই দেখি, তাইতো অমন করি।" আমাদের তো সে বোধ নাই। আমরা যে ঠাকুরকে দেখি না, তাই মহারাজ বলে জানি। স্বরূপ কি তিনি সকলের কাছে ব্যক্ত করেন? তিনি কি সকলকে আত্মস্বরূপ দেখান? অতি ভাগ্যবান যারা, তারা তাঁকে ঠাকুরের চলমূর্তি জ্ঞানে দেখতেন ও সেই ভাবেই ব্যবহার করতেন।

আর একদিনের কথা স্মরণ হয়। কাশীধামে ১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমহারাজ ও পূজনীয় শ্রীশরৎ মহারাজ উভয়েই মোগলসরাই পর্যন্ত ট্রেনে এসেছেন। উভয়েই এক মোটরে মোগলসরাই থেকে ৺কাশীধামে পৌঁছবেন। সেদিন এক অপূর্ব ব্যবহার পূজনীয় শরৎ মহারাজ করলেন দেখলুম। পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ অদ্বৈত আশ্রমের হলঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের দিকে মুখ করে, আর পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাঁর শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীচরণ স্পর্শ করে বলছেন, "মহারাজ প্রণাম হই, কাশীতে প্রণাম (হই)।" সে ব্যাপার কিছু বুঝলাম না, তবে যেন একটা মাধুর্যমাখা সুন্দর ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত হলো। সেসব দৃশ্য মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে জেগে উঠে হৃদয় নির্মল করে তোলে। আর একদিনের কথা স্মরণ হয়। ঐ কাশীক্ষেত্রেই সেবারে শ্রীশ্রীমহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে দোতলার ঘরে বাস করেন আর প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ধ্যান করেন। আর একসঙ্গে সমবেত

আমাদিগকে কত সদুপদেশ দেন, কত জোর দিয়ে বলেন, "বাবা কিছু কর দিকি, কিছু কর, অন্তত তিনটে বছরও কর দিকি। কিছু না করলে কি হয়! না হয় ছমাসও কর দিকি একসঙ্গে।" কত আকুলভাব কিসে আমাদের কল্যাণ হবে। অমন সুহৃদ তো আর পাব না। যিনি শ্রীভগবানের পরম সুহৃদ, যাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছিলেন ভাবে—গঙ্গার উপরে সুপ্রস্ফুটিত সহস্রদল কমলের উপর বিরাজমান বংশীধারীর লীলাসহচর রূপে, তিনি যে আমাদের সুহৃদ, শুধু আমাদের কেন, সারা বিশ্বের সেকথা কি আর বলতে হবে? না, বলেই বোঝান যাবে? বোঝান তো যাবে না!

সেবারকার আর একদিনের ঘটনা মনে ভাসছে। পূজনীয় হরি মহারাজ তখন সেবাশ্রমে থাকেন, শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। রাত্রে নিদ্রা হয় না তাই দিবাভাগে সেবাশ্রমের সেবকদের বাসভবন অতিক্রম করে যে বাটীখানি সৌদামিনী ওয়ার্ড বলে পরিচিত সেখানে সচরাচর থাকতেন, আর রাত্রে ১০ নং ওয়ার্ডে ঢুকেই দক্ষিণদিকের কোণের ঘরখানিতে নিদ্রা যেতেন। বৈকালে শ্রীশ্রীমহারাজ অদ্বৈতাশ্রম থেকে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। পায়চারি করতে করতে এগিয়ে আসছেন। সেবাশ্রমের এখন যেখানে অস্ত্রচিকিৎসাগার ঠিক ঐ স্থান একটু পার হয়ে এসেছেন, আর পূজনীয় হরি মহারাজ ১০ নং বাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি তাঁর পাশে। দেখলাম তিনি করজোড়ে পূজনীয় মহারাজকে সহাস্যে অভিবাদন করে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতে লাগলেন। মুখে এক কথা, "প্রণাম মহারাজ, প্রণাম, আসুন আসুন মহারাজ, আসুন।" সে অপূর্ব প্রেমের মিলন মনে হলে প্রাণ মেতে উঠে, মন ভরে যায়। তাইতো মহারাজের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের জনৈক বন্ধু যখন কোন সাধুর কথা তুলেছিলেন পূজনীয় হরি মহারাজের কাছে, তখন তাঁর কি সদর্প বাণীই না শুনেছিলাম—কত দর্পভরে তিনি বলে উঠেছিলেন, "তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই। ওঁরা কি সাধু? ওঁরা সাধুর উপরের জিনিস। ওঁদের সংকল্পে কত সাধু জন্মায়!" সেসব সোনার মানুষ আর চোখের সামনে দেখছি কোথায়! তাঁরা সব একে একে স্মরণের জিনিস হয়ে গেলেন।

কত কথাই না মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে, সেই সেবার কাশী থেকে যেবার শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে ফিরতে রাজি হননি—সেবারের কথা। কত পত্র, কত আবদার জানান হচ্ছে, কিন্তু তিনি অটল। সবাই হার মেনে গেল। সেবাকার্যের চাপে সাধু ব্রহ্মচারীদের কষ্ট হচ্ছে শুনে মহারাজ মঠে আর ফিরবেন না এই ইচ্ছা। তখন মঠের কর্তা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—মঠের রাজা মঠে না এলে কি

মঠ মানায়! পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আর থাকতে পারলেন না। একেবারে বিশ্বনাথধামে—বিশ্বনাথকে কৈলাশ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসতে গেলেন। নিয়ে আনবার আর উপায় কি, বিশ্বনাথকে হৃদয়ের আর্তি জ্ঞাপন করা ছাড়া? সাধ্যমতো সে আর্তি জানান হলো। শিব তো অটল—কিছুতেই নামবেন না। তখন শেষ মিনতি করা হলো। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ একেবারে স্বর্ণকাশীর স্বর্ণভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে বিশ্বনাথের যুগলচরণ ভুজযুগলে জড়িয়ে ধরলেন। আশুতোষ ভক্তের নিবেদন কি উপেক্ষা করতে পারেন? একেবারে তখনি রাজি। "চল ভাই, চল, আমি যাব যাব যাব।" তখনই সব স্থির হয়ে গেল। পূজনীয় মহারাজের পারিষদ-অগ্রণী পূজনীয় অমূল্য মহারাজকে হুকুম হলো, "চল অমূল্য চল, মঠে যেতে হবে।"

আপনারা মনে করবেন না আমি গোঁড়ামি করে, অতিরঞ্জিত করে, কল্পনার সাহায্যে শ্রীশ্রীমহারাজকে বিশ্বনাথের আসনে বসিয়ে ভক্ত সাজার অভিপ্রায়ে ভক্তির আতিশয্য করছি। শ্রীশ্রীমহারাজকে বিশ্বনাথ বলে যিনি জানতেন সেই পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের শ্রীমুখে একথা শ্রীশ্রীমহারাজের সামনেই বলতে শুনেছি। একদিন পায়ে বাতের বেদনায় বড় কাতর হয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজ যখন শ্রীমন্দিরে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে পারেননি তখন ধীরে ধীরে নিজ বাস হতে (কিরণবাবুর বাটীতে কাশীধামে থাকতেন) এসে অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীনিকেতনে প্রবেশ করে ঠিক ঐ কথা বলেছিলেন, "মহারাজ আজ বাত বেড়েছে বলে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে পারিনি। তাই তোমায় দেখতে এলুম।" এখনো যেন আমার সেই মধুর গম্ভীর বাণী মনে পড়ছে। আর শ্রীশ্রীমহারাজ নীরব ভাষায় ইঙ্গিতে বললেন, "বস ভাই, বস।"

সেবারকার আর একদিনের ঘটনা বলি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তি (পট) খানির বদলে নূতন মূর্তি বা নূতন পট স্থাপন হবে। যোগিরাজ তাঁর স্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলি নিয়ে ব্যস্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিষেক হচ্ছে। এমন সময় আমাদের মহারাজ সপারিষদ সেখানে উপস্থিত। আমার উপর 'রুদ্রাধ্যায়' পড়ার আদেশ হয়েছে। পারি আর না পারি, ভাল লাগে তাই তারস্বরে 'রুদ্রাধ্যায়' পড়ছি। এমন সময় মহারাজের আদেশে কীর্তন আরম্ভ হলো। সেখানে পূজনীয় নীরদ মহারাজ, বরদানন্দ, জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি সব বড় বড় গাইয়ে উপস্থিত। পূজনীয় হরি মহারাজও সেখানে ছিলেন। সবাই গান ধরেছে, কিন্তু শ্রীমহারাজের তাতে তেমন তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই সহসা দেখলুম সেই শ্রীমূর্তি তাঁর সেই প্রশান্ত

চিরগম্ভীর সুস্মিত-বদন, সেই বিশাল বক্ষ, বিশাল নেত্র, বিশাল উন্নত কলেবর নিয়ে আবেগভরে লম্ফপ্রদান করতঃ নৃত্য আরম্ভ করলেন। নটরাজ স্বধামে কি এমনি উদ্দাম নৃত্য করে থাকেন! তারপর যা হলো মুখে বলা যায় না। আনন্দের কূলকিনারা নেই। থৈথৈ করছে আনন্দ, সবাই সে আনন্দে গরগর। এত আনন্দ যে পূজনীয় হরি মহারাজ যাঁর চলবার সামর্থ্য নেই, তিনিও হাত নেড়ে শরীর কাঁপিয়ে নৃত্যানুকরণ করতে লাগলেন।

এই ঘটনার পর সেই দিন বৈকালে শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখতে গেলুম, তিনি উপরের বারান্দায় নিজ কক্ষের সম্মুখে আসীন আছেন। আমি তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হয়ে সেই নিভৃতে যেমন বললুম, "মহারাজ কি যে আনন্দ হয়েছিল, আজ, কি আর বলব! শুধু আজ নয়, আপনি যেদিন থেকে এসেছেন সেই দিন থেকে আনন্দের হাটবাজার বসে গেছে। আনন্দ তো আর ধরে না।" সেই আনন্দময় মূর্তি স্বাভাবিক স্মিতবদনে আমার কথা সমর্থন করে বললেন, "বাবা, চৈতন্যের উন্মেষ হলে অমনি আনন্দ হয়ে থাকে।" কি যে চৈতন্য তা কি বুঝি তবে আনন্দটুকু যে পাই তা তো অস্বীকার করবার যো নেই। তাঁর সামীপ্যে যে আনন্দ হতো একথা তাঁর ভক্তমাত্রেই জানেন। তিনি নীরব মানুষ—তাঁর সব নীরব। কাছে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত—কিন্তু উঠে আসতে পারা যেত না। আমাদের অনেকেই কি সে কথার সাক্ষ্য দেবেন না? কিছু হচ্ছে না কোন উপদেশ মুখে নাই, বরং গল্পগুজব হাসিঠাট্টা চলেছে তবু তো ছেড়ে আসতে প্রাণ চাইত না। ব্যাপারটা কি! পুঁথি-পত্তর তো বড় ঘাঁটতেন না। যদিই বা কখন একটু আধটু তন্ত্র-মন্ত্র বা পুরাণাদি দেখতেন—তা সে দেখার মধ্যেই বা কি একটা অপূর্ব শ্রদ্ধার ভাব। হাতে গঙ্গাজল নিয়ে গুরুইষ্ট স্মরণ করে অতি সন্তর্পণে শাস্ত্রখানি খুলতেন কত যত্ন করে। দেখলে মনে হতো শাস্ত্র বা বুঝি চেতন জিনিস। তারও বুঝি শরীর অতি কোমল, অতি কোমল! তবে সব জিনিস চেতন, এটা যে তিনি দেখতেন তা তাঁর শ্রীমুখে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। তখন মঠে খুব যাতায়াত করি—আমার শরীরটা খারাপ। পূজনীয় মহারাজ আমায় একটা ওষুধ দেবেন ঠিক হলো। বাবুরাম মহারাজকে ডেকে বললেন, "ভাই, ঐ গাছটার মূল ওকে দাও। আমি তো তুলতে পারব না। সব চেতন দেখছি।" তখন পূজনীয় হরি মহারাজ ও পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ উভয়ই মঠে ছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল গেটের পাশে যে পুষ্করিণীটি আছে সেইখানে দাঁড়িয়ে। আরও অনেক কিছু যে তিনি চেতন

দেখতেন তা সময়ে সময়ে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শোনা যেত। একবার ভুবনেশ্বরে জঙ্গলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যেমনি একটা পুষ্পিত বৃক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন, অমনি দেখলেন সেখানে সেই বৃক্ষটি তাঁকে আহ্বান করে বলছে ঃ "আসুন আসুন, এই গন্ধ আঘ্রাণ করুন।" এসব ভাবরাজ্যের কথা—ভাবরাজ্যের রাজার ছেলের মুখেই শোভা পায়। তিনি কতবার উপদেশ দেবার সময় আমাদের বলেছেন, "ওরে বাবা, এ একটা রাজত্ব আর সে একটা রাজত্ব। এ রাজত্বে থেকে সে রাজত্বের কথা বোঝা যায় না।"

এমনও শুনেছি তিনি বলেছিলেন ঃ "লোকে বলে নির্বিকল্প সমাধি শেষ কথা—কিন্তু আমার মনে হয় ঐখানেই ধর্মের অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হলো। তারপর কত অনুভূতি করবে কর। অনন্ত, অনন্ত—তার কি ইতি আছে।" ভাবলে মন কোথায় অনন্তে লীন হয়ে যায়। মন-বুদ্ধি একধারে পড়ে রইল, তবে তো সে রাজত্ব আরম্ভ হলো। মনের গণ্ডি কাটিয়ে উঠতেই বাই জন্মে যায়, তারপর তো অন্য কথা। এই অনন্তের কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীমহারাজ (কাশী থাকা-কালীন) একদিন কি যে মেতে গিয়েছিলেন তা আর মুখে কি বলব! তাঁকে ধ্যানের পর সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তিতে যিনি দেখবার সৌভাগ্য করেছেন, তিনি জানেন সে মূর্তি কেমন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! যেন হিমালয়ের মতো শীতলতা নিয়ে উন্নতশিরে তিনি উপবিষ্ট আর তাঁর পাদদেশে আমরা বসে আছি আমাদের তৃষিত-হৃদয় শান্ত করব এই আশায়। আমরা যেন সেই মহান বটবৃক্ষের মূলে, সেই বিচিত্র পাদপের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় বসে আছি আর নীরব ভাষায় তিনি আমাদের দেহ-প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছেন—সেসব কথা স্মরণ হলে এখনো হৃদয় ভরে যায়। সেই অমৃতময় শ্রীমূর্তি ধ্যানস্থ, আর আমরা সেই অমৃতের সিন্ধুর তীরে অমৃতপানে পরিতৃপ্ত। সে দৃশ্য কি ভোলা যায়? সে যে প্রাণ-জুড়ান মূর্তি, প্রাণ অধিকার করে বসে আছেন!

সুন্দরের কি সকলি সুন্দর! তাই তাঁর মোহন স্মিত হাস্যটুকু মনে হলে মনে হয় এমন সুমধুর হাস্যও দেখিনি। সেই নিজের আসনে বসে একটু একটু ধূমপান করছেন আর সময়ে সময়ে আত্মহারাভাবে ভোলানাথ-নাথ হয়ত শুধুই নলটি মধ্যে মধ্যে চুম্বন করছেন এবং কি এক অজানা দেশে অজানা মানুষের সঙ্গে মত্ত হয়ে অজানা জিনিস উপভোগ করছেন—সেসব কথা স্মরণ হলে মন যে আমাদেরও সে দেশে ছুটে যায়। সে দেবমধুর ধ্যানমঙ্গল মূর্তি একবার হৃদয়ের ধ্যাননেত্রে আপনারা উপভোগ করে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করুন। চিরসন্তাপহর

সেই মূর্তি, স্মরণ-মঙ্গল সেই মূর্তি একবার স্মরণ করুন। স্মরণমাত্রেই যে আমাদের হৃদয়ের সকল জ্বালা আপনা থেকে মিটে যায়।

কত কথাই না মনে পড়ছে তাঁর সম্বন্ধে। মনে পড়ছে উৎসবানন্দে তাঁর শ্রীমূর্তিখানি। তাঁর জন্মোৎসব এমনি দিনে, এই বসন্তের সমাগমে। কাশীধামে—সেই তাঁর লীলা একবারকার মনে আছে। পূজনীয় সুধীর মহারাজকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দাঁড় করিয়ে সবাই মিলে জ্ঞানেশ্বরাদি গান ধরেছে, আরতি করছে। পূজনীয় সুধীর মহারাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তিনি দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত আনন্দে, কত রহস্যপূর্ণ কথায় আমাদের আনন্দে পাগল করে তুলছেন। সে সব কি ভোলা যায়? ভোলানাথের সব ভুল হয় বটে কিন্তু ভক্তকে কৃপাদানে কখনো বিস্মৃতি দেখিনি। যখনই গেছি তখনই কত আনন্দ দানে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠে সেই মধুররবে কখনো "গোবিন্দ মধুসূদন" কখনো "শ্রীদুর্গা, শ্রীদুর্গা" বলে আনন্দ করছেন। "জাগনেওয়ালা জাগো, শুননেওয়ালা শোন" বলে কি অমৃতবর্ষণ করছেন। মনে হয় এখনো তেমনি করে বুঝি তিনি সেই লীলা করছেন। (যিশু) ঋষি কৃষ্ণের সেই বাণী মনে জাগে—"He that hath ears to hear, let him hear." কান থেকেও যে আমাদের কান নেই, তাইতো তাঁর বাণী শুনেও শুনি না। তিনি তো আমাদের জাগাবার জন্যে সদা উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু আমরা জাগি কই? তবে আজ তো আর না জেগে উপায় নেই। তিনি যে জাগাবেনই স্থির করেছেন—আজ তো জাগাবেনই।

তখন মনে ভাবতুম বুঝি মহারাজের সেজেগুজে আমোদ করার বাসনা হয়েছে তাই শুভ জন্মতিথি-বাসরে অত সেজেছেন, ফুলসাজে সেজেছেন। তিনি তো সাজবেনই, বলরামের লীলার সাথী একটু সাজলেনই বা ক্ষতি কি? কিন্তু আমাদের কল্যাণের জন্যই যে সাজছেন তা কি বুঝেছিলাম?— না এখনো বুঝি? তবে এখন এইটুকু বুঝি যে, সেই শ্রীমূর্তিতে আমাদের হৃদয়পটে আরূঢ় হয়ে আমাদের ধ্যানের সহায়তা করবেন বলেই ঐ সাজে সজ্জিত হতেন। দেবতাদেরও তো শিঙ্গার বেশ হয়। তিনি কি দেবতাদের চেয়ে কম? আমাদের হৃদয়ের দেবতা তো তাঁরাই ছিলেন। আসুন, আজ এই মধুর মিলনের দিনে আমরা আমাদের হৃদয়ের দেবতাকে হৃদয়ে রেখে একবার প্রাণ জুড়াই, প্রাণ শীতল করি। তিনি তাঁর লীলালাস্যনেত্রে আজ আমাদের অন্তরের চক্ষুর অন্তরে বিরাজ করুন এই প্রার্থনা আমাদের।*

* স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে ১১ ডিসেম্বর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ভক্তসম্মেলনে পঠিত।

২

মহারাজ বললেন, "পাখিটা মাস্তুল ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তারপরে মাস্তুল সার করে। মহামায়া সব জায়গায় ঢুকে আছেন, মায় সাধুর কৌপীনের মধ্যে, গেরুয়া কাপড়ের ভিতর পর্যন্ত। তিনি পাঁচরকম জিনিসে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন, মান যশ ইত্যাদি। ওসব ছাড়িয়ে যাওয়াই কঠিন। কিন্তু ভগবানের কৃপা যার উপর হয় তার ভগবানের দিকটা প্রশস্ত হয় আর নিজের দিকটা অণু হয়ে আসে, শেষে নিজের সত্তাটা এত ছোট বোধ হয় যে 'নেই' হয়ে যায়।

"ঠাকুর বলতেন, 'অহংকার যাবার একটা উপায় ওপর দিকে তাকান। সব জিনিসেরই তারে বাড়া তারে বাড়া আছে, সেটা দেখলেই নিজের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হয়।' তা না হয়ে যার বোধ হলো নিজেই একটা কিছু হয়ে পড়েছে তার উন্নতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ঠাকুরের একবার মনে হয়েছিল যদি আমি পাইখানা সাফ করতে পারি তবে বুঝব অহংকার গেছে। যেই মনে হওয়া অমনি রাতারাতি পাইখানা সাফ করে এলেন। এসে বললেন—'মন এইবার হয়েছে!' আমি সেদিন বিশ্বনাথ দর্শনে গেছি সঙ্গে দু-পাঁচ জন আছে, বেশটা বেশ সুন্দর তারপর 'স্বামী' পদবাচ্য হয়েছি। সামনে দেখলুম বিশ্বনাথের আঙ্গিনায় একজন ঝাড়ু দিচ্ছে। দেখেই মনে হলো, এই তো ঠিক অবসর এখন যদি ঝাড়ু দিতে পারি তবে বুঝব হয়েছে। অমনি লোকটাকে বললুম—'তোকে একটা পয়সা দেব ঝাড়ুগাছাটা দে তো' (কারণ সাধু দেখে দিতে চাইছিল না)। অমনি তার হাত থেকে ঝাড়ুগাছাটা নিয়ে ঝাড়ু দিলাম। তারপর মনে এমনি একটা আনন্দ হলো দুটি ঘণ্টা ধরে যে বলতে পারি না। প্রাণ তর হয়ে রইল। দীনতার এমন একটা আনন্দ আছে যে তা মুখে বলা যায় না। বিশ্বনাথ দর্শনে যে আনন্দ হয়েছিল মন্দির মার্জনায় তার চেয়ে বেশি হলো।"*

৩

আমি স্বপ্নে তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছিলাম। সেই কথা তাঁকে বলায় তিনি বলেছিলেন, "বেশ বেশ, তুই খুব জপ কর।" আমাকে খুব উৎসাহিত করলেন।

১৯১২ সালে দুর্গাপূজার সময় আমি চাটগাঁয়ে পূর্ণানন্দ জগৎপুর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ফিরে এলে মহারাজ আমায় বলেছিলেন, "কোথায় গেছলি? যাবি তো আমাদের কাছে চলে আয় না।"

---

* ১৯২০ সালে কোন একসময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

স্বামীজীর তিথিপূজার দিন শচীন, যতীনদা প্রভৃতির ব্রহ্মচর্য হয়ে গেল। মহারাজ আমায় বললেন, 'তোর এখন থাক।' তাতে আমার দুঃখ হয়েছে দেখে বললেন, "মুখটা অমন করে রইলি কেন? হাস, একটু হাস দেখি।" তারপর বললেন, "আচ্ছা তোর ঠাকুরের জন্মতিথিতে হবে।"

সন্ন্যাসের পূর্বে যখন প্রার্থনা করতে গেলাম তখন আমি বললাম, "মহারাজ একটা নিবেদন আছে, একটা প্রার্থনা আছে।" মহারাজ উঠানের আমতলায় বসেছিলেন। সেখানে একটা বেঞ্চের উপর গদি দেওয়া থাকত। মাঝে মাঝে প্রভাতে একটু বেড়িয়ে এসে তিনি তাতে বসতেন। আর বৈকালে গঙ্গার সামনে লন-এ এসে বসতেন। আমার কথা শুনে বললেন, "বেশ, বেশ, একটা প্রার্থনা কিরে সহস্র প্রার্থনাও পূর্ণ করব।" আমি বললাম, "মহারাজ, সন্ন্যাস চাই।" বললেন, "বেশ বেশ, তাই হবে।"

শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর দাসকে কমলেশ্বরানন্দ এই নাম দিয়ে সন্ন্যাসের সময়ে কৃতার্থ করেন। এবং সেই হোমের সময়ে জিজ্ঞাসা করেন, "তোর পছন্দ হয়েছে তো?" আমার ভিতরে ভিতরে এই ভাবটি ছিল "গোবিন্দানন্দ" নামটি বেশ। যাই হোক গুরুদেব পুনরায় ঐ নামটি "বড় সুন্দর" "বড় সুন্দর" বলে উৎসাহিত করলেন। কি বুদ্ধি আমার, বলিহারি যাই! প্রভুর জয় হোক। প্রভুর জয় হোক।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের কথা। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে সে কি আনন্দের ব্যাপার! শ্রীশ্রীমহারাজ উত্তরমুখে আসীন, পাশে অন্যান্য সব মহারাজরা। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ প্রভৃতি আছেন। আর শ্রীশ্রীমহারাজ পূজনীয় রামকৃষ্ণানন্দের সেই 'ওঁ ব্রহ্মচর্যব্রতসূত্রাণি' পড়ছেন। সে কি অপূর্ব ব্যাপার যখন 'ত্রিতাপনাশাত্মকায়' এই মন্ত্রাংশ পাঠ হলো এবং শ্রীশ্রীমহারাজ যেন আনন্দাম্বুধিতে মগ্ন হলেন। এই আনন্দ-সাগরে মগ্ন হবার জন্য পূজনীয় প্রেমানন্দ-স্বামী কতবারই না আমাদের বলেছিলেন, "ওরে ডুবে যা, ডুবে যা, ডুবে যা, উপরে উপরে ভাসলে কি হবে। উপরে ভাসলে চলবে না। ডুবে যা, ডুবে যা। দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ফেল দেখি। তোদের দেখে জগৎ শিখুক।" কি উৎসাহই দিতেন, মনে হলে মনে হয় আমরা এঁদের কাছে না এলে কি অমানুষই হতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ আমায় বলেছিলেন, "ললিত, শেষে মনই গুরু হয়, guide

(চালনা) করে নিয়ে যায়। স্থূল শরীরে গুরু তো থাকেন না বেশি দিন। ঠিক দর্শন হলে আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। প্রাণেই সাড়া পাবে। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা ততক্ষণ ঠিক হয়নি। ভগবদ্দর্শন হলে জীবন কৃতার্থবোধ হবে।"

আমি তাঁকে বলেছিলাম, "মহারাজ, অহংকার যাবে কি করে?" তিনি বলেছিলেন, "ও অহংকারের কি আঁট আছে তোর।" এমন হেসেছিলেন আমার মনে হচ্ছে এখন ভগবান সম্বন্ধে রাসে যেমন আছে "নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত"* অবিকল তাই।

ভোর রাত্রে উঠে শ্রীশ্রীমহারাজ বলতেন, 'জাগনেওলা জাগো, শুননেওলা শোনো।'

একদিন ধ্যান করে উঠে মহারাজ বলেছিলেন, "দেখ ললিত, ঠাকুর সময় সময় পঞ্চবটীতে মধুর বংশীধ্বনি শুনতে পেতেন।" আমার দেখে মনে হয়েছিল যেন মহারাজ স্বয়ং তখন ঐ ধ্বনি শুনছেন। বললেন, "দ্যাখ, যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। এইরকম বাহিরে যেমন নদ-নদী পাহাড়, অবিকল তেমনি সব ভিতরেই আছে।"

মহারাজ আমায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "ললিতলবঙ্গলতা"। তিনি আমায় বলেছিলেন, "সুখের পায়রা।"

পরেশ মহারাজ ও আমি অযোধ্যা থেকে ফিরে প্রাতে কাশীতে অদ্বৈত আশ্রমে তাঁর কাছে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, "তুই ঐখানে একটা মঠ কর তো বাবা।" বারবার ঐ কথা বলেছিলেন।

একদিন যখন মহেশবাবুর টোলে পড়তে যাব আহারাদি সম্বন্ধে নিজে থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "মাখন খাবি, ঘি খাবি, দুধ খাবি। দুধে nerves soothe (স্নায়ুকে স্নিগ্ধ) করে। আলোচালের ভাত খেতে হবে। ঘি থাকলে আমাশা হয় না। মাখন খেলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে।"

যেদিন কাশীতে ঠাকুরের নূতন পট বদলান হলো, যোগী অভিষেক করতে লাগল, আমি রুদ্রী পড়লাম। মহারাজ 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে নৃত্য করেছিলেন। সেদিন বৈকালে একান্তে পেয়ে বলেছিলাম, "আপনি আসাতে দুই আশ্রম আনন্দের স্রোতে ভাসছে।" তাতে বলেছিলেন, "তোরা ভক্ত কিনা তাই বলছিস।" তারপরই বললেন, "দেখ বাবা, চৈতন্যের উন্মেষ হলে ওরকম হয়।"

---

* ভাঃ ১০/৩১/৬ তোমার হাস্য নিজ জনের গর্বনাশক।

একদিন বাবুরাম মহারাজকে বলেছিলেন, "বাবুরামদা, অমুকগাছ তুলতে পার শিকড়শুদ্ধ? আমি পারব না। সব চৈতন্যময় দেখছি।"

ঢাকায় একদিন বলেছিলেন, "দেখ ললিত, তোদের কেউ কিছু বললে আমাদের মুখ ছোট হয়ে যায়। কেউ সুখ্যাতি করলে আমাদের বুকটা দশহাত হয়ে যায়।"

একদিন বলরাম মন্দিরে থাকাকালীন সূর্যকে বলেছিলেন, "ঠাকুর আজ এসেছিলেন।" সূর্য বললে, "তাহলে তাঁর গায়ের হাওয়া লেগেছে তো ভাই বলতে হবে।" আমি মনে মনে ভাবলাম মলয়ের হাওয়া লাগলে সারবান বৃক্ষে চন্দন হয়।

মহারাজ বলেছিলেন, "সত্যে থাকলে সত্যের ঠাকুরকে পাওয়া যায়।"

আরও বলেছিলেন, "দেবার জন্য তো বসে আছি, নিতে চায় কে? কেউ কিছু করবে!"

শ্রীশ্রীমহারাজ যে মাছ ধরতেন এ সকলের গূঢ় অভিপ্রায় অনেকে না জেনে তাঁকে নিষেধ করতেন। কারণ অতবড় রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রেসিডেণ্টের পক্ষে এসব মানায় না; লোকে কি মনে করবে! কিন্তু তিনি স্বয়ং তা কিছু একটা অন্যায় হচ্ছে বা লোকে কিছু মনে করবে তা মনে করতেন না। যখন তাঁর ইচ্ছা হতো কারোর কথা তিনি শুনতেন না। শুনবেনই বা কেন? প্রভু তাঁর সকল আচরণ যে পূত করে দিয়েছিলেন।

আমাদের শাস্ত্রও তাই বলছেন। ভক্তের প্রত্যেকটি আচরণই শুভ আচরণ, তাঁরা যা করেন তাই শুভ কর্ম, তাঁরা যা বলেন শুভ শাস্ত্র অর্থাৎ সৎ শাস্ত্র। তাঁরা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের পারে যান। শাস্ত্র তাঁদের এটা কর, ওটা করো না এসব অনুজ্ঞা দিতে পারেন না। প্রত্যুত তাঁদের কর্ম 'তেজীয়সাং ন দোষায়' বলে শ্রীমদ্ভাগবত মান্য করে গেছেন।

খোকা মহারাজ বলতেন, "মহারাজের কাছে গেলে যেমন শান্তি পাই এমন আর কোথাও পাই না।" একটি ছেলের উপর খোকা মহারাজের টান ছিল। হঠাৎ সেই ছেলেটি মারা যাওয়ায় খোকা মহারাজ বড় কষ্ট পান। তাঁর সেই শোক মহারাজের কৃপায় বিদূরিত হয়।

মহারাজের সঙ্গে সেই শিবরাত্রিতে বালির কল্যাণেশ্বর দর্শনে যাওয়ার ঘটনা মনে পড়ছে। আর মহাপুরুষের সঙ্গে সেই দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার ঘটনা।

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে দেখা হলো। লক্ষ্মীদিদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শীতলার অংশ বলতেন। সেই জন্য মহারাজ দেখা হলে বলতেন, "দিদি, একটু হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ কর।"

কারো বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করলে মহারাজ বলতেন, "ভগবানকে কি ফরমাশ দিয়ে লোক পাঠাতে বলব?"

কালী মহারাজ একদিন মহারাজকে বললেন, "যেদিকে দেখি সব মহারাজ, আর মহারাজ! যত slave mentality (দাসসুলভ মনোভাব)। রাজা তুমি ওদের অমন করে ফেলেছ কেন?" মহারাজ তার উত্তরে বলেছিলেন, "আমি তো কিছু বলিনি। ওরা ভালবাসে তাই। আর আমায় কি করে? হরি মহারাজকে দেখ। সবাই তাঁর কাছে যেতে চায়।"

মহারাজ একদিন মঠে ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে যেখানে উঠানে কাঁঠাল গাছ ছিল সেখানে পিছন থেকে এসে হাত দুলিয়ে আমার পিঠে ছোট ছেলেরা যেমন খেলা করে তেমনি স্পর্শ করেছিলেন, খপ্ করে। (অমূল্য মহারাজ ১৩. ১১. ১৯৩৫ সালে বলেছিলেন, "আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।")

দুর্গাদেবীর দর্শন পেয়ে মহারাজ দুর্গাপূজা করতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি কিছু না দেখলে পূজা করি না।"

ঠাকুরের দর্শন পাওয়া সম্বন্ধে আমি সুধীর মহারাজকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়েছিলাম। তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, "ভাবে দেখি। কখনও এমনিও দেখি।"

নিজের তৈলমর্দন সম্বন্ধে মহারাজ বলেছিলেন, "যোগচর্যায় এসব আবশ্যক হয়।"

তিনি আমায় যোগ শেখাবেন বলেছিলেন। পরে বলেছিলেন, "শহরের আবহাওয়া ভাল নয়।"

মহারাজ বলতেন, "দক্ষিণদেশে গিয়ে ইচ্ছা হয়েছিল যে গঙ্গাজল ও মহাপ্রসাদ খাইয়ে সব (হিন্দুধর্মে) ফিরিয়ে আনি।"

মহারাজ বলতেন, "সময় নষ্ট করিসনি, সময় নষ্ট করিসনি। লেগে পড়, লেগে পড় দিকি একবার।"

মহারাজ প্রত্যহ Physical exercise (ব্যায়াম) করতেন। ঘরে আয়না

ছিল। রাত্রে ছোট বাতি জ্বালা হতো। সাধারণের বসবার জন্য একটা কার্পেট পাতা থাকত। দুটি খাট ছিল, শোবার আর বসবার। তাঁকে দেখলে অনেক সময়ে উন্মনা বলে মনে হতো। মহারাজ কোন জিনিস ফেলা-ছড়া পছন্দ করতেন না। সব জমিয়ে রাখতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল লক্ষ্মী স্বয়ং আসছেন তাঁকে কি ছাড়তে আছে। টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে খুব হিসেবী ছিলেন, এ বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল।

মহারাজ বলতেন, "কখন-কখন দেখি অনেকের লক্ষণ হয়ত ভাল তারপর দেখলুম সব ভেস্তে গেল। আবার দেখেছি লক্ষণ হয়ত খারাপ কিন্তু ভগবানের কৃপায় উঠে গেল। তোদের হাউইয়ের মতো হু হু করে উঠতে হবে।"

মহারাজের বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি যেমন একদিকে উচ্চ, উচ্চতর তত্ত্বে নিমগ্ন থাকতেন তেমনি সামান্য কাজও অতি উত্তমরূপে করতে পারতেন।

একবার মহারাজকে বলেছিলাম, "মহারাজ, আপনি আমাদের সম্বন্ধে indifferent (উদাসীন)।" তাই শুনে বললেন, "সে কি বাবা। তোরা এসে জিজ্ঞাসা করেছিস আর আমি বলিনি এমন কি কখন হয়েছে?" আহা সেই মধুর মূর্তি মনে পড়ছে আর সেই সকরুণ দৃষ্টি!

কাশীতে পড়তে যাব, তিনি বললেন, "বেশ বেশ, কিন্তু ওখানে গিয়ে একটু দুধ খাবি, একটু ঘি খাবি বাবা। ঘি না খেলে আম হয় পেটে। দুধ খাবি—দুধ খেলে ব্রেন ভাল থাকে।" পুনঃ পুনঃ এ কথা সে কথার পর ঐ এক কথা। ক্রমাগত এই চলেছে। বলরাম মন্দিরে ঐ কথা হলো। বড় ঘরে ঢুকেই প্রথম দরজার সামনে আমি যখন যাব মহারাজ বলরাম মন্দিরে নিতাইবাবুর ঘরের সামনে বসে খাচ্ছেন। আমি যেমন বললাম, "মহারাজ, তবে আমি আজ আসি" অমনি মহারাজ একটা আম একটু মুখে দিয়ে আমায় খেতে দিলেন।" সে পিতার ন্যায় পুত্রবাৎসল্য মনে হলে প্রাণ অধীর হয়।

কথা কইতে কইতে তাঁর গায়ে পানের পিক পড়ে গেল, আমি জল দিয়ে ধুয়ে দিলাম, তিনি কিন্তু একটা কথাও বললেন না।

শ্রীশ্রীমহারাজ বলতেন, "তেমন তেমন ভাব এলে চাপাই মুশকিল। দিলে নেবে কে? রাখবে কে? 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।' যে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ যোগ হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞান আর তার পরিরক্ষণ হচ্ছে ক্ষেম। জ্ঞানভক্তি ভগবানের কৃপায় পাওয়া যায় আর ভগবানের কৃপায় তিনি নিজেই উহা রক্ষা করেন। না রক্ষা

নয়, তিনি নিজে বহন করে, মাথায় বহন করে ভক্তের নিকট এসে হাজির হন।”

একবার বেলুড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপটখানি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁর মূর্তি নবকলেবর হবে স্থির হয়। অতঃপর সেই নবকলেবরের যখন অভিষেকাদি হলো তখন পূজারী লক্ষণ মহারাজ এবং তন্ত্রধারক এই শ্রীমান কমলেশ্বরানন্দ।

নূতন পটপূজার জন্য অভিষেক করবার সময় ভুবনেশ্বর মঠের কর্মাধ্যক্ষ বলাই মহারাজের গায়ে একটা কাটা ফতুয়া জামা দেখে মহারাজ বললেন, “ও কিরে, ওটা ছেড়ে আয়। ঠাকুরের জোগাড় দিচ্ছিস, ওরকম জামা পরে কেন!” এই প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ছে তিনি অতি ছোট-খাট ব্যাপারেও, বিশেষ করে শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্রান্ত বিষয়ে সাত্ত্বিক ও সদাচার পছন্দ করতেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের বাসনের নিকট কে মুখ ধুচ্ছে, তিনি সেইখানে পাদচারণা করছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, “ও কিরে ওখানে ঠাকুরের বাসন রয়েছে, অমন করে মুখ ধুচ্ছিস! যদি তোর মুখের জলের ছিটে ওতে লাগে। সাবধান! অমন করিসনি। আমার বাপু বড় ভয় করে।”

এই প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ছে একবার মঠে খাবার চাল এসেছে নৌকা করে। মঠের ঘাটে ঐ চাল নেমেছে। নিয়ে যাবার সময়ে ঐ চালের কয়েকটি দানা মঠের প্রাঙ্গণের সম্মুখে বারান্দায় পড়ে আছে। শ্রীশ্রীমহারাজ নেমে এসে সেগুলি দেখে কাকে বললেন, “ওরে ওগুলো ওখান থেকে তুলে নে। মা লক্ষ্মীর ওপর দিয়ে অমন করে মাড়িয়ে যেতে নেই।”

এই প্রসঙ্গে আরও অনেক ঘটনা মনে পড়ছে যা তাঁর সদাচারের পরিচয় দেবে। ১৯১২ সালে যখন শ্রীশ্রীমহারাজ কনখলে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে পূজনীয় রামলালদাদা ছিলেন। পূজনীয় মহারাজ রামলালদাদাকে বড় ভালবাসতেন। তার কারণও ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যখন শ্রীশ্রীমহারাজ প্রথম যান তখন রামলালদাদাই তাঁকে সঙ্গে করে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের কাছে হাজির করেছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ঐ ঘটনা এত প্রাণের সহিত মনে রেখেছিলেন যে সেই অবধি শ্রীযুত রামলালদাদাকে পরম মিত্র জ্ঞান করতেন। এবং ভাবতেন যিনি ভবসাগরের কাণ্ডারি তাঁর সঙ্গে ইনিই প্রথম যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন, সুতরাং এঁর চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। মহতের সকল আচরণই মহৎ। কি অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাবোধ! আর আমরা? একথা ভাবলে মনে হয় আমাদের জীবনে কত ব্যাপারে কত অকৃতজ্ঞতা না প্রকাশ করি—ওঁদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনেরও

তো অধিকারী নই। তথাপি জানি না কোন্ ভাগ্যবশত তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং শুধু তাই নয় তাঁদের সঙ্গে বাস করার তাঁদের 'লোকে' বাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল। শাস্ত্রে সত্যলোকের যে বর্ণনা দেখি তাতে বলে, যেখানে সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষগণ বাস করেন তাই সত্যলোক। তাই শুনে মনে হয় এই বেলুড় মঠটি তাহলে নিশ্চয়ই সত্যলোক। কারণ এঁদের মতো সত্যনিষ্ঠ, সত্যদর্শী, সদাচারী লোক যখন এখানে বাস করছেন, এটা নিশ্চয়ই সত্যলোক। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে একথা বলা ও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখে যা শুনেছি তাই এখন বলি। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে কতবার বলেছেন, "আহা, আহা, এ স্থান কৈলাস, কৈলাস। এখানে গুরু গঙ্গা একসঙ্গে রয়েছেন। এখানে স্বামীজী দেহ রেখেছেন। এ স্থান বৈকুণ্ঠ। দেবদুর্লভ স্থান।" অবশ্য অত তখন বুঝিনি, এখনো যে বুঝি তা নয়। তবে মনে হয় এ স্থান যে অতি পবিত্র তা নিঃসন্দেহ। মহাত্মারা যে স্থানে থাকেন সেই স্থান যে পবিত্র এ কথা বলাই বাহুল্য।

মহারাজ প্রাতে ধ্যান করে উঠে যখন আমাদের কিছু সদুপদেশ দিতেন তখনই এ সব বাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনতাম। কিন্তু বুদ্ধির স্বল্পতাবশত কিছু বুঝতাম না। শুনতে পাই স্বামীজী নাকি মহারাজের বারান্দার পরে ভিজিটার্স রুম-এর উপর যে গোল বারান্দা আছে সে স্থান থেকে দাঁড়িয়ে বলতেন, ঐ স্থানে যে মাধুর্যময় দৃশ্য তা তিনি এত জায়গা পরিভ্রমণ করে এসেছেন কিন্তু কোথাও পাননি। মঠের মধ্যে আর একটি স্থান মহারাজ বড় ভালবাসতেন। সেটি হচ্ছে স্বামীজীর মন্দিরে যে দীর্ঘ সরলাকার দেবদারু পাদপশ্রেণী আছে সেই স্থানটি। স্বামীজী অনেক সময় সানন্দে ধূমপান করতে করতে ঐ স্থানে পাদচারণা করতেন। এবং একদিন শ্রীশ্রীমহারাজকে বলেছিলেন, "রাজা, আমায় এখানে একটু জায়গা দিতে পারিস?" মহারাজ তার উত্তরে বলেছিলেন, "ভাই, তোমারই তো সব। তোমায় আবার জায়গা দেব কি?" কিন্তু স্বামীজীর ভাব ছিল যে মঠটি যখন ট্রাস্ট ডীড করে তাঁদের নামে দিয়েছেন তখন ওটা তো আর তাঁর নয়, সুতরাং ঐ স্থানটিতে কিছু করতে হলে ট্রাস্টীগণের অনুমতি ব্যতীত কিছু করা সম্ভব নয়।

একদিন কয়েকটি লোক ঠাকুরের দাঁড়ান অবস্থায় ছবিতে যে এক হাতের দু আঙ্গুল ঊর্ধ্বদিকে আর অপর হাতের তিন আঙ্গুল অধঃদেশে নির্দেশ আছে তার অর্থ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, "সবেরই একটা ভাব নিতে হয়।

ওর মানে প্রকৃতি পুরুষ ও ত্রিগুণ এরূপ একটা হবে। তাঁর সমাধি অবস্থায় স্বভাবতই এরূপ নানারকম মুদ্রা দেখতে পাওয়া যেত।”

তাঁর কথা—“যেখানেই থাক ভগবানকে নিয়ে থেকো। বাপ-মাকে সেবাদ্বারা প্রসন্ন করলে ভগবান তুষ্ট হন।”

পূজনীয় মহারাজ অলৌকিকভাবে দেহরক্ষার পূর্বে যে রাত্রে নানা উপলব্ধির কথা বলেন, আমি ও অমৃতেশ্বরানন্দ বাগবাজারে জ্ঞান মহারাজ যে একটি স্থান করেছিলেন সেখানে রাত্রিযাপন করি। তার পরে দু-এক দিনের মধ্যেই মহারাজের স্থূল শরীর চলে যায়। এসবের একটা গূঢ় অর্থ আছে।

(শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ, স্বামী কমলেশ্বরানন্দ।
প্রকাশক ঃ শ্রীতারকনাথ মজুমদার, কলকাতা)

মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী অচ্যুতানন্দ

১৯১৪ সালে দুর্গাপূজার পর মহারাজ কাশী থেকে মঠে এসেছিলেন। মহারাজকে পেয়ে সকলেরই প্রাণে খুব আনন্দ। শীত পড়েছে। একদিন বাবুরাম মহারাজ রাজা মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, ছেলেরা যাতে নিয়মমতো জপধ্যান করে তুমি একটু বলে দিও।" মহারাজ নিয়ম করলেন ঃ শেষ রাতে ৪ টার সময় ঘণ্টা দেওয়া হবে। সকলে আমার ঘরে এসে জপ-ধ্যান করবে। মহারাজ ৪টার আগেই উঠতেন। আমি তাঁর পাশের ঘরেই থাকতুম। তাঁর উঠবার আওয়াজ পেলেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতুম তাঁর হাত-মুখ ধোবার জল দিতে। তারপর তামাক সেজে দিতুম। তিনি তামাক খেতেন। ইতোমধ্যে অনেকেই তাঁর ঘরে এসে জপ-ধ্যান আরম্ভ করে দিত। তামাক খাবার পর তিনি ছোট খাটটিতে বসে জপ-ধ্যান করতেন।

তিনি একদিন জপ-ধ্যান করবার সময় বললেন ঃ "এই সময় মনকে এদিক ওদিক নিয়ে গিয়ে চঞ্চল করো না। মন স্থির করে জপ কর; সেই সঙ্গে ধ্যান কর। মন্ত্রের উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া চাই। তা না হলে কাজ হয় না। তাড়াতাড়ি করো না।" কাকেও কাকেও বলেছেন, "সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ রাত্রদিনের সংযোগ ভোর ও সন্ধ্যায় জপ করবে। ঐ সময় অন্তত এক হাজার জপ ও তৎসহ ধ্যান করবে। ঘুম পেলে চোখ চেয়ে জপ করবে, নতুবা দাঁড়িয়ে জপ করবে।" জপ-ধ্যানের পর প্রাতঃকালে স্তোত্র পাঠ হতো। তিনি কালী, শিব, গোপাল প্রভৃতি স্তোত্র বিষয়ে যেটা নির্দেশ করে দিতেন, তাই পাঠ হতো। তারপর ভজন। বিশ্ব মহারাজ ভজন গাইতেন। আমরা সকলে তার সঙ্গে গাইতুম। তারপর সকলে মহারাজকে প্রণাম করে ঠাকুরের দৈনন্দিন কাজে চলে যেত।

একদিন মহারাজ বললেন ঃ "তোমরা সাধু হয়েছ। বেশ করে জপ-ধ্যান করতে হবে। এই জীবনেই যাতে তাঁকে লাভ করতে পার, তার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে শুধু ডাল চচ্চড়ি খেয়ে মঠে পড়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়। তোমাদের

এখন বয়স অল্প। এই বয়সই জপ-ধ্যান করবার উপযুক্ত। পরে আর কিছু হবে না। উঠে পড়ে লেগে যাও। অনর্থক সময় নষ্ট করো না। যে সময় যাচ্ছে সে সময় আর ফিরে পাবে না।" ব্রহ্মচারীদের কেহ কেহ অন্যত্র বসে জপ-ধ্যান করত। মহারাজ লক্ষ্য করেছেন কয়েকদিন যে দুই জন তাঁর ঘরে আসে না। একদিন মঠে ভাণ্ডারা হচ্ছে। প্রচুর পায়েস হয়েছে। তিনি বললেন, "আগে পায়েস খেয়ে পরে ভাত খাবে। তা না হলে ভাত খেয়ে পেট ভরে আর পায়েস খেতে পারবে না।" আমার কাছে এসে বললেন, "শ্যামাচরণ, কি জোলাপ নিয়েছিলে নাকি?" বালক স্বভাব মহারাজ ঘুরে ফিরে ফস্টিনস্টি করে আনন্দ করছেন। দিব্যানন্দের কাছে গিয়ে বললেন, "ভোলা যেন দিন দিন তিলভাণ্ডেশ্বর হচ্ছে।" ঐ দুই ব্রহ্মচারীর একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সকলে আমার ঘরে ধ্যান-জপ করতে যায়, কই তোমাকে তো দেখতে পাই না। তুমি জপ-ধ্যান করতো?" ব্রহ্মচারী বলল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" মহারাজ ঃ "কোথায় বস?" ব্রহ্মচারী ঃ "ঠাকুর ঘরে।" মহারাজ ঃ "তা হবে না। কাল থেকে আমার ঘরে যেতে হবে।" অপর ব্রহ্মচারীর সামনে গিয়ে বললেন ঃ "কৈ তোমাকেও তো দেখতে পাই না। তুমি কোথায় বস?" সে বলল, "স্বামীজীর ঘরে।" মহারাজ ঃ "বাঃ! কেউ ঠাকুর ঘরে, কেউ স্বামীজীর ঘরে। সব বড় বড় ঘর বেছে নিয়েছ। আমরা যেন কেউ নই। আর ভারি সুবিধে। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট করলে বা না করলে, কে আর দেখতে যাচ্ছে? ওসব চলবে না। কাল থেকে সকলকে আমার ঘরে যেতে হবে। তা না হলে খ্যাঁট বন্ধ করে দেব। ভিক্ষে করে খেতে হবে।"

এরূপে শীতকালটা বেশ আনন্দে মহারাজের ঘরে জপ, ধ্যান, পাঠ, ভজনে কেটে গেল। গরমের সময় গঙ্গার ধারে বারান্দায় জপ-ধ্যান হতো। বর্ষাকালে তখন মঠে বেশ ম্যালেরিয়া হতো। ভাদ্র মাস, মহারাজের জ্বর হয়েছে। আমি কাছে থেকে তার কিছু সেবার কাজ করছিলাম। অসুস্থ হলে মহারাজের মুখে ঠাকুর দেবতার নাম এবং ভাল ভাল কথা শুনা যেত। তিনি বললেন, "দুটি পাখি রয়েছে। একটি আনন্দে মগ্ন হয়ে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে বসে আছে। অপরটি সুখ-দুঃখ ভোগ করছে।" আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "বুঝেছিস?" আমি ঃ "হাঁ মহারাজ। একথা উপনিষদেও আছে।" মহারাজ ঃ "হাঁ, ঠিক বলেছিস।" আমার মনে হলো—তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

পরদিন তাঁর গা হাত-পা টিপে দিচ্ছি। তিনি বললেন, "এখানে বসে টেপ।" তবুও আমি দাঁড়িয়েই টিপছিলাম। তিনি বললেন, "তুই কি আমাকে ভালবাসিস

না?" আমি ঃ "তা না মহারাজ, আপনার বিছানায় বসতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।" চার-পাঁচ দিন পরে মহারাজ সুস্থ হলেন। ইতঃপূর্বে আমি যখন মঠে নূতন এসেছি, নিত্য তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম না। একদিন কানাই মহারাজের ঘরে আমাকে বললেন, "সকলে আমাকে প্রণাম করে, কৈ তুমি তো আমাকে প্রণাম করো না। দেখ, আমি নেহাৎ খারাপ সাধু নই।" আমি ঃ "আমি আপনাকে পিতার মতো মনে করি। বাপ-মাকে নিত্য কখনো প্রণাম করিনি।" যা হোক আমি তখনি তাঁর পা স্পর্শ করে প্রণাম করলুম। সে অবধি সকাল সন্ধ্যা তাঁকে এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের নিত্য প্রণাম করতাম। অহেতুক কৃপাসিন্ধু মহারাজ এভাবে আমার ভুল সংশোধন করে দিলেন।

তখন মঠে খাবার সময় নিত্য শ্লোক বলা হতো। কোন একটি উৎসব উপলক্ষে অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে। কেউ কেউ শ্লোক বলছেন এবং আমিও বলছি। গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ্, ভাগবত থেকে শ্লোক আবৃত্তি হতো। আমি চণ্ডী থেকে একটা শ্লোক বলাতে, তিনি আমার কাছে এসে বললেন, "বাবা, এঁটো মুখে চণ্ডীর শ্লোক বলতে নেই।" তিনি আমাকে গীতার ১৫ অধ্যায় থেকে শ্লোক বলতে বললেন। আমি তাই বললুম।

১৯১৪ সালের চৈত্রমাসে আমরা কয়েকজন কেদার-বদ্রী যাবার পথে কাশীতে আসি। মহারাজ তখন কাশীতে আছেন। বিশ্বনাথ দর্শন করে কাশীতে কয়েক দিন ছিলাম। তখন অদ্বৈত আশ্রমে নিত্য কাশীখণ্ড পাঠ হতো। বিশ্ব মহারাজ পাঠ করতেন। মহারাজও উপস্থিত থাকতেন। উভয় আশ্রমের সাধুদের অনেকেই পাঠ শুনতেন। একদিন পাঠের সময় "শাকের কড়ি মাছে, মাছের কড়ি শাকে"—এরূপ ভাবের কথা হচ্ছিল। মহারাজ চন্দ্র মহারাজকে বললেন, "শুনছ চন্দ্র।" চন্দ্র মহারাজ মাথা চুলকাতে লাগলেন। কয়েক দিন থেকে আমরা মহারাজকে প্রণাম করে কাশী থেকে কনখলে গেলাম।

কনখলে তখন হরি মহারাজ ছিলেন। আমরা কিছুদিন কনখলে থেকে কেদার-বদ্রী যাত্রা করলাম। কেদার-বদ্রী দর্শন করে কিছুকাল উত্তর কাশীতে ছিলাম। সেখানে থাকাকালে বাবুরাম মহারাজ-এর পত্র পেলুম। তিনি আমাকে মঠে ফিরতে লিখলেন। পূর্বাশ্রম থেকে মার কাতর ক্রন্দনে বাবুরাম মহারাজের দয়ার্দ্র চিত্তে করুণার সঞ্চার হওয়ায় তিনি আমাকে বাড়ি যেতে আদেশ করেছিলেন। আমার তখন আসবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। মহারাজকে একথা লিখলাম। অমূল্য মহারাজ উত্তরে জানালেন যে মহারাজ বললেন, "আমি তার

কি জানি। তার ইচ্ছা হয় যাক।" আমি কিছুই ঠিক করতে না পেরে ফিরে আসা ঠিক করলুম। কাশীতে এসে মহারাজকে প্রণাম করে কাছে দাঁড়িয়েছি। অমূল্য মহারাজ মহারাজকে বললেন, "এ ছেলেটি উত্তর কাশীতে বেশ সাধন ভজন করছিল। বাবুরাম মহারাজের পত্র পেয়ে চলে এসেছে। শুনে মহারাজ একটু বিরক্ত হলেন। কারণ মহারাজ সাধন ভজনের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এলে কেন?" আমি ঃ "বাবুরাম মহারাজ লিখেছেন, "আমার কথা যদি তুমি না শুন তবে তোমার মঠে স্থান হবে না।" মহারাজ ঃ "নাই বা হলো মঠে স্থান। মঠে থাকবার জন্য কি সাধু হয়েছ?" আমি ঃ "মঠে থাকবার উদ্দেশ্য আপনাদের সঙ্গ লাভ করা। তা না হলে বাইরে থেকে সাধন ভজন করে থাকা যায় বটে তবে আপনাদের দুর্লভ সঙ্গ লাভ হয় না।"

পরদিন মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমের বাগান দেখছিলেন। তিনি যখন যেখানে থাকতেন নানারূপ ফুল ফলের গাছ লাগাতেন এবং যত্ন করতেন। আমাকে দিয়ে বাগানে কিছু জল দেওয়ালেন। পরে অমূল্য মহারাজ আমাকে বললেন, "দেখ, বিশ্বরঞ্জনের শরীর খারাপ হয়েছে। বুলবুলও (চাকর) চলে যাচ্ছে। তুমি কিছুদিন এখানে থেকে যাও। পূজার পর আমরা মঠে যাব, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" দুই কারণে আমি রাজি হইনি। এক—মহাপুরুষের সেবার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং দুই—বাবুরাম মহারাজের আদেশ। সাধুজীবনে এই আমার প্রথম ভুল হলো। মহারাজ কৃপা করে আমার সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে এমন সুবর্ণ সুযোগ হারালুম। সেই দিনই আমি মঠে ফিরলুম।

মঠে একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার পূর্বাশ্রমে যাবার প্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে বললেন, "শ্যামাচরণের মা তাকে একবার বাড়ি যাবার জন্য কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছে। কিন্তু ও কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছে না। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বল।" মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে কি হয়েছে?" আমি তাকে সব বললুম। শুনে তিনি বাবুরাম মহারাজকে বললেন ঃ "অনেক কষ্টে মানুষ আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটিয়ে সংসার ত্যাগ করে আসে, আবার তাকে ফিরে যেতে বলা ঠিক নয়। ফিরে গিয়ে আবার আসতে পারে কিনা কে জানে। ওর যেয়ে কাজ নেই।" বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, "যা বেটা, তুই বেঁচে গেলি।"

ঠাকুর-ভাঁড়ারের কাজ করে যখনি আমি সময় পেতুম তখনি মহারাজের কাছে যেতুম এবং তাঁর কিছু কিছু সেবা করে আনন্দ পেতুম। বাবুরাম মহারাজ

আমাকে ভাঁড়ারে দেখতে না পেয়ে খুব বকতেন। একদিন আমি ঐরূপ মহারাজের নিকট আছি। বাবুরাম মহারাজ বকছেন। মহারাজ বললেন, "বাবুরামদা কি পাগল হলো নাকি? বড্ড চেঁচামেচি করছে তো। এরা কেউ চায় না কেউ আমার কাছে আসে, আমাকে একটু ভালবাসে।"

একদিন স্নান করবার আগে মহারাজকে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিলাম। বাবুরাম মহারাজ আমাকে ভাঁড়ারে না দেখে খোঁজ করে জানলেন মহারাজের কাছে আছি। খাওয়ার সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই ভাঁড়ার ছেড়ে কোথায় যাস?" আমি বললুম যে মহারাজকে তেল মাখাতে গেছিলাম। তিনি বললেন, "মহারাজকে তেল মাখাবার আর লোক নেই?" অমূল্য মহারাজ বললেন, "মহারাজ যদি ওকে ডাকেন, ও কি করবে?" তিনি আর কোন কথা বললেন না। আর একদিন মহারাজের হাত পা টিপে দিচ্ছিলাম। ভাদ্র মাস। খুব ঘেমে গেছি দেখে মহারাজ বললেন, "তুই তো বড় ঘেমে গেছিস। তোর কষ্ট হচ্ছে। এখন থাক।" আমি ঃ "মহারাজ, আপনার সেবা করে যে আনন্দ পাচ্ছি, তার তুলনায় এ কষ্ট কিছুই নয়।"

মহারাজ মধ্যে মধ্যে তাস খেলতেন। খুব ভাল খেলতে পারতেন। তাঁর নাম শুনে অপরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মহারাজকে খবর দেওয়া হলে তিনি বলে পাঠালেন, আজ শরীরটা ভাল নয়, আর একদিন আসতে বলে দাও। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ হলো। তৃতীয় দিন মহারাজ বলে পাঠালেন, "বসতে বল। একটু পরে যাচ্ছি। দু-দিন ফিরিয়ে দিয়েছি, আজ আর ফেরান উচিত নয়।" নিচে এসে তাকে বললেন, "মশাই, তাস খেলছিলুম। খেলাটা খুব জমেছিল। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করবেন না।" তিনি কিছু কথাবার্তা বলে বিদায় নিলেন। কিছুদিন পরে তিনি মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন। অপরেশবাবু পরে একজনকে বলেছিলেন, "এমন সরল লোক আমি আর কখন দেখিনি। তিনি তাস খেলছিলেন, একথা আমাকে বলবার দরকার ছিল না। অপর কেহ হলে নিশ্চয় বলত না। তিনি বালকের মতো সরলভাবে আমাকে বলে ফেললেন।

মহারাজ মাঝে মাঝে পুকুরে চার ফেলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে ভালবাসতেন। মাছ গেঁথে খেলাতেন। শেষে খেলে খেলে ছেড়ে দিতেন। একদিন মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে বললেন, "অনর্থক মাছগুলোকে কষ্ট দেওয়া কেন? মারতে যদি সে একটা কথা ছিল। শুধু খেলার জন্য কতকগুলি জীবকে কষ্ট দেওয়া।"

মহারাজ বললেন, "তারকদা দেখছি বুড়ো বয়সে বৌদ্ধ হয়েছেন।" মেদিনীপুরের মোক্তার অক্ষয়কুমার সিংহ মা-র শিষ্য ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কাকেও মহারাজের দর্শনের জন্য পাঠাতেন। একবার ঐরূপ একজনকে পাঠিয়েছিলেন। সে মঠে ঢুকেই দেখে একজন সাধু ছিপ হাতে করে ঘাটে বসে মাছ ধরছে। মঠে এসে মহারাজের খোঁজ করাতে একজন বললেন যে মহারাজ পুকুরে মাছ ধরছেন। সে ভাবলে যে যাঁকে দর্শন করতে এসেছি তিনি ঐ মহারাজ! কিরকম সাধু! সাধু হয়ে মাছ ধরছেন! মহারাজের সঙ্গে আর দেখা না করে সে চলে গেল। ফিরে সে অক্ষয়বাবুকে বলল, "ভাল সাধু দেখতে পাঠিয়েছিলেন, গিয়েই দেখি তিনি ঘাটে বসে মাছ ধরছেন। দেখেই আমার ভক্তি চটে গেল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে এসেছি।" অক্ষয়বাবু বললেন ঃ "ওরে অভাগা, তোর অদৃষ্টে নেই আমি কি করবো? আমি যখন যাই কত আদর করে কথাবার্তা বলেন, কত ভালবাসেন। যে ২/১ দিন মঠে থাকি কত আনন্দ পাই তা আর কি বলব! তোর মতো হতভাগাদের তাড়াবার জন্যই ঐরূপ মাছ ধরছিলেন।" আমি যখন মেদিনীপুর যাই এই কথা তখন অক্ষয়বাবু আমাকে বলেছিলেন।

রান্নাঘরের পশ্চিমদিকে একটা ছোট ফুলের বাগান ছিল। গোলাপ, বেল, যুঁই প্রভৃতির গাছ ছিল। মহারাজ সেখানে একটি ম্যাগনোলিয়ার গাছ লাগিয়েছিলেন। বেশ ফুল। খুব সুমিষ্ট গন্ধ। ফোটা ফুলগুলি তুলে ঠাকুরের পূজায় দিতুম। অর্ধ প্রস্ফুটিত ফুলগুলি খানিকটা ডালশুদ্ধ কেটে তোড়া সাজান হতো। একদিন হরিপদ ফুল তুলতে গিয়ে ঐরূপ ডালশুদ্ধ ফুল নিয়ে আসবার সময় মহারাজের সামনে পড়ে যায়। মহারাজ দেখে খুব রাগ করলেন। তিনি বললেন ঃ "এতখানি ডালশুদ্ধ ফুল তুলতে তোকে কে বলেছে? কতকষ্টে গাছটি বাঁচান হয়েছে। এ রকম ডাল কেটে গাছটাকে মারবি নাকি?" ভাঁড়ারীকে বলে দিলেন যে ওর আজ ভাঁড়ার নেবে না। ওকে আজ বাইরে গিয়ে ভিক্ষে করে খেতে হবে। ভাগ্যে যে আমার নাম করেনি; তাহলে আমাকেও ভিক্ষায় যেতে হতো। হরিপদ বাইরে গিয়ে কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যায় মঠে ফিরে এসেছে। ভাঁড়ারী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করল, "হরিপদ এসেছে। কি করব? রাতে খাবার দেব? সারাদিন খাওয়া হয়নি।" মহারাজ বললেন, "হাঁ, রাতে ও ডবল খাবে।"

কেউ কেউ কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হয়ে কোনরূপ উন্নতি হচ্ছে না দেখে মহারাজের নিকট এসে বলত, "কি করব কিছুই হচ্ছে না।" তিনি বলতেন,

"অবিশ্বাস করতে নেই। একই তো মন্ত্র। কুলগুরুই দিন আর আমরাই দেই। মন্ত্রের কোন দোষ নেই। বিশ্বাস করে জপ-ধ্যান করতে থাক, কালে বুঝতে পারবে।"

এক সময়ে আমি খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলাম। তখন বর্ষার শেষে খুব ম্যালেরিয়া হতো। মঠে থেকে শরীর কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না, মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিল। একদিন বিপিন ডাক্তার (জামাই) মঠে এসেছিলেন। তিনি আমাকে ঐরূপ দেখে তাঁর বাড়িতে আমাকে যেতে বললেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠে আছেন, মহারাজ বলরাম মন্দিরে। বিপিনবাবু মহাপুরুষ মহারাজকে বলে আমাকে কলকাতায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে থাকাকালীন একদিন মহারাজের সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। আমার শরীর তখন একরূপ দেখে, তিনি আমাকে কাশী সেবাশ্রমে পাঠালেন। মহারাজও কিছুদিন পরে কাশীতে এসেছিলেন। সেটা ১৯২১ সাল। সে বৎসর চারুবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি অনেকে মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কাশীতে মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমের উপরের ঘরটিতে থাকতেন। বাঙ্গাল মা ঐ ঘরটি মহারাজের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন। একদিন কথায় কথায় মহারাজ যখন বৃন্দাবনে কুসুম সরোবরে তপস্যা করতেন সেই সময়ের কথা বলছিলেন, "কুসুম সরোবর বড় সুন্দর জায়গা। বেশ নির্জন। বসবামাত্র ধ্যান জমে যেত। গভীর রাত্রে এক বাবাজী এসে আমি কি করছি দেখতেন। ঘুমিয়ে থাকলে জাগিয়ে দিতেন। কিন্তু ঐ বাবাজীকে কখনও দিনের বেলায় দেখতে পাইনি।" মহারাজ বলতেন ঃ "জপ-ধ্যান যখন তখন এলোমেলোভাবে করলেই হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময় জপ করতে হয়। বৃন্দাবনের সময় রাত্রি ২টা থেকে ৪টা। কাশীর সময় রাত ৩টা থেকে ভোর। বেলুড় মঠে ৪টা থেকে ভোর। ঐ সময় Spiritual Current বইতে থাকে। ঐ সময় জপধ্যান করলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়। ভদ্রকে দেখলুম সম্পূর্ণ অন্যরকম। (ভদ্রক উড়িষ্যার অন্তর্গত বলরামবাবুর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত।) সেখানে ভোর রাত্রি, সন্ধ্যাতে বসে দেখলাম কোন সময়ে মন বসছে না। ভাবলুম কি হলো? একদিন দুপুরে ২টার সময় বসেছিলাম। বেশ জমে গেল। ওখানে বেলা ২টা থেকে ৪টা জপ-ধ্যানের উপযুক্ত সময়।

১৯১৬ সালে আমরা ১২ জন একসঙ্গে মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নিয়েছিলাম। ইতঃপূর্বে ২/৪ জন করেই প্রায় সন্ন্যাস হয়েছে। এতজনের

একসঙ্গে সন্ন্যাস মহারাজ এই প্রথম দিলেন। পরের বছর আরও বেশি—বোধহয় ১৬ জন। একদিন গঙ্গার দিকে বারান্দায় বেঞ্চিতে মহারাজ বসে আছেন। নিকটে আমাকে দাঁড়ান দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এবার কি সন্ন্যাস নেবে?" আমি ঃ "আপনি কৃপা করে দেন তো নেব।" মহারাজ ঃ "আচ্ছা, এবার তুমি দণ্ডী হও।" আমি চুপ করে রইলাম।

Relief-এ যাবার জন্য লোকের দরকার। শরৎ মহারাজ এসেছেন বাগবাজার থেকে। তিনি বাবুরাম মহারাজকে লোকের কথা বললেন। লোকের কষ্ট হচ্ছে, তাদের সাহায্য করা দরকার। দেখে শুনে কয়েকজনকে দিতে হবে। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "এই তো সব ছেলেরা রয়েছে, দেখ তুমি কাকে কাকে চাও। মঠের সব কাজকর্মও রয়েছে।" ২/৪ জনকে জিজ্ঞাসা করাতে তারা আপত্তি জানাল। শরৎ মহারাজ দুঃখ করে বললেন, "মঠ তো এখন হৃষীকেশ হয়েছে। লোক পাওয়া যাবে কি করে?" তিনি খাবার সময় শ্লোক বলা লক্ষ্য করে একথা বলেছিলেন।

মহারাজের নিকট একথা উঠল। বিকালে মহারাজ সকলকে ডেকে উপরের বারান্দায় বসে তাদের কার কি আপত্তি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। শরৎ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গিরিজা মহারাজ অগ্রণী হয়ে আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন ঃ "Relief-এ কাজ করতে গিয়ে আমাদের জপ-ধ্যান হয় না। রাতদিন কেবল খাটতে হয়।" গিরিজা মহারাজ তপস্যা করতে যাবেন বলাতে, মহারাজ বললেন ঃ "এত কি খাটতে হয় তোমাদের? প্রথমটা একটু খাটুনি বেশি পড়ে বটে, পরে তো তত খাটতে হয় না। সুতরাং তোমাদের জপ-ধ্যানের কিরূপ ক্ষতি হয় বুঝতে পারছি না। বাইরে ভিক্ষে করে খেয়ে তোমরা যে খুব বেশি সাধন ভজনে রত থাক—তাও তো শুনতে পাই না। হৃষীকেশে গেলেই খুব সাধন ভজন হয় নাকি? অনেক সময় তো শুনি ফাঁকি দিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট কর। তার চাইতে মঠে থেকে কিছু কাজকর্ম করা, আর সময় সময় গরিব দুঃখীদের জন্য কিছু কিছু কাজকর্ম এত খুব ভাল। হৃষীকেশে গিয়ে না হয় তোমাদের এদিক না হয় ওদিক। এখানে ঠাকুরের প্রসাদ পাও—শুদ্ধ অন্ন। ছত্রের অন্ন খেয়ে হজম করা কঠিন। খুব সাধন ভজন না থাকলে হজম করা যায় না। মাড়োয়ারীদের দানে হাজার কামনাবাসনা থাকে।" আর কারো কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। মহারাজের ঐরূপ কথা শুনে আর কেউ কিছু বলতে সাহস করল না।

যে বৎসর মার শরীর যায় সে বৎসর অনঙ্গ (পরে স্বামী ওঁকারানন্দ) মঠে যোগদান করে। তখন মঠে পণ্ডিত তারাসার বেদান্ততীর্থ ছিলেন। তাঁর নিকট স্বামীর মহারাজ প্রভৃতি আমরা অনেকেই ব্রহ্মসূত্র পড়তাম। সবে তিনি ন্যায় পড়ে এসেছেন। তাঁর ন্যায় পড়াবার খুব ঝোঁক ছিল। অনঙ্গ তাঁর কাছে তর্কসংগ্রহ পড়তে শুরু করল। কৃষ্ণলাল মহারাজ একদিন মহারাজকে বললেন ঃ "এই ছেলেটি তারাসারের কাছে ন্যায় পড়ছে।" শুনে মহারাজ বললেন, "ন্যায়, বেশি পড়তে নেই। ওতে মনকে বড় বহির্মুখী করে দেয়।" অনঙ্গ বলল, "ও একখানা প্রাথমিক বই। ব্রহ্মসূত্র পড়তে গেলে একটু একটু দরকার হয়।"

অনেকেই মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করতে চাইত। তিনি তাঁর পাতের অবশিষ্ট ভাত, পায়েস, ফল একসঙ্গে একটু ঘি দিয়ে মেখে সকলেকে দিতেন। তার এক অপূর্ব স্বাদ হতো। তার নাম দিয়েছিলেন, "স্যার উইলিয়ম ভট।" মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, "ভট কেমন হয়েছিল?" সকলেই বলত যে বেশ হয়েছিল।

একদিন কাশীতে মহারাজ সূর্যকে (স্বামী নির্বাণানন্দ) দিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজকে একখানা গরদের কাপড় ও চাদর পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন—চন্দ্রকে উহা পরিয়ে দিয়ে আরতি করবি। চন্দ্র মহারাজ কাপড় পড়ে চাদর গায়ে দিয়ে বসলেন। সূর্য আরতি করল। মহারাজ ছাদে দাঁড়িয়ে দেখে খুব আনন্দ করছিলেন। চন্দ্র মহারাজকে অনেকে মোহন্ত বলত। মহারাজ এভাবে মোহন্তের প্রতিষ্ঠা করলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

পাঠ্যাবস্থায় প্রথম 'মহারাজ'—ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয় স্বামীজীর তিথিপূজার দিন (১৯১২ খ্রীস্টাব্দ) বেলুড় মঠের ভিজিটার্স রুমে। ঘরের মধ্যেই বেড়াচ্ছেন। পাখোয়াজের সহিত গান হবে, সব প্রস্তুত। বাগবাজারের একটি ছেলে তাঁকে একখানি হাতে আঁকা স্বামীজীর ছবি, পেন্সিল স্কেচ উপহার দিলে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি আসনে বসলে ধ্রুপদ গান চলতে লাগলো। আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। যখন বেরিয়ে এলেন, তখন আমি ও আমার সহপাঠী শচীন উভয়ে প্রণাম করলুম। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে আসছ?" বললুম, "আমহার্ষ্ট স্ট্রীট থেকে।" বললেন, "আজ বড় ভিড়, লোকজন, আর একদিন এসো, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।" এমন মিষ্ট কথা কখনো শুনিনি। কিন্তু যতবারই এসেছি পাঠ্যাবস্থায় আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। একেবারে দেখা হলো যখন গৃহত্যাগ করে মঠে যোগ দিলুম। সবে মঠে ঢুকেছি কয়েক মাসমাত্র, মহারাজ মাদ্রাজ বা কাশী থেকে এলেন, ঠিক মনে নেই। উঠানে আমগাছ-তলায় বেঞ্চির উপর বসে তামাক খেতে লাগলেন। আমি, ঈশ্বর, বিরূপাক্ষ, বীরেন, মাখন, যতীন ডাক্তার, চারুদা, গোঁসাই, নরেনদা, গোপাল প্রভৃতি সকলে নমস্কার করলুম। বাবুরাম মহারাজ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহারাজ বললেন, "একজনকে করলে সকলকে নমস্কার করতে হয়।" আমরা তখন বাবুরাম মহারাজকেও প্রণাম করলুম। হঠাৎ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে দেখা করতে বলেছিলাম না একবার?" আমি বললুম, "হাঁ, কিন্তু যতবারই আমি মঠে এসেছি, আপনি ছিলেন না।" জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম লাগছে, পারবে তো?" আমি বললুম, "খুব ভাল লাগছে, ঠাকুরের যদি কৃপা থাকে, তা হলে আর পারব না কেন?"

তিনি বললেন, "হাঁ, হাঁ, থাকা না থাকা তাঁর হাত। বেশ কাজকর্ম কর। সর্বদাই মনে রাখবে যে ঠাকুরের সেবা করছি, মানুষের দিকে তাকিয়ে কাজ

করলে শান্তি পাবে না। ঠাকুরের সেবা করছি মনে করলে, ভাল মন্দ সকল অবস্থায় আনন্দে থাকবে।”

* * *

মঠে তখন কেনা বলে একজন চাকর ছিল। একবার তার জ্বর, কাজে কাজেই আমাকে বিরূপাক্ষ, বীরেন প্রভৃতিকে গোয়ালের কাজ, বাসন মাজা, বিচালি কাটা, মঠ ও উঠান ঝাড়ু, ঠাকুরের ঘরের বাসন মাজা, জল তোলা, বাগানের কাজ, ট্যাণ্ডা চালানো প্রভৃতি সব করতে হতো। মহারাজের দর্শনের জন্য একদিন ফল-ফুল নিয়ে বলরাম মন্দিরে গেলুম। সব খবরাখবর নিয়ে বললেন, “কাজ ভাল, তবে নিয়মিত ধ্যান-ভজন ও লেখাপড়ার চর্চাও রাখা চাই।” হঠাৎ বললেন, “তোকে আমি পাঠক করব, বক্তা করব।” আমি হাসতে লাগলুম; ভাবলুম আমি শাস্ত্রাদি কিছুই পড়ি না, কেবল কোদাল, কুড়ুল, বাঁক নিয়ে থাকি; লেখা পড়া করি না বলে ঠাট্টা করছেন। বললুম, “এবার থেকে লেখাপড়া করবার চেষ্টা করব। আমি তো ভাল সংস্কৃত জানি না, তবে বাংলা বা ইংরেজীতে যতটুকু নিজে পারি তা করব।” কিন্তু তারপর থেকে মঠে খুব পাঠ আরম্ভ হলো, বিকাল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। বাবুরাম মহারাজ ক্লাস পরিচালনা করতেন। চারুদা, বিরূপাক্ষ, মাখন, আমি হতুম পাঠক। প্রথম আরম্ভ হলো স্বামীজীর বই। মহারাজ যখন মঠে থাকতেন, তখন বাইরের গঙ্গারধারে বেঞ্চিতে বসে মাঝে মাঝে শুনতেন। সঙ্গে ব্যাকরণকৌমুদী পড়া আরম্ভ হলো। কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দজী এসে ব্রহ্মসূত্রের ক্লাস সকালে আরম্ভ করলেন। পরে ললিত, অবনী, পরেশ এসে যোগ দেওয়ায় ক্লাস খুব জোরে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে উদ্বোধন থেকে কপিল মহারাজ, রাজদা, দ্বিজেন, বিমল প্রভৃতিও যোগ দিত। এদিকে শ্রীশ্রীমহারাজ স্বয়ং ভোরে ধ্যানের ক্লাস আরম্ভ করলেন। যখন কালীকৃষ্ণ মহারাজ, শুকুল মহারাজ থাকতেন, তখন তাঁরাও ক্লাসে যোগ দিতেন।

বড় ও কঠিন কাজ ভুল করলে মহারাজ হেসে উড়িয়ে দিতেন। তিনি শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতেন ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়ে। পুরানো ফটকের কাছে একটা চাঁপার চারা যখন পোঁতা হলো, মহারাজ চারুদাকে রোজ তাতে জল দেওয়ার ভার দিলেন। বলরাম-মন্দিরে গিয়েও খবর নিতেন, “চারু গাছটায় জল দেয় তো?” হরিপদ একবার ম্যাগনোলিয়া গাছের ডাল ভাঙায় একদিন তাকে ভিক্ষা করে খেতে বললেন। আবার একজন তাঁর কাছে অনুযোগ করলেন, “ছোঁড়ারা

তামাক ধরেছে।” শুনে বললেন, “আমি ন বছর থেকে তামাক ধরেছি, তা আমার মানা কি কেউ শুনবে?”

* * *

শ্রীশ্রীমহারাজ একদিন প্রার্থনার উপর খুব জোর দিয়ে বললেন, “সরলভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। স্বাধীনভাবে মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, একটুও যেন তাতে অবিশ্বাস না থাকে। যারা দীন এবং শান্ত তারা খুব শীঘ্র তাঁর কথা শুনতে পায়। অনেকদিন তাঁকে ডাকিনি বলে, অথবা ভুলচুক হয়েছে বলে তাঁর কাছে লজ্জা করতে নেই। সরলভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেই তিনিও দেখবে সামনে দাঁড়িয়ে। ‘সরল না হলে সরলেরে যায় না চেনা’।”

একদিন সকালে বেলুড়ে তাঁর ঘরে আমাদের সঙ্ঘের নিয়মাবলী পড়া হলো। পূজনীয় মহারাজ তাঁর ছোট খাটটিতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে। স্বামী শুদ্ধানন্দজী পড়লেন। পাঠ শেষ হলে মহারাজ বললেন, “এসব কথা স্বামীজী এ দেহে থেকে বলেননি, খুব উঁচু স্তরে মনকে তুলে তারপর বলেছেন এবং তারকদা লিখেছেন। এসব কথা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেননি। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য, তাঁর ভাব প্রচারের জন্য বলেছেন। ঠাকুরের কথায় ও সেবায় সকলের সমান অধিকার—তা সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, ধনী বা দরিদ্র হোক, উচ্চ বা নীচ বংশের হোক—তাঁর কথা ও সেবা যে গ্রহণ করবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। তোমরা জীবনে এই সব সরল বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ কর, আচরণ কর, আর একধার থেকে ছড়াতে থাক, দেখবে কলির প্রতাপ নাশ হয়ে সত্য যুগের আবির্ভাব হবে।”

* * *

একজন আর একজনকে মিথ্যা গালাগালি করায় তাকে উত্তেজিত দেখে শ্রীশ্রীমহারাজ বললেন, “হরি মহারাজের কাছে গীতা পড়ছ; কিন্তু শুধু পড়লে কি হবে? সেই রকম জীবন যাপন করতে হবে। সর্বংসহ হতে হবে, লোকের কথায় টললে চলবে কেন? কেবল বিচার করে দেখবে, তুমি ঠিক সত্য পথে আছ কিনা। একরকম লোকের স্বভাব কি জান? তারা ওপর ঠোঁটে ভাল বলে, আবার নিচের ঠোঁটে মন্দ বলে। ‘সুখদুঃখে সমে কৃত্বা’ ভগবান বলছেন, জানত?”

একদিন বললেন, “কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও কুরুক্ষেত্র, এই

পদঃপীঠে তপস্যা করলে খুব শীঘ্র সিদ্ধি হয়—এ সব জায়গায় তপস্যা কর।" পরে কুরুক্ষেত্রে যখন গিয়েছিলুম পাণ্ডার খাতায় শ্রীশ্রীমহারাজের নাম দেখলুম। আবার বৃন্দাবনে গোবর্ধনের পাণ্ডারা শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের নামমালা রচনা করেছে দেখেছিলুম। শুনলুম কুসুম সরোবরে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন তপস্যা করেন, তখন একবার মৌনী অবস্থা। শীতকালে একজন শেঠ তাঁর গায়ে একখানা ভাল কম্বল জড়িয়ে দেয়। একটি চোর দেখলে, এ সাধু তো মৌনী। সে কম্বলখানি খুলে নিয়ে নিজের ছেঁড়া ময়লা কাঁথাটা তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

* * *

শ্রীশ্রীমহারাজের একবার ভাব-সমাধি দেখেছিলুম। পুরাতন মঠবাড়ির উত্তর পশ্চিমের ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। প্রায় দ্বিপ্রহর। নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) গাইছিলেন ঃ 'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব-আবেশে।' কালীকীর্তনের গান। দেখি চোখ দিয়ে অবিরল ধারা বইছে; পুলক-কম্প, সমস্ত শরীর লাল, কণ্টকিত, দাঁড়িয়ে উঠলেন। দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন এইরূপ দেখেছিলুম। নাটমন্দিরে—মাঝখানে মহারাজ, একদিকে মহাপুরুষ মহারাজ এবং অপরদিকে রামলালদাদা। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে। মহারাজ রামলালদাদাকে বললেন, "ঠাকুর যেমন এখানে দাঁড়িয়ে গাইতেন ও নাচতেন, দাদা, তেমনি করে গান।" হাত নেড়ে রামলালদাদা শ্রীশ্রীভবতারিণীর দিকে তাকিয়ে গান ধরলেন, 'কে নাচে সমরে বামা, তিমিরবরণী। শোণিতসায়রে যেন ভাসিছে নীলনলিনী॥' মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ ঠিক সেইরূপ অনুকরণ করতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে একবার করে শ্রীশ্রীজগদম্বার দিকে এগিয়ে যান, আবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসেন। তিনজনেরই সে কী ভাবের অভিব্যক্তি! বুঝলুম—স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অঙ্গগুলি কী এবং 'অনুরাগের' পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত 'ভাবের' প্রাকট্যই বা কী!

(উদ্বোধন ঃ ৫৬ বর্ষ ১ সংখ্যা)

সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

একদিন খুব গরম পড়েছে। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (রাজা মহারাজ) পুরাতন মঠ বাড়ির গঙ্গার ধারের দোতলার উত্তর-পূর্ব ঘরে বসে আছেন, বেলা দুটো তিনটে। মঠে এলে সেই ঘরেই তিনি থাকতেন, সামনে বারান্দা, ওপরে তখন টাইলশেড, দক্ষিণ দিকে স্বামীজীর ঘর। বাইরের রোয়াকের দুপাশ থেকে দুটো চীনে যুঁইয়ের লতা ওপর পর্যন্ত তোলা। একজন বাতাস করছেন। আমি ঘরে যেতেই বললেন, "আয়, হিমালয়ের ধ্যান করি, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ব্যাপারটা কি জানিস? মনটাকে একেবারে খালি করে দিতে হয়, তাতে কোন রকম সংস্কার থাকবে না, তারপর সেখানে এক চৈতন্যসত্তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। কলসী থেকে জল ফেলে দিলে কি কলসী খালি থাকে? আকাশে পূর্ণ হয়ে যায়। আকাশ কি তার আগে কলসীতে ছিল না? ছিল, কিন্তু জলের সঙ্গে মিশে ছিল। জলটা আমরা দেখতে পাই বলে মনে হয় যেন সেখানে কেবল জলই ছিল। সেই রকম মনে বাহ্য সংস্কারের সঙ্গে চৈতন্য মিশে আছেন, কিন্তু আমরা কেবল স্থূল বাহ্য সংস্কারই মনে দেখি; কারণ, ঐগুলোই আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে, নির্মল চৈতন্যকে তো আর আমরা দেখতে পাই না। কোনপ্রকারে মনকে সংস্কার শূন্য করতে পারলে নির্মল চৈতন্য দপ করে জ্বলে ওঠেন। তখন সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যই যে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ তা বোঝা যায়। নইলে মাত্র বিচার করতে করতে একটু আভাসমাত্র পাওয়া যায়। ভক্তির সহিত ধ্যানকে সহায় করে বিচার করতে হয়, তবে শাস্ত্রের কথা, মহাপুরুষদের কথা, ঠাকুরের কথা বুঝা যায়।

"আবার অন্য সংস্কার ঠেলে দিয়ে যদি একটি বিশিষ্ট সাত্ত্বিক ও শুভ সংস্কারকে সেখানে বসান যায়, তখন সেখানে আর কোন সংস্কার না থাকায় সেই প্রতিষ্ঠিত সংস্কারটি চৈতন্যের আলোকে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, বরফের পাহাড় তখন জ্যোতির্ময় হয়ে মনে হয় যেন শিব, তখন সেই শিবজ্যোতিতে সর্বাঙ্গ শীতল ও শান্ত হয়ে ওঠে।

"এইভাবে মন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে যে কোন আদর্শ বা ইষ্টবস্তুকে সেখানে বসাবে তাই জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। নইলে আজে-বাজে সংস্কারের ঘোলাটে মনে চৈতন্য প্রতিভাত হন না। যা—এই তোকে একটা মস্ত গুপ্ত কথা বলে দিলুম। গোপনে রাখবি ও সাধন করবি। ঠাকুর যে 'আশ্চর্য গামলা'র গল্প করতেন, পড়েছিস তো? যাতে যে যেমন রঙ চায়, তাতে সেই রকমই কাপড় রাঙিয়ে ওঠে—এই সেই গামলা।"

* * *

শ্রীশ্রীমহারাজ একবার দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করে বেলুড় মঠে এসে (যে বার শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত দেখতে যান) বললেন, "দেখে এলুম দক্ষিণী খ্রীস্টানরা অনেকেই হিন্দু হতে চায়, কিন্তু হিন্দুরা রাজি নয়। তাদের আমার সঙ্গে দেখাই করতে দেয় না। এক জায়গায় নদী সাঁতরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। যাদের খুব ইচ্ছে তাদের গঙ্গাজল, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এবং ঠাকুরের নাম শুনিয়ে হিন্দু করে ফেলতে হবে।"

* * *

একদিন মঠে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) খেতে খেতে বললেন, "দেখ, কাউকেও কোন কাজে পাঠাতে গেলেই সে মনে করে আমাকে punishment (শাস্তি) দেওয়া হচ্ছে। সব এখানে বসে থাকবে আর হট্টগোল করবে। যাদের spirit of service (সেবার ভাব) থাকবে তারা কাজকে ভয় করবে কেন—এখানকার কাজ duty (কর্তব্য), না service of love (প্রেমের সহিত সেবা)? স্বামীজীর হুকুম তামিল করা soldier-এর (সৈনিকের) মতো; শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামীজী বলেছেন, "Work is worship" (কাজই সেবা), আমি কিন্তু আর একটু অন্য রকম করে বলি, "Work and worship" (কর্ম ও উপাসনা)—কাজের সঙ্গে বিচার ও ধ্যান-ভজন না থাকলে ঠিক ঠিক Work is worship হয় না।"

একদিন ঠাকুর-ভাণ্ডারের রোয়াকের সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে বললেন, "ধর্ম জিনিসটা কি জানিস, fact কে fact (সত্যকে সত্য) বলে নেওয়া"—আমি মনে মনে বিচার করে দেখলুম, এ কারুর অস্বীকার করবার জো নেই, কিন্তু এটা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে একজন অতিমানবের শক্তি দরকার।"

একদিন সকালে খুব ধ্যান-ভজন চলেছে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে, কেউ নিচেই

নামে না, এদিকে বাবুরাম মহারাজ খুব চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, "ওরে, ভক্তেরা কে কোথায় আছিস নেমে আয়, ঠাকুরের রান্নার জোগাড় তো এখনও হলো না।" মহারাজ সকলকে নিচে যেতে বললেন, আর বললেন, "গিয়ে ওঁকে বল যে, মশাই মুক্তিটে দিয়ে দিন না, তা হলেই তো আর ধ্যান-ভজনের ঝঞ্ঝাট থাকে না। আপনি তো ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন।" শুনে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আচ্ছা, তোমরা সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি নেই, আমি নিজেই সব করে নেব। কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে হাটবাজার বসাও, তা হলে কিন্তু ধরে এনে কাজে লাগাব।"

* * *

শ্রীশ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্বে, একবার যখন তিনি বলরাম-মন্দিরে ছিলেন—মহাভারতের শান্তিপর্ব ও ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ হয়। কেবল মূল ও বঙ্গানুবাদ পাঠ শেষ হতে প্রায় ছ-মাস লেগেছিল। অবশ্য সব সময় মহারাজের থাকবার সুবিধা হতো না। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের ভগ্নি অর্থাৎ বলরামবাবুর স্ত্রী, বাবুরাম মহারাজের মা, যোগেন-মা, গোলাপ-মা, কখন-কখন মাস্টার মশাই, বাবুরাম মহারাজের ভাই শান্তিরামবাবু, বলরামবাবুর ছেলে রামকৃষ্ণবাবু, নিতাইবাবু এবং তাছাড়া যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেছেন এবং তখনও জীবিত আছেন, তাঁরা অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। মাঝে মাঝে রামলাল দাদা ও শিবুদা, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতিরাও দক্ষিণেশ্বর হতে আসতেন। আমি যেদিন কোন কারণে উপস্থিত হতে না পারতাম, দ্বিজেন (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) পাঠ করত। পাঠের পর কোন দিন কালীকীর্তন, কোন দিন ব্রহ্মসংগীত, কোন দিন কেবল নাম-সংকীর্তন হতো। তখন মূল গায়ক ছিল ভবানী (স্বামী বরদানন্দ) এবং শ্রীশ্রীমহারাজের প্রধান সেবক ছিল সূর্য মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ)। কোন কোন দিন কীর্তন প্রায় রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত চলতো। রামবাবুর মা উপস্থিত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের খুব ফলমিষ্টাদি খাওয়াতেন। 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমার বাড়ির আরতির পর বলরাম-মন্দিরের হলঘরে সভা বসত। ঠিক যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর বসতেন, সেখানেই পাঠের ব্যবস্থা হতো। সকলেই ঐ সময়টির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখে প্রাচীন ভক্তেরা বলতেন, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরই ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। একদিন পাঠশেষে রামলালদাদার সখীবেশে 'ব্রজে চল ব্রজেশ্বর' গানটি শুনে মহারাজের কি এক ভাবান্তর উপস্থিত হলো!

এই সময়ে মহারাজ আমাকে একদিন বলেন, "শাস্ত্রচর্চা করা ভাল। কারণ

গুরুকে তো সব সময় কাছে পাওয়া যায় না; তখন শাস্ত্রই গুরুর কাজ করেন, শাস্ত্রকে সেবা করলে শাস্ত্র সেবকের প্রতি কৃপা করেন। প্রতিমাদির মতো দেখনি বেদ ভাগবত চণ্ডী এঁদের পুজো হয়। শব্দের মধ্যে অর্থই তো রয়েছেন। ঠাকুর যে 'গ্রন্থ নয় গ্রন্থি' বলেছেন, সে সব ঈশ্বরীয় গ্রন্থ-সম্বন্ধে বলেন নি। তিনি একবার দেখেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে শালগ্রাম-শিলা থেকে জ্যোতি বেরিয়ে ভাগবতে পড়েছে, সেই ভাগবতের জ্যোতি আবার তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছে; অর্থাৎ ভক্ত ভগবান ভাগবত এক। শিখেরা গ্রন্থসাহেবের পুজো করে। আমাদের আচার্যেরা বেদের কিরূপ সম্মান করেছেন—খ্রীস্টানদের বাইবেলে, মুসলমানদের কোরানে, বৌদ্ধদের ত্রিপিটকে যেমন ভক্তি! শাস্ত্র যে সত্য তা প্রমাণ করবার জন্যই শ্রীশ্রীভগবানের নরদেহে আবির্ভাব।"

* * *

এই কথাগুলো শোনার পর গুরু কৃপায় আমার শাস্ত্রে বিশ্বাস হলো। ইংরেজীতে Higher Criticism-এর বই পড়ে আমার মনের মধ্যে যে আধুনিক ঐতিহাসিক ভিত্তিতে শাস্ত্র পড়বার উৎসাহ হয়েছিল, সেটা চলে গিয়ে বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে শাস্ত্রের যথার্থ মর্মার্থ উদ্ঘাটনের জন্য মন প্রস্তুত হলো। শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রমুখ পূজ্যপাদ মহাপুরুষের সহিত আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। কিন্তু কেউ কোন দিন আমাকে শাস্ত্র বা পূজা-পাঠ ত্যাগ করতে বলেননি। সকলেই এতে উৎসাহ দিয়েছেন; শুধু উৎসাহ নয়, বাবুরাম মহারাজ নিয়মিত ভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করলে খুব বকতেন, বলতেন—"কেবল কুলিগিরি করবার জন্য এখানে এসেছিস?" একদিন রমেশ দত্তের বাংলা ঋগ্বেদ পড়ছিলাম। দেখে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "স্বামীজী থাকলে তোমার মাথা ভেঙে দিতেন, বামুনের ছেলে হয়ে ইংরেজী মতে বেদ পড়া?" উৎসবাদিতে পূজা সংক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলে মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, "ওতে আর কি হবে, ও তো গেরস্থরাও করে।" মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, "স্বামীজীর manuscript পড়া দেখে জার্মান পণ্ডিতরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলত— 'You read a manuscript like a novel.' " মহারাজ বলতেন, "দু-দশহাজার জপ গৃহস্থরাও করে। তবে যারা রামকৃষ্ণ-নাম কিছুও করবে, তাদের অন্নকষ্ট হবে না, খেতে পরতে পাবে।"

শ্রীশ্রীগুরু কৃপায় শাস্ত্রের ভিতর দিয়েই আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতে পারে। সন্ত টমাস একুইনাসের (St. Thomas Aquinas) Summa Theologica

লেখার সময়ই সমাধি হয়—"I have seen that which makes all; What I have written and taught looks small to me."—যিনি সব করেছেন, তাঁকে সাক্ষাৎকার করেছি, যার তুলনায় আমি যা লিখেছি বা শিক্ষা দিয়েছি, তা অতি নগণ্য। এর পর টমাসের আর গ্রন্থ শেষ করা হয়নি। ভাগবতী পুঁথি পড়ার পর লেখাতে ধ্যান আরও গভীর হয়—'pen and the inkhorn'—দোয়াত-কলম স্তব্ধ হয়ে থাকে, সময়ের জ্ঞান অন্তর্হিত হয়—লেখার জ্ঞানও থাকে না, সত্যের সঙ্গে চিত্তের তদাকারাকারিতা—divine communion উপস্থিত হয়—চিত্ত দৃশ্য জগৎ ছাড়িয়ে পরম-সত্য-সুন্দরের সিংহাসনে উপস্থিত হয়।

* * *

একবার শ্রীযুক্ত বিপিন ডাক্তারের বাড়ি বিবেকানন্দ সোসাইটির অধিবেশন হলো। শ্রীশ্রীমহারাজ সভাপতি। আমাকে কিছু বলতে বললেন। আমার কিন্তু মহারাজ ও শরৎ মহারাজ সামনে থাকায় ভয়ে গলা জড়িয়ে আসতে লাগলো, পাঁচ মিনিট বলার পর যেন শব্দজগৎ শূন্য হয়ে পড়লো। তারপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হলো, পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ উত্তর দিতে লাগলেন—

প্রশ্ন—ঠাকুর এলেন, তবুও লোকে নিচ্ছে না কেন?

উত্তর—বড় গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে। একি তুবড়ি যে খানিক ফুল কেটে তক্ষুনি নিভে যাবে?

প্রশ্ন—প্রচার আরও বেশি হওয়া দরকার নয় কি?

উত্তর—ঠাকুরের কথাগুলো জীবনে যতটা পার পরিণত কর, তা হলেই তোমাদের দেখে লোকে শিখবে, প্রচার আপনা আপনি হবে।

প্রশ্ন—স্বামীজী বেদান্তের উপর এত জোর দিলেন কেন?

উত্তর—লোকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, সেইটে ফের ফিরিয়ে আনবার জন্য; ধর্মে অনেক কুসংস্কার ঢুকে গেছে, তা থেকে ধর্মকে শুদ্ধ করবার জন্য; অতীতের সমাজ বর্তমান অবস্থায় চলে না, সেইজন্য সেটাকে একটু উদার করবার জন্য।

শেষে শ্রীশ্রীমহারাজ বললেন, "ঠাকুরের ধ্যান কর, ধ্যান করলেই তাঁর ভাবগুলো ভেতরে ঢুকবে। ভাব ভেতরে ঢুকলেই সেইরূপ কাজও হবে—এই পৃথিবীটা দেখবে স্বর্গ হয়ে যাবে!"

* * *

একদিন শ্রীশ্রীমহারাজ 'উদ্বোধনে' ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসছেন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে; আমি নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। নামতে নামতেই বলতে লাগলেন, "আপন সাধনকথা না বলিবে যথাতথা।" ঠাকুর বলতেন, 'ধ্যান করবে মনে বনে ও কোণে'। গানে আছে জানত, 'মন তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।' লোকের সঙ্গে প্রথম অবস্থায় সাধারণ ভাবে ধর্মচর্চা করতে হয়, ব্যক্তিগত সাধন নিয়ে সাধারণে চর্চা করা উচিত নয়—ভাব ফিকে হয়ে যায়, সাধন-ভজনের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে নানা লোকের হট্টগোল সেখানে বেশি থাকতে নেই, সেখান থেকে সরে যেতে হয়—হয় কোন কাজে মন দিতে হয়, নয় নির্জনে গিয়ে বসতে হয়।

১৯২০ সনে পূজার পূর্বে হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে কাশীধাম হয়ে আসি। তখন পূজ্যপাদ হরি মহারাজের নিকট ললিত (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) 'যোগবাশিষ্ঠ' পড়ত এবং বহু সাধু ও প্রবীণ গৃহস্থ শ্রবণ করতেন। প্রসঙ্গক্রমে একদিন ব্রহ্মলোকের আলোচনা হয়। পরে মঠে দুর্গাপূজা কাটিয়ে 'উদ্বোধনে'র কার্যভার গ্রহণ করি। শ্রীশ্রীমহারাজ তখন বলরাম-মন্দিরে কাশী আশ্রমের খবর নিতে লাগলেন, কথায় কথায় যোগবাশিষ্ঠের ব্রহ্মলোকের এক উৎসবের (কাক ভূশণ্ডীর জন্মকথা-সম্বন্ধে) কথা উঠলো। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মহারাজ, এই সব লোক-সম্বন্ধে আপনার মত শুনলে আমাদের মনে খুব দৃঢ় বিশ্বাস হয়।" এমন সময় সেখানে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের ভ্রাতা শান্তিরাম বাবু ও অনঙ্গ (স্বামী ওঁকারানন্দ) উপস্থিত হন। বললেন, "দেখ, একবার জগন্নাথে দেখলুম একজন দেবতাদর্শনে এসেছেন, তাঁর গায়ের গন্ধ যেমন ৭/৮ শো বিঘে জমিতে বেল ফুল ফুটলে হয় তেমনি। তোমরা ভাব কেবল বুঝি মানুষেই তাঁকে দর্শন করতে আসে—দেবতারাও আসেন। এই থেকে ব্রহ্মলোক-নিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারবে।"

এর পরে একবার বেলুড় মঠে ঠাকুরের তিথিপূজার দিন হঠাৎ রাত্রে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ময়ূরচড়া দেবী কে, চারিপাশে মেলা পাখি।" আমি চণ্ডী থেকে কৌমারী শক্তির স্তব বললুম, "ময়ূরকুক্কুটবৃতে"। তিনি বললেন, "ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছিলেন। কিন্তু কুক্কুট মানে কেবল কুঁকড়ো না, পাখিও হয়।" তখনই লাইব্রেরী থেকে দেবীভাগবতের ও দুর্গাসপ্তশতীর টীকা এনে দেখা হলো। একটা টীকাতে দেখা গেল কুক্কুট মানে পিচ্ছ, ময়ূরকুক্কুটবৃতে মানে ময়ূরপিচ্ছধারিণী।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল বললেন, "তন্ত্রে কিন্তু ময়ূর ও কুক্কুট দুই আছে।" মহারাজ বললেন, "তা থাকতে পারে, কিন্তু আমি দেখলুম নানা পাখির দল।"

* * *

মঠের পুরানো গেটের পাশে একটা ছোট পুকুর ছিল, শ্রীশ্রীমহারাজ মাঝে মাঝে ছিপ নিয়ে বসতেন। বলতেন, "এতে ধ্যান-অভ্যাস হয়, চিত্ত-সরোবরে ভাবরূপ ফাতনাটা লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়, কখন ফাতনা নড়ে।" আমাদের ভোরে উঠতে দেরি হলে, বিছানার পাশে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন, "হর হর মহাদেব।" মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে না থাকলে আমরা পুরাতন ঠাকুরঘরের পেছনের ঘরে ধ্যান করতুম, শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ সেখানে বসতেন। সেটা ধ্যানঘর বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু তিনি মঠে থাকলে তাঁর ঘরে বসেই তাঁর সঙ্গে ধ্যান করতে হতো। তাঁর যখন ধ্যান ভাঙত, তখন প্রথম স্তোত্রপাঠ ও পরে ভজন-গান হতো। কোন কোন দিন শীতকালে বেলতলায় ধুনি জ্বেলে ধ্যান করা হতো, মহারাজ গিয়ে মাঝে মাঝে দেখে আসতেন। আবার পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকেও প্রায়ই পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতেন। তাঁর ধ্যান ভাঙলে সেখানে মাঝে মাঝে ভজনও হতো। একবার শিবরাত্রির সময় তিনি সারারাত ধরে ঐ বেলতলায় বসে পূজাদি দর্শন করেন এবং ভজনের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজান। তাঁরা এইগুলোর ওপর খুব বেশি জোর দিতেন।

আবার মহারাজের ঘরে ধ্যানাদির পর তিনি অনেক সাধন-রহস্য প্রকাশ করতেন। একদিন বললেন, "নির্বিকল্প সমাধি হলে আসল ধর্মরাজ্যের আরম্ভ হলো, তার পূর্বে সবই কল্পনা। মন নির্বিকল্প হলে তবে শুদ্ধ জ্ঞানের বোধে বোধ হয়; সে বোধটা কিন্তু মহানন্দময়। সেই সচ্চিদানন্দে যার যা ভাব তার অনুপাতী সেখানে চিন্ময় মূর্তির দর্শন হয়। যেমন ঠাকুর বলতেন, 'জল আর বরফ'। মন নির্বিকল্প না হলে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ হয় না, তার পূর্ব পর্যন্ত দর্শনাদি সবই বুদ্ধির কল্পনা। বুদ্ধি যখন নিজের সর্ববিধ কল্পনা (উপাধি) ত্যাগ করে, তখন তাকে আর বিশুদ্ধচৈতন্য থেকে তফাৎ করা চলে না। বুদ্ধির বাঁধ (উপাধি) ভাঙলেই অমনি সেখানে সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেন। ঠাকুর বলতেন আল ভাঙ্গলেই জল আপনি সেখানে গিয়ে ঢোকে।"

(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ, ৬, ১০, ১২ ও ৫৪ বর্ষ, ২, ৪, ৬ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ প্রসঙ্গে

স্বামী সারদেশানন্দ

পূজনীয় মহারাজের দর্শনলাভ করিবার সৌভাগ্য সম্ভবত প্রথমবার মঠে যাওয়ার সময়েই (১৩১৯ সালে ফাল্গুন মাসে—শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসবের সময়) হইয়াছিল। কিন্তু তাঁর সহিত মিলিবার, আলাপ পরিচয় করিবার সুবিধা তখনও হয় নাই। তবে, তাঁহার সম্বন্ধে কথামৃতে অনেক কথা পড়িয়া ও ভক্তগণের মুখে তাঁহার অলৌকিক ভাব-ভক্তির কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে ভয়, বিস্ময় ও সঙ্কোচ জন্মিয়াছিল বলিয়া নিকটস্থ হইতেও সাহস পাই নাই। বয়স অল্প থাকায় (২০ বৎসরের মধ্যে) ও পাড়াগাঁয়ে জন্ম বলিয়া প্রথমবার মঠে গিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরবর্তী কালে যখন তাঁহার নিকটে থাকা ও খোলাখুলি কথাবার্তার সুযোগ হইয়াছিল তখন সেই বিরাট গম্ভীর মহান পর্বতসদৃশ মূর্তির অন্তরে যে মধুর সুধা-প্রস্রবণের করুণাধারা বর্তমান, তাহার আস্বাদ পাইয়া মোহিত ও বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই অমৃতের সন্ধান পাইবার অল্পকাল পরেই তাহা মর্তবাসীর দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাওয়াতে প্রাণ ভরিয়া পান করিবার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। সে দুঃখ এখনও অন্তরে রহিয়াছে।

মহারাজের সঙ্গে মিশিতে ভয়-সঙ্কোচের কারণও বলিতেছি। বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছিলাম মহারাজ খুব রঙ্গরসপ্রিয়, কখন কিভাবে কাহাকে উপলক্ষ করিয়া হাস্য-পরিহাসের রোল তুলিবেন তাহা বুঝা কঠিন। স্বভাবতই আমি লোকসমক্ষে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হই, তদুপরি যেখানে গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোকের সমাবেশ সেখানে অগ্রসর হইতে পারি না। মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন—মঠে, উদ্বোধনে ও বলরাম মন্দিরে—দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই দেখিয়াছি আমার নমস্যগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন। তাঁহাদের সঙ্গেই কথাবার্তা চলিতেছে। পিছনে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াই বিদায় লইয়াছি। তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমাদের বন্ধু পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আশ্রিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বিনোদবন্ধু গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন (সম্ভবত ইংরাজী ১৯১৫/১৬ সনের ঘটনা,

তিনি তখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়েন।) শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দিনে মঠে গিয়াছেন সকালের দিকে। তখনও মঠে বিশেষ ভিড় জমে নাই। রাজা মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি তাঁহাকে অঙ্গুলি নির্দেশে অল্পদূরে উপবিষ্ট জনৈক ভদ্রলোককে দেখাইয়া বলিলেন ঃ "উহার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসো— 'মহাশয়, মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী এখন কোথায় আছেন'?" তিনি মহারাজের আদেশ অনুসারে সেই ভদ্রলোকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলিলেন ঃ "কে জানে বাপু! শিবানন্দ স্বামী এখন কোথায় আছেন। মহারাজকে গিয়ে বল আমি কিছু জানি না।" ভদ্রলোকের পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বিনোদবাবু বিস্মিত-চমকিত হইলেন। তিনি পূর্বে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিয়াছেন। ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া ও উপবিষ্ট লোকদের হাসি শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে একটু সন্দেহ হইল, উনিই মহাপুরুষ নাকি? যাইহোক তিনি মহারাজের কাছে ফিরিয়া আসিয়া যখন ভদ্রলোকের জবাবের কথা বলিলেন, তখন সেখানেও হাসির রোল উঠিল। বিনোদবাবু অবাক হইয়া সেই রঙ্গরস দর্শন করিলেন এবং অপরের নিকট শুনিলেন মহারাজই রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে মহাপুরুষজীকে সাদা ধুতি-চাদর-জামা পরাইয়া বাবু বানাইয়া বসাইয়াছেন। বিনোদবাবু আমাদিগকে এই মজার ঘটনা শুনাইয়াছিলেন।

আমাদের অপর একজন বন্ধু যতীন্দ্রনাথ দত্ত (শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত) অপর এক বন্ধুর সঙ্গে বলরাম মন্দিরে বিকালবেলা রাজা মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। বৈঠকখানা ঘরে মহারাজ বহু দর্শনার্থী ভক্ত-পরিবৃত। তাঁহারা প্রণামান্তে উপবেশন করিলে মহারাজ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন তাঁহাদের জন্মস্থান শ্রীহট্ট তখন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ "উভয়ে খাঁটি শ্রীহট্টের ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলিয়া শুনাও তো দেখি।" তাঁহার বারম্বার আদেশ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া উভয়ে সসঙ্কোচে মাতৃভাষায় কয়েকটি বাক্য বিনিময় করিলেন। সেই দুর্বোধ্য শব্দ ও অদ্ভুত উচ্চারণ শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিস্মিত-স্তম্ভিত। কিন্তু মহারাজ মজা উপভোগ করিয়া খুব খুশি, হট্টিয়াগণ লজ্জিত, সঙ্কুচিত।

আমি নিজেও একবার এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। মহারাজ উদ্বোধনে আছেন, নিচে অফিস ঘরে (বর্তমানে মায়ের বাড়ির একতলার 'গদিঘরে'); পূজনীয়া মাতাঠাকুরানী উপরে আছেন। তাঁহার বাসস্থান ঠাকুরঘরে।

মায়ের সান্নিধ্যে সন্তানের হৃদয় আনন্দে ভরপুর—সদা রঙ্গরস উছলিয়া উঠিতেছে। মহারাজের এই বালকভাবের কথা তখন আমার অজ্ঞাত। আমি জয়রামবাটী হইতে পূর্বদিন রাত্রে আসিয়াছি, পরদিন সকালে মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছি তাঁহার ঘরে। মহারাজ একখানি ছোট ধুতি ও একটি ছোট ঢিলা পাঞ্জাবি গায়ে সদানন্দ চঞ্চল বালকের মতো ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং উপস্থিত সেবক ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দু-একটি রঙ্গরসের কথা—হাসি-তামাশা করিতেছেন। আমি ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়াই এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তব্ধ হইলাম। জনৈক পরিচিত সাধু মহারাজকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি কিছুকাল জয়রামবাটীতে ছিলাম। উপস্থিত সেখান হইতে আসিয়াছি। মহারাজ সেই কথা শুনিয়া আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলে, আমি নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ অতি বিনীতভাবে কাছে দাঁড়াইলাম। তখন মহারাজ একেবারে আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ওখানে গেছলা ক্যান্? বক্ত হইতে গেছলা বুঝি?" 'ভক্ত' শব্দটির 'ভ'-এর দীর্ঘ না করিয়া পূর্ববঙ্গের মতো হ্রস্ব উচ্চারণ 'ব' করিবার চেষ্টাতে অতি অদ্ভুত শুনাইল ও উপস্থিত সকলের হাস্যের উদ্রেক করিল। আমি কোন প্রকারে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িলাম। এরপরে যে-কয়দিন উদ্বোধনে ছিলাম, যতদূর সম্ভব নিজেকে মহারাজের সম্মুখ হইতে আড়ালে রাখিতে চেষ্টা করিতাম, পাছে না মুস্কিলে পড়ি। সেইজন্য এখন কত আপশোস হয়! পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানীর সান্নিধ্যে তাঁহার পরম আদরের দুলালের হৃদয় কি অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত তাহা পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষদর্শী প্রাচীন সাধুগণের মুখে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ হওয়ায় মহারাজের অদ্ভুত স্বভাবের ও আচরণের কারণ কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইয়াছে। উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণামকালে মহারাজের চাল-চলন, দৃষ্টি, বাচনভঙ্গি ঠিক বালগোপালের প্রতিরূপ হইতে দেখা যাইত। আর জগদম্বাও যশোদার ভাবে বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয়ে সন্তানের চিবুক ধরিয়া চুমা খাইতেন। পরম স্নেহাদরে জিজ্ঞাসা করিতেন কুশল সংবাদ ঃ "কেমন আছ বাবা?" বহুপূর্বে মহারাজ একবার জয়রামবাটীতে মাতৃদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। পুলকে পূরিত হৃদয়ে তিনি যে-স্থানে 'গোপাল নৃত্য' নাচিয়াছিলেন—বড় মামার সেই বৈঠকখানা ঘরটি আমাদিগকে প্রাচীনেরা দেখাইয়াছিলেন। আমাদের সেই ঘরে বাস করিবার সৌভাগ্যও হইয়াছিল এবং শ্রুত ঘটনার দিব্যস্মৃতি আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিত। পরবর্তী কালে বর্তমান মালিক ঘরখানি ভঙ্গ করাতে প্রাচীন ভক্তগণের মনে খুব কষ্ট হয়।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘরূপ মহান মহীরুহের যে সূক্ষ্মতম বীজ তাঁহার প্রধান পার্ষদ নরেন্দ্রনাথের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দরূপে নরেন্দ্রনাথ সেই বীজ অঙ্কুরিত করিয়া গুরুদেবের মানসপুত্র রাখালরাজের তত্ত্বাবধানে তাহা সুরক্ষিত করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। মহারাজ অপরাপর গুরুভ্রাতা, ভক্ত অনুরাগিগণকে একত্র সংহত রাখিয়া কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা বলে সমবেত চেষ্টায় সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করিয়া বিশাল বৃক্ষে পরিণত করেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়মাত্র লোকের নিকট প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা প্রাচীনগণের মুখে কখন-কখন কোন কোন ঘটনার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কারণ, আমরা যখন তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি তখন তিনি লোক তৈয়ার করিয়া তাহাদের হস্তেই কার্যভার অর্পণপূর্বক সাক্ষিরূপে অবস্থিত ও সময়মতো সুমন্ত্রণা দান ও সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই বিশেষ আগ্রহান্বিত, মনে হইয়াছে। তাঁহার অদ্ভুত কর্মতৎপরতা ও কুশলতা সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এ সম্বন্ধে শোনা কিছু কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

পূজ্যপাদ স্বামীজী স্থায়ী মঠে জমি সংগ্রহের জন্য অতীব ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং মহারাজের উপর উহার ভারার্পণ করিলেও দেরি হইতেছে দেখিয়া অতীব উতলা হইয়া এদিকে সেদিকে অপরের নিকটেও জমি ও বাড়ির সন্ধান লইতেছিলেন। কিন্তু মহারাজ ঐ সকল জমি পছন্দ করেন নাই। সেইজন্য একদিকে স্বামীজীকে প্রবোধ দিয়া সন্তুষ্ট রাখা এবং অপর দিকে গঙ্গাতীরে মনোমতো প্রশস্ত জমি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন সমস্যা হইয়া উঠে। মহারাজ অতিশয় ধৈর্য ও পরিশ্রমের সহিত বেলুড় মঠের বর্তমান মনোহর ভূমিভাগ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই জমির মালিকানা-স্বত্ব লইয়া অনেক গণ্ডগোল ছিল। মহারাজ বহু খোঁজখবর লইয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া, আইনজ্ঞ উকিল ও বিজ্ঞ বিষয়ী লোকের সাহায্যে সেই সকল ব্যাপারে সুমীমাংসাকরত জমি ক্রয় ও হস্তগত করিলে স্বামীজী ও অপরাপর গুরুভ্রাতা ও ভক্তবৃন্দ সকলেরই মন সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে সেই সময়ে মহারাজের কর্মতৎপরতা ও কষ্টস্বীকারের কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক প্রাচীন সাধু এক সময় বলিয়াছিলেন ঃ "মহারাজ তখন সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া চারিটি ভিজা চিঁড়া মুখে দিয়া ব্যাগের ভিতর আবশ্যকীয় দলিল কাগজপত্র পুরিয়া হাঁটিয়া বাহির হইয়া যাইতেন। দিনভোর এখানে সেখানে উকিল মক্কেল ও সহায়ক পরামর্শদাতা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া, কোর্ট অফিস করিয়া কোন দিন অপরাহ্ণে, কোনদিন

সন্ধ্যায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মঠে ফিরিতেন। কোনদিন মধ্যাহ্নে কোন ভক্ত বা পরিচিত লোকের বাড়িতে খাওয়া হইত, কোনদিন হইত না। কোনদিন অপরাহ্লে মঠে ফিরিয়া ঠাণ্ডা ভাত, কোনদিন ভিজা চিঁড়া, কোনদিন বা উপবাসের পর রাত্রেই একেবারে অন্নগ্রহণ করিতেন। এজন্য কেহ কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তি, অবসাদ, দুঃখ বা নৈরাশ্যের কথা শুনে নাই।"

অপর একজন প্রাচীন সাধু বেলুড় মঠের সম্মুখস্থ গঙ্গাগর্ভে যে ঘাট ছিল তাহা বাঁধাইবার সময়ে মহারাজের কর্মতৎপরতা, উৎসাহ-উদ্দীপনার বর্ণনা শুনাইয়াছিলেন। যাঁহারা সেই প্রাচীন ঘাট দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে উহা নির্মাণের কৃতিত্ব, কৌশল-সুদক্ষতা ও মনোহারিতার প্রশংসা করিয়াছেন। জ্যোৎস্নারাত্রে জোয়ারের সময় সেই ঘাটে বসিয়া থাকিলে মনে হইত যেন ধরাধামের বাহিরে স্বর্গ-মন্দাকিনীর মধ্যস্থিত দ্বীপোদ্যানে রহিয়াছি। কালে সে সুন্দর সুপ্রশস্ত সোপানাবলী সুশোভিত ঘাট ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের কৃতিত্বের কথা আমাদের মনে জাগিতেছে। ঘাট কিরূপ হইবে মহারাজ স্বয়ং তাহা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং নির্মাণ-কর্মে অভিজ্ঞ দীনু মহারাজের (স্বামী সচ্চিদানন্দ) সহায়তায় তাহা কার্যে পরিণত করেন। অর্থের অনটন থাকাতে স্থির হয় যে, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান ক্রয়ের জন্যই পয়সা খরচ হইবে। মজুর ও সহায়কদের কাজ করিবেন সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ। কাজটি অত্যন্ত কঠিন। গঙ্গায় মাত্র ভাটার সময়েই গাঁথনি চলিবে, আবার ভাটা প্রতিদিন রাত্রে বিভিন্ন সময়ে হয়। তদুপরি অজানা নূতন লোকের পক্ষে ঐ কাজের জোগাড় দেওয়াও অতীব কঠিন ব্যাপার। সেজন্য মহারাজ প্রতিদিন সকলকে সমবেত করিয়া কোন্ সময়ে কাজে হাজির থাকিতে হইবে, কাহাকে কি কাজ কিভাবে কতক্ষণ করিতে হইবে দীনু মহারাজের সহায়তায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া বলিতেন।

কর্মক্ষেত্রে যাহাতে ত্রুটি না ঘটে সেজন্য শিক্ষাকালে রিহার্সাল (মহড়া) দেওয়া হইত ঝুড়ি, কোদাল প্রভৃতি হাতে লইয়া। কে কোথায় দাঁড়াইবেন, কি করিবেন, তাহা খুব ভাল করিয়া তালিম দেওয়া হইত যাহাতে কাজের সময়ে একটি সেকেণ্ডও নষ্ট না হয় এবং কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না ঘটে। ভাটা কোন দিন সকালে, কোন দিন মধ্যাহ্নে, কোন দিন অপরাহ্লে, আবার কোন দিন সন্ধ্যায়, কোন দিন বা মধ্যরাত্রে, কোন দিন বা শেষরাত্রেও হইত। সেইভাবে প্রত্যহ কর্মীদের আহার-বিশ্রামেরও সময় নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইত। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সমস্ত গুছাইয়া পূর্বেই ঘাটের কিনারে জড়ো করিয়া রাখা হইত এবং

ঘণ্টা পড়িবামাত্র সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া নীরবে আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য আরম্ভ করিতেন। দীনু মহারাজের তত্ত্বাবধানে কাজ চলিত। মহারাজ নিজেও দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতেন। এইভাবে সুশৃঙ্খলে সেই পরম রমণীয় ঘাট অল্প খরচে অনায়াসে নির্মিত হইলে সকলের মন প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়াছিল।

মহারাজ যতদিন মর্তধামে ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত সকল আশ্রমেরই (বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র অথবা ভক্তগণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত আশ্রম) বিশেষভাবে খোঁজখবর রাখিতেন। উন্নতির উপায়-বিধান ও প্রয়োজনানুসারে উপদেশও প্রদান করিতেন। আশ্রম ও সাধু-ভক্তদের উপর মহারাজের স্নেহদৃষ্টি সম্বন্ধে কত কথাই না মনে পড়ে! একদিনের কথা বলি। সন্ধ্যার পরে মহারাজ গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সাধু-ভক্ত অনেকেই আছেন। শীঘ্রই ভুবনেশ্বর যাইবার ইচ্ছা। সে সম্বন্ধেই কথাবার্তা চলিতেছে ব্যাঙ্গালোরের বিশিষ্ট ভক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গারের সঙ্গে। মহারাজের ইচ্ছা যাইবার পূর্বে জামতাড়ার নূতন আশ্রম দেখিয়া যাইবেন। কিন্তু গ্রীষ্ম আরম্ভ হইয়াছে, দিনে প্রবল রৌদ্রে ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। সেজন্য জামতাড়ার গরম আবহাওয়ায় ফাঁকা মাঠে নূতন আশ্রমে যাওয়া ও থাকা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে। বিশেষত ভুবনেশ্বর একদিকে, জামতাড়া অপরদিকে, রেলে যাতায়াতও কষ্টকর এবং অনেক সময়ও লাগিবে। নারায়ণ আয়েঙ্গারকে মহারাজ খুব স্নেহ করেন। তিনি খুব প্রাচীন ভক্ত, সঙ্ঘের বিশেষ অনুগত, সর্বপ্রকার কার্যে সহায়ক। তদুপরি অতি উচ্চপদস্থ সম্মানিত রাজকর্মচারী। তাই সকলে সম্মানও করিয়া থাকেন। জামতাড়া হইয়া ভুবনেশ্বর যাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, এই সময়ে এইভাবে বিপরীত দিকে ঘুরিয়া যাওয়াতে ভুবনেশ্বর পৌঁছিতেও দেরি হইবে এবং জামতাড়ার গরমে সেখানে থাকা, দেখাশুনা খুব কষ্টকর হইবে। অতএব এখন জামতাড়া যাওয়া স্থগিত রাখাই ভাল। মহারাজ আয়েঙ্গার মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ কথা ধীরভাবে শুনিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন (তাঁহাদের উভয়ের কথাবার্তা ইংরাজীতে চলিতেছিল) ঃ "আমাকে সেখানে যেতেই হবে, যতই অসুবিধা হোক, আর কষ্ট হোক। আমিই ছেলেটিকে (ভাব মহারাজ—স্বামী রামেশ্বরানন্দ) সেখানে পাঠিয়েছি, বলামাত্র কোন ওজর আপত্তি না করে সে সেখানে চলে গেছে। নতুন জায়গা, সেখানে সে কেমন আছে, খাওয়া-দাওয়া কিরূপ কি করছে সব আমাকে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে হবে। ভবিষ্যতে সেখানে কি কাজ হবে, কিভাবে কি করতে হবে,

দেখেশুনে খোঁজখবর নিয়ে সব বলে দিতে হবে। টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমাকে নিজে গিয়ে না দেখলে কি চলে?" আমরা উপস্থিত সকলে মহারাজের হৃদয়বত্তা, কর্মী ও আশ্রমের প্রতি আন্তরিক দরদ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম।

পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ তখন স্বামীজীর মন্দিরের কাজ করাইতেছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কর্ম হইতে অবসর পাইয়া মহারাজের ঘরের পার্শ্বস্থিত তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় রেলিং-এর কাছে একটি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। গঙ্গাদর্শন করিতেন কি দক্ষিণেশ্বরের দিকে চাহিয়া পূর্বস্মৃতি জাগরূক রাখিতেন বলা কঠিন। সেই সময়ে কেহ কেহ প্রণাম করিতে যাইত কিন্তু বিশেষ কথাবার্তার সুযোগ হইত না। আমিও তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অল্পদূরে স্বামীজীর দরজার নিকট দাঁড়াইতাম। কোন দিন একটি-দুইটি কথা বলিতেন, কোন দিন মৌনাবলম্বন করিতেন। একদিন এইভাবে দাঁড়াইয়া আছি। সেদিন তাঁহাকে খুব পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছিল। বোধ হয় চৈত্র মাস, বেশ গরম ছিল। মহারাজের জনৈক সেবক বাহিরে আসিয়া বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মহারাজ জানতে চেয়েছেন আপনি অমুক (একটি বিদ্‌ঘুটে নাম) ফল খাবেন কিনা?" বিজ্ঞান মহারাজ 'হো-হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন আর বলিলেন ঃ "বাবা, বুড়ো হয়ে গেলুম, কই এতদিন তো ঐ ফলের নাম শুনিনি। তা মহারাজকে বলো তিনি যা দেবেন তাই খাব।" সেবক ঘরের ভিতরে মহারাজের কাছে গিয়া সব বলিলেন এবং একটু পরেই বেশ বড় একটি কমলালেবু উল্টাভাবে ধরিয়া লইয়া আসিয়া বিজ্ঞান মহারাজের হাতে দিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ সহাস্যে লেবুটি গ্রহণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে খাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ আরও কোন কোন দিন নজরে পড়িয়াছে—মহারাজ কর্মক্লান্ত বিজ্ঞান মহারাজকে গ্রীষ্মোপযোগী ফল, সরবৎ প্রভৃতি পাঠাইতেছেন এক-একটি অদ্ভুত হাস্যকর নামকরণ করিয়া। অপর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন সন্ধ্যার পরে সকলে সমবেত হইয়াছেন। নানারূপ প্রসঙ্গ চলিতেছে—হাস্যরসই প্রধান। কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহার আসনে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সকল কথাবার্তা যেন তাঁহাকে স্পর্শই করিতেছে না। হঠাৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন ঃ "বিজ্ঞান মহারাজ এরূপ চুপচাপ গম্ভীরভাবে বসে আছেন, কেন জানো? তিনি এখন 'ফোর্থ ডাইমেনশন' (fourth dimension) চিন্তা করছেন।" মহারাজের কথায় বিজ্ঞান মহারাজ ও অপরাপর সকলের হাস্য উদ্রেক করিল। সেই সব আইনস্টাইনের নূতন আবিষ্কার ও গবেষণা সম্বন্ধে বিদ্বান্মণ্ডলে খুব

আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। আমাদের মনে হইয়াছিল বিজ্ঞান মহারাজ উচ্চ গণিত শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার পক্ষে আইনস্টাইনের আবিষ্কার সম্বন্ধে চিন্তা করা স্বাভাবিক, কিন্তু মহারাজও যে সেই সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতেন তা কে জানিত!

মহারাজের সান্নিধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল ছিলেন তাঁহারা তো বিশেষভাবেই জানিতেন, এমনকি আমরা যাহারা অল্পসময়ের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটস্থ হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম, তাহারাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, তিনি পারমার্থিক রাজ্যেই অধিক সময় কাটাইলেও ব্যবহারিক জগতের ব্যাপারও তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচর থাকিত না। সেইজন্য দেশের, সমাজের, পৃথিবীর অবস্থা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক—সকল ব্যাপারেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত এবং সঙ্ঘ-মঠ-আশ্রম ও সাধু ও গৃহী ভক্তগণের কল্যাণের জন্য—যাহার যে ক্ষেত্রে যেরূপ মঙ্গলকর হইবে, তাহাকে তদনুরূপ পরামর্শ দিতেন—কর্তব্য নির্দেশ ও সহায়তা করিতেন। সেই প্রবল রক্ষণশীলতা ও গোঁড়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকালে তিনি খ্রীস্ট ধর্মান্তরিত এক যুবককে পুনরায় হিন্দুধর্মাবলম্বী ও সঙ্ঘের সাধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার! সেই সাধু লখনৌ আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ হন। স্বদেশী যুগ, বিপ্লববাদ ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনাকালে মঠ-মিশন কিরূপে তিনি সুপথে পরিচালনা করিয়াছিলেন ও আদর্শনিষ্ঠ রাখিয়াছিলেন তাহাও বিস্ময়কর। আবার বিপ্লবীদলের সদস্য এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিচিতগণকেও মঠে স্থানদান, তাঁহাদের দায়িত্বগ্রহণ ও সুপথে পরিচালনরূপ কঠিন কার্য তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি রাজরোষে পতিত, অপরের চক্ষে ভয়ানক ত্যাগী যুবকদলের অন্তর স্নেহ-মমতায় জয় করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যমী অক্লান্ত কর্মিরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সম্বন্ধে অপর একটি বিষয়ও উল্লেখনীয়। স্বামী চিন্ময়ানন্দ (পূর্বে মানিকতলা বোমার মামলার আসামী শচীন সেন) মঠে যোগদান করিয়া আপনার মধুর স্বভাব ও সর্বকার্যে তৎপরতা, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গুরুজনের সেবা এবং ভগবদ্-ভজনে নিষ্ঠার জন্য মঠের সকলের প্রিয়পাত্র ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে বলিয়াছিলেন ঃ "মঠে এসে আমি আমার কর্মকুশলতার জন্য সকলেরই নিকট প্রশংসা লাভ করেছি, এক মহারাজ ছাড়া। মহারাজ এইসব ব্যবহারিক বিষয়ে তৎপরতার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন না। তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল

আমাদের যাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অনুরাগ, বিশ্বাস, ভক্তি ও সাধন-ভজনে নিষ্ঠা বাড়ে।" ত্যাগ, তপস্যার প্রতি তিনি তাঁহার আশ্রিতগণকে সর্বদাই উৎসাহিত এবং সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া সেই পথে পরিচালিত করিতেন। তাঁহার একান্ত অনুগত আশ্রিতগণকে যখন তপস্যার কষ্টকর পথে প্রেরণ করিতেন তখন সাময়িকভাবে তাহা কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরবর্তী কালে সেই সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের জীবনকে দিব্যভাবে পূর্ণ ও মধুময় করিয়াছিল।

বিশ্বরঞ্জন মহারাজ একটি ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তখন ব্রহ্মচারী। মহারাজের সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গে কাশী সেবাশ্রমে গিয়াছেন। তাঁহার সেবা করেন, সেবাশ্রমেই খাওয়া-দাওয়া করেন। তিন দিন পরে মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "সেবাশ্রমের অন্ন গরিব-দুঃখীর জন্য, তোমার এখানে খাওয়া ঠিক নয়। তুমি অদ্বৈতাশ্রমে ঠাকুরের প্রসাদ পাবে। এবং সেখানেও একেবারে কিছু কাজ না করে খাওয়া উচিত না। নিত্য সকালে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফুল তুলে দিয়ে আসবে।" এই প্রসঙ্গে বিশ্বরঞ্জন মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, তিনি যখন কাঞ্চীতে তপস্যার্থে যান ও মন্দিরের প্রসাদ-গ্রহণে জীবনধারণ করিতেন, সেই সময় কালীকৃষ্ণ মহারাজ তীর্থদর্শনে সেখানে যান এবং বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে সেখানে দেখিয়া বিশেষ সুখী হন। কালীকৃষ্ণ মহারাজও তাহাকে বলেন, মন্দিরে বিনা সেবায় প্রত্যহ প্রসাদ গ্রহণে প্রতিগ্রহ হয় এবং দাতাদের পাপের স্পর্শ হইয়া থাকে। সেজন্য তাঁহার নির্দেশে বিশ্বরঞ্জন মহারাজ তদবধি মন্দিরে ঠাকুরের সেবার জন্য নিত্য ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিতেন। বিশ্বরঞ্জন মহারাজের অন্তরে মহারাজ ও প্রাচীন সাধুদের সদুপদেশ ও উন্নতভাবে জীবন পরিচালনার আদর্শ কিরূপ দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা আমরা ঢাকাতে তাঁহার সমীপে অবস্থানকালে পদে পদে পরিচয় পাইয়াছি।

বিভিন্নস্থানে নব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমসমূহের উন্নতির জন্য মহারাজ কি করিয়াছেন তাহা সেই সকল স্থানের প্রাচীনগণের মুখে কিছু শুনিবার সুযোগ হওয়ায় বুঝিয়াছি মহারাজ সেই সকলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। জমি বাড়িঘর ও কাজকর্ম প্রত্যেকটি ব্যাপারে মহারাজ বিশেষভাবে খোঁজখবর রাখিয়াছেন ও আলোচনা অনুসন্ধানাদি করিয়া যথাযথ নির্দেশ দিয়াছেন, অর্থ ও লোক দিয়া সহায়তা করিয়াছেন। সকল আশ্রমেই জমিটি বৃহৎ ও মনোরম স্থানে হয় সেজন্য তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত এবং ঘরবাড়ি সুন্দর ও ফলফুলে আশ্রম সুশোভিত

হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতেন। স্থানীয় ভক্তদের আশ্রমকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে উৎসাহিত করিতেন। কাশী সেবাশ্রমের প্রাচীনগণের নিকট শুনিয়াছি, সেবাশ্রমের জমি লওয়ার সময় মহারাজের বিশেষ ইচ্ছা ছিল আরও জমি লইবার। কিন্তু তখনকার সেবাশ্রম পরিচালকগণ সাহস পান নাই। অবশ্য এর পর মহারাজের অভীপ্সিত জমির অনেকটা লইতে হইয়াছে। কনখল সেবাশ্রমের ক্ষেত্রেও মহারাজের উৎসাহ ও সহায়তাতেই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কাশী, কনখল দুই স্থানই সন্ন্যাসিগণের প্রধান কেন্দ্রস্থান। মহারাজ উভয় স্থানে বাস ও প্রাচীনপন্থী সাধু সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও মেলামেশা করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণকে প্রাচীনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কনখলে কল্যাণ মহারাজের (স্বামী কল্যাণানন্দের) নিকট মহারাজের সম্বন্ধে একটা সুন্দর ঘটনা যেমনটি শুনিয়াছিলাম তেমনটি বলিতেছি ঃ "পূজনীয় মহারাজ তখন কনখলে নূতন সেবাশ্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহারই নির্দেশমতো সেবাশ্রমের জমি নির্বাণী আখড়ার নিকট হইতে সবে ক্রয় করা হইয়াছে। বর্তমান লাইব্রেরি-ঘরের উত্তরে এখন যেখানে প্রাঙ্গণ, সেই স্থানে একটি ফুলের চালাঘর মাত্র সাধুদের আশ্রয়স্থান। সেই ঘরের একপাশে একখানা খাট, মহারাজ তাহাতে শয়ন করেন। অপর পাশে ওপর-ওপর রাখা প্যাকিং বাক্সে ঔষধ, ডিস্পেনসারির অন্যান্য সামগ্রী। মাঝখানে মাদুর বিছাইয়া মহারাজের খাটের পাশে আমরা শয়ন করি। এই ঘর হইতে একটু দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে একটি কুশের বেড়া দেওয়া ছোট একটি কুটির, তাহাতে রান্না-খাওয়া, ভাঁড়ার আর পাচক থাকে। রান্নার সময় যে পাচক, অন্য সময় সে মালী—আবার ডিস্পেনসারির প্রয়োজনে যখন দরকার, সে-ই সব কাজ করে। মহারাজের একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছি। ভাল খাবার অথবা খারাপ খাবার যখন যেমন হউক সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই খাইয়া স্বচ্ছন্দে সুখে দিন কাটাইতেন। চাকরটি মোটা মোটা রুটি করিত, আর শীতের সময় তখন মূলার তরকারি হইত। মহারাজ তাহা দিয়াই অম্লান বদনে পেট ভরিয়া খাইতেন। তখন এইসব জায়গায় ভাল সবজি-তরকারি কিছুই পাওয়া যাইত না। শীতের সময় সেদিন বাদলা হইয়াছে, দিনের বেলা অন্ধকার, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, লোকজন ঘরের বাহিরে বড় একটা নাই। প্রবল শীতে ঔষধ লইতেও সেইদিন খুব কম লোক আসিয়াছিল। আমরা দুপুরের খাওয়া শিগ্‌গির শিগ্‌গির খাইয়া ঘরে শুইয়া পড়িয়াছি। পাচকটি গম ভাঙ্গিতে কি অন্য কোথাও কোন কাজে গিয়াছে। মহারাজের দিনে কি

রাত্রিতে ঘুম বড় একটা ছিল না। খানিক শুইয়া, উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন খাটের উপরে। পাচকটি রান্নাঘরের নিকটে খানিকটা জমিতে সরিষার শাক বুনিয়াছিল। মহারাজ জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, বড়বড় দাঁতওয়ালা একটি প্রকাণ্ড জংলী হাতি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই সরিষার শাক খাইতেছে। মহারাজ খুব আস্তে আস্তে আমাদের জাগাইয়া তুলিয়া সেই হাতি দেখাইলেন। দেখিয়াই আমরা ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। জংলী হাতি হিংস্র জানোয়ার—সহজেই রাগিয়া যায়। ভয় হইল হয়তো আমাদের চালা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। মহারাজ আমাদের আশ্বস্ত করিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া চুপচাপ করিয়া থাকিতে বলিলেন। যেন হাতি বুঝিতে না পারে এখানে কোন মানুষ আছে। আমরা তাঁহার নির্দেশমতো কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া রহিলাম। কিন্তু ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ কুশের বেড়ার ফাঁক দিয়া হাতির গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরেই হাতিটি মাথা তুলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া সোজা পিছনের দিকে বাহির হইয়া গেল। তখন আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম।”

কনখলে তখন ভাল জাতের ফলের গাছ ছিল না। মহারাজের চেষ্টাতেই আশ্রমে ভাল আম, বেল, লিচু ও অন্যান্য ফল-ফুলের গাছ লাগানো হয়। পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে উৎকৃষ্ট আমের কলম আনা হইয়াছিল এবং আমের ফলন খুব ভাল হওয়ায় কল্যাণ মহারাজের বাগানের প্রতি খুব মনোযোগ হইয়াছিল। আমরা কনখলে মহারাজের লাগানো একটি সুন্দর লাল রঙের লতানো ফুলের গাছ দেখিয়াছিলাম যাহা বড় আম গাছে বিস্তৃত হইয়া আশ্রমের শোভাবর্ধন করিত। আর একটি ঝোপাকৃতি পুষ্পবৃক্ষ দেখিয়াছি যাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগন্ধী সাদা রঙের অসংখ্য ফুল ফুটিয়া দর্শকদের মনোরঞ্জন করিত। মহারাজ উত্তর ভারতের বৃক্ষাদি দক্ষিণদেশে, আবার দাক্ষিণাত্যের গাছপালা আর্যাবর্তে আনিয়াছিলেন। ঢাকার প্রাচীন ভক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস (স্বামীজীকে পূর্ববঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের অন্যতম) স্বামীজী ও মহারাজের কয়েকটি স্বহস্তলিখিত পত্র আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ তাঁহাকে এক পত্রে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, নূতন (বেলুড়) মঠে লাগাইবার জন্য ঢাকার নবাবের বাগান হইতে দুর্লভ ‘পদ্মকোষ’ কাঁঠালের বীজ সংগ্রহ করিয়া দিতে। যতীনবাবু সেই বীজ পাঠাইয়াছিলেন। মঠে সেই বৃক্ষ ও ফল আমরা দেখিয়াছি। বর্তমানে মঠে যেখানে মাতাঠাকুরানীর মন্দির নির্মিত হইয়াছে—তাহারই সন্নিকটে কাঁঠাল

গাছটি ছিল। ছোট ছোট গোলাকার কাঁঠাল। গাছটিতে কত ফল যে ধরিত। কাশী সেবাশ্রমেও মহারাজের বাগানের জন্য আগ্রহ ও বৃক্ষাদি লাগাইবার কথা শুনা যায়। এই সম্বন্ধে জনৈক প্রাচীন সাধু আমাদের বলিয়াছিলেন ঃ "একসময়ে মহারাজ কাশী সেবাশ্রমে রহিয়াছেন। সেখানে ফুলবাগানে ভাল ফুল হয় না বলিয়া বাগানের তত্ত্বাবধায়ক আপশোস করিতেছেন। মহারাজ তাঁহাকে দুটি খালি ড্রাম সংগ্রহ করিয়া রান্নাঘরের বাসন যেখানে মাজা হয় তাহার নিকটে রাখিয়া উচ্ছিষ্ট ডাল-ভাত-তরকারি প্রভৃতি তাহাতে ঢালিয়া ভর্তি করিতে বলিলেন। কয়েক দিনেই ড্রাম দুইটি ভর্তি হইল ও পচা দুর্গন্ধ বাহির হইল। তখন উহা ভাল করিয়া ঢাকা দেওয়াইয়া, সরাইয়া বাগানে নিয়া রাখিতে বলিলেন। আরও কিছুদিন পরে উহা যখন সম্পূর্ণ পচিয়া মিশিয়া গেল, তখন ফুলের বাগানে সার হিসাবে ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিলেন। সেই সারের গুণে সে-বৎসর চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া প্রভৃতি এমন চমৎকার হইল যে, সকলেই দেখিয়া মোহিত হইলেন। ভুবনেশ্বর মঠের বর্তমান পরিবেশ নানা জাতীয় বৃক্ষ ফল-ফুল-সুশোভিত বাগান দেখিয়া এখন কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না কিরূপ মরুভূমি-সদৃশ জমি উহা ছিল। মহারাজের রাজবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, অলৌকিক শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় ভুবনেশ্বর মঠ। জনবসতিবিরল, ধ্বংসাবশেষ পূর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল অঞ্চলে বিস্তৃত জমি গ্রহণ ও বহু অর্থব্যয় ও কায়শ্রমে এই মঠ নির্মাণ তখন অনেকেই ভাল চোখে দেখেন নাই। কারণ, কাহারও কল্পনাতেও আসে নাই যে, ঐ স্থান ভবিষ্যতে উড়িষ্যার সুরম্য রাজধানীতে পরিণত হইবে।"

মহারাজ কাশী, বৃন্দাবন, কনখল প্রভৃতি স্থানে থাকাকালে অধিকাংশ সময় উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবেই কাটাইতেন সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের দিকেও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। এই সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনা যায়। আর মহারাজের অমোঘ ইচ্ছাও আশ্চর্যরূপে পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে। শুনিয়াছি ব্রজভূমে কুসুমসরোবরে তিনি যখন তপস্যা করিতেন তখন ব্রজের এসব অঞ্চলের ত্যাগি-তপস্বী ভজননিষ্ঠ বাবাজীগণের ভিক্ষার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মনে খুব দুঃখ হইত এবং তাঁহাদের ভিক্ষার সহায়তার জন্য একটি ছত্র (অন্নসত্র) প্রতিষ্ঠার কথাও তাঁহার মনে হইত। তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্পের ফল তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যাইবার কিছুকাল পরেই ফলিয়াছিল। কুসুম-সরোবর ও রাধাকুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে গোয়ালিয়রের মহারাজের ভাই এক সুবৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রজবাসী ভিক্ষাজীবী সাধুদের সেবার জন্য বহু টাকার স্থায়ী তহবিল তৈরি করিয়া দেন। তাহার আয় হইতে বহু সাধু নিয়মিত সাহায্য পাইয়া থাকেন।

মহারাজের আনুকূল্যেই বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ঐ অঞ্চলের নিরাশ্রয় অসুস্থ সাধুগণেরও সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

বাগানে চাষবাস সম্বন্ধে মহারাজের আগ্রহ ও উৎসাহ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার কামারপুকুর হইতে আসিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে রোপিত গাছের কতকগুলি আম নিয়া আসি। যতদূর মনে পড়ে তখন বৈশাখের শেষ কিংবা জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ হইবে। শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে, তাঁহারই জন্য আম আনা। আম তখনো ঠিক পাকে নাই; গাছের উপরের ডালে কয়েকটি আমে একটু রং ধরিয়াছিল। গাছে চড়িয়া স্বহস্তে আম কয়টি পাড়িয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। আসিবার সময় কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কেশবানন্দ তাঁহাদের চাষের নূতন পটলও কিছু আমার হাতে দিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের জন্য। উদ্বোধনে পৌঁছিবার পর শ্রীশ্রীমাকে প্রণামান্তর আম, পটল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দিলাম। তিনি আমার নিকট সকলের কুশল সমাচার পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পরদিন অপরাহ্ণে গোলাপ-মা আমার হাতে একটি পুঁটলিতে কয়েকটি আম ও কিছু পটল দিয়া আমার সঙ্গে বলরাম মন্দিরে মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলেন। মাতাঠাকুরানীই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। বিকালে সেখানে ভিড় জমে বৈঠকখানা ঘরে। গোলাপ-মার সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হইল বারান্দার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। মহারাজ সেখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলাম। গোলাপ-মার সঙ্গে হাসিমুখে মহারাজের কুশল বিনিময় হইল ও মহারাজ শ্রীশ্রীমা, শরৎ মহারাজ, রাধু ও উদ্বোধনের সকলের খোঁজখবর লইতেছিলেন। আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া নীরবে তাঁহাদের সুমধুর প্রীতিপূর্ণ কথাবার্তা শুনিয়া খুব আনন্দ পাইতেছিলাম তৎপরে গোলাপ-মা আমার পরিচয় করাইয়া মহারাজকে বলিলেন ঃ "ছেলেটি কামারপুকুরের ঠাকুরের গাছের আম নিয়ে এসেছে, কোয়ালপাড়া আশ্রম থেকেও তাদের নিজেদের চাষের পটল পাঠিয়েছে। মা তোমার জন্য পাঠিয়েছেন।"

আমি পুঁটলিটা খুলিয়া মহারাজের সম্মুখে ধরিলে মহারাজ আগ্রহান্বিত হইয়া স্বহস্তে আম কয়টি হাতে তুলিয়া লইয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেন। একটু পরে প্রসন্নচিত্তে সেবককে ডাকিয়া আমের অম্বল রান্না করিবার জন্য বলিলেন। আমগুলি তখনো ভাল পাকে নাই, টক হইবে, সেইজন্যই অম্বল করিতে

বলিলেন, মনে হইল। পটলগুলিও বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আশ্রমের জমিতে ওরা নিজেরা চাষ করে এমন সুন্দর পটল ফলিয়েছে ?" আমি বলিলাম ঃ "আমার সাক্ষাতেই তাঁরা খেত থেকে তুলে দিয়েছেন। এখনো ভাল ফলেনি। সবে ধরতে আরম্ভ করেছে, তাই পুষ্ট হয়নি, সেইজন্য বেশি দিতে পারেনি।" সেই ছোট্ট ছোট্ট অপুষ্ট পটলও মহারাজের নিকট চিত্তাকর্ষক ও পরমাদরণীয় হইয়াছিল। সে সময়ে কলকাতায় কত ভাল ভাল পটলের প্রচুর আমদানি হইত। আশ্রমের সাধুদের হাতে ফলিয়াছে বলিয়া মহারাজ কোয়ালপাড়ার আশ্রমের সাধুদের আশীর্বাদ ও তাঁহাদের চেষ্টা, উদ্যম ও কর্মতৎপরতার প্রশংসা করিলেন।

কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের অনুকম্পা সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান বিষ্ণুপুরে প্রাচীন কালে অতি উৎকৃষ্ট একপ্রকার তামাক প্রস্তুত হইত। তাহার নাম ছিল অমৃত তামাক। কত দূর-দূরান্তরে এই তামাকের নাম প্রচার ও ধনী ধূম্রপায়িগণের নিকট পরমাদরের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে বিষ্ণুপুরের তামাকব্যবসা জমিয়া উঠিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজাগণের রাজত্বনাশ, রাজ্যের পতন হইতে থাকিলে অন্যান্য শিল্প-ব্যবসার সঙ্গে তামাকের ব্যবসারও অবনতি হইতে থাকে। তৎপরে বিলাতী সিগারেটের আমদানী ও প্রচলন বাড়িলে উহা একপ্রকার বিলুপ্তই হইয়া যায়। মহারাজ তামাক খান জানিয়া স্বামী কেশবানন্দ বহু অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে সেই তামাক প্রস্তুত-প্রণালী সংগ্রহ করেন এবং কষ্ট ও আয়াস স্বীকারপূর্বক নানাস্থান হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘকালের চেষ্টায় সেই তামাক স্বহস্তে প্রস্তুত করেন এবং মহারাজের জন্য নিজে মঠে তামাক লইয়া যাইবেন স্থির করেন।

সেই সময়ে ঐ আশ্রমে দেবু নামে কোয়ালপাড়ার একটি চাষি-বালক সর্বদা যাতায়াত ও কাজকর্মে বিশেষ সহায়তা করিত। দেবু লেখাপড়া জানিত না। কিন্তু সাধুগণের সাহচর্যে সে ঠাকুর ও মায়ের উপর বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল এবং বেলুড় মঠ ও মহারাজের দর্শনের জন্য তাহার আগ্রহ বাড়িয়াছিল। মহারাজ তখন মঠে রহিয়াছেন। স্বামী কেশবানন্দ তাঁহাকে দর্শনের জন্য মঠে যাইতেছেন জানিয়া দেবুও অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইল। দেবু গরিব লোক, মহারাজকে কি দিবে? একটি সিকি সে আঁচলে বাঁধিয়া লইল মহারাজকে প্রণামী দিবার জন্য। তাঁহারা বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া রাজা

মহারাজকে দর্শন করিলেন। মহারাজ স্নেহাদর প্রদর্শনপূর্বক কেশবানন্দ স্বামীকে নিকটে বসাইয়া খোঁজখবর লইতেছেন। উভয়ের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ তামাক পাইয়া মহারাজ খুব প্রসন্ন। দেবু প্রণামান্তর কেশবানন্দের পাশে বসিয়া মহারাজকে একদৃষ্টে দর্শন ও তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে লাগিল। কিন্তু মঠের ঐশ্বর্য ও মহারাজের মান-সম্মান দেখিয়া তাহার মন একটু ভীত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে সাহস করিয়া তাহার পরমাগ্রহে আনীত সিকিটি বাহির ও মহারাজের পদে সমর্পণ করিতে পারিতেছিল না। মনে মনে কেবল সিকিটি এখন সে কি করিবে ভাবিয়া চলিতেছিল। ইতোমধ্যে মহারাজের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। দুই-একটি কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কাপড়ের দিকে মহারাজ দৃষ্টিপাত করিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেবুকে বলিলেন ঃ "তোমার খুঁটে কি বাঁধা?" অগত্যা সে বাষ্পপূর্ণলোচনে খুঁট হইতে অতি সঙ্কোচে সিকিটি বাহির করিয়া কম্পিত হস্তে মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল ঃ "আমি গরিব লোক, আপনাকে প্রণামী দেব বলে বাড়ি থেকে এই সিকিটি নিয়ে এসেছি।" মহারাজ অতীব প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহাকে স্নেহাশীর্বাদ করিলেন। দীনহীন ভক্তের উপর মহারাজের অহৈতুক কৃপাতে দেবুর অন্তরে বিস্ময় ও পুলক জন্মে। যতদিন সে বাঁচিয়াছিল, অতীব বিমুগ্ধ চিত্তে মহারাজের সেই ভক্তকৃপার কথা সে সকলকে শুনাইত।

মহারাজ সাধুগণকে একান্তে তপস্যা, অনন্যচিত্তে ভগবদ্ভজনে উৎসাহ ও প্রেরণাদান করিতেন। তবে তাহা সকলের জন্য সমান ছিল না, অধিকারি-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। এই সম্বন্ধে তাঁহার সেবক বিশ্বরঞ্জন মহারাজের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম। বেলুড় মঠে তখন অল্প সাধু-ব্রহ্মচারী। মহারাজ সকলের খোঁজ-খবর রাখেন, প্রয়োজনমতো তাহাদের কল্যাণের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশও দিয়া থাকেন। কয়েকদিন হইতে তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীর চালচলনে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীটি খুব ভক্তিমান, ভজনশীল, স্বভাব-চরিত্রও চমৎকার, কাজকর্ম নিষ্ঠা সহকারে সুসম্পন্ন করেন। সেই সময় সন্ধ্যার পরে সকলেই মহারাজের ঘরে সমবেত হইতেন। মহারাজ সকলের কুশল সমাচার লইতেন, কাজকর্মের খবর শুনিতেন ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। মহারাজ দু-চারদিন হইতে উক্ত ব্রহ্মচারীকে অনুপস্থিত থাকিতে দেখিয়া একদিন তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি নির্জন স্থানে বসিয়া আপনার ভাবে ডুবিয়া জপ-ধ্যান করিতেছিলেন। মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর উপবেশন করিলেন, মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "তুমি

আজকাল সন্ধ্যার পরে এখানে আসো না কেন?” ব্রহ্মচারী বিনীতভাবে বলিলেন ঃ “এখানে আসলে কথাবার্তায় অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য আর আসি না, একান্তে ভজন করি।” মহারাজ তাহার ভজননিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন ঃ “তা একটু সময় নষ্ট হয় হোক; তুমি রোজ এখানে এই সময়ে আসবে। আমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবে। তাতে তোমার ভালই হবে। মনের অনেক বাঁক কেটে যাবে, হতাশা চলে যাবে। একা একা থাকলে অনেক বিপরীত চিন্তা মনে আসে। সবার সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনায় সেগুলি আসতে পারে না। এতে মনেও আনন্দ পাবে। সাধন-ভজনে আরও বেশি করে মন বসবে।”

পরদিন সকালবেলা সেই ব্রহ্মচারীকে মঠে দেখা গেল না। ব্যস্ত হইয়া চারদিকে খোঁজা হইল, কিন্তু কোন সন্ধান মিলিল না। সকলে খুব দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। কলকাতা ও কলকাতার বাহিরে সন্ধান চলিল। দিনকয়েক পরেই চন্দননগরে ভক্ত ভূষণ পালের বাড়ি হইতে খবর আসিল, ঐ ব্রহ্মচারী সেখানে রহিয়াছেন এবং তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি একটি নির্জন ঘরে সর্বদা সাধন-ভজনে নিরত থাকিতেন। একদিন দেখা গেল সর্বাঙ্গে বিষ্ঠা মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন। সব শুনিয়া মহারাজ গম্ভীর ও চিন্তিতমুখে বলিলেন ঃ “আমি ওর মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কাই করেছিলাম। সেইজন্যই ওকে আমার কাছে অন্য সকলের মতো আসতে বলেছিলাম। কিন্তু সে বুঝল না।” মহারাজ তাঁহাকে আনাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ চন্দননগরে লোক পাঠাইলেন এবং মঠে আনাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা, ঔষধপত্র ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া সদুপদেশ ও সহানুভূতির দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। মহারাজের স্নেহ-মমতাপূর্ণ ব্যবহার তাহাকে বশীভূত করিল এবং মহারাজের নির্দেশে তিনি ক্রমে উৎকট তপস্যার আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যথাযথভাবে অধ্যাত্মপথে চলিতে শিখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি খুব ভাল সাধু বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন।

সমাজে যাহারা ঘৃণ্য পতিতা বলিয়া পরিচিতা, মাতৃশ্রেণীর সেরূপ কোন কোন ভাগ্যবতীর জীবন শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী, স্বামীজী ও মহারাজের কৃপাকটাক্ষে পরিবর্তিত হইয়া ভগবদ্ভক্তিলাভে ধন্য হইয়াছিল। আমরা ঢাকাতে সেইরূপ এক ভক্তিমতীকে দর্শন করিয়াছিলাম, যিনি মহারাজের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ যে সময়ে ঢাকাতে গিয়াছিলেন সেই সময়ে এই মহিলা

তাঁহাকে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথম দর্শনেই তিনি মহারাজের প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ বোধ করেন এবং রোজ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। মহারাজকে দর্শনের পূর্বে তাঁহার অন্তরে ভোগ-লালসাই প্রবল ছিল, ভক্তিভাবের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। মহারাজের কৃপাকটাক্ষে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি অঙ্কুরিত হইয়া দিনে দিনে বাড়িয়া চলিল। পূর্বের চালচলন, জীবনের ধারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ত্যাগ-তপস্যার ভাব তাঁহার অন্তরে এমন প্রবল হইল যে, ঐশ্বর্য-তৃষ্ণা, ভোগবিলাস বর্জন করিয়া তিনি দীনাহীনা তপস্বিনীর ভাবে জীবন কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখন তিনি প্রৌঢ়া, ক্ষীণ মলিন দেহ। উৎসবপর্ব উপলক্ষে আশ্রমে আসিয়া ভক্তিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণামান্তর নাটমন্দিরের একাকোণে বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন দীনাহীনার মতো। প্রসাদের ঘণ্টা পড়িলে মেয়েদের পঙক্তির একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সাধুদের প্রণামান্তর সকলের অলক্ষিতে চলিয়া যাইতেন। প্রাচীন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্বল্পকথায় উত্তর দিতেন, বেশি বাক্যালাপ করিতে চাহিতেন না। আমাকে জনৈক প্রাচীন ভক্ত তাঁহার কথা বলিয়াছিলেন। আমি তখন ঢাকা আশ্রমের কর্মী, মন্দিরে ঠাকুরসেবার কাজে ছিলাম। শেষ বয়সে তিনি ঢাকা ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের সন্নিকটে একটি কুটিরে বাস করিয়া একবেলা সামান্য আহার করিয়া নিত্য নিয়মিত গঙ্গাস্নান, জপ, ধ্যান, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ-মননে কাল কাটাইতেন। যেন প্রাচীন কালের কোন তপস্বিনী। তাঁহার নাম ছিল রাধারানী। প্রথম যৌবনে তিনি পরমা রূপসী ছিলেন। ঢাকার এক ধনী জমিদারের রক্ষিতা থাকিয়া অগাধ ঐশ্বর্য অর্জন ও ভোগ-বিলাসের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহার ভক্তিভাব এবং গভীর ও উন্নত অধ্যাত্ম-জীবন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এই অসাধারণ রূপান্তরের মূলে ছিল মহারাজের সান্নিধ্য ও উপদেশের যাদু।

মঠের ভক্তগৃহে নিমন্ত্রণে, তাঁহাদের আয়োজিত উৎসবানুষ্ঠানেও সাধুদের যোগ দিবার জন্য তাঁহার নির্দেশ ছিল এবং সে বিষয়ে যাহাতে অন্যথা না হয় সেজন্য তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপাত্রী ভক্তপ্রবর মণিলাল মল্লিকের ভক্তিমতী বিধবা কন্যা নন্দিনী, মহারাজ ও মঠস্থ সকল সাধু-ব্রহ্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করেন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। মণিলাল মল্লিকের কন্যার পক্ষ হইতে যাঁহারা নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের আন্তরিক আদর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়া মহারাজ বলিয়া দেন তাঁহার নিজের পক্ষে এই বয়সে

আর নিমন্ত্রণে যাওয়া সম্ভব নহে, তবে মঠের অপর সাধুরা যাইবেন। নির্ধারিত দিনে সকালে খবর দিয়া শুনিলেন যে, অনেকেই যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সময় মঠেও দু-একদিনের মধ্যে উৎসব-ভাণ্ডারার আয়োজন চলিতেছিল। মহারাজ নির্দেশ দিলেন রুগী, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং মঠের কাজের জন্য যাহাদের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন তাহারা ছাড়া বাকি সকলকেই নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। তখন আর গত্যন্তর রহিল না। মঠ হইতে নৌকাতে করিয়া আমরা অনেকে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় রওনা হইলাম। বাড়িটি গঙ্গা হইতে অল্প দূরে বাগানে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। সেখানে সেই পরম ভক্তিমতী ও ঠাকুরের স্নেহ কৃপালাভে ধন্যা বর্ষিয়সী মহিলাকে দর্শন করিয়া আমরা অতীব প্রীত হইয়াছিলাম। নীরবে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধুদের ভোজন ও পরিবেশনের তদারক করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স অনেক হইলেও মুখখানি বালিকার মতো, গায়ের রং তখন বেশ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ, বেশ সুঠাম সবল মনে হইয়াছিল। সেই দিনের দৃশ্য এখনও চক্ষে ভাসিতেছে। সাধুরা খাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার চোখে-মুখে আনন্দ ও তৃপ্তি যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। মঠে প্রত্যাবর্তনের পর সাধুদের মুখে সব খবর শুনিয়া মহারাজও খুব প্রফুল্ল হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ ছিলেন সর্ববিষয়েই বিচক্ষণ। ব্যবহারিক বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির জন্য বহু ভক্তকে সাংসারিক ব্যাপারেও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। জনৈক ভক্ত-যুবক ডাক্তারি পাস করিবার পর চাকুরি করিবেন, কি স্বাধীন ব্যবসা করিবেন নিজে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর অতি বিনীতভাবে তাঁহার পদতলে বসিয়া স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজ প্রথমে কিছুই বলিতে চাহিলেন না। কিন্তু যুবকটি নাছোড়বান্দা, কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার জন্য বারবার মহারাজের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তাঁহাকে কি নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা স্বকর্ণে শুনিবার সুযোগ হয় নাই, কারণ কর্তব্য ব্যপদেশে আমাকে সে স্থান তখনই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি মহারাজের ইঙ্গিতেই তিনি কলকাতায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন ও পরে প্রভূত প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠাকুরের ভাবে ভাবিত এবং মঠের আশ্রিত থাকিয়া সাধু-ভক্তগণের যথেষ্ট সেবা করিয়া ধন্য হন।

খুঁটি-নাটি সব বিষয়েই মহারাজের দৃষ্টি ছিল। একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে।

দূরস্থান হইতে রেলগাড়িতে বরফে ঢাকিয়া কোন ভক্ত মঠে একটি প্রকাণ্ড রুই মাছ পাঠাইয়াছিলেন। মাছ মঠে আসিলে পর মহারাজ ও অন্যান্য সাধুগণ দেখিয়া খুব প্রীত হইলেন। তখন বেলা ৯/১০টা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মাছ কাটিয়া রান্না করিতে দেওয়া হইল মহারাজের নির্দেশে। ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইবে। কাটা মাছ ধুইয়া রান্না ঘরে পৌঁছাইবামাত্র পাচক ভাজিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছু মাছ ভাজা হইবার পর পাচকের সন্দেহ লাগিল মাছ খারাপ হইয়া গিয়াছে, খারাপ গন্ধ তাহার নাকে লাগিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডারি মহারাজকে খবর দিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারও মনে শঙ্কা জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উপরে মহারাজের ঘরে গিয়া সব জানাইলেন। মহারাজ আদেশ করিলেন ভাজা মাছ খানকয়েক লইয়া আসিবার জন্য। মহারাজ ভাজা মাছ হাতে লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মাছ খারাপ হইয়া গিয়াছে—উহা ঠাকুরের ভোগে চলিবে না এবং এমনিতেও খাওয়া চলিবে না। ভাজা ও কাটা মাছ সমস্তই নষ্ট করিয়া দিতে বলিলেন। বাহির হইতে কিছু টের পাওয়া যায় নাই যে মাছ ভিতরে খারাপ হইয়া গিয়াছে।

মাছের সম্বন্ধে আরও একটি কথা মনে পড়িতেছে। এক সময়ে কয়েকদিন আমাকে মঠের বাজার করিতে হইয়াছিল। বাজার সামান্যই, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার জন্য মিষ্টি, টাটকা শাক, তরকারি ও মাছ। সেই সময় শনি ও মঙ্গলবারে আট আনার মাছ আসিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য। মহারাজের নির্দেশ মতো আমাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল কই-মাগুর প্রভৃতি মাছ যাহা কাদাজলে থাকে, তাহা যেন না আনি। কারণ তখন শীতকালের শেষ, খাল-বিলের জল কমিয়া গিয়াছে, ঐসকল মাছে এইসময় পোকা হয় এবং এইসময় ঐসব মাছ খাইলে অসুখ হয়। পরে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বেশিদিন হাঁড়িতে বা ডোবাতে জিয়াইয়া রাখা এবং গেঁড়ে ডোবার কাদাজলের মাছে সত্য সত্যই পোকা হয়।

মহারাজের খুঁটি-নাটি প্রত্যেক বিষয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও জ্ঞানের কথা প্রাচীনগণের নিকট তখন কতই না শুনা যাইত। তাঁহার সংসর্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের আচার-ব্যবহারেও ঐসকল সুশিক্ষার পরিচয় সর্বদা মিলিয়াছে।

মহারাজের লিখিত পত্রাবলী কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে মঠের বা সঙ্ঘের প্রথমাবস্থায় তাঁহার কর্মতৎপরতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন দেখিয়াছি তখন তিনি বেলুড় মঠের বাহিরে অনেক সময় থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার মঠের সকল সাধু-ব্রহ্মচারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টার

পরিচয় জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। মঠে পানীয় জলের অসুবিধা দূর করিবার জন্য কলের জল আনা, রান্না-খাওয়ার স্থান বাড়ানো, সাধু ও অতিথিদের থাকার জায়গা, মঠের জন্য জমি ক্রয়, রিলিফের কাজ, আশ্রমাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে মহারাজের চিন্তা, পরিকল্পনা ও প্রয়াসের সংবাদ তখন কানে আসিত।

নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজের কয়েকটি তীর্থস্থানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহারাজের ঐসকল তীর্থে বিশেষ উপলব্ধি ও ভাবাবেশ হইয়াছিল। সেজন্য ঐসকল জাগ্রত পীঠে সাধু ও ভক্তগণের অবস্থান ও ভগবদ্ভজনের সুবিধার জন্যই তিনি মঠ-আশ্রম করিতে চাহিতেন। এই সম্বন্ধে অনেকের অজানা একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ অযোধ্যাতে অতি আনন্দে প্রভুর দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থানে একটি আশ্রম স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলেন জানিয়া স্বামী জগদানন্দ ও স্বামী সম্পূর্ণানন্দ এক সময়ে কাশী অদ্বৈতাশ্রম হইতে সেখানে আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। অযোধ্যাতে সরযূতীরে গড়বেতার জমিদারের একটি বাড়ি ছিল। তাঁহারা ঐ বাড়িটি আশ্রমের জন্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী জগদানন্দ ও স্বামী সম্পূর্ণানন্দ অযোধ্যায় উপস্থিত হইবার পর স্বামী সম্পূর্ণানন্দ আমাশয় রোগে আক্রান্ত ও বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। দুই-চারিদিন অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার শরীর সুস্থ না হওয়ায় এক সপ্তাহ পরে জগদানন্দ মহারাজ রুগীকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে ঐ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা উদ্যম হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। মহারাজের বিশেষ অনুগত শিষ্য ও মালাবার-ভ্রমণ সময়ের সঙ্গী ও সেবক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ বলিতেনঃ “মহারাজ কন্যাকুমারী দর্শনে ও সেই স্থানের মনোরম পরিবেশে এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, ওখান ছেড়ে আসতে চাইছিলেন না। অনেক সাধ্য-সাধনা করে তাঁকে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে রাজি করানো গিয়েছিল। মহারাজ বলতেন ঃ ‘এই শান্তিপূর্ণস্থানে একটি কুটির করবে। আমি শেষকালে এখানে এসে নির্জনে আনন্দে থাকব’।” পরবর্তী কালে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র কেরলের জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক কন্যাকুমারীতে একটি ছোট আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মহারাজের ইচ্ছার স্মরণে তাহার নামকরণ হইয়াছে ‘শান্তিকুটির’।

মহারাজের দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শনের ও উচ্চ উপলব্ধি এবং ভাবাবস্থার

সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের ভক্তগণের নিকট অনেক কথা শুনা যাইত। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে মাদ্রাজ (চেন্নাই) হইতে তিরুপতি দর্শন করিতে যাই। দর্শনান্তে পাহাড়ের নিম্নদেশে আসিয়া সেখানে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণান্তে দ্বিপ্রহরের পর একটি পোস্টকার্ড কিনিবার জন্য পোস্ট অফিসে চলিয়াছি। রাস্তায় জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "পোস্ট অফিস কোথায়?" তিনি দূর হইতেই আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মৃদু হাস্যে বলিলেন ঃ "এখন পোস্ট অফিস বন্ধ, সেখানে কি প্রয়োজন?" তদুত্তরে আমি জানাইলাম ঃ "আমার একটি পোস্টকার্ড চাই।" তখন তিনি সাগ্রহে আমার পরিচয় লইয়া নিকটস্থ নিজের বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন ঃ "আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে পোস্টকার্ড দেব।" আমার বিশেষ জরুরি প্রয়োজন বলিয়া পোস্টকার্ড লইতে আমি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি অতি সমাদরে বৈঠকখানাতে বসাইয়া আমাকে পোস্টকার্ড দিলেন এবং ভক্তিগদগদ চিত্তে বলিলেন ঃ "আপনাদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করবার সৌভাগ্যলাভ আমার হয়েছে। তিনি যখন তিরুপতি দর্শনে এসেছিলেন আমি তখন সেখানে ডাক্তার ছিলাম। তিনি অসুস্থ বোধ করায় আমাকে ডাকা হয়। আমি তাঁকে পরীক্ষা করে ঔষধের ব্যবস্থা করি। সেই ঔষধে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং কয়েকদিন থেকে পরমানন্দে দর্শনাদি করেন। আমি নিত্যই তাঁকে দেখতে যেতাম। তিনিও আমায় খুব স্নেহ করতেন। তিরুপতিমন্দিরে শ্রীমূর্তি দর্শন করে তিনি ভাবাবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর দিব্যমূর্তি দর্শন করে আমি মোহিত হয়েছিলাম। অতঃপর তাঁকে প্রণাম করি। তখন থেকে আমার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। সাধনভজনে নিষ্ঠা বেড়েছে। কিছু কিছু অলৌকিক শ্রবণাদিও হয়েছে। সকলই তাঁর স্নেহ কৃপার ফল বলে মনে করি। আরও আশ্চর্যের কথা যে, আমরা গোঁড়া বৈষ্ণব, একমাত্র নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন ঈশ্বরবিগ্রহ বা নামে আমাদের বিশ্বাস-ভক্তি নেই। কিন্তু আমার অন্তরে এখন শক্তি উপাসনার প্রতি টান জন্মেছে, স্যার জন উড্রফের বই পড়ছি এবং আমার মধ্যে ঐ ভাব ক্রমশ পরিপুষ্ট হচ্ছে।"

মাদুরাতে মহারাজের মীনাক্ষীদর্শন সম্বন্ধে মাদ্রাজের জনৈক প্রাচীন ভক্তের নিকট শুনিয়াছি ঃ "মহারাজ নাটমন্দিরে প্রবেশ করেই ভাবাবিষ্ট হন এবং শিশু

যেমন জননীর নিকট দৌড়ে যায় ঠিক সেইরকম গর্ভগৃহে মহারাজ দেবীর দিকে ছুটে চলেন। সঙ্গী পূজনীয় শশী মহারাজ আগে থেকেই সাবধান ছিলেন। দ্বারের সম্মুখেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। গভীর ভাবাবেশে মহারাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবাবেশে তাঁর উজ্জ্বল কান্তি, অপূর্ব মুখশ্রী আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। বিস্মিত পুলকিত দর্শকগণ চারদিকে ভিড় করতে লাগল।”

মহীশূরের যাদবগিরিতে ‘মেলকোর্ট’-এর মন্দির দর্শনে গিয়াও মহারাজ সেই স্থানের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহে এমন আকৃষ্ট হন যে, সে স্থান তিনি সহজে ছাড়িতে চাহেন নাই। ব্যাঙ্গালোরে প্রাচীন ভক্তদের মুখে মহারাজের সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা শুনিয়াছি। বর্তমান ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সময় মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেইখানে গিয়াছিলেন। মহারাজের অভিপ্রায় মতো অভেদানন্দ মহারাজই ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করেন। তদুপলক্ষে তথায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। নগরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা মহারাজ অভেদানন্দ মহারাজকে সেখানে পরিচিত করাইবার জন্য একটি বক্তৃতা করেন। আমরা কখনও কোথাও মহারাজের বক্তৃতার কথা শুনি নাই। সেইজন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ নিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রায় কুড়ি মিনিট মহারাজ সেদিন ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাদের খুব হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ সরল সুন্দর ইংরাজীতে ঠাকুর স্বামীজীর ভাবাদর্শ, আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচার এবং স্বামী অভেদানন্দের প্রচারকার্যে সফলতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

মহারাজের কন্যাকুমারী দর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাদের বলিয়াছিলেন ঃ “তীর্থস্থানে দেবমন্দিরে কোন মহাপুরুষের সঙ্গে যাবার সুযোগ হলেই সেই ক্ষেত্রমহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়।

“মহারাজের সঙ্গে আমরা যখন কন্যাকুমারী দর্শন করি তখন মনে হয়েছে সাক্ষাৎ জীবন্ত বালিকা যেন মধুর হাস্যে ভক্তদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু মহারাজের সঙ্গ ছাড়া অন্য সময়ে যখন নিজেরা গিয়েছি তখন কিন্তু সেই সজীব ভাব দেখিনি, মনেপ্রাণে তেমন সাড়াও দেয়নি।”

মাদ্রাজ মঠে প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের মুখে শুনিয়াছিলাম, মহারাজ নটরাজমূর্তি

দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন তখন পায়ের ভঙ্গি ঠিক ঠিক নটরাজের পায়ের ভঙ্গির মতোই দেখা যাইত।* মাদ্রাজ মঠের নিকটস্থ কপালেশ্বর মন্দিরে একদিন জনৈক ভক্ত একটি স্থান দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ কপালেশ্বর দর্শনান্তে দেবালয় প্রাঙ্গণের অন্যান্য মন্দিরসমূহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শেষে চণ্ডেশ্বরের মন্দির দর্শন করিয়া নিকটবর্তী বিল্ববৃক্ষের তলায় জপ করেন এবং স্থানটি ভালরূপে পরিষ্কার না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, এইসকল স্থান বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিল্ববৃক্ষমূল বাঁধাইয়া রাখিতে হয়, যাহাতে ভক্তগণের বসিয়া জপধ্যান করিতে সুবিধা হয়। পরে এই কথা মন্দির কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ায় তাহারা স্থানটি পরিষ্কার ও বিল্বমূলটি বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

উদ্বোধনের ডাক্তার মহারাজের (স্বামী পূর্ণানন্দের) মুখে শুনিয়াছি, তিনি একসময়ে রাজা মহারাজের সঙ্গে পুরীতে শশীনিকেতনে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, সেই সময় মহারাজের মন সর্বদাই খুব উচ্চভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "একদিন আকাশ খুব পরিষ্কার, পূর্ণিমা রাত্রি। জ্যোৎস্নায় চারিদিক যেন হাস্যময়। মহারাজের নির্দেশে রাত্রে প্রাঙ্গণে বিছানা করা হয়েছে। মহারাজ শুয়ে শুয়েই কথাবার্তা বলছেন। আমরা যারা আছি সবাই শুনছি। কথাপ্রসঙ্গে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আমাদের ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা, তাঁর নীলাচলে বাসের স্মৃতি মহারাজের অন্তরে জাগরূক হলো। মধুর স্বরে তিনি খুব আবেশের সঙ্গে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলেন, 'এরূপ সুন্দর পূর্ণিমার রাত্রে মহাপ্রভুর ঘুম হতো না। ভগবদ্‌বিরহের স্ফূর্তিতে অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে তাঁর রাত্রি অতিবাহিত হতো। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলাম না বলে রোদন আর্তি প্রলাপে নিশি ভোর হয়ে যেত।' এইসব কথা, মহাপ্রভুর ভগবদ্‌বিরহের বিষয় বর্ণনা করতে

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁড়ানো সমাধি অবস্থার (কেশবের বাড়িতে) চিত্রে তাঁহার হস্তদ্বয়ে 'বরাভীতি' মুদ্রা দেখা যায়, তাহা ঠিক যেন শিবের হস্তের মৃগমুদ্রা' ("মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং..." শিবের ধ্যান)।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীগুরুমূর্তিরূপে 'ঐং' বীজে পূজা ও 'হর হর', 'শিব শিব' বলিয়া আরাত্রিক করা হয় (সর্বত্রই দক্ষিণামূর্তি শিব শ্রীগুরুমূর্তি বলিয়া পরিচিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তবে স্বামীজী 'ওঁ হ্রীং' বলিয়া শুরু করিয়া সশক্তিক শ্রীগুরুদেবের (শিব-শক্তি অভেদ) 'শরণ' প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুরের আরাত্রিকে "ধে ধে ধে লঙ্গ... মৃদঙ্গ" শিবের তাণ্ডবনৃত্যের তাল এবং স্তবের 'মোহঙ্কর্ষং' অজ্ঞানতিমিরহারী শ্রীগুরুমূর্তি স্মরণ করায়।

করতে মহারাজেরও ঐরূপ বিরহ ভাবের উদয় হলো। তিনিও বিছানায় ছটফট, এপাশ ওপাশ করছেন আর বার বার বলছেন, "তিনি এমন সুন্দর নিশিতে ঘুমোতে পারতেন না; কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করতেন, আর আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটাব? ধিক্ আমাদের!" বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো পূর্ণানন্দজী শ্রীশ্রীমহারাজের সেই অপূর্ব ভাবাবেশের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তি গদগদ চিত্তে বলিলেন ঃ "তাঁর সেই অপূর্ব ভাবাবেশ দেখে আমাদের চোখ থেকেও নিদ্রাদেবী পালিয়ে গেলেন। আমরা বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে সারারাত বিনিদ্র মহারাজের পাশে বসে সেই বিনিদ্র রাত্রি কাটালাম।"

তাঁহার প্রতি মহারাজের অতুলনীয় স্নেহ কৃপার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ডাক্তার মহারাজ আরও বলিয়াছেন ঃ "তখন ডাক্তারি পড়ি। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভের জন্য অন্তরে ইচ্ছারও উদ্রেক হয়েছে। মহারাজ বলরাম মন্দিরে আসার সংবাদ পেলেই সেখানে এসে তাঁকে দর্শন করি ও নিজের অন্তরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। মহারাজও খুব স্নেহের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে কাছে বসতে বলতেন। কিন্তু বসবার পর আর বিশেষ কিছু বলতেন না। তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীরভাবে তিনি বসে থাকতেন, গড়গড়ার নল হাতে থাকত, কখনো টানতেন কখনো টানতেন না। আবার কখনো আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে বারান্দায় বেড়াতেন। কখনো কোন আগন্তুক এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। আমি উঠতে চাইলে বলতেন, 'বসো, আর একটু।' আমিও আশা করে বসে থাকতাম, হয়তো এবার কিছু বলবেন। কিন্তু কোন কথাই তিনি বলতেন না। আগ্রহ দেখালে বলতেন, 'আজ থাক, আর একদিন হবে।' এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে কতদিন নিরাশ হৃদয়ে ফিরে আসতাম। মনে হতো মিছিমিছি আর ঘোরাফেরা করব না। কিন্তু না গিয়েও থাকতে পারতাম না। এক-একদিন ঐভাবে নিঃশব্দে প্রায় দুঘণ্টা কেটে গিয়েছে। মনে কত তোলপাড় করতাম। সময় যেন কাটতে চাইত না। মহারাজ ঘরে থাকলে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম, কখনো বা কাছে বই পড়ে থাকলে তার এক-একটি পৃষ্ঠা বারবার পড়তাম। এইভাবে তখন মহা অশান্তিতে কাটত, কিন্তু ফেরার মুখে মহারাজের প্রসন্ন মুখ এবং মধুর বাণী 'আবার এসো' শুনে আনন্দে মন ভরে যেত। 'কর্তব্য কি;' জানার জন্য কতদিন ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতাম কিছু উপদেশের জন্য। কিন্তু রোজ একই উত্তর, 'আজ থাক, আর একদিন হবে।' এইভাবে প্রায় দু-বছর যাতায়াতের পর মহারাজ কৃপা করেন। নিজের আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ হয়।" মহারাজের স্নেহ-মমতার কথা স্মরণপূর্বক ডাক্তার মহারাজ

অতিশয় নম্রভাবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতেন ঃ "আমাদের চঞ্চল মন স্থির করবার জন্য, ধৈর্য তিতিক্ষা বাড়াবার জন্য, অজ্ঞাতসারে মহারাজ কি চেষ্টা যত্ন করেছেন—এখন তা ভাল করেই বুঝেছি।" মহারাজের দীক্ষাদান বিষয়ে আর একটি কথাও শুনিয়াছিলাম তাঁহার (ডাক্তার মহারাজের) মুখে। মহারাজ তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন রোজ সন্ধ্যাকালে সংখ্যা রাখিয়া দশহাজার জপ করিবার জন্য। যদি কখনও সংখ্যা ভুল হয় তবে আবার প্রথম হইতে জপ করিতে হইবে, নতুবা জপের ফল রাক্ষসে খাইয়া ফেলিবে। মহারাজের আদেশ অনুযায়ী ডাক্তার মহারাজ নিষ্ঠা সহকারে একাগ্র চিত্তে নিত্য জপ করিতেন। কিন্তু কোন কোন দিন ভুল হইয়া পড়িত। তখন আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতেন। এক একদিন এমন হইত যে, সংখ্যা পূর্ণ হইতে অল্প বাকি, তখন ভুল হইয়া গেল; কাজেই আবার প্রথম হইতে পুনরায় জপ আরম্ভ করিতেন। সেই সকল দিনে রাত্রে ঠিক সময়ে খাইতে যাইতে পারিতেন না—দেরি হইয়া যাইত। এইরূপ কয়েকদিন অত্যন্ত দেরি হওয়ায় সকলেই বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। উদ্বোধনে তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও রহিয়াছেন। তিনি একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া জানিতে চাহিলেন, "রাত্রে খাওয়ার সময় আসিতে দেরি হয় কেন বাবা, তোমার?" শ্রীশ্রীমার স্নেহ ও বাৎসল্যপূর্ণ বাক্যে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মায়ের প্রবোধবাক্যে একটু শান্ত স্থির হইয়া মহারাজের দশহাজার জপের সংখ্যা পূর্ণ না করিলে জপের ফল রাক্ষসে খাইয়া ফেলিবে, সেই ভয়-ভাবনার কথা নিবেদন করিলেন। সব শুনিয়া মাতা ঠাকুরানী 'হো', 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ও রাখাল বলেছে—'রাক্ষসে জপের ফল সব খেয়ে নেবে'!" তৎপরে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাদের চঞ্চল মন স্থির ও একাগ্র করবার উদ্দেশ্যেই রাখাল এরূপ বলেছে। আমি তোমাকে বলছি এখন থেকে তুমি আর ঐজন্য কোন ভয় করো না, খাবার ঘণ্টা পড়লেই এসে খেয়ে নিও, ঐ জন্য কোন দোষ হবে না।" মায়ের আশ্বাস ও অভয়বাণী শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন এবং তদবধি সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলে সকল অসুবিধা ও গোলমাল মিটিয়া যায়।

মঠে জনৈক প্রাচীন সাধুর মুখে শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ মহারাজের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, সঙ্ঘের কার্যের প্রসার ও দীক্ষাদি দান করিবার সময় হইতেই তাঁহার এতটা বাহ্যিক বিভূতির প্রকাশ ও লোকাকর্ষণের শক্তি বিস্তার হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু পূর্বে এমন গুপ্তভাবে থাকিতেন যে তাঁহাকে দেখিলে লোকে কিছুতেই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিত না।

মহারাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা, ভাবাবেশ প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার-বুঝিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে তাঁহার কয়েকটি চিত্র যাহা অন্তরে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

মহারাজকে একই দিবসে বিভিন্ন সময়ে দেখিয়াছি, যেন বিভিন্ন মূর্তি—চোখে-মুখে, গলার স্বরে, কথাবার্তার ধরনে, এমনকি পায়ের রঙে পর্যন্ত যেন স্বতন্ত্র একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইত। সেই সেই সময়ে তাঁহার অন্তরে দিব্যভাবের অভিব্যক্তির প্রেরণায় যে উহা সংঘটিত হইত তাহা এখন বুঝিতে পারি। বস্তুত মহাপুরুষের মহাভাবসকল বুঝিবার যোগ্যতাও তো থাকা চাই!

মহারাজ একদিন সকালবেলা—বেলা আটটা নয়টার সময় হইবে—মঠে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠবাড়ির দোতলা হইতে নামিয়া স্বামীজীর মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন, সঙ্গে দু-তিন জন সেবক। একটু অগ্রসর হইয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া সহাস্যবদনে দাঁড়াইয়াছেন। একজন সেবক একখানা রেঙ্গুনের সুন্দর রঙিন ছাতা মাথার উপর ধরিয়াছেন। মহারাজের পরিধানে অতি উজ্জ্বল গৈরিক বস্ত্র ও গায়ে সেইরকম চাদর। আমি তখন স্বামীজীর মন্দিরের দিক হইতে মঠবাড়ির দিকে আসিতেছিলাম। একটু দূর হইতেই মহারাজের সেই পরম চিত্তাকর্ষক মূর্তির দিকে নজর পড়িল। বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলাম। মনে হইল তিনি যেন এ-পৃথিবীর লোক নহেন। উজ্জ্বল দেহকান্তি গৈরিক বসনের ভিতর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সমস্ত মুখাবয়ব যেন অতি কোমল ঢল ঢল লাবণ্যময় স্নিগ্ধ সুমধুর হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত। মহারাজের সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যমূর্তি আজও যেন চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

মহারাজ একবার বলরাম মন্দিরে বাস করিতেছেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে তখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। আমরা একদিন সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে সেখানে গিয়াছি। উপরের হলঘরে পাঠ হয়। পাঠক হরিহর মহারাজ (স্বামী বাসুদেবানন্দ) গ্রন্থ সম্মুখে লইয়া পাঠ করিতেছেন। ঘরভর্তি লোক। মহারাজ আপনমনে দ্রুত হলের সম্মুখবর্তী লম্বা বারান্দার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করিতেছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হইল তিনি যেন এই সংসার ছাড়িয়া অন্য কোন ভাব-জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন।

তাঁহার সেই মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত স্তব্ধ হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল এই কি সিংহবৎ আত্মারামের বিচরণ? শ্রোতাদের অনেকেই মহারাজকে দেখিতেছেন। মহারাজের কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

মঠে কতদিন দেখিয়াছি, তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া আছেন, যেন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। কিন্তু নিকটে থাকিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তখন ঠিক বুঝা যাইত—তাঁহার দৃষ্টির লক্ষ্য বাহিরে নয়, অন্তরে। চক্ষের সেই চাহনি মন মুগ্ধ করিত। ইহাই কি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত পাখির ডিমে তা দিবার দৃষ্টি?

কথাবার্তা বলিবার সময় কখনো কখনো তাঁহার কণ্ঠস্বর হইতে এমন মধুবর্ষণ হইত যে, সেই স্নেহ-করুণার ধারায় শ্রোতাদের অন্তর শান্ত ও স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। ভাগবতে যে লেখা হইয়াছে—'তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্', তাহা যে বাস্তবিক কত সত্য তাহা তখন বুঝিতে পারিতাম।

ভবানীপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ, পেশায় উকিল, মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ছুটির দিনে প্রায়ই মঠে আসিতেন, এক-দুইদিন থাকিতেনও সুযোগ সুবিধামতো। প্রৌঢ়বয়স্ক ভক্তিমান ভদ্রলোক মঠে আসিলে জপ-ধ্যানে অনেক সময় কাটাইতেন। মহারাজ ও মহাপুরুষের সঙ্গে সাধন-ভজন সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ আলোচনাও হইত। একদিন একান্তে উপরের বারান্দায় মহারাজের পদতলে বসিয়া তিনি নিজ সাধনার উপলব্ধির কথা বলিতেছিলেন। কোন বিশেষ কারণে আমাকে বারান্দায় যাইতে হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহাদের প্রসঙ্গের একটুমাত্র কর্ণগোচর হয়। ভক্তটি ভজনের ফলে তাঁহার আনন্দ অনুভবের কথা বলিতেছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া আরও অগ্রসর হইতে বলিয়া বলিলেন ঃ "আনন্দও নিচের অবস্থা; তারও ওপরের অবস্থা আছে। সে যে কী প্রশান্তি তাহা মুখে বলা যায় না!"

বেলুড় মঠ হইতে পূজ্যপাদ মহারাজ বলরাম মন্দিরে যাইতেছেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। মহারাজ উপর হইতে নিচে নামিয়া উঠানে ঠাকুরঘরের সিঁড়ির সামনে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়াইলে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া প্রণাম করিলেন। অতঃপর হাসিমুখে ঠাকুরঘরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে প্রণাম করিয়া গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় খোকা মহারাজ দ্রুত আসিয়া তাঁহার পদে মাথা নুয়াইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিলেন ঃ "শীঘ্র শীঘ্র ফিরে আসবেন।" মহারাজ কোন জবাব

না দিয়া তাঁহার মুখের দিকে সহাস্যে তাকাইয়া দেখিলেন; তৎপরে গাড়িতে উঠিলেন, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সমবেত সাধুগণ গাড়ির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মহারাজের উপস্থিতিতে মঠে যে আনন্দোৎসব চলিতেছিল, তাহা স্থগিত হইবে ভাবিয়া সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। এদিকে মঠবাসীদের বিষাদ দিনে দিনে বাড়িয়া চলিল। কারণ, খবর আসিয়াছে, মহারাজের শরীর খুব অসুস্থ, কলেরা হইয়াছে। মঠ-কলকাতা সদা সর্বদা লোক যাতায়াত চলিয়াছে। কখনও একটু ভাল খবর শুনিয়া মনে আশা বাড়ে, আবার খারাপ সংবাদ শুনিয়া বিষাদ বাড়িতে থাকে। আনন্দমুখর বেলুড় মঠ নীরব-নিস্তব্ধ, দিবসেই যেন অন্ধকার বোধ হয়। বিশেষ পূজার্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন চলিতেছে। মহারাজের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধু ও অনুরাগিগণ প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য। ইহারই ভিতর সঙ্কটাপন্ন অসুখের মধ্যেও মহারাজের অলৌকিক দিব্য ভাবাবেশ সকলকে চমৎকৃত করিতেছে, সে সকল বার্তা শুনিয়া সকলেই পুলকিত। একদিন চিন্ময় নিত্য ব্রজধামের অধিপতি চিন্ময় শ্যাম তাঁহার নিত্যসঙ্গী রাখালকে স্বয়ং আসিয়া হাত ধরিয়া নিজ সকাশে লইয়া গেলেন। মর্তলোকে পরিত্যক্ত তাঁহার শুদ্ধ পবিত্র দেহ মঠে আনীত হইয়া ঠাকুরঘরের দিকে মুখ করিয়া উঠানের সেই স্থানেই রাখিয়া পূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইল। চিন্ময়ধামে যাত্রার প্রাক্কালে প্রিয়তমের স্পর্শে তাঁহার বদনমণ্ডলে যে দিব্য জ্যোতির্ময় আভা প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে মঠে আনীত হইবার পরেও তাহা একই ভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। খবর পাইয়া শোকসন্তপ্ত বহু ভক্তের স্রোত আসিয়া বেলুড় মঠে আছড়াইয়া পড়িল। মহারাজের সেই অপূর্ব মুখশ্রী তাঁহার বিয়োগব্যথা ভুলাইয়া দিতেছিল।

স্মৃতি দুর্বল। অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে যখনই স্নেহ-করুণার সাকার-মূর্তি শ্রীশ্রীমহারাজের কথা স্মরণ করি তখনই মন এক অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠে। পুলকিত সেই মনে অভাবিতভাবে বহু স্মৃতি, বহু কথা, বহু মুহূর্ত জীবন্ত হইয়া উঠে। লেখনী চলিতে থাকে। জানি না, আমার এই লেখনী সেই পরম প্রেমময় অধ্যাত্ম-বিগ্রহের অমানুষী চরিত্রের কতটুকু আভাস তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইল। তবে যদি এই লেখা শ্রীশ্রীমহারাজ সম্পর্কে কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাঠককে দিতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রয়াস সার্থক হইবে।

কালিন্দীফুল্লকমলে মাধবেন ক্রীড়ারত।
ব্রহ্মানন্দং নমস্তুভ্যং সদ্‌গুরো লোকনায়ক॥

যমুনাবক্ষে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ারত সদ্‌গুরু, লোকনায়ক ব্রহ্মানন্দ, তোমাকে প্রণাম করি।

৺বিজয়াদশমী, ১৩৭৭—*বৃন্দাবনধাম*

(উদ্বোধন ঃ ৯৩ বর্ষ ২—৮ ও ১০ সংখ্যা)

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ও পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে দেখে মনে হয়েছিল তাঁরা একটু ভাবপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দজী, শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। সহজে ভাবের আবেগে চালিত হওয়া তাঁদের ধাতে ছিল না বলে মনে হয়েছিল। তবে মহারাজের ভাবের আবেগ যে কখনো দেখা যেত না তা নয়। যদিও তিনি ভাব চেপে রাখতেন, তবুও মাঝে মাঝে তা বেরিয়ে পড়ত।

রাজা মহারাজজীর সাধারণত তিনটি ভাব দেখা যেত। কখনো ছেলেমানুষের মতো চোখে দুষ্টু হাসি। সাধারণভাবে থাকলে মজলিস জমিয়ে রাখতেন, যখন দুপুরে ঘুম থেকে উঠতেন, মুখের দিকে তাকায় কার সাধ্য? চোখ লাল টক টক করছে।

শরৎ মহারাজ চট করে রাজা মহারাজের ঘরে ঢুকতেন না। হয়তো সেবক ভবানী মহারাজকে (স্বামী বরদানন্দ) বলতেন ঃ "যা তো দেখে আয়, মহারাজ কি করছেন?" যাওয়া-আসা করতে করতে আমরাও খানিকটা তাঁর দেখাদেখি শিখে গিয়েছিলাম। যদি বুঝতাম মহারাজের ঘরে ঢোকা যায়, ঢুকে পড়তাম। হয়তো দেখলাম শুয়ে আছেন, মুড বুঝে হাত-পা টিপে দিতুম। বলতেন ঃ "কিরে, এতদিন আসিসনি কেন? রাগ করেছিস নাকি?" কখনো বলতেন ঃ "আরে, মঠ তো তোদেরই।" তাঁর মুখে দু-একবার বলতে শুনেছি ঃ "যাকে ভালবাসলাম, সে যদি তা জানতে পারল তাহলে তা আর ভালবাসা হলো কই?" এই হেঁয়ালিপূর্ণ অতি গভীর কথার কিঞ্চিন্মাত্রও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি সে ক্ষমতা আমার নেই।

সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁর কি অপার করুণা ও সহানুভূতিই না ছিল। সেই সহানুভূতি দিয়েই তিনি মঠ-মিশন পরিচালনা করতেন। একবার কাশী সেবাশ্রমে কর্মীর অভাব হলে মহারাজ তাঁর এক দীক্ষিত সন্তানকে (স্বামী মঙ্গলানন্দকে) বলেন ঃ "দেখ বাবা, কাশী সেবাশ্রমে কর্মীর বড় অভাব হয়েছে। তুই কি সেখানে যাবি? গেলে বড় ভাল হয়।"

একজন সন্ন্যাসী পাঞ্জাব অঞ্চলে কিছুকাল কাটিয়ে ভুবনেশ্বর মঠে এসে রয়েছেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, সম্ভবত রামলালদাদাও ভুবনেশ্বর মঠে রয়েছেন। তখন ভুবনেশ্বর মঠের ঠাকুরঘর নিচে। একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ মাঝের হলঘরটিতে সাধু-ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন। ঐ সাধুটিকে অতি স্নেহ ও করুণামাখা স্বরে আধঘণ্টা ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যেন আর কোথাও না গিয়ে ভুবনেশ্বর মঠেই তিনি থাকেন। শুধু হাতে-পায়ে ধরতেই বাকি রেখেছেন—সে রাজি নয়। তখন বলছেন ঃ "আচ্ছা, তুমি কি চাচ্ছ? তুমি চাচ্ছ নিরিবিলিতে থেকে সাধন-ভজন করবে আর ভগবানের নাম করবে। তা বেশ তো, আমি তোমার জন্য এখানে আলাদা কুঠিয়া করে দিচ্ছি। খাবার দাবার সব সেখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোমায় বিশেষভাবে অনুরোধ করছি তুমি এই স্থান ছেড়ে আর কোথাও যেও না।"

উপস্থিত দর্শকদের হৃদয় মহারাজজীর এই কাতর আবেদনে অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। আধঘণ্টা ঐভাবে বলার পরেও যখন সাধুটি বললেন তিনি আবার বেরুবেন তখন মহারাজ বললেন ঃ "দেখ বাবা, মানুষে কি করবে বল! ইচ্ছা করলেই মানুষ কি সব করতে পারে, না সৎপথে চলতে পারে? কত সব evil propensities (অশুভ সংস্কার) রয়েছে।" কথাগুলি বলে তিনি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

মহাপুরুষ মহারাজজী সব শুনে ঐ সাধুটিকে লক্ষ্য করে শুধু বললেন ঃ "বেশ, মহারাজের কথা তো আর শুনলে না। এর ফল শিগগিরই বুঝতে পারবে।" ভুবনেশ্বর মঠ ছেড়ে যাবার অল্প কিছুকাল পরেই গর্হিত কোন কাজ করার ফলে সাধুটি নৈতিক জীবনে পতিত ও সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হন।

একবার গর্হিত কোন কাজের জন্য জনৈক সাধুকে কর্তৃপক্ষ বেলুড় মঠ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ। যখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন সেই সভায় সভাপতি হিসাবে তিনি উপস্থিতও ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি চুপ করে ছিলেন। পরের দিন সকালেই বলরাম মন্দির (সেখানেই তিনি তখন ছিলেন) থেকে একখানা কাপড় ও গামছা বগলে নিয়ে তিনি হাজির হলেন মায়ের বাড়ি (উদ্বোধন কার্যালয়ে) সারদানন্দজীর কাছে। মহারাজকে সকালে ঐ অবস্থায় আসতে দেখে সারদানন্দজী তো অবাক! "একি? এত সকালে যে! কি ব্যাপার?"—শরৎ মহারাজ বললেন। মহারাজ বললেন ঃ "দেখ

ভাই, কালকে তো তোমরা resolution পাশ করে ঐ ছোঁড়াটাকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করলে। আমি কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। কিন্তু মঠ-মিশনের সভাপতি থেকে তাদের আইন লঙ্ঘন তো আমি করতে পারি না। তাই মনে করছি ঐ সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে তিন-চার টাকা দিয়ে গঙ্গার ধারে একখানা ছোট ঘর ভাড়া করে ওকে নিয়ে থাকব। তাই চলে এসেছি।"

বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত! ঐ কথা শুনে সারদানন্দজী একেবারে হতভম্ব। তখন তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন ঃ "এ কি বলছ মহারাজজী। ঠিক আছে, ও বিষয়ে কি করা যায় তা আমি দেখছি। তুমি শান্ত হও।" এইসব বলে তাঁকে শান্ত করলেন শরৎ মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান সেই সাধুটি এই দুই মহাপুরুষের অশেষ কৃপায় মহারাজের শরীর ত্যাগ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মহারাজ তখন স্থূলদেহে নেই। বিশেষ কোন অন্যায় কাজের জন্য কোন সাধুকে মঠ থেকে সরিয়ে দেবার কথা ট্রাস্টী বোর্ডের সভায় ওঠে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজ। তাঁর অনুমতি চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন ঃ "দেখ, মহারাজ তো আমাকে ছেলেদের দেখবার কথা বলে গেছেন, কাকেও তিনি তাড়িয়ে দেবার কথা বলে যাননি।" মহাপুরুষ মহারাজজীর অশেষ কৃপায় সেই সাধুটিকে আর যেতে হয়নি।

মহারাজ যেবার আঁটপুরে গিয়েছিলেন, সেবার শিবচতুর্দশীর দিনটিতে তিনি সেখানে ছিলেন। রামলালদাদাও সঙ্গে আছেন। শিবচতুর্দশীর সকালে রামলালদাদার সঙ্গে দেখা হতেই 'সুপ্রভাত দাদা' বলে তাঁকে অভিবাদন করে ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে বললেন ঃ "দাদা, আজ তো শিবরাত্রি। তাহলে আজ তো উপবাস।"

রামলালদাদা—"হ্যাঁ, তাই তো।"

মহারাজ—"আচ্ছা দাদা, হবিষ্যান্ন তো উপবাসের সামিল?"

রামলালদাদা—"তা বলতে পার।"

মহারাজ—"তাহলে দাদা, আজ আমরা হবিষ্যান্ন করেই শিবরাত্রি-ব্রত পালন করব।"

দাদাও তাতে রাজি, তখন মহারাজজী শান্তিরামবাবুকে (বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদরকে) ডেকে বললেন ঃ "দেখ শান্তিরাম, আজ তো শিবরাত্রি।

আমরা দুজন হবিষ্যান্ন করে শিবরাত্রি-ব্রত পালন করব, তুমি তার ব্যবস্থা কর।" শান্তিরামবাবুও হবিষ্যান্নের ব্যবস্থাদি সব উপবাসের সামিলই করলেন এমন বেশি কিছু নয়, ভাতের সঙ্গে পনের-বিশ রকম সেদ্ধ-ঘি-সহযোগে সেব্য! এ যেন সেই ব্যাসের উপবাস!

গ্রীষ্মের এক বিকেলে বলরাম মন্দিরে গেছি। মহারাজকে তাঁর ঘরে না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, তিনি ছাদে আছেন। আমিও নিঃসঙ্কোচে ছাদে গিয়ে হাজির। দেখি মহারাজ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, সঙ্গে আছেন ভবানী মহারাজ, ঈশ্বর মহারাজ (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ) প্রমুখ কয়েকজন। আমি গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলাম। তিনি আমায় বললেন ঃ "তুই ঘুড়ি ওড়াতে পারিস?"

আমি উত্তরে বললাম ঃ "হ্যাঁ, কিছু কিছু।"

তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ "প্যাঁচ খেলতে পারিস?"

আমি—"হ্যাঁ, একটু একটু।"

তখন তিনি সেই উড়ন্ত ঘুড়ির সুতোটা আমার হাতে দিলেন অন্য আর একখানা ঘুড়ি তখন প্যাঁচ খেলতে এসেছে। সেই ঘুড়ির সঙ্গে আমি প্যাঁচ খেললাম। প্যাঁচে আমি কাটলাম না সে কাটল তা এখন মনে নেই।

বেশ কিছুকাল পরের ঘটনা। মহারাজ শেষবার ভুবনেশ্বরে আছেন। আমিও তখন আমার এক বন্ধুর ভাড়া করা বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন ভুবনেশ্বরে ছিলাম। অধিকাংশ সময়টা মঠেই কাটাতাম। বিশেষ করে সকালে যখন মহারাজজী প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন, তখন তাঁর সঙ্গে থাকতাম ছাতা নিয়ে। রামলালদাদাও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। একদিন মহারাজজীর সঙ্গে সকালে আমি একাই বেরিয়েছি। সঙ্গে আর কেউ নেই। তিনি মঠের প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে বাঁদিকে শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে মাঠ ভেঙে রেললাইন পার হয়ে উদয়গিরি-খণ্ডগিরির রাস্তায় চলেছেন। জঙ্গলঘেরা এই ফাঁকা মাঠে প্রায়ই তিনি বেড়াতে যেতেন। সেই ফাঁকা নির্জন মাঠে যেতে যেতে তিনি আমায় হঠাৎ বললেন ঃ "হ্যাঁরে, এখানে ঘুড়ি ওড়ালে কেমন হয়, বল দেখি?"

আমি বললাম ঃ "খুব ভাল হয়।"

তখন বললেন ঃ "দেখ, এবার কলকাতায় গিয়ে আমায় খানকতক ঘুড়ি দিবি তো।"

আমি তখন ভাবলাম—মহারাজজীকে ঘুড়ি দেব, তাহলে লখনৌ থেকে কিছু ঘুড়ি আনিয়ে দেব। কারণ লখনৌর ঘুড়িই সবচেয়ে ভাল। পরে কলকাতায়

ফিরে মঠের এক ভক্তকে (যাঁর ভাইরা লখনৌ থাকতেন) লখনৌ থেকে কিছু ঘুড়ি আনিয়ে দিতে বলি, ঐ ঘুড়িগুলি মহারাজজীকে দেব বলে। তিনি সানন্দে আনিয়ে দিতে রাজি হন।

তারপর মহারাজজী কলকাতা ফিরেছেন। বলরাম মন্দিরে আছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ভবি ভোলবার নয়। আমাকে দেখেই বললেন ঃ "কিরে, ঘুড়ির কি হলো?"

আমি বললাম ঃ "মহারাজজী, লখনৌ থেকে ঘুড়ি আনাবার ব্যবস্থা করেছি।"

উত্তরে তিনি বললেন ঃ "না, না, লখনৌ থেকে দরকার নেই। তুই কলকাতার ঘুড়িই নিয়ে আয়।"

এর অল্প কয়েকদিন পরেই মহারাজজী আঁটপুরে যান। আর শান্তিরামবাবুকে বলে ইন্দু (দেবাত্মানন্দ), ফণী ও আমাকে কৃপা করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর পূতসঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে তারপর কলকাতায় ফেরা হলো। এরপর মহারাজজীর অসুখ, আমাদেরও ম্যালেরিয়ায় পড়া, আর এরই প্রায় এক-দেড় মাস পরে মহারাজজীর স্বধামে প্রস্থান। তারপরেই লখনৌ থেকে ঘুড়ি এসে হাজির। সে ঘুড়ির একখানিও আমি স্পর্শ করিনি। আমি ঘুড়ি-পাগলা ছিলাম। এইভাবে দয়া করে তিনি আমার ঘুড়ি ওড়াবার তীব্র নেশাটি কাটিয়ে দিয়ে গেলেন।

ভুবনেশ্বর মঠের সাহায্যকল্পে স্টার থিয়েটার একবার একটি সাহায্য-রজনী দেয়। ঐ উপলক্ষে মহারাজজী আমাকে কিছু টিকিট বিক্রি করে দেবার জন্য বলেন। আমিও আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প কয়েকখানি টিকিট বিক্রির জন্য নিই। তখন তাঁর ছেলেমানুষের মতো এক মহা দুর্ভাবনা এসে হাজির হলো— যাদের কাছে টিকিটগুলো বিক্রি করব, তারা আগে ঐগুলি নিয়ে ছেলেমানুষ ভেবে পাছে আমায় ঠকিয়ে শেষে দাম না দেয়। তাই পাখি-পড়ানোর মতো আমায় বারবার বলতে থাকেন ঃ "দেখ, আগে কক্ষনো টিকিট কাউকে দিবিনে। যে টিকিট দিবি, প্রথমে তার পুরো দামটা হাতে নিবি তারপর টিকিট দিবি।"

তাঁর তখনকার এ-অবস্থাটি দেখে বেশ একটু মজা উপভোগ করেছিলাম। ঐ সাহায্য-রজনীতে 'কিন্নরী' ও 'রামানুজ' নাটক দুখানি অভিনীত হয়েছিল। যাহোক, টিকিট বিক্রির কোন টাকা মারা না যাওয়ায় তিনি কতখানি আনন্দিত হয়েছিলেন তা কিন্তু জানা যায়নি।

ভুবনেশ্বর মঠ তৈরি হলে নারায়ণ আয়েঙ্গার ব্যাঙ্গালোর থেকে মাঝে মাঝে এসে মহারাজজীর সঙ্গে সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। মহারাজজী তখন ভুবনেশ্বরে। নারায়ণ আয়েঙ্গারও ছুটিতে এসে তাঁর কাছে আছেন। মহারাজজীর ভক্ত বিনোদবাবু সপ্তাহে দু-তিনটে করে শাক-সবজি ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পার্শেল সেখানে পাঠাতেন। ঐ সময়ে কিছুদিন আমিও ভুবনেশ্বরে চেঞ্জে গিয়েছিলাম। বেশির ভাগ সময় মহারাজজীর সঙ্গেই কাটাতাম। একদিন ঐরকম একটা শাক-সবজির পার্শেল এসেছে। মহারাজজীর সামনে সেই পার্শেল খোলা হলো। তার মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর ডেণ্টনিক টুথ পাওডার-এর একটি কৌটোও ছিল। সম্ভবত সেটা আয়েঙ্গার মশায়ের জন্য আনানো হয়েছিল। সকালবেলা—সাড়ে আটটা হবে। আয়েঙ্গার নিচে ঠাকুরঘরে বসে ধ্যান-জপ করছিলেন। সেই টুথ পাওডার-এর কৌটোটি দেখে মহারাজজী ভবানী মহারাজকে (স্বামী বরদানন্দকে) বললেন ঃ "দেখ, আয়েঙ্গার এখন ঠাকুরঘরে ধ্যান-জপ করছে। তুই খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঐ কৌটোটি ওর সামনে রেখে দিবি। ও যেন টের না পায়। আবার সাবধানে পা টিপে টিপে ফিরে এসে ঠাকুরঘরের বাইরে একটু অপেক্ষা করবি। লক্ষ্য রাখবি, ও ধ্যান-জপ সেরে যখন উঠতে যাবে তখন ওকে গিয়ে বলবি—'your meditation has brought you this.' " ভবানী মহারাজও ঠিক তাই করেছিলেন।

মহারাজজীর কৃপাধন্য শিষ্য স্বামী মঙ্গলানন্দ একবার আমায় বলেছিলেন ঃ "একদিন সকালে আমি বেলুড়ে পুরনো ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় জপ করছি। মহারাজ ক্বচিৎ কখনো ঠাকুরঘরে যেতেন। সেদিন কিন্তু কি মনে হয়েছে, ঠাকুরঘরে গিয়েছেন। তিনি আমার সামনে দিয়েই কিন্তু নিঃশব্দে ঠাকুরঘরে গেলেন। সরু বারান্দা। আমি চোখ খুলে দেখি তিনি। দেখে যেন মহা অন্যায় করেছেন এই ভেবে তিনি বলতে থাকেন—"দেখ বাবা, তুই জপ করছিলি; আর আমি তোর জপে বাধা দিলাম। তা তুই কিছু মনে করিসনি।" এই ছিলেন মহারাজ!

ঐ মঙ্গলানন্দজীকেই তিনি একবার বলেছিলেন ঃ "দেখ, যেখানেই যাস না কেন, যেখানে গিয়ে থাকিস না কেন, সেখানে এমন কিছু করিসনি যাতে অপরে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ওপর সামান্যমাত্র কটাক্ষপাত করতে পারে।" আর একবার তাঁকে বলেছিলেন—"দেখ, তোর চেয়ে বয়সে যদি কেউ ছোটও হয়, কিন্তু তোর চেয়ে একদিন আগে মঠে এসে যোগ দিয়েছে তবে তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবি।"

ভুবনেশ্বর মঠে এক শীতের বিকালে তাঁর ঘরের সামনে মহারাজজী পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; আর আমি তাঁর সামনে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য অস্ত যাবার আগে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সেই নিস্তেজ অস্তমিত কিরণ আমার মুখে পড়েছে। তখন মহারাজজী বলে উঠলেন ঃ "ওরে, পড়ন্ত রোদ্দুর মুখে লাগাসনি।" অতি সামান্য একটি কথা। কিন্তু সে-কথা এমন স্নেহভরে বলেছিলেন যে, তা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

তখন শীতকাল। মহারাজজী ভুবনেশ্বর মঠে রয়েছেন। রোজই সকালে বেড়াতে বেরোতেন। সঙ্গে প্রায়ই রামলালদাদা, বিপিন জামাই প্রভৃতি আরও দু-একজন থাকতেন। আবার কোন কোন দিন তিনি একলাও বেড়াতে বেরোতেন। আমিও সকালে তাঁর সঙ্গী হবার চেষ্টা করতাম। প্রধানত আমিই তাঁর ছাতাটা বইতাম। ভুবনেশ্বর মঠের প্রধান গেটটি দিয়ে বের হয়ে তিনি বাঁদিকে ধানের ক্ষেত আর রেললাইন পার হয়ে উদয়গিরি-খণ্ডগিরির দিকে যেতেন। কোন দিন মেন গেট দিয়ে বের হয়ে স্টেশনের দিকে যেতেন। আবার কোন দিন বা স্টেশন অবধি গিয়ে সোজা রাস্তায় না ফিরে পেছনের জঙ্গলের রাস্তা ধরে মঠে ফিরতেন।

একদিন তিনি সকালে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আর কেউ নেই, একা আমি তাঁর ছাতা বয়ে নিয়ে চলেছি। সেদিন তিনি স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে পেছনের জঙ্গলের রাস্তা ধরে মঠে ফিরছেন। তখন সকাল নটা-সাড়ে নটা। আর আট-দশ মিনিট চললেই পেছনের দরজা দিয়ে মঠে ঢোকা যাবে। এমন সময় কি একটা জানোয়ারের ডাক শোনা গেল। তখন মহারাজজী ভয় পেয়ে আমাকে বললেন ঃ "ওরে, কি ডাকছে রে? বাঘ নয়তো?" জন্তু-জানোয়ারের ডাকের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত ছিলাম না। সুতরাং আমি আর কি জবাব দেব? চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু মহারাজজীর ভয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

প্রতিরোধের অস্ত্র হিসাবে একমাত্র ছাতাটাই আমার হাতে আছে। ভাবলাম এই ছাতা দিয়েই প্রথমে রুখবার চেষ্টা করব, পরে যা হয় হবে। এভাবে ভয়ে ভয়ে দুজনে এগিয়ে চলেছি। এমন সময় লিঙ্গরাজ মন্দিরের দিক থেকে চার-পাঁচজন স্থানীয় লোক আমাদের কাছ দিয়ে বড়গেরে গ্রামের দিকে ফিরছিলেন। মহারাজজী ভীত-সন্ত্রস্তভাবে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ওটা কি ডাকছে?" তখন তাঁরা উত্তরে জানালেন—"মোষ ডাকছে।" এই বলে তাঁরা তাঁদের

গন্তব্যস্থলের দিকে চলে গেলেন। এদিকে "মোষ ডাকছে" একথা শুনে মহারাজজী আরও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বললেন ঃ "এ যে আরও ভয়ানক! নে, নে, শিগ্‌গির ছাতা বন্ধ কর।"

তারপর একবার মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে যাচ্ছেন। আবার কখনো ছোট কাঁটা-ঝোপের আড়ালে, কখনো বা বড় গাছের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই দারুণ ভয়ের সময়ে কাছে রয়েছি একমাত্র আমি। তিনি ভয়ে যে কিরকম বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যদি সেই সময়ের ফটো তুলে রাখা যেত, তবেই তাঁর সে ভাবভঙ্গি মুখচোখের হাবভাব দেখে তা কিছুটা অনুমান করা যেত। যা হোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ঐরকম করে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে কোন রকমে লুকিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে নিরাপদে মঠে পৌঁছাই ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কলকাতায় বলরাম-মন্দিরে থাকাকালে কয়েকবার তাঁর সঙ্গে সকালে ও বিকেলে বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বেড়াতে যাবার সময় রাস্তার ধারে অশ্বত্থ বা বটগাছের তলায় যেসব দেব-দেবীর মূর্তি বা অন্য ঠাকুর-দেবতার মন্দির পড়ত, তিনি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করতেন। কখনো বা বলতেন—"ওরে, দু-একটা পয়সা আছে কি রে? যদি থাকে তবে তা দিয়ে প্রণাম কর।" তখন প্রকাশ্যে ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে লজ্জা করত। কিন্তু তাঁকে ঐরূপ করতে দেখে ঐসব দেব-দেবীকে প্রণাম করতে বাধ্য হতাম।

তিনি বলতেন—"দেখ, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আপনজন এলে যেমন তাদের আদর-যত্ন করে বসিয়ে খাওয়াতে হয়, তেমনি কোন দেব-দেবীকে আবাহন করলে ঠিক ঐভাবে তাঁকে বা তাঁদেরকে সেবাযত্ন ও পরমাত্মীয়বোধে আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হয়।"

তাঁর জন্য কোন কিছু নিয়ে যেতাম না। কিন্তু তিনি পাকেচক্রে কিছু আদায় করে ছাড়তেন। কোনদিন হয়তো বলতেন—"ওরে, তোদের বৌবাজারের দিকে টাটকা কচি ভাল ডুমুর পাওয়া যায় কি রে?"

"হ্যাঁ, পাওয়া যায়" বলে জানালে তিনি তখন হয়তো বলতেন—"তা ঐরকম ভাল ডুমুর এক-আধ পয়সার কিনে আনিস তো।"

কোনদিন বা বলে বসলেন—"তোদের ওদিকে ভাল কাঁচা মুগের ডাল পাওয়া যায় না রে?"

"হ্যাঁ, পাওয়া যায়" বলে জানালে তিনি বলতেন—"তবে ঐরকম বেশ টাটকা কাঁচা মুগের ডাল আধপোয়া বা পোয়াটাক আনিস তো।"

বেশি দামের নয় মাত্র দু-চার পয়সা দামের জিনিস আনতে বলতেন। এভাবে নিজ গুণে কিছু গ্রহণ করতেন। আদায় করে ছাড়তেন।

সেটা আন্দাজ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ। কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের ইন্দু (পরে স্বামী দেবাত্মানন্দ), ফণী ও আমি পড়া ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদকে জীবিকার্জনের মাধ্যম করে তাতেই লেগে থাকতে ইচ্ছুক হই। কাজে লাগার আগে ইন্দু ও আমি ঐ বিষয়টি মহারাজজীকে জানাবার জন্যে একদিন সকালে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে যাই। সুবিধামতো নিরিবিলিতে তাঁকে বলি—"লেখাপড়া আর ভাল লাগছে না।" সব কথা শুনে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—"তবে চলে আয় না।"

এসব বিষয়ে তিনি বড় চাপা ছিলেন। ক্বচিৎ কখনো তাঁর মুখ দিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বার হতো। কিন্তু মুখ দিয়ে একবার যে-কথা বার হতো সেটি ছিল অমোঘ অব্যর্থ; কখনো তা বিফলে যেত না। তাঁর ঐ কথা শুনে তখন আমরা বলি—"না মহারাজজী, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদ করব বলে পরিকল্পনা করেছি।" তখন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তিনি চাষ-আবাদ সম্বন্ধে নানা ধরনের পরামর্শাদি দিয়ে শেষে উপসংহার করলেন—'মন রে কৃষি কাজ জান না, / এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।'

একবার দুর্গাপূজার অল্প কয়েকদিন আগে (সালটা মনে নেই) এক সকালে ইন্দু ও আমি মহারাজজীকে দর্শন করতে বলরাম-মন্দিরে গিয়েছি। দু-একটা কথার পর তিনি আমাদের বললেন—"দেখ, সামনে পূজা। তোরা সব মঠে গিয়ে কাজকর্ম করবি, খাটবি। মঠ তো তোদেরই।" ঐবার পূজার সময় আমরা দুজনে মঠে রয়েছি। মহারাজজী, মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদ কয়েকজনও মঠে রয়েছেন। মঠে গিয়েই দুর্গাপূজার প্রধান জোগাড়দার ও ভাণ্ডারি দেবেনদা ও ভাব মহারাজের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে। তাঁরা আমাদের অতি আপনজন বলে গ্রহণ করেন ও খুব ভালবাসতেন। মঠকেও ধীরে ধীরে মহারাজজীর কথামতো আমাদের নিজেদের মনে হতে থাকে। দেবেনদা ও ভাব মহারাজ আমাদের জানিয়ে দিলেন—"যখনই তোমাদের যা খাবার দরকার হবে, তখনই তা আমাদের আর জিজ্ঞাসা না করে তোমরা নিজেরা প্রসাদ-ভাণ্ডারঘরে ঢুকে তোমাদের ইচ্ছেমতো নিয়ে খাবে।"

ঐবার মহানবমীর দিন নিজেদের সব কাজ সেরে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে ইন্দু ও আমি হাওড়ার খুরুট রোডে পূজা দেখতে যাই। সন্ধ্যার সময় মঠে ফিরে মহারাজজীকে প্রণাম করতে যাই। তিনি তখন দোতলায় স্বামীজীর ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কিরে, সকালে জপটপ হয়েছিলো তো?"

আমি গাঁইগুঁই করে বললাম—"একটু করেছিলাম।" তারপর ইন্দু প্রণাম করতেই তাকে প্রশ্ন করলেন—"তোর হয়েছিল তো?" সে চুপ করে রইল।

তাতে মহারাজজী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ও রেগে আমাদের দুজনকে ভীষণ ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন—"আমি ('আমি'র উপর খুব জোর দিয়ে) বলেছি রোজ নিয়মিত জপধ্যান করতে। আর তা না করে, খালি হই হই করে বেড়ানো হচ্ছে? সারা দুনিয়া যদি ভেসেও যায়, তাহলেও জপ-ধ্যান আগে করে তারপর আর কোন কিছু করবি।"

তিনি বলতেন—"ইষ্টকে সহাস্যবদনরূপে ধ্যান করতে হয়, তা না হলে শুঁটকো ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যান করবার আগে আমি কখনো কখনো খুব হাসি ও মজার কথা কিছু মনে করে পরে ধ্যানে বসি।"

একাধিকবার তিনি হাসতে হাসতে আমাদের সামনে বলেছিলেন—"আমরা সব জাতসাপের বাচ্চা, যাকে একবার ছোবলাব, সে যদি তখনই না-ও মরে, তবে অন্তত গর্তের মধ্যে গিয়েও মরে পড়ে থাকবে।"

যতবার তিনি ইন্দু ও আমাকে নির্জনে পেয়েছেন প্রায় ততবারই জিজ্ঞাসা করেছেন—"কিরে, যা বলেছি তা করেছিস তো? খুব করে যা, আবার নতুন কিছু বলে দেব।"

তখন প্রায় বছর খানেক বা বছর দেড়েক ধরে জোর করে তাঁর উপদিষ্ট পথে জপ-ধ্যানাদি করে যাচ্ছি। এমন সময় একদিন বেলা আড়াইটা-তিনটার সময় বলরাম মন্দিরে আমরা দুজনে মহারাজজীকে তাঁর ঘরের মধ্যে নিরিবিলিতে পেয়ে প্রণাম করি। ইন্দু সামনে ছিল। সে প্রথমে প্রণাম করলে মহারাজজী তাকে সেই আগের মতোই প্রশ্ন করলেন—"কিরে, ধ্যান-জপে লাভ কেমন হচ্ছে?" তাতে সে উত্তর দিল—"না মহারাজ, আর বেশিক্ষণ ধরে বসতে ও ধ্যান-জপ করতে ভাল লাগছে না।" তারপর আমি তাঁকে প্রণাম করে উঠলে তিনি আমাকেও সেই একই প্রশ্ন করলেন—"আর তোর?" উত্তরে আমি বললাম—"ও যা বললে, বোধ হয় তার চেয়ে আরও খারাপ।"

আমাদের দুজনের উত্তর শুনে সামান্য একটু থেমে তিনি আমাদের বললেন—"আচ্ছা, কেন এমন হয় বল দিকি?" এর উত্তর আমরা আর কি দেব? দুজনেই চুপ করে রইলাম। তারপর তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—"দেখ, প্রত্যেক কাজেরই একটা reaction আছে। জপ-ধ্যান করারও reaction আছে। কিন্তু তা মোটেই ছাড়া চলবে না। জোর করে লেগে থাকতে হবে, তাতেই সিদ্ধি।"

তিনি বলতেন—"খুব ব্যাকুল হয়ে কেঁদেকেটে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।"

আর একটি খুব মূল্যবান কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন—"যা বলেছি নিষ্ঠার সঙ্গে regularly তা করে যা। কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে যাসনি।" একথাটি জানিয়ে একদিকে যেমন তিনি আমাদের অভয় দিয়েছিলেন, আবার অন্য দিকে তেমনই লাভ-লোকসান খতাতে গিয়ে আমরা হতাশায় ডুবে না যাই সে বিপদ থেকেও রক্ষা করেছিলেন। তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকারও ইঙ্গিত সেই সঙ্গে করেছেন—আমাদের কল্যাণের জন্য।

তিরোধানের কিছুকাল আগে থেকে মহারাজজীকে একাধিকবার বলতে শোনা যেত—"এ-শরীরটা এক মহাবন্ধন। কত সব অতি সুন্দর উচ্চ উচ্চ মজাদার ভাব আছে, সেগুলো এই স্থূল শরীরটা অনুভব করতে বাধা দেয়। এটা গেলে তখন কি মজা, কত আনন্দ, কত কি সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন অনুভূতি!"

তিনি বলতেন—"ঠাকুরের খিস্তি-খেউড়ের মধ্য দিয়েও আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পেতাম?" ভাবরাজ্যের কোন সুউচ্চ মহান পবিত্র স্তরে মন বিচরণ করলে এরূপ আভাস পাওয়া যেতে পারে তা ভোগসর্বস্ব আমাদের ভাবার বিষয়।

পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের প্রতি তাঁর কি অস্বাভাবিক রকমের টানই না ছিল! একবার আমি ভুবনেশ্বর থেকে পুরী যাওয়ার কথা তাঁকে জানালে তিনি বললেন—"বেশ, আমার জন্য মহাপ্রসাদ আনবি।" যথাসময়ে প্রসাদ নিয়ে ভুবনেশ্বর মঠে পৌঁছে তা তাঁকে দিলাম। এতে তিনি কি আনন্দিতই না হয়েছিলেন। পরে তাঁর সেবকদের মুখে শুনলাম ঃ "দেখ, তোমার ট্রেন আসবার যখন সময় হয়ে আসছে, সেই সময় থেকে তিনি মহাব্যস্ত হয়ে কেবল ঘর-বার করছেন আর রেললাইনের দিকে তাকাচ্ছেন। কখন ট্রেন আসবে, আর কতক্ষণে তিনি মহাপ্রসাদ পাবেন!"

রসভঙ্গ করলে মহারাজ বড় বিরক্ত হতেন। একবার সন্ধ্যের পর কলকাতার দু একজন বড় গাইয়ে মঠে গান গাইছেন। ঐ সময়ে দোতলার বারান্দায় আমি মহারাজজীর কাছে বসেছিলাম। তখন বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ—যিনি দোতলার বাবুরাম মহারাজের ঘরে থাকতেন—মহারাজজীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মহারাজ, এটা কি সুর গাইছে?"

উত্তরে তিনি 'সোহিনী' বা 'সাহানা' কি একটা নাম বললেন আমার ঠিক মনে নেই; তিনি কিন্তু নির্দিষ্টভাবে একটি সুরের নাম বলেছিলেন, তারপর তিনি আমায় ইঙ্গিত করে বললেন—"যা তো, জিজ্ঞেস করে আয় তো ওটা কি সুর?"

নিচে গেলাম। গান থামলে অম্বিকানন্দ-স্বামীকে (নীরদ মহারাজ) জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "এটা কি সুর গাওয়া হলো?"

তার উত্তরে মহারাজজী যে সুরের নাম বলেছিলেন স্বামী অম্বিকানন্দ সেইটিই বললেন। বলেই হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন ঃ "কে জিজ্ঞাসা করছেন?" আমি বললুম ঃ "মহারাজজী।"

আমি বেশ খুশিমনে মহারাজজীর কাছে গিয়ে বললাম ঃ "মহারাজজী, আপনি যে সুরটির নাম বলেছিলেন সেই সুরই গাওয়া হয়েছে।"

মহারাজজী—কাকে জিজ্ঞাসা করলি?

আমি—নীরদ মহারাজকে।

মহারাজজী—সে আর কিছু বললে?

আমি—হ্যাঁ।

মহারাজজী—কি বললে?

আমি—তিনি বললেন, 'কে জিজ্ঞাসা করেছেন?'

"তুই কি বললি?"—এই বলে মহারাজজী সাগ্রহে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি বললাম, "মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছেন।" আমার উত্তর শুনে মহারাজজী খুব বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ "বোকা, বাঁদর, গাধা! তোর বলা উচিত ছিল বিজ্ঞানানন্দ স্বামীই জিজ্ঞাসা করেছেন।" মহারাজের কথাই ঠিক। কারণ বিজ্ঞান মহারাজ ঐ সুরের নামটা জানতেন না বলেই মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি ভাবলাম, আমি সঠিক উত্তর দিইনি বলে

মহারাজজী রাগ করেছেন। কিন্তু তখন জানতাম না যে, মহারাজজী এবং বিজ্ঞানানন্দজীর মধ্যে ছোট ছেলের মতো ভালবাসার খেলা চলত, আর মহারাজ প্রতি পদে তাঁকে হারিয়ে দিয়ে বালক-সুলভ আনন্দে মেতে উঠতেন। সেকথা না জানায় আমি বলে দিয়েছিলাম, 'মহারাজজী জানতে চেয়েছেন।' বিজ্ঞান মহারাজ জানতে চেয়েছেন বললে বিজ্ঞান মহারাজ যে সেই সুরের নাম জানেন না তা নীরদ মহারাজকে বোঝানো যেত। তাতে মহারাজজীর জিত হতো। "মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছেন" বলাতে দুই বালকের খেলায় আমি মহারাজকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। বিজ্ঞানানন্দজীকে নিয়ে মহারাজের খেলাটা আমি নষ্ট করে দিয়েছিলাম। সেই রসভঙ্গের জন্য মহারাজজীর ঐ রাগ ও বকুনি।

ভক্ত, আগন্তুক, দর্শনার্থী অল্প বা বহুসংখ্যক—দু-পাঁচজন থেকে শুরু করে চল্লিশ-পঞ্চাশজন— মহারাজজীর কাছে হাজির হলে তিনি তাঁদের নিয়ে আসর জমিয়ে বসতেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা গল্প-গুজব হাসি-তামাসা প্রভৃতি করতেন। এসব সময়ে সাধারণত ধর্মপ্রসঙ্গ বিশেষ কিছু হতো না। মাঝে মাঝে গড়গড়ায় তামাক খেতেন। এরূপ আসর বসার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। প্রধানত ভক্তাদি সমাগমের ওপর তা নির্ভর করত। কখনো কখনো ঠিক ঐরকম আসর দিনে দু-তিনবার বসত। ঐসব আসরে ধর্মালোচনাদি বিশেষ না হলেও আনন্দের হাট-বাজার বসত। তাতে হয়তো কেউ উদ্বিগ্ন বা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এসেছে, কোন যাদুবলে যেন তাঁর দুশ্চিন্তা ও শোকদুঃখ সব কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যেত। সে এমন এক পবিত্র আনন্দে বিভোর হয়ে যেত যা সহজে হৃদয় থেকে মুছে যেত না। এমনই ছিল মহারাজজীর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব। আর তিনি স্বয়ং এত হাস্যরস কৌতুকাদি নিয়ে মেতে থাকলেও প্রায় প্রতি দশ-পনের মিনিট অন্তর তাঁর চোখ দুটি দিয়ে হঠাৎ যেন একটি বিদ্যুতের ঝলক খেলে যেত। তারপরই চোখ দুটি বুজে যেত এবং তাঁর সর্বশরীর একেবারে স্থির নিস্পন্দ হয়ে যেত। তামাক খেতে খেতে ঐরূপ অবস্থা হলে মুখ থেকে গড়গড়ার নল অজ্ঞাতসারে খসেও পড়ত। এ রকম অবস্থায় তোলা তাঁর একখানি ফটো আছে। সেটি দেখলে তাঁর তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে একটু ধারণা করা যাবে। কথামৃতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুহুর্মুহু সমাধির কথা আছে। মহারাজজীর ঐ যে অবস্থা সেটি ঠাকুরের ঐ মুহুর্মুহু সমাধি অবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মহারাজজী আর দুটি আসরও জমিয়ে রাখতেন। তার মধ্যে একটি বসতো তাঁর নিজের ঘরে। যখন যেখানে তিনি থাকতেন সেখানে অতি প্রত্যূষে তাঁর

।নজ ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে জপ-ধ্যান ও স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ চলত। প্রয়োজনে তিনি সকলকে সাধন-ভজনাদি বিষয়ে অতি সরল, মূল্যবান ও কার্যকরী উপদেশাদি দিতেন। তখন তিনি যেন আধ্যাত্মিক ভাবের জমাট প্রবাহ বিস্তার করে বসে থাকতেন—যা সকলের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত স্পর্শ করে তাদের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করত। দুই, সন্ধ্যারতির পর সাধু ও আগন্তুকদের নিয়ে তাঁর ঘরে আর একটি আসর বসাতেন। এটি হতো ভজন-কীর্তনাদির আসর। তখন কি গান হবে তা অনেক সময়ে তিনিই বলে দিতেন। তাঁর উপস্থিতি-মাহাত্ম্যে ঐ আসরটিও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠত; আর উপস্থিত সকলেও এক দিব্য বিমল আনন্দ উপভোগ করতেন।

আমরা তাঁর কাছাকাছি থাকি এটা যেন তিনি চাইতেন। তাঁর সঙ্গে একটু ভাব জমার পর আমি বেশ কিছুদিন যাইনি। পরে যখন যাই, তখন তিনি বললেন ঃ "কিরে, এতদিন আসিসনি কেন? রাগ করেছিলি নাকি?" মহারাজজী ভুবনেশ্বরে থাকতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, সেকথা আগেই বলেছি। তিনি কলকাতা ফেরার পর একদিন ইন্দু ও আমি তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম; তিনি আমাকে দেখিয়ে ইন্দুকে বললেন ঃ "দেখ দেখি, এ কেমন ভুবনেশ্বর ঘুরে এল! আর তুই এত ঘরকুনো কেন?"

একবার তাঁর সঙ্গে ইন্দু ও আমি আঁটপুরে গিয়েছিলাম। ১০-১২ দিন সেখানে কাটিয়ে ফিরেছি। সেবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন মঠে গিয়েছি, সারাদিন তাঁর কাছে ভক্তরা এসেছেন প্রণাম করতে। আমরা স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম ওখানেই। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যার পর মহারাজজীর সঙ্গে বাজি পোড়ানো দেখলাম। তারপর তিনি তাঁর ঘরের সামনে দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমরা তখন বাড়ি ফিরব বলে তাঁকে প্রণাম করছি। আমি প্রণাম করে উঠতে না উঠতেই তিনি বললেন ঃ "কিরে, এখন যাবি নাকি?" কথার ধরন দেখে তখন তাঁর ভাব সামান্য কিছু আন্দাজ করতে শিখেছিলাম। সেই হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থাতেই বললাম ঃ "কিছু বলছেন কি?" তিনি বললেন ঃ "দাঁড়া এক মিনিট। একটা thought উঠছে। সেটা develop করি!" ইন্দু তখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললেন ঃ "সূয্যিকে ডাক।" সূর্য মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ) এলে তাঁকে বললেন ঃ "এদের দশটা টাকা দে। তোরা মঠের ছেলেরা সব আর এরা সকলে আজ খুব খেটেছিস। এই দশ টাকা দিয়ে কাল ভাল মাছ আনিয়ে ঠাকুরের ভোগ দেব। (আমাদের বললেন) তোরা কাল প্রসাদ পাবি।"

এই বলে কি মাছ, কত বড়, একেবারে জীবন্ত—নড়বে চড়বে ইত্যাদি নানা কথা জানিয়ে শেষে তিনি বললেন ঃ "তোরা তো আবার বড় বোকা। ঐ রকম ভাল মাছ আনতে পারবি কি?" তখন আমরা আমাদের বন্ধু ফণীর নাম করি। তাতে তিনি বলেন ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই ঠিক যোগ্য লোক। তাকে ডাক।"

তাকে খুঁজে বার করে আনলে কি রকম মাছ আনতে হবে মহারাজজী তা তাকে বুঝিয়ে বলে দিলেন। তাঁর নির্দেশমতো পরদিন সকালে প্রায় মণখানেক মাছ কলকাতা থেকে কিনে এনে তাঁর সামনে রাখলাম। মনোমতো মাছ পাওয়ায় তিনি খুব খুশি হলেন।

সেবার দোলপূর্ণিমার দিন ইন্দু, ফণী ও আমি মঠে যাই। মঠে খুব রঙ মেখে গঙ্গায় স্নান করতে নামি, সে সময় তিনজনেরই একসঙ্গে ভীষণ কেঁপে জ্বর আসে। কোন রকমে চারটি প্রসাদ মুখে গুঁজে পোর্ট কমিশনারের স্টীমার ধরে কোন রকমে বড়বাজার ঘাটে এসে যে যার গন্তব্যস্থলে ফিরি। (তখন পোর্ট কমিশনারের স্টীমার বেলুড় মঠে আসত) তারপর প্রায় মাস খানেক ধরে তিনজনেই ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী থাকি। ইতোমধ্যে খবর পেলাম মহারাজজীর অসুখ—পেটের গোলমাল, কি সব হয়েছে। তারপর দিন কয়েক তাঁর আর কোন খবর পাইনি। পরে শুনলাম তিনি ভীষণ অসুস্থ—ডায়াবেটিস হয়েছে। অনেকদিন আমাদের না দেখে ঐ ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থেকেও তিনি একদিন নির্বেদানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "সে ছোঁড়াগুলো আসছে না কেন? এ সময়ে এলে খসখসগুলোয় জল দিতে পারত।" দারুণ অসুখে ভোগার সময়েও তিনি কিন্তু আমাদের ভোলেননি।

প্রথম দু-এক বছর যখন মঠে যাই, তখন মহারাজজীর সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়েছে। তাঁকে প্রণাম করেছি মাত্র, কথাবার্তা তখন বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আমার বরাবরই ধারণা ছিল তিনি আমায় চেনেন না, কারণ আমার এমন কিছু বিশেষ গুণ সত্যিই ছিল না যাতে আমি তাঁর নজরে পড়তে পারি। ঐ সময় একদিন—ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস হবে—আন্দাজ বেলা তিনটা-সাড়ে তিনটার সময় হাতিবাগানের কাছ থেকে হেঁটে বৌবাজারের দিকে আসছি। মোটামুটি রাস্তা ফাঁকা। আট-দশ হাত অন্তর দু-চারজন লোক যাতায়াত করছে আর পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর দু-একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি বা ট্রাম যাচ্ছে। ঐ সময়ে কলকাতায় যানবাহনের অবস্থা ঐ রকমই ছিল। চলতে চলতে আমি যখন ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছি, তখন বিপরীত

(বৌবাজার) দিক থেকে রাস্তার মাঝ দিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি আসতে দেখলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো—'এই গাড়িতে যদি মহারাজ থাকতেন!' গাড়িটি আমার কাছাকাছি আসতে আর বাঁদিকে চাইবামাত্র দেখি মহারাজজী মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। আমি তখন সেই গাড়ির দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু তিনি আমায় হাত নেড়ে বারণ করলেন। কিন্তু আমার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক ছেলেকেও তিনি কৃপা করে মনে রেখেছেন এই ঘটনায় তা বুঝলাম। মন-প্রাণ বিপুল আনন্দে ভরে উঠল, বুকটা যেন গর্বে দশ হাত ফুলে উঠল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

আন্দাজ ১৯২০-২১ খ্রীস্টাব্দের শীতকাল। মহারাজকে দর্শন করার জন্য বিদ্যার্থী ভবন থেকে ইন্দু ও আমি বৈকালে বলরাম মন্দিরে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার একটু আগে মহারাজ আমাদের বললেন ঃ "ওরে, কিছু কপি মঠে দিয়ে আসতে পারিস?" আমরা সানন্দে সম্মত হলাম। নৌকা ও মুটে ভাড়ার জন্য কিছু পয়সাও আমাদের দিলেন। তারপর ফুলকপিতে ভরা একটি বড় ঝুড়ি দেখিয়ে বললেন—"যা, এটা নিয়ে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে দিয়ে বলবি, 'মহারাজ এই সামান্য কটা কপি পাঠালেন। তাঁর ইচ্ছে যে নৌকা-ভরতি কপি পাঠান। কিন্তু তা আর হলো কৈ? তবে আপনারা সাধু মানুষ, বিন্দুতে সিন্ধুজ্ঞান করেন—এই যা ভরসা। তাই তিনি সাহস করে এই সামান্য ক-টা কপি পাঠিয়েছেন?' এই কথাগুলোই বলবি কিন্তু।" মহাপুরুষজীকে কপিগুলো দিয়ে ঐ কথা বলাতেই তিনি খুব হাসতে লাগলেন এবং মহারাজের কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করলেন। আর আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে যেতে বললেন। মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের কী মধুর সম্বন্ধই না ছিল!

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১০ এপ্রিল রাত্রি প্রায় নটার সময় ঠাকুরের চির আদরের মানসপুত্র 'ব্রজের রাখাল', স্বামীজীর 'রাজা' নরলীলা সংবরণ করে চিন্ময়ধামে চলে গেলেন। শেষ সময়ে সকলে মিলে তাঁকে যে নাম শোনাচ্ছিলেন, তা থামলে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ একটিও কথা না বলে বলরাম মন্দিরের দ্বিতলের বড় হলঘরটি থেকে গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজজী তার একটু পরেই শ্রীশ্রীমহারাজজীর সেই শায়িত দেবদুর্লভ মূর্তির দিকে একটু গিয়ে এবং তা অপলক দৃষ্টিতে দর্শন করে নিজের ভাবেই বলতে লাগলেন ঃ "আ-হা-হা! কী বিরাট দেহ, কী বিশাল বক্ষ! যেন শেষশায়ী নারায়ণ, শেষশায়ী

নারায়ণ! কে বলবে যে এ-শরীরে কোন রোগ ছিল?" এই কথাগুলো বার-বার বলতে বলতে তিনিও ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

* * *

কলকাতা বিদ্যার্থী-ভবনের (স্টুডেন্টস হোমের) কয়েকজন ছাত্র রাজা মহারাজের কাছে যাতায়াত করত। মহারাজও ছেলেগুলিকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি লীলা সংবরণ করে স্বধামে চলে যেতে ঐ ছাত্রদলটি প্রাণে বিশেষ আঘাত পায়। তাঁর অদর্শনের চার-পাঁচ দিন পরে ঐ দলের ইন্দু ও আমি খুব শোকার্ত হৃদয়ে বিকালের দিকে বেলুড় মঠে যাই। মহাপুরুষ মহারাজজী তখন মঠবাড়ির দোতলার ঘরখানি কালী মহারাজজীকে (স্বামী অভেদানন্দজীকে) ছেড়ে দিয়ে 'গিরিশ মেমোরিয়াল'-এর নিচের তলার ঘরটিতে বাস করছেন। আমরা ঐ ঘরটিতে ঢুকে দেখি মহাপুরুষ মহারাজজী হাত জোড় করে মা গঙ্গার দিকে মুখ করে স্থিরভাবে চেয়ারে বসে আছেন। তারপর আমি "মহারাজ, মহারাজ তো চলে গেলেন"—মাত্র এই কথা কটি বলে আমাদের মনোবেদনা জানালাম। তিনি কতকটা তাঁর স্বভাবসুলভভাবেই প্রথমে বলতে শুরু করলেন ঃ "দেখ, যদি একথা সত্য হয় যে তাঁর কৃপায় আমরা এগোচ্ছি—(সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে)—যদি? যদি-ফদি এতে নেই। প্রত্যক্ষ দেখছি যে, তাঁর কৃপায় আমরা দিন দিন এগোচ্ছি, এতে কোন সন্দেহই নেই। আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ঠিক এগোচ্ছ। কারণ আমরা তোমাদের ভালবাসি, তা তোমরা এটা বুঝতে পার, আর নাই পার।"

ঐ কথাগুলো বারবার দৃঢ়ভাবে বলতে বলতে তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। ভাবাবেগে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি কখনো নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠছেন, কখনো আবার বসছেন। ভাবে আত্মহারা হয়ে যেন নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মনে হলো সন্দেহবাচক ঐ 'যদি' শব্দটি নিজ অজ্ঞাতসারে একবারমাত্র উচ্চারণ করেই যেন তিনি মহা অন্যায় ও গর্হিত কাজ করেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর দারুণ অবিচার করেছেন আর সেজন্য যেন তিনি মহা অনুতপ্ত হয়েছেন।

(উদ্বোধন ঃ ৯২ বর্ষ, ১, ৩—৬ সংখ্যা)

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী অখিলানন্দ

(অনুবাদিকা ঃ সান্ত্বনা দাশগুপ্ত)

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি স্বামী আত্মবোধানন্দের সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শন-মানসে বলরামবাবুর বাড়িতে যাই। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ তখন সেখানে ছিলেন। আমরা বলরামবাবুর বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি আসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের আয়োজনের জন্য প্রেমানন্দ মহারাজ বাইরে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করতে তিনি স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য ফিরে এলেন। তিনি আমাদের বললেন ঃ "একদিন মঠে এস, মহারাজ এখন মঠেই রয়েছেন।"

দু-তিনদিন পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি দিবসে অপর একজন যুবকের সঙ্গে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা ভবতারিণীর মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে অতিবাহিত করে নৌকাযোগে আমরা বেলুড় মঠে এলাম, মঠে নেমেই আমরা স্বামী তুরীয়ানন্দজীর দর্শন পেলাম। তিনি বললেন ঃ "মহারাজ এখানেই রয়েছেন, যাও তাঁকে দর্শন কর।"

আমরা মঠবাড়ির কাছে গিয়ে শুনলাম, মহারাজ মন্দিরে আছেন। শুনে আমরাও মন্দিরে গেলাম। সেদিন আমরা এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাওয়া করছেন, ওদিকে পূজা চলছে, মহারাজের সমগ্র মুখমণ্ডল এক দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। একটু পরে মহারাজ মঠপ্রাঙ্গণে নেমে এলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ গ্রহণের সময় তাঁর কাছে বসেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ।

কয়েকদিন পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। ঐদিন খুব ভোরে আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করতে এলাম। সেদিন

তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। তাঁকে দর্শন করে প্রণাম করলে তিনি দু-একটি করুণামাখা কথা বললেন। সেদিন সেই সাক্ষাতের স্মৃতির সঙ্গে আমার নিজের আচরণের কথা মনে পড়ে হাসির উদ্রেক হয়। যেই একদল নতুন দর্শনার্থী আসে, আমি তাদের সঙ্গে মিশে প্রতিবারই গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করছি। আর যতবারই আমি যাচ্ছি ততবারই মহারাজ করুণাঘন হাসি দিয়ে আমাকে অভিসিঞ্চিত করছেন। এইভাবে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শেষে একদল সুদক্ষ গায়ক এলেন, তাঁরা ভক্তিমূলক গান গাইছিলেন। গান শুনতে শুনতে মহারাজের ভাবসমাধি হলো।

এই দর্শনের পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন প্রায় বৎসরাধিক কাল আমাকে দূরে থাকতে হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদ যাত্রার প্রাক্কালে আমি কলকাতায় বলরাম মন্দিরে মহারাজকে দর্শন করতে গেলাম। আমার সঙ্গে মহারাজ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন এবং এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দর্শন করতে বলে দিলেন। তারপর একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীকে বলে দিলেন আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে।

একটু সুস্থ হবার পর এলাহাবাদে যাই, সেখানে থাকাকালে প্রায় প্রতিদিনই আমি পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজীকে দর্শন করতে যেতাম। কলকাতায় ফেরার সময় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আমায় বললেন, আমি যেন মহারাজের নিকট আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানাই। আমি তাঁকে বললাম ঃ "আপনি কেন আমার মধ্যে ঐ শক্তি জাগিয়ে দিচ্ছেন না?" উত্তরে তিনি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন ঃ "না। তুমি মহারাজের কাছে যাও, তিনি অধ্যাত্মশক্তির এক বিরাট উৎস। তাঁর অনুভূতির শেষ নেই।"

কলকাতায় এসেই আমি মঠে গেলাম, পুনরায় আমার প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল এবং আমি মঠে রাত্রিবাসের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি তক্ষুনি আমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। মহারাজ তখন গঙ্গার দিকে মুখ করে একলা বসেছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতে প্রেমানন্দ মহারাজ বললেন, আমি মঠে রাত্রিবাস করতে চাইছি। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন এবং প্রেমানন্দ মহারাজ মায়ের মতো যত্ন নিয়ে আমার থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একই ঘরে আমাকে সেদিন থাকতে দেওয়া হলো।

পরের দিনটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সকালবেলায়

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তা মহারাজকে নিবেদন করলাম। মহারাজ বললেন ঃ "তুমি বিজ্ঞানানন্দকেই কেন বললে না তোমার অধ্যাত্মশক্তি জাগিয়ে দিতে?" আমি বললাম ঃ "বলেছিলাম।" বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আমাকে যা বলেছিলেন সব তাঁকে বললাম। শুনে মহারাজ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ সেইভাবেই রইলেন। এরপর বললেন "আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত করতে হলে তার প্রস্তুতি প্রয়োজন। তোমায় দীক্ষা নিতে হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ বললাম ঃ "আমার যা যা দরকার আপনিই করে দিন।" আমাকে তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিলেন এবং পুনরায় উপদেশাদির জন্য কয়েকমাস পরে যেতে বললেন।

নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে আমি মহারাজকে দর্শন করতে কাশী গেলাম। কারণ, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন। রাত চারটের কিছু পরে আমি মঠে গিয়ে পৌঁছালাম। মহারাজের ঘরের নিকটে যেতে মহারাজ এবং তাঁর সচিব-সেবক স্বামী শঙ্করানন্দ একই সঙ্গে নিজ নিজ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মহারাজ আমাকে দেখে খুশি হলেন। দিন কয়েক কাশীতে ছিলাম। ঐসময় মহারাজ আমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি এবং খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন।

একদিন মহারাজ কাশীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, কাশীতে মৃত্যু হলে মৃত্যুর সময় মুক্তিলাভ হয়। আর একদিন মহারাজ বললেন, কাশীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ এমনই যে, এখানে সামান্য ধ্যানাদি করলেই উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয়। অপর একদিন তিনি বললেন, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময়ে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ অনুভূত হয়। একথা যদি কারও জানা থাকে আর সে যদি যখন সেই তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে তখন সাধন-ভজন করে তাহলে সে তাতে ডুবে যেতে পারে।

দিন কয়েক পর কাশী থেকে ফিরে আসি। কয়েক মাসের মধ্যে আবার মহারাজকে দর্শন করতে কাশী যাই দুর্গা পূজার সময়। ঐ সময় মহারাজ আমার প্রতি মায়ের মতো যে ভালবাসা দিয়েছিলেন তা কখনো ভুলবার নয়। এবারও তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন।

কিছুকাল পর আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে কলকাতায় ফিরে আসি। প্রতিদিন বিকাল হতে না হতে মহারাজকে দর্শন করতে যেতাম। আমি চাইতাম না কেউ আমার মঠে যাওয়ার ব্যাপার জেনে ফেলে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই

সময় একদিন মহারাজ আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদির জন্য পরদিন যেতে বললেন। আমি মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। উনি হেসে বললেন ঃ "আসিস, সব ঠিক হয়ে যাবে।" আমিও হেসে ফেললাম। মহারাজ তাহলে আমার গোপনতার কথা জানেন। বাস্তবিক দেখা গেল, সব কথাই তিনি জানেন। আশ্চর্যের কথা তার পরদিন থেকে এ ব্যাপারে আমার সব অসুবিধা দূর হলো। কিভাবে মহারাজ আমার পথের সব বাধা দূর করে দিলেন তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না।

আমার দীক্ষার আগে আমি ঘন ঘন মহারাজকে দর্শন করতে যেতাম। একদিন মঠবাড়ির বারান্দায় মহারাজ চুপ করে বসেছিলেন। এমন সময় প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁর সামনে এসে মজা করে বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি এই ছেলেটাকে এত ঘন ঘন আসতে দেন কেন?" মহারাজ একবার আমার দিকে, একবার প্রেমানন্দ মহারাজের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন ঃ "তুমি কি মনে কর আমি ওকে মঠে আসতে দিই? ও যেমন খুশি আসবে যাবে—এটা ওর নিজের জায়গা।" তারপর দুজনেই মধুর হাস্য বিনিময় করলেন। বলা বাহুল্য মহারাজের কথা শুনে আমার খুবই আনন্দ হলো।

একদিন মহারাজ আমাকে বললেন যে, আমার কলেজের পড়াশুনা শেষ হলে আমি মঠে যোগদান করতে পারব। অবশেষে মহারাজ স্থির করলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন আমার দীক্ষা হবে। ঐদিন খুব ভোরে ফুল ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে কলেজের ছাত্রাবাস থেকে মঠে পৌঁছালাম। মহারাজের ঘরে জিনিসগুলি রাখতে গেলে তিনি আমাকে গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে যেতে বললেন, ততক্ষণে তিনিও মন্দিরে যাবেন। আমি সবে স্নান করে তৈরি হয়েছি এমন সময় তিনি আমাকে একজন নবীন সাধুকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। মহারাজ ইতোমধ্যে পুরনো মন্দিরে চলে গিয়েছেন। আমি ছুটতে ছুটতে মন্দিরে এলাম। আমার দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়তেই তাঁর এমন রাজরাজেশ্বর মূর্তি দর্শন করলাম যে বলার নয়। তিনি তখন মূল মন্দিরের বারান্দায় আমার প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলেন। "আয়, বাবা আয়।" বলে তিনি আমায় ডাকলেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মন্দিরে তখন শুধু আমরা দুজন। আমি তখন একটি বোকা বালক ছিলাম। দীক্ষার পর যে গুরুকে প্রণাম ও গুরুদক্ষিণা দিতে হয়, তা আমি জানতাম না। আমি মন্দির থেকে বের হতে যাচ্ছি এমন সময় তিনিই আমার হাতে একটি ছোট্ট ফুল দিয়ে তাঁর পায়ে দিতে বললেন।

সেদিনের বিশেষ পূজাদির পর স্বামী প্রেমানন্দ এবং মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুগণ প্রসাদ পেতে বসলেন। আমিও বসলাম। কয়েকশত লোক সেদিন মঠে এসেছিলেন। বিকালের দিকে আমি বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ব ভেবে মহারাজ আমাকে ছাত্রাবাসে ফিরে যেতে বললেন।

১৯১৬ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের অধিকাংশ সময়ই মহারাজ বেলুড় মঠ ও কলকাতায় বলরাম মন্দিরে অতিবাহিত করেন। ঐ সময় আমার মতো আরও কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে এসে তাঁর চরণতলে মিলিত হয়। তারাও তখন তাঁকে ঘন ঘন দর্শন করতে আসত। এইভাবে আমাদের একটি দল গড়ে উঠল। আমরা সকলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলাম। এইভাবে আমাদের সময় কাটতে লাগল। আমি তখন প্রতিদিন বিকেলে কিংবা সন্ধ্যা নাগাদ তাঁকে দর্শন করতে যেতাম।

আমার জীবনে সেদিনটি ছিল এক পুণ্যদিন, যেদিন আমি মঠে মহারাজ, অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ভক্তকে খাবার পরিবেশন করলাম। তারপর নিজে খেতে না বসে মহারাজকে খাবার সময় বাতাস করতে লাগলাম। মহারাজ অন্যদের উপস্থিতিতে কিছুই বললেন না। কিন্তু হাত-মুখ ধোবার সময় বললেন ঃ "তুই খেলি না কেন? তোকে নিয়ে তো এই মুস্কিল!" আমি তাঁর সেই স্নেহমাখা কথা অথচ করুণাসিক্ত অভিব্যক্তি জীবনে ভুলব না। আমার স্বাস্থ্যের জন্য তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। একবার তিনি আমায় বলেছিলেন ঃ "ডাক্তারের নির্দেশমতো সবকিছু খাবি। তুই তো গোঁড়া পরিবারের ছেলে, কিন্তু একটু গঙ্গাজল খেয়ে নিয়ে সব কিছু খেয়ে ফেলবি।" ছাত্রাবাসে থাকবার সময় মহারাজ আমাকে খাঁটি মাখন ও ঘি খাবার জন্য বারবার বলতেন। তিনি সর্বদা আমার কল্যাণ-চিন্তা করতেন।

সন্ধ্যা হয়ে এলে ধ্যান-ভজনের পর সন্ন্যাসী ও ভক্তরা মহারাজের কাছে আসতেন। তখন কখনো কখনো ভক্তিমূলক গান গাওয়া হতো। কখনো বা গভীর নীরবতা রক্ষা করা হতো। সে সময় আমরা সবাই একসঙ্গে বসে ধ্যান করতাম। সেসব বাস্তবিকই ছিল অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কেউ প্রশ্ন না করলে এ সময় মহারাজ কদাচিৎ কথা বলতেন। যদি আমাদের সাধন-ভজনের কোন ব্যাপারে কোন নির্দেশের প্রয়োজন হতো আমরা খুব সকালের দিকে বা বিকালের দিকে তাঁর কাছে যেতাম। আমরা তাঁর প্রতি এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করতাম। মনে হতো, আমাদের সমস্ত সত্তা একটি উচ্চ ও মহিমান্বিত কোন কিছুর দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে।

মাঝে মাঝে দু-একদিন তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে উঠত না, তারপর যেদিন যেতাম সেদিনই তিনি বলতেন ঃ "তোকে আজকাল আর দেখা যায় না।" যদি আমি বলতাম ঃ "মহারাজ এই তো সবে পরশু আমি এসেছিলাম।" তিনি বলতেন ঃ "যেমন তুই, তেমনি তোর পরশু।"

একদিন মহারাজ এক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছেন—স্বামী অম্বিকানন্দের পিতৃগৃহে (শিবপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে)। আমি ও মহারাজের অপর দুজন মন্ত্রশিষ্য—বর্তমানে স্বামী বিবিদিষানন্দ ও স্বামী তেজসানন্দ তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা করতে গিয়েছি। মহারাজের সামনে আমরা বসে আছি। এমন সময় একজন অল্পবয়স্ক সাধু এসে আমাকে একজন ভক্তের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তটি আমাদের ছাত্রাবাসে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি করেছিলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ব্যাপার কি? কি হয়েছে" আমি তখন তাঁকে সংক্ষেপে সব ঘটনা বললাম। তিনি বললেন ঃ "লোকটিকে ছাত্রাবাসের সঙ্গে যুক্ত করবার আগে তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করলি না কেন?" আমি উত্তর দিলাম ঃ "মহারাজ, আমি ভেবেছিলাম লোকটি ভক্ত, সুতরাং তাকে নিয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হবে না।" মহারাজ তখন জোরে বলে উঠলেন ঃ "ওরকম ভক্ত আমি অনেক দেখেছি।"

তখন মহারাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও লোকব্যবহার নিয়ে প্রায় একঘণ্টা ধরে বললেন। বললেন ঃ "বাবা, কারও ভালর জন্য তুমি যদি অনেক কিছু কর, আর যদি একটিমাত্র কাজ তার অপছন্দের কর তাহলে সেই একটিই সে মনে রাখবে, আর তার ভালোর জন্য যা কিছু করেছ সব ভুলে যাবে। সে তখন সর্বত্র তোমার নিন্দা করে বেড়াবে। সংসারের ধারাই এই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বিচারে একধার থেকে সকলের উপকার করতেন। কিন্তু যারা তাঁর কাছ থেকে উপকার নিত, তাঁর দয়া পেত, তারাই তাঁর নিন্দা করে বেড়াত, তা সত্ত্বেও তিনি পুনর্বার তাদের সাহায্য করতেন। জীবনের শেষদিকে তাঁকে একদিন একজন গিয়ে বলে যে, অমুক আপনার নিন্দা করেছে। শুনে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে তিনি বললেন ঃ 'কই, আমি তো তাঁর কোন উপকার করেছি বলে মনে পড়ে না যে, সে আমার নিন্দা করছে।' এ থেকে তুই সাধারণ মানুষের স্বভাব ধারণা করতে পারবি।"

এরপর মহারাজ আমাকে আর একটি কাহিনী শোনালেন। এক জায়গায় এক নদীর ধারে এক সাধু বসে ধ্যান করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন

গেল, একটি কাঁকড়াবিছে জলে ভেসে যাচ্ছে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। তখন সাধুটি তাঁকে জল থেকে তুলে তীরে নিয়ে এলেন। বিছেটি তখন তাঁকে কামড়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বিছেটি আবার জলে পড়ে গেল। সাধুটি আবার তাকে জল থেকে তুলতেই সে দ্বিতীয়বার তাঁকে কামড়ে দিল। বিছের কামড়ে সাধুটির খুবই যন্ত্রণা হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সাধুটি দেখলেন, বিছেটির আবার জলে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তখন কি করণীয় তিনি ভাবতে লাগলেন। চিন্তা করে তিনি দেখলেন যে, বিছের ধর্ম দংশন করা, আর সাধুর ধর্ম বিপন্নকে ত্রাণ করা। সুতরাং তৃতীয়বারও তিনি বিছেটিকে জল থেকে তুলে তার কামড় খেলেন। এবার তিনি তাকে তুলে নিয়ে নদীর পাড়ে অনেক দূরে ছেড়ে দিলেন, যাতে সে আর জলে পড়তে না পারে।

এই কাহিনীটি বলে মহারাজ প্রকৃত সাধুর ধর্ম ও আচরণ চিরদিনের জন্য আমার মনে অঙ্কিত করে দিলেন।

আমি তখন বি.এ. পড়ছি। মহারাজ আমাকে মাদ্রাজ মঠে যোগ দিতে বলেন। আমাকে তিনি বললেন ঃ "এখনই এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলিস না।" আবার বললেন ঃ "আমি তোকে ওখানে পাঠাতে চাইছি, কারণ অবনী (পরবর্তী কালে স্বামী প্রভবানন্দ) প্রভৃতি কয়েকটি তোর মতো অল্পবয়সী ছেলে ওখানে আছে। তোরা পরস্পরের বন্ধু হতে পারবি।"

মঠে যোগ দেবার পর মহারাজের কাছে থাকবার জন্য যখন ভুবনেশ্বরে যাই, মহারাজ তখন অত্যন্ত দয়া ও করুণা দেখালেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের সময় আমাকে তিনি সঙ্গে নিতেন। অনেক সময়ই কোন কথাবার্তা হতো না। আমি শুধু সঙ্গে থাকতাম। কি করে কয়েক আনা পয়সা মাত্র সম্বল নিয়ে কাশী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালে তা রুগ্ণ পরিত্যক্ত ও বৃদ্ধদের সেবার জন্য একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় সে কাহিনী একদিন আমাকে তিনি শোনালেন। সেদিন মহারাজ ঠাকুরের কাজ কিভাবে প্রসারলাভ করে সে বিষয়ে আমার মনে ধারণা জন্মিয়ে দিলেন।

আমি যখন ভুবনেশ্বর মঠে ছিলাম তখন আমাকে মাঝে মাঝে মহারাজের জন্য রান্না করতে হতো। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন ঃ "এখানে থাক আর রেঁধে মর।" কিন্তু তাঁর মনে সবসময় এই চিন্তা যে, তিনি আমাকে মাদ্রাজে পাঠাবেন। একদিন আমি মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি একজন প্রাচীন ভক্তকে

বললেনঃ "আমি এই ছেলেটিকে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে শেখার জন্য মাদ্রাজে পাঠাতে চাই।" আমি তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, আমেরিকায় কাজ করবার জন্য আমাকে পাঠানো হবে। সেই সময় একদিন কলকাতা থেকে অল্পবয়স্ক এক সাধুর লেখা চিঠি এল। চিঠির মর্ম ছিল এই যে, মঠের সচিব স্বামী সারদানন্দ চান কলকাতাতে একটি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজে আমি যেন কলকাতায় যাই। একজন ধনী ব্যক্তি কিছু টাকা দিয়েছিলেন। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে মঠে যোগ দিই, সেই সময় অর্থদানের ব্যাপারে আমি কিছুটা যুক্ত ছিলাম। এই প্রস্তাব যেদিন এল মহারাজ চাইলেন সেই রাত্রেই আমি মাদ্রাজ যাই। আমি অবশ্য তাঁর কাছে থাকতে এবং তাঁর সেবা করতেই চাইলাম; কিন্তু তিনি বললেন ঃ "তুই কি মনে করিস যে, যেসব ছেলেরা দূরে আছে আর ঠাকুরের কাজ করছে না, তারা আমার সেবা করছে না?" এই কথায় আমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

বলরামবাবুর ছেলে রামবাবু (রামকৃষ্ণ বসু) পরমভক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজকে অনুরোধ করলেন আমাকে আর কয়েকটা দিন রেখে দিতে, যাতে আমি তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পুরী যেতে পারি। মহারাজ বললেন ঃ "না রাম, আমি চাই ও এখনই মাদ্রাজে চলে যাক।" যাবার আগে আমি জানতে চাইলাম, মহারাজ শীঘ্রই মাদ্রাজে আসবেন কিনা। তিনি বললেন যে, তিনি আসবেন। আমি আরও জানতে চাইলাম, অবতারপুরুষ ও সাধুদের সম্পর্কে দেখা স্বপ্ন সত্য কিনা। তিনি বললেন ঃ "সত্য"। আমি মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেলাম।

মঠের একটি কেন্দ্রে কয়েকটি তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারী কিছু গোলমাল করেছিল। কয়েকজন প্রাচীন সাধু তাদের সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করে দেবার জন্য মহারাজকে বলেন। মহারাজকে প্রাচীন সাধুরা বললেন, ছেলেগুলির চাল-চলন বা সংস্কারাদি আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল নয়। মহারাজ মন্তব্য করলেন ঃ "মানুষের ভুলভ্রান্তির জন্য দরদ ও সহানুভূতি দেখাতে হলে, সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে হলে বিশেষ গুণ থাকা চাই।" ঐ বিভ্রান্ত তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি মহারাজ কি অসীম ক্ষমা ও ভালবাসাই না দেখালেন। পরে এদের তিনি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি বলতেন ঃ "কম্বলের রোঁয়া বাছতে আরম্ভ করলে তা আর শেষ করা যাবে না।"

পিছনের দিকে তাকালে দেখি মহারাজ আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ দেখতে

শেখাতেছিলেন এবং কিভাবে নানা সমস্যার সমাধান করতে হয়, কিভাবে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আচরণ করতে হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে আমার জীবন গঠন করে দিয়েছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'শ, ষ, স। যে সয় সে রয়। যে না সয় তার নাশ হয়'।" তিনি আরও বলেছিলেন ঃ "সর্বদা সত্য বলবে, কিন্তু সবসময় অপরের পক্ষে কল্যাণকর সত্যই বলবে, কখনো নিষ্ঠুর সত্য বলবে না।"এই দুইটি উপদেশ অনেক সঙ্কট মুহূর্তে আমায় সাহায্য করেছে এবং ভারতে ও আমেরিকায় আমার নগণ্য জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ করে দিয়েছে।

একদিন আমি মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁর খুব কাছে বসেছি। হঠাৎ কলকাতায় যখন আমার অসুখের সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলাম তখনকার সব কথা তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই দেখে যে, সে সময় একদিন আমি তাঁর জন্য সামান্য যা নিয়ে গিয়েছিলাম সে কথাও তাঁর মনে আছে।

আমার জীবনের অন্যতম বড় ঘটনা আমার সন্ন্যাস। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে আমার সন্ন্যাস হয়। একদিন সকালবেলায় তাঁর ঘরে ঢুকে নীরবে বসে আছি। এমন সময় তিনি আমাকে বললেন ঃ "তোকে সন্ন্যাস দিই, কি বল?"

আমি হেসে বললাম ঃ "মহারাজ, সে আপনার ইচ্ছা।" তখন মহারাজ বললেন ঃ "ঠিক আছে। তুই সব আয়োজন কর, আর স্বামী শিবানন্দ ও শর্বানন্দকে জানা।" (স্বামী শিবানন্দ তখন মাদ্রাজ মঠে ছিলেন, স্বামী শর্বানন্দ ছিলেন মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ।)

আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। প্রাথমিক আয়োজন ও অনুষ্ঠানাদি দিনের বেলায় হয়েছিল, পরদিন খুব ভোরে আমি ও স্বামী প্রভবানন্দ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলাম।

যেদিন মহারাজ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রাবাসটি ঠাকুরকে উৎসর্গ করলেন সেদিনটি ছিল আর একটি স্মরণীয় দিন। পরম করুণা ও স্নেহের সঙ্গে তিনি পূজানুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আমাকে পাঠালেন। পরে অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণসহ মহারাজ শোভাযাত্রা করে মঠবাড়ি থেকে নতুন ছাত্রাবাসে এলেন। প্রায় চার-পাঁচশো লোক হয়েছিল। শোভাযাত্রাটি ছাত্রাবাসের নিকটে এলে আমি কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে শোভাযাত্রাটির সামনে গেলাম। মহারাজ ছিলেন

সামনে। মহারাজের কাছে যেতেই আমি এক অনির্বচনীয় অনুভূতি লাভ করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, উপস্থিত প্রত্যেকেই সেদিন অসাধারণ কিছু অনুভব করেছিলেন। যেন সকলেই এক উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হয়েছেন। পরদিন সকালে আমি স্বামী শিবানন্দকে প্রণাম করতে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে বললাম। তিনি বললেন ঃ "একই সঙ্গে বহুলোককে উচ্চতর ভূমিতে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা মহারাজ রাখেন।"

মহারাজের উপস্থিতিতে মাদ্রাজ মঠে দুর্গাপূজার সময়ও অনুরূপ অভিজ্ঞতা সমবেত সকলের হয়েছিল। সেই কয়েকটি মাত্র দিনের কথা কেউ কখনো ভুলতে পারবে না। পূজার শেষ-দিনে সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও আধ্যাত্মিক উচ্চানুভূতি লাভ করেছিলেন।

আমি যখন মাদ্রাজে, তখন একদিন একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা মঠে এলেন। তিনি নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। আমি তাঁকে কলকাতায় গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে বললাম। তিনি কলকাতা গেলেন। পরে যখন ভদ্রমহিলা সিংহলের পথে মাদ্রাজে এলেন তখন মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা তিনি আমাকে শোনান। তিনি বললেন যে, তিনি বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে যখন মহারাজের নিকটে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলেন, মহারাজ তখন তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সেই সময় তাঁর এক অননুভূত উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয় এবং তারই ফলে তাঁর সমস্ত কষ্ট দূর হয় এবং তিনি প্রভূত আনন্দ ও শান্তির অধিকারিণী হন।

(উদ্বোধন ঃ ৯৪ বর্ষ ৪ ও ৫ সংখ্যা)

মহারাজের স্মৃতি

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের দুর্গোৎসবের কিছু পরে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করে স্বামীজীর ঘরে দোতলায় গেলাম। তারপর মঠে ঘোরাঘুরি করে কলকাতায় ফিরব ভাবছি। এমন সময় দেখলাম, স্বামীজীর মন্দির-সংলগ্ন বেলগাছ এবং প্রেমানন্দ স্মৃতিমন্দিরের মাঝে নারকেল গাছের সামনে রাস্তায় সেবক বিশ্বরঞ্জন মহারাজের সঙ্গে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বেড়াচ্ছেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ "আচ্ছা—হবে, হবে।" তাঁর এই কথাকয়টি এখনো আমার কানে বাজছে। তিনি আমার অন্তরের আবেদন জানতে পেরে আমাকে অব্যর্থ আকর্ষণে আমার উত্তরকালের গতিপথের ইঙ্গিত করলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজের কথাকয়টিতে আশ্বস্ত ও শান্ত হয়ে গেট দিয়ে বের হয়ে কলকাতার পথে যাত্রা করলাম। তখন মঠের গেট ছিল ওটিই, জি. টি. রোডের দিকের বড় গেট তখন ছিল না। ঐসময় কয়েকবার আমি মঠে গিয়েছি এবং দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় স্বামীজীর ঘরের কাছে মহারাজের ঘরের সামনে চেয়ারে বসা মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করেছি।

মহারাজ তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে নিয়ে ধ্যান করতেন। সেই কারণে ঠিক ভোর ৪টার সময় ঘণ্টা বাজানো হতো। আমি এক রাত্রি অনুমতি নিয়ে মঠে বাস করি এবং স্বামীজীর ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় শয়ন করি, তাই বিষয়টি জানতে পারি।

ঠাকুরের ও স্বামীজীর জন্মোৎসবের সময় মহারাজকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতে দেখেছি। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও অন্যান্য সাধু-ভক্তদের নিয়ে কনখল সেবাশ্রমে যান। এতদিন সেখানকার অন্যান্য সাধুরা সেবাশ্রমের সাধুদের কেবল রোগীর সেবক ও চিকিৎসক বলেই জানতেন। এখন মহারাজকে দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। তাঁদের

আগেকার ভুল ভেঙে গেল। তাঁরা শ্রদ্ধা জানালেন এই মহাসাধক ও মহাপুরুষকে। হিমালয়ের পাদমূলে গিরিরাজতনয়া সতীর কথা মহারাজের মনে পড়ল। তিনি ধ্যাননেত্রে দেখলেন, দক্ষালয় কনখলে জগজ্জননী দশভূজা সিংহবাহিনীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে সেবাশ্রমে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হলো। পূজামণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমার সামনে সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ মহানন্দে পূজা দর্শন করে ধন্য হলেন। এই সময়ে হাসপাতালের পথে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উচ্চভিত্তির ওপর সুবৃহৎ গৃহ নির্মিত হয়। কনখল সেবাশ্রমে পুরনো বেলগাছ ও কাঁঠাল গাছের বীজ মহারাজ অন্যস্থান থেকে আনিয়ে বপন করিয়েছিলেন। কনখল সেবাশ্রম থেকে এসে তিনি কাশীধামে সেবাশ্রমের অফিসবাড়িতে স্বামীজীর মন্দিরের পশ্চিমে এবং বেলগাছের উত্তরদিকের কোণের ঘরে থাকতেন। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সাগ্রহ আহ্বানে মহারাজ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রয়াগধামে গিয়েছিলেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর জন্মতিথির কিছুদিন পরে মহারাজ শেষবার কাশীধামে আগমন করেন। এবার তিনি অদ্বৈত আশ্রমে এসে অবস্থান করেন। দোতলায় একটি প্রশস্ত গৃহে (হিরণময়ী-কিরণময়ী-স্মৃতি) থাকতেন। আমি ঐ সময় এলাহাবাদ থেকে এসে কাশী সেবাশ্রমে কর্মিরূপে দু-তিন মাস ছিলাম। প্রত্যহই আরতির পর তাঁর দর্শনলাভ করতাম। মহারাজ প্রত্যহ সেবকদের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতাম। মহারাজ গুরুদ্বার, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি স্থানে যেতেন এবং রথতলার চৌমাথা থেকে স্টেশনের দিকে উত্তরমুখ হয়ে দাউজির (বলরামের) মন্দির পর্যন্ত গিয়ে রাস্তার ওপরে পশ্চিম দিকের প্রথম গেটে দাঁড়িয়ে দাউজিকে প্রণাম করতেন। মহারাজ সেবার কাশীধামে দু-তিন মাস ছিলেন। একদিন অদ্বৈত আশ্রমের মণ্ডপে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী অম্বিকানন্দ ও অন্যান্য সাধুরা মহারাজ এবং স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে চক্রাকারে নৃত্যগীত করতে করতে কীর্তনানন্দে মেতে গিয়েছিলেন।

সেবার ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশীধামের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। মহারাজ স্বয়ং মণ্ডপের বারান্দায় ও জামগাছের কাছে প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট সাধুদের ভোজনের সময় পরিবেশকদের পরিচালনা করেছিলেন।

অন্নপূর্ণা পূজার সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে মহারাজ সকল সাধুদের সঙ্গে নিয়ে অন্নপূর্ণার নাটমন্দিরে কীর্তনাদি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। স্বামী

সারদানন্দ এবং যোগীন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতি মহিলা ভক্তগণও সেদিন ছিলেন।

সেবাশ্রমের অফিস বাড়ির দক্ষিণ বারান্দা, রাস্তা এবং বেলগাছের উত্তরে খানিকটা (প্রাঙ্গণের অংশ) স্থান জুড়ে বেঞ্চি ও চেয়ার সাজিয়ে ফটো তোলা হয়। মহারাজের যত ফটো আছে তার মধ্যে এই গ্রুপ ফটোখানি সবচেয়ে বড়।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ তপস্যার অনুকূল স্থান ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলতেন ঃ "ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্ত কাশী।"

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরের ওপরে ওঁকার মন্দির সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রায় তিনমাস ছিলেন। এলাহাবাদ মঠ ও মিশনের বার্ষিক রিপোর্ট ছাপানোর আগে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে দেখানো ও স্বাক্ষর করানোর জন্য আমি ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির প্রারম্ভে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। গঙ্গার ঘাটের ওপরে মঠবাড়ির দোতলার বারান্দায় (স্বামীজীর ঘরের উত্তরে) মহারাজ ও বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ উভয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের হাতে রিপোর্টের পাণ্ডুলিপিটি ছিল। তিনি মহারাজকে তা দেখিয়ে বললেন ঃ "এই ছেলেটি আমার ওখানে থাকে। ওরই লেখা রিপোর্ট।" মহারাজ বললেন ঃ "আমি জানি।" আমি দুজনকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম।

মহারাজকে এই আমার শেষ দেখা।

প্রয়াগধামে মঠে বসে আমরা খবর পেলাম—১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১০ এপ্রিল সোমবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটে মহারাজ মহাসমাধি লাভ করেছেন।

(উদ্বোধন ঃ ৯৭ বর্ষ ১ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা

স্বামী অপূর্বানন্দ

'মহারাজ' বা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে প্রথম দর্শন করি ১৯১৮ সালে—কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার কয়েকদিন পরে। তিনি তখন বলরাম মন্দিরে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় বলেছিলেন যে, রাখালের রাজবুদ্ধি আছে—সে একটা রাজ্য চালাতে পারে। সেকথা শুনে স্বামীজী তখন থেকে রাখাল মহারাজকে 'রাজা' বলে ডাকতেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রথম প্রেসিডেন্ট করেন। এইসব ঘটনা জানার পরে 'রাজা মহারাজ'কে দর্শন করবার একটা প্রবল ইচ্ছা মনে জাগে, কিন্তু সময় না হলে কিছুই হয় না। আমার জীবনে ঐ শুভলগ্নটি এসেছিল ১৯১৮ সালে যখন বেলুড় মঠ প্রথম দর্শন করি এবং বেলুড় মঠের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক 'মহাপুরুষ মহারাজ' বা স্বামী শিবানন্দজী মহারাজই তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বেলুড় মঠে তিন-চার দিন বাস করার পরে একদিন সকালে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গিয়েছি দোতলায় তাঁর ঘরে। প্রণাম করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছি তখন মহাপুরুষজী নিজে থেকেই আমায় বললেন ঃ "তুমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাবে না? তিনি এখন বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়িতে আছেন। রাজা মহারাজ ও হরি মহারাজ বলরাম মন্দিরে আছেন। তাঁদেরও দর্শন করে এস।"

পরদিনই ভোরবেলায় চলতি নৌকায় বাগবাজারে গেলাম। প্রথম বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম যে, সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন হবে না—তিনি ভোরে অন্যত্র গিয়েছেন। তখন বলরাম মন্দিরে গেলাম। দ্বিতলে উঠে দেখলাম যে, কয়েকজন ভক্ত রাজা মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করছেন। মহারাজ তখনো নিজের ঘর থেকে বের হননি। আমি ভক্তদের পাশে এক বেঞ্চিতে বসে মহারাজের দর্শনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় আধ

ঘণ্টা পরেই রাজা মহারাজ হলঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় আপনমনে পায়চারি করতে লাগলেন। মহারাজকে দেখেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অন্তর ভরে গেল, মনে মনে তাঁর চরণে প্রণত হলাম। কী সৌম্যদর্শন! সুন্দর, উজ্জ্বল হেমবর্ণ; গায়ে একটিমাত্র উত্তরীয়, পরিধানের গৈরিকের সঙ্গে তাঁর শরীরের রং মিলে গিয়েছিল। উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, কমনীয় দিব্যকান্তি—যেন কোন দেবতা মর্তে নেমে এসেছেন। তিনি পায়চারি করছিলেন, কিন্তু তাঁর ঊর্ধ্বদৃষ্টি ও অন্তর্মুখ ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যেখানে বসেছিলাম তার সামনে দিয়েও কয়েকবার পায়চারি করলেন, কিন্তু ঐ গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে সে সময় কেউ তাঁকে প্রণাম করল না। আমরা তখন হাত জোড় করে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়েছিলাম। খানিকক্ষণ ঐভাবে বেড়িয়ে তিনি দক্ষিণদিকের বারান্দায় দাঁড়ালেন আমাদের দিকে মুখ করে। তখন ভক্তগণ একে একে তাঁকে প্রণাম করতে এগিয়ে গেলেন। তিনি স্থিরভাবে সকলের প্রণাম গ্রহণ করলেন, কিন্তু কারো সঙ্গে কোন কথা বললেন না—যদিও উপস্থিত সব ভক্তই তাঁর পূর্বপরিচিত। তাঁর মৌন অবস্থিতিতেই সকলের মনপ্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল। শেষটায় আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম এবং করজোড়ে বললাম ঃ "আমি বেলুড় মঠ থেকে এসেছি, মহাপুরুষ মহারাজ আমায় পাঠিয়েছেন আপনাকে দর্শন করতে।" তিনি স্মিতমুখে বললেন ঃ "ওঃ! তারকদা পাঠিয়েছেন? তিনি কেমন আছেন?" যথাযথ উত্তর দিলাম। এইটুকু মাত্র কথা! তাঁর কণ্ঠস্বর এত মধুর ও মমতামাখা যে, ঐ দুটি কথাতেই আমার প্রাণ ভরে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন তো ভাগ্যে ঘটেনি, কিন্তু তাঁর মানসপুত্রকে স্থূলশরীরে প্রসন্নমূর্তিতে দেখে মনে এক অব্যক্ত আনন্দের দোলা এসেছিল। একটু পরেই তিনি হলঘরে ঢুকে পড়লেন। মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইলাম ঐ দেবমানবের দিকে। ভগবান যিশুর কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন ঃ "He who that hath seen the Son, hath seen the Father also." পিতা পুত্র যে অভেদ। মনে পড়ল কথামৃত-বর্ণিত সব ঘটনা। রাখালের প্রথম আগমন—শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক সময় বলেছিলেন ঃ "রাখাল ব্রজের রাখাল!... নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যখনই জানতে পারবে তখনই শরীর ছেড়ে দেবে।"

সেই রাখাল এখন 'রাজা' হয়েছেন—হয়েছেন রাজা মহারাজ—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ এবং বিশ্বপূজ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কতশত মানবজীবনতরীর

কর্ণধার, সেই মহারাজকে প্রণাম ও দর্শনের পুণ্যস্মৃতি আজ সত্তর বছর পরেও হৃদয়ে আনে এক অনির্বচনীয় আনন্দ-শিহরণ! জীবনের গতি ফিরে যায়, মন চলে যায় সেই সুদূর অতীতে—অন্তরাত্মা বারবার লুটিয়ে পড়ে সেই মহাজনের চরণতলে। তিনি এখন অন্তরে অধিষ্ঠিত অধিদেব। ঐ বলরাম মন্দিরের বারান্দায় এখনো যেন তিনি তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন এ দীনের প্রণাম গ্রহণ করতে।

* * *

রাজা মহারাজের দ্বিতীয় দর্শন লাভ হয় ১৯১৯ সালে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় বেলুড় মঠে। বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্য শেষ করে মঠে ফিরে এসেছি পঞ্চমীর দিন। মঠে পূজার আনন্দ-সমারোহে যোগদান আমার জীবনে এই প্রথম। ঐ আনন্দ যেন শতগুণ বেড়ে গেল মহাষ্টমীর পূজার দিন যখন রাজা মহারাজ মঠে শুভাগমন করলেন। আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করলাম। কিন্তু এখন তাঁর অন্য রূপ—যেন স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব। তিনি মঠের ওপরের বারান্দায় আরামকেদারায় বসে সকলের প্রণাম গ্রহণ করছিলেন। তাঁর অন্তর্মুখী ভাব একটা গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। বহু সাধু-ভক্ত তাঁকে প্রণাম করেন, আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর মৌন অবস্থিতি দিব্যানন্দে ভরে দিচ্ছিল সকলের মনপ্রাণ।

নবমীর সকালেও অনেকের সঙ্গে মহারাজকে প্রণাম করি। মহানবমীর রাত্রে কালীকীর্তনের আসর বসেছে। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, সারদানন্দ মহারাজ সকলেই কীর্তনে যোগ দিয়েছেন। কীর্তন খুব জমেছে। যখন "সমরে নাচেরে কার এ রমণী, নাশিছে তিমিরে তিমিরবরণী" গানটি সমস্বরে গাওয়া হচ্ছিল, তখন ভাবের আতিশয্যে মহারাজ দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজও। তিনজনই ভাবে বিভোর হয়ে তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। উপস্থিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দও নাচতে নাচতে কীর্তন করতে লাগলেন—কেউ তানপুরা কেউ বা অন্য বাদ্যযন্ত্র-হাতে নাচছেন। সে এক উদ্দীপনাময় দৃশ্য! একদিকে ঠাকুরের তিনজন ব্রহ্মজ্ঞ পার্ষদ ভাবাবেশে নৃত্যরত, সঙ্গে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের তন্ময় অংশগ্রহণ—সে যে কী অতীন্দ্রিয় দৃশ্য ও স্বর্গীয় আনন্দ তা বলে বোঝাবার নয়! সকলেই ঐ দিব্যানন্দের স্রোতে ভেসে চলেছে। রাজা মহারাজের ঐ ভাবময় নৃত্যদর্শনে সকলেরই মনপ্রাণ দিব্যানন্দে ভরপুর। ঐ স্মৃতি এখনো মানসপটে আমার অক্ষুণ্ণ

হয়ে রয়েছে এবং নিত্য-নব অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি, দেখবও না।

দ্বাদশীর দিন বিকালে মহারাজ কলকাতায় বলরাম মন্দিরে ফিরে যাবেন। সকালবেলা মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আমিও তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি। তিনি তাঁর ঘরের পাশে ওপরের বারান্দায় আরামকেদারায় বসে সকলের প্রণাম গ্রহণ করছিলেন।

মঠের সাধুরা প্রণাম করার সময় তিনি কাউকে কাউকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ঐ সময়ে শুধু মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদেরই প্রণাম করবার কথা। তাই আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুই কি মঠের ব্রহ্মচারী?" (আমার ব্রহ্মচারীর পোশাক ছিল না) তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি চুপ করে আছি। মহারাজের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ। তিনি আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, কয়েক মাস পূর্বে মঠে যোগদান করেছে। মহাপুরুষ মহারাজ ওকে বাঁকুড়ার রিলিফের কাজে পাঠিয়েছিলেন। ঐ কাজ শেষ করে সবে মঠে এসেছে। ব্রহ্মচারী হবে। তা শুনে রাজা মহারাজ বললেন ঃ "যা, তারকদাকে জিজ্ঞেস করে আয়।" আমি মহারাজের ঘরের ভিতর দিয়েই মহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম। তিনি তাঁর তক্তপোশের উত্তরদিকে চেয়ারে বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "আমি মঠের ব্রহ্মচারী কিনা তা মহারাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন।" প্রশ্ন শুনে তিনি খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। পরে বললেন ঃ "যাও, মহারাজকে বল যে, তুমি মঠের ব্রহ্মচারী হতে এসেছ।" আমি তখনই মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে মহাপুরুষজীর কথা বলতেই তিনি খুশি হয়ে বললেন ঃ "তা বেশ বেশ, তুই মঠের ব্রহ্মচারী হলি।" আমি পুনরায় তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি, তিনিও আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ঐ দিন আমার নবজীবন লাভ হলো। মহারাজ আমায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সঙ্ঘে স্থান দিলেন। তাঁর আদেশ না হলে তা সম্ভব হতো না। বিকালে যখন মহারাজ কলকাতায় গেলেন তখনো তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করেছি—তিনিও স্মিতমুখে ঐ প্রণাম গ্রহণ করেছেন। এর পরে বেলুড় মঠে মহারাজকে অনেকবার দর্শন করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।

মহারাজ ছিলেন সঙ্ঘনায়ক। তাই তাঁকে সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে সব কেন্দ্রেরই উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের পরামর্শ দিতে হতো। সেজন্য ১৯১৯ সাল থেকে শেষের দিকে তিনি এককালে দীর্ঘদিন

বেলুড় মঠে বাস করতে পারতেন না। কিন্তু যখনই বেলুড় মঠে এসে বাস করতেন, মঠের সর্বত্র একটা অপার্থিব আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর ঘরে মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে ধ্যান করতেন। তিনি ধ্যানে মগ্ন হতেন আর মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীরা তাঁর ঘরের মধ্যে ধ্যানে বসতেন, পাশের বারান্দায় বসতেন নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা। এভাবে ধ্যান চলত সকাল পর্যন্ত। মহারাজের অবস্থিতিতে এমন একটা স্বর্গীয় ধ্যানগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হতো যাতে নেহাৎ চঞ্চল মনও শান্তভাব ধারণ করত। আমি তখন নতুন ব্রহ্মচারী, ধ্যানের কিছুই জানি না বা বুঝি না—কিন্তু মহারাজের ধ্যানমগ্ন মূর্তি দর্শনে আনন্দ পেতাম। মুগ্ধ প্রাণে বসে থাকতাম।

ধ্যানের পর মহারাজের নির্দেশে স্তবপাঠ হতো। গুরু, জগদ্ধাত্রী, দক্ষিণাকালিকা, ত্রিপুরাসুন্দরী, গোপাল প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব পাঠ হতো। যাঁরা ভিতরে বসতেন তাঁদের কেউ কেউ ধ্যান-জপ সম্বন্ধে মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। তিনিও উপদেশচ্ছলে সকলকে আশীর্বাদ করতেন।

একদিন জনৈক সন্ন্যাসী খুব দীনভাবে বললেন ঃ "মহারাজ, ধ্যান-জপে মন বসে না—বড়ই অশান্তিতে আছি। আশীর্বাদ করুন যাতে মনের এই অশান্তি কেটে যায়।"

মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "ধ্যান কি এত সোজা কথা যে, একটু চোখ বুজে বসলেই ধ্যান হবে! ধ্যানের জন্য অনেক খাটতে হয়। মনকে নির্বিষয় করতে হয়। মনে বাসনার লেশমাত্র থাকলেও ধ্যান হবে না।" খানিক চুপ করে থেকে পরে বললেন ঃ "খুব জপ করবি, মনে মনে সবসময়ে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করবি। চলতে ফিরতে মানসজপ চালা। এভাবে যদি ১৫/১৬ ঘণ্টা জপ করে যেতে পারিস তো দেখবি যে, ঘুমের মধ্যেও সেই জপ চলছে। তখন ধ্যানও হবে—মনে শান্তিও পাবি।"

মহারাজের এই অমূল্য উপদেশ শুনে সকলেরই মন অভিভূত হয়ে গেল। সন্ন্যাসী আবেগভরে মহারাজকে আশীর্বাদ করতে বললেন। মহারাজও সন্ন্যাসীর মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্বাদ করলেন। আমরা দূর থেকে মহারাজের ঐ কৃপামূর্তি দর্শন করে ধন্য হই। আমার তরুণ পিপাসু মনে মহারাজের ঐ উপদেশ গভীর রেখাপাত করেছিল এবং পরবর্তী জীবনে ক্রমে মূর্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মুখনিঃসৃত মন্ত্ররূপী ঐ অমোঘ বাণী।

* * *

মহারাজ মঠে এলেই যেন আনন্দের হাট বসে যেত। তিনি নানাভাবে মঠবাসীদের আনন্দ দিতেন, কতরকমের খাবারের ব্যবস্থা করতেন—রোজই নিত্যনতুন প্রচুর খাবার। সকালে বিকালে ঘণ্টা মেরে কোন দিন ডগলাস[১], কোন দিন উইলিয়াম ভট[২], কোন দিন গোপাল গপ্পা[৩], মোগলাই চা[৪], আরও কত কিছু। আমরাও আনন্দে সেসব খেতাম। তিনি ছেলেদের খাওয়া দেখে আনন্দ করতেন।

মহারাজ বাগ-বাগিচা খুব ভালবাসতেন। দক্ষিণ ভারত থেকে 'নীলাম আম', অতি সুস্বাদু কাঁঠাল, ভিতরটা সাদা রঙের সুমিষ্ট বাতাবি লেবু, ভাল ভাল নতুন নতুন ফুল-ফলের গাছ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে এনে মঠে লাগিয়েছিলেন এবং গাছগুলি দেখাশুনা করতে বাগানে যেতেন। আমরা তখন বাগানে কাজ করতাম। তিনি আমাদের উৎসাহ দিতেন। মঠের প্রয়োজনীয় সবজি, ফুল, ফল সবই মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা মঠের জমিতে উৎপাদন করতেন। তখন মঠে একজন মাত্র চাকর—বাসনমাজা ও রান্নাঘরের কাজের জন্য নিযুক্ত ছিল। বাকি যাবতীয় কাজ মঠবাসী সাধুদেরই করতে হতো।

মহারাজ ফুল ও ফল খুব ভালবাসতেন। মঠের উঠানের পাশের বাগানেই নানারকমের ভাল ভাল গোলাপ ও ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার চারা লাগিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে নাগলিঙ্গম ফুলের গাছ, দক্ষিণ ভারত থেকে চন্দন গাছ ও বৃন্দাবন বা অন্য কোন স্থান থেকে অশোক, বট এনে মঠে গঙ্গার ধারে লাগিয়েছিলেন। আরও কত রকমের দুষ্প্রাপ্য গাছ লাগিয়ে বেলুড় মঠকে সুশোভিত করেছিলেন তিনি। যখন তিনি মঠে থাকতেন ঘুরে ঘুরে সব দেখতেন। একবার মহারাজ কলকাতায় আছেন। সে সময় মহারাজের লাগানো পল নাইরন গোলাপগাছে প্রথম খুব বড় একটি ফুল ফুটেছে—৮ ইঞ্চি ডায়ামিটার। আরেকটি গোলাপগাছেও হলদে রঙের অনেক ফুল ফুটেছিল। মহারাজকে সে-খবর দিতেই তিনি একদিন মঠে এসেই সোজা গেলেন গোলাপবাগানে এবং ঐ ফুলগুলি দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলেন। তিনি একটি ফুলও কাটতে দিলেন না। বললেন ঃ "ঠাকুর বাগান দেখতে আসেন, ফুল না থাকলে কি বাগানের শোভা হয়?"

---

১ ডগলাস—লুচি, চাপ চাপ ছোলার ডাল, আলুর দম।

২ উইলিয়াম ভট—ডাল, ভাত, তরকারি, পায়েস, দৈ, মিষ্টি, শুক্তো, চচ্চড়ি, ফল—সব মিলিয়ে।

৩ গোপাল গপ্পা—পাতলা খিচুড়ি, সবরকমের তরকারি ও প্রচুর ঘি দিয়ে তৈরি হতো।

৪ মোগলাই চা—গরম মসলার জল করে তাঁর সঙ্গে প্রচুর দুধ দিয়ে গাঢ় চা।

একবার মহারাজ বেলুড় মঠে রয়েছেন। ঐ সময় তাঁর হাতে-লাগানো ছোট ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা গাছটিতে প্রথম ফুলটি ফুটল। তার কয়েক দিন আগে থেকেই মহারাজ রোজ ঐ ফুলের কুঁড়িটি দেখতেন। একদিন সকালে ঠাকুরঘরের ভাঁড়ারি ঐ ফুলটি খানিকটা ডাল-সমেত কেটে ফুলদানীতে করে ঠাকুরঘরে সাজিয়েছিলেন। মহারাজ সকালে এসে ঐ ফুলটি গাছে দেখতে না পেয়ে সন্ধান নিয়ে যখন ঘটনাটি জানতে পারলেন তখন ভাঁড়ারিকে ডেকে খুব তিরস্কার করে বেদনাভরা স্বরে বললেন ঃ "অত ছোটগাছের ডালটি কেন কাটলি? ওতে গাছটি যে কমজোরি হয়ে যাবে। তুই মহা লক্ষ্মীছাড়া—তুই মঠে থাকবার যোগ্য নোস।" পরে বলেছিলেন ঃ "গাছপালাকে ভালবাসতে হয়।" ঐ ঘটনাতে তিনি এতই বেদনা অনুভব করেছিলেন যেন তাঁর অঙ্গেই কেউ আঘাত করেছে!

তিনি যখন মঠে থাকতেন তখন রোজই রাত্রে মঠের অতিথিভবনে গানের আসর বসত। কালীকীর্তন, ব্রহ্মসঙ্গীত, ঠাকুরের গান ও অন্যান্য ভজনাদি হতো। কীর্তনও তিনি ভালবাসতেন। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সকলকে ঐ সব ভজনাদি শেখাতেন। কোন্‌দিন কি গান গাওয়া হবে তা তিনিই বলে দিতেন। কালীকীর্তনের মধ্যে 'পঙ্কজবনে রাত্রদিনে কি রঙ্গ করিছ শিবা' এবং 'আহা মরি মরিরে, কিরূপ মাধুরী', 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কে বা চায়' ইত্যাদি গান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ঐ সব গান শুনতে শুনতে তিনি ভাবস্থ হয়ে যেতেন।

মহারাজ মঠে এলে ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে রাত্রি পর্যন্ত মঠবাসীদের ধ্যান-জপ, কাজকর্ম, পাঠ, আলোচনা, ভজন-কীর্তন—সবই ঘড়ির কাঁটার মতো চলত। সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধন-ভজনের ওপর তিনি খুব জোর দিতেন এবং মঠের যাবতীয় কাজকর্মই যে ঠাকুরের কাজ এবং তা ধ্যান-জপের চাইতে কম নয় তাও তিনি বলতেন। একদিন সকালে সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে খুব ভাবের সঙ্গে বলেছিলেন ঃ "বাবারা, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ভজন-সাধন কর। একদিনও বাদ দিবিনি। মন বসুক আর নাই বসুক, নিয়মিত সময়ে জপ-ধ্যান করে যাবি। ক্রমে ভগবানের নামে রুচি হবে। ভগবানের ওপর একটা প্রীতি আসবে। তখন আপনা থেকেই জপ করতে ইচ্ছা হবে—ধ্যান করতে ভাল লাগবে। একবার ভগবানের নামে আনন্দের স্বাদ পেলে তখন জপ-ধ্যান ছাড়া আর সব আলুনি বোধ হবে।"

"ভগবানের কৃপা চাই, তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবে না। খুব প্রার্থনা কর। আন্তরিক প্রার্থনা তিনি খুব শোনেন। খুব ডাক—খুব প্রার্থনা কর, দেখবি তিনি সাড়া দেবেন।"

তাঁর সেই কণ্ঠস্বর এখনো অন্তরে ঝঙ্কৃত হয়। ঐ বাণীরূপে তিনি এখনো আমার অন্তরে বিরাজমান। কালের সুদীর্ঘ ব্যবধানও তাঁর কণ্ঠস্বরকে ক্ষীণ করতে পারেনি। এবং আরও আরও জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমার হৃদয়-দেউলে, তুলছে আনন্দ-কোলাহল।

* * *

সাধারণত মহারাজ রোজ মন্দিরে যেতেন না, কয়েকদিন অন্তর যেতেন। কিন্তু যেদিন যেতেন সেদিন বিশেষ একটা ভাব নিয়ে যেতেন। হাত জোড় করে তিনি যখন গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর সারা শরীর কাঁপত, চক্ষু থাকত অর্ধনিমিলিত, মুখমণ্ডল ভাবগম্ভীর ও রক্তিমাভ। প্রণাম করে যুক্ত করে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে যখন তিনি মৌন প্রার্থনা জানাতেন, তখন মনে হতো তিনি যেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন। মহারাজ যেদিন মন্দিরে ঠাকুরদর্শন করতে যাবেন সেদিন মঠে তড়িৎবেগে সে-খবর প্রচারিত হয়ে যেত এবং সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ উঠানে সমবেত হয়ে উদগ্রীব ভাবে মহারাজের দর্শনের জন্য অপেক্ষা করতেন। মহারাজ যখন ওপরের ছাদ দিয়ে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করতেন, তখন সব সাধুরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের বারান্দায় সমবেত হতেন। ঐভাবে মহারাজকে মন্দির দর্শন করতে দেখার সৌভাগ্য আমার দু-তিনবার হয়েছিল। সেদৃশ্য এখনো চোখের সামনে ভাসছে। মহারাজ ঠাকুরের দিকে মুখ করে করজোড়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার পূর্বে একবার চারিদিকে দেখতেন। ঐ তাকানোতেই তিনি সবকিছু দেখে নিতেন। একদিন ঐভাবে মন্দির দর্শন করে নিজের ঘরে ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গেই পূজারীকে ডেকে পাঠালেন—আমরাও উৎসুক হয়ে কি ব্যাপার জানবার জন্য ওপরের বারান্দায় গেলাম। পূজারী যেতেই তিনি একটু বিরক্তির সুরে বললেন ঃ "কি পূজা করছ? দুটো ফুল দিলেই ঠাকুরের পূজা হলো? ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে যে ঝুল হয়েছে তা দেখতে পাও না? মন্দিরের ওপরের কোণে ও নিচেও ঝুল হয়েছে। এই মন-নিয়ে ঠাকুরসেবা কর?" এইভাবে নানা কথায় তিনি পূজারীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। পূজারী কাঁদতে কাঁদতে মহারাজের পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন ঃ "আর কখনো এমন করব না, আমার অপরাধ হয়েছে।"

তখন মহারাজ খুবই স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন ঃ "দেখ বাবা, বহু জন্মের সুকৃতির ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরপূজার অধিকার পেয়েছিস। প্রাণমন দিয়ে ঠাকুরের সেবা করবি। তাতেই চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে; ঠাকুরপূজা শ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্বক্ষণ অন্তরে তাঁর ধ্যানচিন্তা করবি, বাজে চিন্তা মনে আসতে দিবিনি। মঠে ঠাকুর জীবন্ত রয়েছেন, এই মন্দিরেই তিনি বাস করেন—এইটা জেনে সেভাবে তাঁর সেবা-পূজা করবি।"

মহারাজ মঠে এলেই অনেক ভক্তও তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করবার জন্য মঠে সমবেত হতেন। তিনি তাঁদের নানা উপদেশ দিতেন—সাধন-ভজন করিয়ে তাঁদের ধর্মজীবন গঠন করতেন। অধিকারী বুঝে জপ, পুরশ্চরণাদিতে তাঁদের নিয়োজিত করতেন। এভাবে তাঁকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকজন ভক্ত মঠে কিছুদিন বাস করে মহারাজের নির্দেশমতো সাধন-ভজন করতেন।

১৯২০ সালের ঘটনা। বারুইপুরের উকিল কেদারবাবু মাঝে মাঝে মঠবাস করে মহারাজের নির্দেশমতো সাধন-ভজন করতেন। সারাদিন জপ করে সন্ধ্যার একটু আগে তিনি মহারাজের কাছে এসেছেন। মহারাজ ওপরে তাঁর ঘরের পাশে ছাদে আরামকেদারায় ঠাকুরঘরের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। আরও কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত। কেদারবাবু বিনীতভাবে প্রণাম করে বসতেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এই যে কেদারবাবু, কেমন আছেন? কিছু দর্শন-টর্শন হলো?"

কেদারবাবু—"কই মহারাজ! কিছুই তো হচ্ছে না। আপনি যেমন বলছেন সেভাবে জপ তো করে যাচ্ছি—কিন্তু কোন সাড়া তো পাই না। যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারেই আছি।"

মহারাজ তখন গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "দেখুন, মনের এই অবস্থা তো খুবই ভাল। অশান্তি বাড়া খুবই দরকার। অশান্তি বাড়লে তার ফলে শান্তি আসবে। খুব ডেকে যান, খুব জপ করে যান, দেখবেন শান্তি পাবেন। অন্তত তিন-চার বছর যদি দিনে রাতে পনেরো-ষোল ঘণ্টা করে জপ করতে পারেন তখন বুঝবেন যে, ভগবানের নাম আপনার অন্তরে বাসা বেঁধেছে। তখন জপ করতে ভাল লাগবে এবং জপে আনন্দ পাবেন। জপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হবে না। অনুরাগ চাই। ঐ অতৃপ্তিও চাই। প্রথমটায় একটু খাটতে হয়। দর্শনাদি সকলের একরকম হয় না। কিন্তু আনন্দটা সকলেরই হবে।

"সাধনা দ্বারা মনকে transparent করতে হয়। তা না হলে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। সবচেয়ে সহজ সাধনা হলো প্রেমের সঙ্গে নামজপ। তাঁকে

আপনার বলে জানবেন—বাইরে যেমন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারাদি করেন, খাওয়ান-দাওয়ান তেমনি মনোরাজ্যেও যখন ভগবানের সঙ্গে ঐ ভাবের ব্যবহারাদি করতে পারবেন তখনই শান্তি, তখনই নির্ভয়।

"Struggle করে যান। বুক পেতে বাধাবিঘ্নকে বরণ করে নিন। Struggle না করে কেউ ভগবানকে পেতে পারে না। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

মাতৃকণ্ঠস্বরের মতো তাঁর কথাগুলি শ্রোতাদের মনের মধ্যে মধুর ঝঙ্কার তুলল, আনন্দে মন ভরে গেল।

(উদ্বোধন ঃ ৯৬ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

সে প্রায় ৬৫ বছর আগেকার কথা, যখন আমি বাড়ি ছেড়ে স্থায়িভাবে জয়রামবাটী এবং কোয়ালপাড়া আশ্রমে থাকা আরম্ভ করি। প্রয়োজনমতো উভয় স্থানেই কাজ করতে হতো। সেই সময় থেকে মাঝে মাঝে কাজের প্রয়োজনে কলকাতা এবং বেলুড় মঠে গিয়েছি। ঐসকল স্থানে থাকবার সময় এবং কখনো কখনো জয়রামবাটী থাকাকালীন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা-পার্ষদদের সঙ্গে দেখা করার এবং কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, ঐসব কথাবার্তার কত গুরুত্ব রয়েছে। তাই সেসব কথা কিছু লিখেও রাখিনি। দীর্ঘকাল পরে এই বৃদ্ধ বয়সে তার কত কথা ভুলেও গিয়েছি।

একবার কিছুদিন বিশ্রামের জন্য এবং মহারাজের পূত সঙ্গলাভের আশায় ভুবনেশ্বর মঠে যাই। শ্রীশ্রীমহারাজ সেই সময় ভুবনেশ্বর মঠে ছিলেন। মঠবাড়ির একতলার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে। দোতলায় ঠাকুরঘর ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে। মহারাজের নির্দেশমতো স্বামী শঙ্করানন্দ নির্মাণকার্যের তদারক করেন। মহারাজ সঙ্গীত পছন্দ করতেন। সন্ধ্যার পর বা অবসর সময়ে মঠে গান-বাজনা হতো। তার মাঝে কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। একদিন জয়রামবাটীর জায়গা-জমি নিয়ে গণ্ডগোল প্রসঙ্গে আমাকে বললেন ঃ "একটা কিছু ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে কোন action না নিয়ে তার গতি কোন্ দিকে কি হয়, লক্ষ্য করে কাজ করবে। Wait and see."

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় ওখানে হাট-বাজারের অসুবিধা ছিল। জিনিসপত্রও তেমন পাওয়া যেত না। কলকাতা থেকে একজন ভক্ত (বিপিনবাবু কি বিনোদবাবু—নাম ঠিক মনে নেই) সপ্তাহে দুদিন এক ঝুড়ি ফল এবং এক ঝুড়ি তরকারি পাঠাতেন। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একদিন বলছিলেন ঃ "মঠে

তেমন খিদে হয় না, কিন্তু সেখানে কত খাবার। আর এখানে খুব খিদে হয়, কিন্তু উপযুক্ত খাবার পাওয়া যায় না।" তিনি ওখানে গৌরীকুণ্ডের জল খেতেন। বিকালে অনেক সময় আশ্রমের মধ্যেই বেড়াতেন। মহারাজকে দেখে আমার মনে হতো, তিনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। একটা যেন ভাবে থাকতেন সব সময়।

সেবারে প্রায় এক মাস তাঁর পূত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটানা এতদিন তাঁর সঙ্গে থাকবার সুযোগ আর কখনো আমার হয়নি।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের তিথিপূজার কিছু আগে শ্রীশ্রীমা তিনজনকে গৈরিকবস্ত্র দিয়ে বলেন বেলুড় মঠে মহারাজের কাছে বিরজা হোম করিয়ে সন্ন্যাস নাম নিতে। আমিও তখন তাঁর কাছে গৈরিক-বস্ত্র প্রার্থনা করি। কিন্তু শ্রীশ্রীমা আমাকে তখন তা দেননি। কিছুদিন পর এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে শ্রীশ্রীমা কৃপা করে একদিন আমাকে হঠাৎই গেরুয়াবস্ত্র দিলেন। গেরুয়াবস্ত্র দানের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করলেন। ঐসময় কেন জানি না, একটা ভীষণ ভয় আমার শরীর-মন জুড়ে বসল। মাকে সে কথা বললে তিনি বললেন ঃ "বাবা, কোন ভয় নেই, শ্রীশ্রীঠাকুর রক্ষা করবেন।" তারপর বললেন ঃ "মঠে তাড়াতাড়ি রাখালের নিকট গিয়ে বিরজা হোম করে নাম নেবে।" আমি বললাম ঃ "আপনি কৃপা করে সন্ন্যাস দিয়েছেন—এই-ই যথেষ্ট। বিরজা হোম করে নাম নেওয়ার আর কি দরকার?" শ্রীশ্রীমা উত্তরে বললেন ঃ "না গো, দরকার আছে। তোমাদের অনেক কাজ করতে হবে।"

সন্ন্যাস নেওয়ার কিছুদিন আগে মহারাজ কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রয়োজনে চাঁদা আদায়ের জন্য আমার নামে একখানা letter of authority দিয়েছিলেন। এর মেয়াদ ছিল দু-বছর (১৯১৬-১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ)। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সন্ন্যাস পেয়ে চাঁদা আদায়ের জন্য খড়্গপুর যাই। সেখানে একদিন হঠাৎ একটা ড্রেনে পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পাই। ক্রমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাঁটাচলা করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। তখন চাঁদা আদায়ের কাজ বন্ধ রেখে সেখান থেকে বেলুড় মঠে চলে আসি। সেদিন বিকালবেলা মহারাজ পুরনো মঠবাড়ির পূর্বদিকের মাঠে গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা বেঞ্চির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর মন অন্য কোথাও রয়েছে। কাছে কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) ছিলেন। আমি প্রণাম করতে মহারাজ কুশল প্রশ্নাদি করলেন। একটু পরে সুযোগ বুঝে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশিত বিরজা হোম এবং

সন্ন্যাস-নামের কথা তাঁকে বললাম। শুনেই কৃষ্ণলাল মহারাজ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ "এই তো সেদিন—শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন—একবার সন্ন্যাস হয়ে গেল, এখন আবার এসব ঝঞ্ঝাট তোমার একার জন্য কি করে হবে?" আমি উত্তরে বললাম ঃ "সন্ন্যাস হোক না হোক আমার আপত্তি নেই। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, তাই বলছি।" মহারাজ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ "মায়ের বাড়ি গিয়ে শরৎ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নাও।" আমি বললাম ঃ "শ্রীশ্রীমা আমাকে আপনার নিকট সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলেছেন। আমি শরৎ মহারাজের কাছে কেন সন্ন্যাস নেব?" একটু চুপ করে থেকে মহারাজ বললেন ঃ "সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) বলরামবাবুর বাড়িতে আছে। সেখানে গিয়ে তাকে একটা দিন স্থির করতে বল, আর তাকে ঐদিন মঠে আসতে বলবে। উদ্বোধনে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) রয়েছেন, তাঁকেও একথা জানাও এবং তাঁকেও ঐদিন মঠে আসতে বলবে।" মহারাজের নির্দেশমতো আমি সুধীর মহারাজের কাছে যাই। তিনি দিন স্থির করে দিলেন। পরে উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের কাছে যাই এবং সকল বিষয় বলি। তিনি কোন আপত্তি করলেন না। সন্ন্যাসের ২/৩ দিন আগে আমি শরৎ মহারাজের সঙ্গে মঠে ফিরে আসি।

নির্দিষ্ট দিনে মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখের উপস্থিতিতে পূজা, বিরজা হোম, আহুতি হতে হতে ভোর হয়ে গেল। মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "তুমি এখন স্নান করে জল খাও গিয়ে। পরে আমার কাছে এসো। তোমার নাম দেবার জন্য একটু ভাবতে হবে।" গঙ্গাস্নান করে জল খেয়ে শ্রীশ্রীমহারাজের কাছে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তিনি সহাস্যবদনে বললেন ঃ "তোমার নাম 'পরমেশ্বরানন্দ'। বল, কেমন নাম হয়েছে?" আমি খুশি হয়ে বললাম ঃ "আপনি দিয়েছেন—আর ভাল হবে না? খুব ভাল হয়েছে।" সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই আমতলায় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই তিনি বললেন ঃ "যা ব্যাটা, উদ্ধার হয়ে গেলি।" শ্রীশ্রীমা এই সংবাদ শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। অনেক বছর পরে উৎকলবাসী জনৈক প্রবীণ জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠীবিচার করে বলেছিলেন যে, সন্ন্যাসের সময় আমার মৃত্যুযোগ ছিল। তখন বুঝলাম কেন মা সেদিন হঠাৎ আমাকে গেরুয়াবস্ত্র দিয়ে সন্ন্যাস দান করেছিলেন, কেনই বা তাড়াতাড়ি মহারাজের কাছে বিরজা হোম করিয়ে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস ও যোগপট্ট (সন্ন্যাস-নাম) নিতে আদেশ করেছিলেন।

আপর এক সময় শ্রীশ্রীমহারাজ মঠবাড়ির দোতলার পূর্বদিকের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে আছেন। আমি প্রণাম করে নিচে বসলাম। আরও কয়েকজন সাধু সেখানে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁদের সাথে কথা বলছিলেন। সেই সময় মঠের দু-তিনজন সাধু হৃষীকেশ থেকে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ তাঁদের উদ্দেশে বললেন ঃ "যাঁদের তীব্র বৈরাগ্য এবং সাধন-ভজনের খুব শক্তি নেই, তাঁদের সেখানে না যাওয়াই ভাল। যারা ছত্রের খাবার যোগায়, তারাই অর্ধেক সত্তা টেনে নেয়। শেষটায় সাধকের মনে কেবল আসতে থাকে —কখন ছত্রের ঘণ্টা পড়বে, কবে ভাণ্ডারা হবে, কবে ধুতি-কম্বল বিতরণ হবে। তার চেয়ে মঠে থেকে স্বামীজীর প্রবর্তিত জনকল্যাণমূলক কাজ নিষ্কামভাবে করা অনেক ভাল। যখন জপ-ধ্যান করার খুব ইচ্ছা হবে, সেই সময় যে কদিন পার, সেখানে গিয়ে তপস্যা করবে।"

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একবার আমাকে বলেছিলেন ঃ "কামারপুকুরে আবলুস কাঠের গড়গড়ার নল পাওয়া যায়। আমার জন্য একটা আনতে পারিস?" আমি বলেছিলাম ঃ "কেন পারব না? আবার আসবার সময় নিয়ে আসব।" পরের বার যখন মঠে যাই সঙ্গে দুটি গড়গড়ার নল নিয়ে গিয়েছিলাম। একটি ছবিতে মহারাজের গড়গড়ার নল মুখ-সংলগ্ন দেখা যায়—তা ঐ নলের একটি।

আর একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "যদি জয়রামবাটী যাই মেঠাই, মুড়ি আর কড়ায়ের ডাল খাওয়াবি তো?" আমি বলেছিলাম ঃ "কেন খাওয়াব না, এতো সাধারণ জিনিস।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থূলদেহে থাকতে তাঁর আর জয়রামবাটী আসা হয়নি। প্রতি বছর তাঁর শুভ আবির্ভাব-তিথিতে জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে বিশেষ পূজাদির অনুষ্ঠান হয়। সেই সময় ঐ কটি জিনিস বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত করে ভোগ নিবেদন করা হয়।

(উদ্বোধন ঃ ৯৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা)

কনখলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী নিষ্কলানন্দ

১৯১২ সনের মার্চ মাসের শেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হতে শেষবার কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আসেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ, সুধীর মহারাজ, কেদার বাবা, অমূল্য মহারাজ ও আরও ৩/৪ জন সাধু এসেছিলেন। এই মহাপুরুষদের আগমনে কনখল আশ্রমে এক অপূর্ব আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছিল। তখন কনখল এখনকার মতো আধুনিক ও জনবহুল ছিল না। হরিদ্বারও তখন এখনকার মতো হর্ম্যরাজি সুশোভিত নগরীরূপে গড়ে ওঠে নি। গঙ্গানিষেবিত হিমালয়ের প্রাচীন তপোভূমি হৃষিকেশও তখন নির্জন তপোবনের মতোই ছিল। মহারাজ কনখল-হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। কনখলের সুশীতল জলবায়ু, অদূরস্থিত হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি ও হর হর ধ্বনি নিনাদিত গঙ্গার সুন্দর স্বচ্ছ প্রবাহ তাঁকে এক অপূর্ব ভাবরাজ্যে নিয়ে যেত। তখন সব আশ্রমের মোহন্ত ও সাধুগণ তাঁর নিকট প্রায়ই আসতেন। তাঁরা সকলেই মহারাজের সদানন্দময় মূর্তি দেখে ও তাঁর সঙ্গে আলাপাদি করে বিশেষভাবে তৃপ্ত হতেন। ১৯১২ সনের বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন ৩ জন ব্রহ্মচর্য দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজ, হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সুধীর মহারাজ আচার্য হয়েছিলেন এবং হরি মহারাজ নাম দিয়েছিলেন। এই দিন সাধুদের একটা ভাণ্ডারাও হয়েছিল। তখনকার দিনে ভাণ্ডারাদিতে সম্প্রদায়ভেদ ছিল না। এজন্য সন্ন্যাসী, উদাসী, গরীবদাসী, দাদুপন্থী, কবীরপন্থী প্রমুখ সব সম্প্রদায়ের মোহন্ত ও সাধুগণ ভাণ্ডারাতে খুব আনন্দ করেছিলেন।

কনখলের প্রতি মহারাজের একটা প্রীতির ভাব দেখা যেত। তিনি বলতেন যে, উত্তরাখণ্ডের মধ্যে কনখল ও বৃন্দাবন তাঁর খুব ভাল লেগেছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গরমেও বলতেন, কলকাতার গরমে ঘাম হয়, এখানে ঘাম হয় না;

গরমেও স্থানটি ভাল। জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি মহারাজের সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন ২/৩টার সময় তিনি বারান্দায় বসে আছেন, নিকটস্থ এক আশ্রমের ২ জন সাধু তাঁর নিকট বসেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনের মাথা খারাপ ছিল। তিনি কিছুক্ষণ পর জল চাইলেন। মহারাজ কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল তুলে খেতে বললেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাগলা সাধুটি কুয়োর কাছে গিয়েই ঝাঁপ দিয়ে তার মধ্যে পড়ে গেলেন। আশ্রমে তখন হৈ চৈ পড়ে গেল। সকলেই কুয়োর দিকে ছুটল। মহারাজ কুয়ো থেকে সাধুকে উঠাবার উপায় বলে দিলেন। অনেক কষ্টে তাকে জীবন্ত অবস্থায় উঠান হলো। মহারাজ বললেন—'ঠাকুরের কৃপায় রক্ষা পেল।'

গরমের সময় কোন কোন দিন গভীর রাত্রে মহারাজ বিছানা থেকে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। কোন দিন রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে কোন রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করলে মহারাজ 'আঃ আঃ' বলতেন। সময় সময় সেবক দেখতে পেত যে, মহারাজ যেন রোগীদের যন্ত্রণা অনুভব করছেন। সেবক তখন মনে ভাবত নারায়ণ জ্ঞানে কিভাবে সেবা করতে হয়, তা দেখাবার জন্য মহারাজ দয়া করে এ দৃশ্য দেখালেন। এই সময় একদিন তিনি সেবককে বলেছিলেন—'দেখ বাবা, এসব জীবন-মরণ নিয়ে কাজ। নিজের বুদ্ধির উপর জোর দিয়ে কিছু করো না। ওষুধ দিবার সময় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো—ঠাকুর, যাতে এ রোগী ভাল হয় তেমন ওষুধের কথা মনে করিয়ে দাও। প্রত্যেক বিষয় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে কাজ করলে তোমার উপর আর দায়িত্ব থাকবে না। তুমি তখন মনে করবে, ঠাকুরই সব করাচ্ছেন।'

একদিন মহারাজ বর্ধমান হতে পলাতক ১৬/১৭ বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে বেশ রগড় করেছিলেন। ছেলেটি তার বাবার বাক্স থেকে না বলে কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে বদরীনারায়ণ যাবার জন্য সেবাশ্রমে এসে উঠেছিল। মহারাজ তাকে বদরিকাশ্রমে যেতে বারণ করেছিলেন। সে কিছুদিন কনখল আশ্রমে মহারাজের সেবা করেছিল। একদিন দুপুর বেলায় মহারাজ ও হরি মহারাজ বাইরে বসে আছেন, ছেলেটিও বসে আছে; নানা কথা হচ্ছে, হঠাৎ মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং বাঁ-হাত কোমরে ও ডান হাতের আঙুল কপালে ছুঁয়ে ঠিক নর্তকীর ভাবাবেশে ছেলেটিকে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগলেন—

"যখন ছিল বয়েস বারো
সুতোয় সুতোয় দিতাম গেরো,

সেই অবধি লাগল গেরো
এখন লাজে তুলি না মাথা।”

হরি মহারাজ এ দৃশ্য দেখে খুব হাসছিলেন। ঠাকুরের সন্তানের নৃত্যে সেবক আজ ঠাকুরকেই দেখতে পেল। ঠাকুরও তাঁর ছেলে-ভক্তদের নিয়ে ঠিক এই রকমই করতেন।

জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে ১৭/১৮ বছরের একটি ব্রাহ্মণের ছেলে কনখলে কেশবানন্দের আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। ছেলেটি খুব শ্রদ্ধাসহকারে মহারাজকে দেখতে আসত। সে ফলাহার করত। কিছুদিন পরে তার আমাশয় হয়। সে প্রত্যহ ঘটি হাতে আসত। মহারাজও ছেলেটির প্রতি সদয় ছিলেন। তার শরীর ক্রমশ দুর্বল হতে দেখে মহারাজ তাকে ফলাহার করতে নিষেধ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ছেলেটির একটা রোখ ছিল বলে মহারাজের কথামতো সে চলেনি। মহারাজ তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এমন কি তাকে বলেছিলেন, আমি তোর সব ভার নিচ্ছি। তুই খাওয়া-দাওয়া কর। মহারাজের অভয় বাণী পাওয়া সত্ত্বেও ছেলেটি ফলাহার ত্যাগ করেনি। অনেক সময় অনাহারে থাকত।

সেবার শারদীয়া পূজার পূর্বে মহারাজ বলেছিলেন—‘কনখল মায়ের জন্মভূমি! এখানে তাঁর পূজা করবার ইচ্ছা।’ মহারাজের ইচ্ছায় কলকাতা হতে ভক্তগণ প্রতিমা নিয়ে আসলেন, কনখল সেবাশ্রমে বেশ আড়ম্বরে দেবীপূজা আরম্ভ হলো। মহাষ্টমীর পূজার দিন সেই ছেলেটি প্রাতে এসে মায়ের সামনে এক জায়গায় আসন করে বসল। সেবার সন্ধিপূজা রাত্রে ছিল। দিনের পূজা ও মায়ের ভোগ হলে সাধুদের আহারাদি হয়ে গেল। ছেলেটি তখনও এক আসনে স্থির ভাবে বসে ছিল। মহারাজ বললেন—‘ছেলেটির বোধ হয় মায়ের-সামনে শরীর ত্যাগ করবার ইচ্ছা। তা যদি হয় তা হলে মায়ের পূজার বিশেষ বিঘ্ন ঘটবে। ওকে ওখান থেকে আনা ভাল।’ মহারাজের আদেশ মতো ছেলেটিকে উঠতে বলা হলো। সে কিছুতেই উঠল না। পরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে এনে বিছানায় শোয়ান হলো। কিছুক্ষণ পর ছেলেটির মূর্ছা ভঙ্গ হলে মহারাজ তাকে দুধ খাওয়াতে বললেন। সন্ধ্যার পূর্বে নীলধারার কেশবানন্দের আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পরে সংবাদ এলো—আশ্রমে তার থাকবার গুহায় সে দেহত্যাগ করেছে। এই ছেলেটির সম্বন্ধে মহারাজ বলেছিলেন—‘সে নিজেকে কোন গুরু অপরাধে অপরাধী ভেবে দেহত্যাগের সংকল্প করেছিল।’

কনখলে অবস্থানকালে মহারাজ রামলালদাদাকে চিঠি লিখে দক্ষিণেশ্বর থেকে আনিয়েছিলেন। তিনি দাদাকে নিয়ে অনেক সময় আমোদ করতেন। সে দৃশ্য উপভোগ্য ছিল। এই সময় পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজও মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কনখলে এসেছিলেন। তখন মহাপুরুষদের সম্মিলনে কনখল সেবাশ্রম এক অভিনব আধ্যাত্মিক ভাবে ভরপুর হয়ে ছিল। সে সময়ে যাঁরা এখানে ছিলেন তাঁরা সকলেই এ ভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন।

(উদ্বোধন ঃ ৪৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা)

ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা

স্বামী অনুপমানন্দ

প্রথম দর্শন ঃ ১৯১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে বেলুড় মঠে যাতায়াত করি। তারই কোন সময়ে একদিন বৈকালে মঠে গিয়াছি, সেদিন শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে ছিলেন। মঠবাড়ির সম্মুখের লনে একখানি বেঞ্চিতে মহারাজ একাকী একমনে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে যাইয়া প্রণাম করিয়া সেই সৌম্যমূর্তির দর্শন করিবার এই প্রথম সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিনা আজ আর তার কিছু স্মরণ নাই।

দ্বিতীয় দর্শন ঃ সেদিন মঠে উৎসব ছিল, বোধ হয় স্বামীজীর জন্মোৎসব। উঠানে আন্দুলের কালীকীর্তনের দল কীর্তন করিতেছিল। চারিদিকে ভক্তেরা বসিয়া দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। আমরাও তাহাদেরই মধ্যে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছিলাম। মঠবাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দায় হেলান দেওয়া বেঞ্চিতে বসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ, শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজও বসিয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। কীর্তন খুব জমিয়াছে, বৈকাল হইয়াছে। কীর্তন সমাপ্ত হইবার পূর্বে কীর্তনের দল দাঁড়াইয়া উঠিয়া "আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে" গানটি আরম্ভ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহারাজ বেঞ্চি হইতে উঠিয়া অদ্ভুতভাবে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া দুই হাত তুলিয়া মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমরা আনন্দে ভরপুর হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দিব্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন চলিবার পর সকলেই যে যার আসন গ্রহণ করিলেন। কীর্তন সমাপ্ত হইল। আমরা সেই আনন্দমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কলকাতা ফিরিলাম। অনেক দিনের কথা এখন আর খুঁটিনাটি স্মরণ নাই।

মঠে তৃতীয় দর্শন ঃ একদিন মঠে গিয়াছি। গঙ্গায় হাত-পা ধুইয়া উপরে ঠাকুর প্রণাম করিয়া নিচে আসিয়া শুনিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে আছেন। তাঁহার দর্শন মানসে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, বাঁ দিকে যে ছোট বারান্দা আছে সেইখানে একখানা ইজিচেয়ারে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া

সামনের গড়গড়ার নলটি মুখে ঠেকাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ভাবস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। (এই অবস্থার একটি Photo-ও আছে) মুখে যেন চাপা হাসি। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই আনন্দ-মূর্তি দর্শন করিলাম। নিকটে কেহ ছিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে আমি প্রণাম করিয়া নিচে নামিয়া আসিলাম। তখনও তাঁহার ভাব ভঙ্গ হয় নাই। এরপর আর তাঁহাকে মঠে দর্শন করিয়াছি কিনা স্মরণ নাই।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে আমি যখন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে থাকিতাম, শ্রীশ্রীমহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে থাকিতেন; কয়েক মাস ধরিয়া নিত্যই তাঁহার দর্শনে যাইতাম। সকালে, কখন বা বৈকালে যাইতাম। তখন সকালে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে ভবানী মহারাজ (স্বামী বরদানন্দ) স্তোত্র পাঠ করিতেন। ত্রিপুরাসুন্দরী, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি স্তোত্র পড়া হইত। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার খাটের উপর পূর্বাস্য হইয়া যোগাসনে বসিতেন এবং আমরা মেঝেতে তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিতাম।

ভবানী মহারাজ দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া পাঠ করিতেন। আমাদের মধ্যে কয়েকজন যুবক ও একজন বৃদ্ধ থাকিতেন। স্তোত্র পাঠ শেষ হইলে সমুখের দেওয়ালে লম্বিত শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, হাত জোড় করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। ভাবে বিভোর হওয়াতে তাঁহার হাত দুটি কাঁপিতে থাকিত। পরে কোলের উপর হাত দুটি ন্যস্ত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন। ঐ সময়ে আমরাও ঐখানে বসিয়া ধ্যান করিতাম। অন্যস্থানে যখন ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতাম, তখন ধ্যান হইত না। কিন্তু মহারাজের ঘরে মন একাগ্র হইয়া বেশ ধ্যান জমিয়া যাইত। মহারাজের ধ্যান ভঙ্গ হইলে আমরা পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রণাম করিতে যাইলে মহারাজ কুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতে বলিতেন। পাদস্পর্শ করিতে দিতে চাহিতেন না। কখনও তাঁহার চটি জোড়া আগাইয়া দিলে মহারাজ বিরক্ত হইতেন।

ঐ সময়ে মহারাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার পরিচিত হইয়া স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। তখন বয়স অল্প, মহারাজের নিকট যাইতে আকর্ষণ বোধ করিতাম। তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতে বেশ ভাল লাগিত। তাই নিত্যই তখন তাঁর দর্শনে যাইতাম। তিনি তাতে প্রসন্নই হইতেন বলিয়া মনে হইত। কয়েকদিন দুইবেলা যাওয়াতে একদিন বলিলেন—"তুই যে দুবেলাই আসতে

আরম্ভ করেছিস।” উত্তরে বলিলাম, “আমার ভাল লাগে তাই আসি।” তিনি হাসিতে লাগিলেন। একদিন বৈকালে যাইতেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই বাজার করতে পারিস?” উত্তরে বলিলাম, “পারি।” “তুই শোভাবাজার চিনিস?” “হ্যাঁ” বলাতে বলিলেন, “অমুক জায়গা থেকে এই জিনিসটি কিনে আনতে হবে, পারবি তো?” সানন্দে সম্মতি জানাতেই সূর্য মহারাজের নিকট হইতে পয়সা নিতে বলিলেন। পয়সা লইয়া ঐ জিনিসটি কিনিয়া আনিলাম। মহারাজ দেখিয়া ভারি খুশি। আমিও মহারাজের সামান্য সেবা করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

আমার এক বন্ধুর মহারাজের নিকট দীক্ষা হইয়া গেল। আমারও দীক্ষা লইবার খুব ইচ্ছা। একদিন বৈকালে বলরাম মন্দিরে যাইয়া দেখিলাম মহারাজ ঘরে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মহারাজ ছাদে বেড়াইতেছেন। আমি ছুটিয়া ছাদে গেলাম। দেখিলাম মহারাজ ধীর পদে ভাবস্থ হইয়া পাদচারণ করিতেছেন, কোন দিকে দৃষ্টি নাই। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। পরে আমার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই এখানে কি করে এলি? কি চাস?” আমি প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, “মহারাজ আমাকে কৃপা করিয়া দীক্ষা দিন।” হাসিয়া বলিলেন, “দীক্ষার জন্য অত ব্যস্ত হবি না, সময়ে দীক্ষা হয়ে যাবে।” ঐ সময় আমাকে আরও কিছু বলিলেন। ঐভাবে মহারাজকে আর কখনও দেখি নাই। মহারাজের নিকট হইতে আমার দীক্ষা গ্রহণ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রীশ্রীমহারাজের মাহাত্ম্যের কথা তখন কি আর বুঝি, এখন সেই সব মনে করিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি।

বইয়ে পড়িয়াছিলাম পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপ্রভু দিনের পর দিন মাসের পর মাস জগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা পাথরের উপর পড়িয়া পড়িয়া সেখানে একটি গর্ত হইয়া গিয়াছে। সেই গর্তটি দেখিয়াছি। কারও অশ্রুজল পড়িয়া ঐরূপ গর্ত হইতে পারে তখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু যখন অম্বিকানন্দ স্বামীজীর নিকট শুনিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ এক সময় নর্মদা তীরে ওঙ্কারনাথে তপস্যা করিতেন, তখন তিনি পাহাড়ের উপর পাথরেতে পাখির পায়ের সব দাগ আছে দেখিয়াছিলেন। অম্বিকানন্দজী জিজ্ঞাসা করেন ঐরূপ দাগ হইবার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—ঐ পাহাড়ে কোন মহাপুরুষ তপস্যা করিতেন। সেই সময় ঐ পাহাড় কোমল হইয়া গিয়াছিল

এবং সেখানে পাখি বিচরণ করায় তাহাদের পায়ের দাগ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মহাপুরুষদের তপস্যা-প্রভাবে ঐরূপ হইতে পারে তখন বিশ্বাস হইল।

বশী সেন, বৈজ্ঞানিক ডঃ জগদীশ বসুর সহকারী। বলরাম মন্দিরে মহারাজের কাছে, তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতাম। তিনি মহারাজের দাড়ি কামাইয়া দিতেন। মহারাজের "নাপিত"। তাহার সহিত মহারাজ অনেক ফষ্টি-নষ্টি করিতেন। একদিন বশীবাবু মহারাজের তামাক সাজিয়া দিয়াছেন। গড়গড়ায় দুই-এক টান দিয়াই, মহারাজ বলিলেন, "এইরকম আর এক ছিলিম সেজে দিলেই তোকে সন্ন্যাস দিব।"

যখন মহারাজের ডায়াবেটিস হইয়াছিল, তখন ডাক্তার তাঁহাকে মিষ্টি খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। একজন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার কি আপনাকে মিষ্টি খেতে বারণ করেছে?" "শুধু কি মিষ্টি, মিষ্টি কথা কইতেও বারণ" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহারাজ অত্যন্ত রসিক পুরুষ ছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা বালক-স্বভাব হন। তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত মহারাজের জীবনে দেখা যায়।

কয়েকদিন মহারাজের অসুখ হইয়াছে। সাগু-বার্লি পথ্য। এর মধ্যে একদিন মহারাজের ঘরে মিটসেফে কয়েকটি প্রসাদী সন্দেশ বাবুরাম মহারাজ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। মহারাজ যখন পথ্য পাইবেন তখন তাঁহাকে একটি-দুটি দেওয়া যাইবে মনে করিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ চলিয়া যাইবার পর, মহারাজ তাঁহার বিছানা হইতে উঠিয়া ২/৩ টি সন্দেশ খাইয়া চুপচাপ বিছানায় শুইয়া রহিলেন। পথ্য পাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ মিটসেফ খুলিয়া দেখেন সন্দেশ অন্তর্ধান করিয়াছে। তখন বাবুরাম মহারাজ বলিলেন—"মহারাজ সন্দেশ কোন বিড়ালে খেয়েছে?"

মহারাজের অন্তর্দৃষ্টি ছিল। সকলের ভাব ধরিতে ও বুঝিতে পারিতেন। যে যেমন লোক তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার ও কথাবার্তা বলিতেন। একদিন কয়েকজন লোক আসিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ তাহাদের সহিত নানা বৈষয়িক আলোচনা করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার নানা বিষয়ে পরিপক্ব জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল আপনার সঙ্গে আলোচনায় আমাদের প্রভূত উপকার হইল।

তাঁহার প্রখর দৃষ্টি সকলের প্রতি থাকিত। সকলের চালচলন, ব্যবহারের

দিকে লক্ষ্য রাখিতেন এবং সকলের কথা শুনিতেন, কিন্তু হঠাৎ কোন মত প্রকাশ করিতেন না। যদি কেহ কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধও করিত, (যাহাতে সে শাস্তি পাইবার যোগ্য) অন্য সাধারণ লোকের মতো তিনি তাহাকে তিরস্কার করিতেন না বা শাস্তি দিতেন না। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অপরাধীর মন উচ্চস্তরে তুলিয়া দিতেন এবং তাহার জীবনের উদ্দেশের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তাহাতেই সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইত। যেমন, মহারাজ বলরাম মন্দিরে আছেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও আছেন। একদিন সকালবেলা ব্রঃ ভোঃ আসিয়া মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত সকালে কোথা থেকে এলে?" উত্তরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "গতকাল কলকাতায় আসিয়াছিলাম, রাত্রি হইয়া যাওয়ায় মঠে ফিরিতে পারি নাই। ভূঃ বাবুর বাড়িতে ছিলাম।" মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—"এর মধ্যেই ভক্ত বাড়িতে রাত্রিবাস?" মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"মঠে বেশ ঠাকুরের পূজা করছিল, সে-সব ছেড়ে কলকাতায় এসে রাত্রিবাস।" ব্রহ্মচারীর দিকে মহারাজ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ভোঃ, দুষ্ট হচ্ছিস?" ব্রহ্মচারী মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল অনুতপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ—"যা, আর কখনও ওরূপ করিস নে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন কোন অপরিচিত লোক আসিলে ছেলে মানুষের মতো তাহার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, মহারাজও সেইরূপ হইতেন। একদিন বেলুড় মঠে একজন সাহেব তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে খবর দেওয়া হইল। মহারাজ বলিয়া পাঠাইলেন দেখা হইবে না। তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন না। অগত্যা সাহেব চলিয়া যাইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন মহারাজ মঠের উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। সাহেবের সঙ্গী ভদ্রলোক তাহাকে বলিলেন—"ঐ দেখুন—মহারাজ উপরে বারান্দায় বেড়াইতেছেন।" নৌকা হইতে দর্শন করিয়াই তিনি নৌকার উপর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন আজ জন্ম সার্থক হইল। তিনি মহারাজের মধ্যে যিশুখ্রীস্টের দর্শন পাইয়াছিলেন। পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ও আমার কাছে এলে অজ্ঞান হয়ে যেত।"

(উদ্বোধন ঃ ৮৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী ধর্মানন্দ

শ্রীমহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র। তিনি তাঁর কোলে ও শয্যাদিতে বসতেন। শ্রীমহারাজ ছিলেন আধ্যাত্মিকতার 'রাজা'। তাঁর দর্শন, স্নেহ, কৃপা যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ধন্য!

শ্রীমহারাজের কথা ভাবলে তাঁহার আধ্যাত্মিক গভীরতা, বালকসুলভ সরলতা, আশ্রিতদের প্রতি করুণা, স্নেহ, জীবনগঠনের শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি এবং ধ্যান-জপাদির বিষয় শিক্ষা ও উপদেশ দান—সবকিছু মনে পড়ে। তিনি বিন্দুতে সিন্ধু দেখতেন।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমার আদেশে আমি কোয়ালপাড়া আশ্রমে যাই। এক বৎসর ওখানে থাকার পর শ্রীশ্রীমার আদেশেই ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে আসি। তখন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ মঠের তত্ত্বাবধান করতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। যখন মঠে এলাম তখন মহারাজ মঠে ছিলেন না, বাইরে কোন আশ্রম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে মঠে ফিরে এলেন।

সেইসময় বেলুড়ে ম্যালেরিয়ার খুব প্রকোপ। মহারাজ মঠে আসলেই পাড়ার অনেক লোক তাঁকে প্রণাম করতে আসত। তাদের কুশল সংবাদাদির প্রশ্ন করলে তারা ম্যালেরিয়া জ্বরে অস্থির, এ-কথা বলত। সেই সময় মঠে ২/১টা আলমারিতে কিছু ঔষধ থাকত। কোন্নগরের ডাঃ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী যখন মাঝে মাঝে কয়েকদিন মঠে থাকিতেন, তখন তিনি সাধুদের ঔষধ দিতেন। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন।

মহারাজ যখন শুনলেন, আমার একটু ডাক্তারি জানা আছে তখন পাড়ার লোকদের অসুখ শুনলে আমায় বলতেন ঃ "ওহে একটু কাগজ দাও তো; আর দোয়াত-কলমটা দাও।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশে ঐসব দিলে ডাক্তাররা যেমন প্রেসক্রিপসন লেখেন—ঠিক সেইভাবে লিখে আমাকে ঔষধ দিতে বলতেন। আর বলতেন ঃ "দেখতো, কোন ওভারডোজ হয়েছে কিনা।" আমি বলতাম ঃ "আজ্ঞে না, ঠিকই আছে।" তিনি বলতেন ঃ "তবে ৩/৪ দাগ

মিকশ্চার দাও। আর বাহ্যের পুরিয়াটা যেন ওষুধ খাবার আগে একটু গরম জলের সঙ্গে খায়। তারপর ২ ঘণ্টা অন্তর মিকশ্চারটা খাবে। পথ্য দুধ-সাগু।"

তার পরদিন আবার শিশি নিয়ে এসেছে। মহারাজকে প্রণাম করবার পর সব কুশল সংবাদ জেনে এবং জ্বর ছেড়েছে ও বাহ্যে হয়েছে জেনে আবার আমায় বললেন কাগজ, দোয়াত-কলম দিতে। আমি তৎক্ষণাৎ দিলে কুইনাইন মিকশ্চার ৩/৪ গ্রেন করে তৈরি করে দিতে বললেন। বললেন ঃ "২ ঘণ্টা অন্তর খাবে। আজও পথ্য দুধ-সাগু।" এ রকম করে ঔষধ দিতেন এবং পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করতেন।

পল্লীতে সব জানাজানি হওয়ায় ক্রমশ দৈনিক রোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ এতো মেয়ে-পুরুষদের এভাবে আসতে দেখে বলতেন, মঠের ভিতরে অন্য কোথাও ঔষধ দিতে। সেভাবে ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তাতে ঔষধাদি খারাপ হতে লাগল। এদিকে মহারাজ সব দেখছেন ও বুঝছেন।

এই সময় বলরাম মন্দিরে একজন দাসীর মৃত্যু হয়। তার পাঁচশত টাকা ছিল। মৃত্যুর পূর্বে সে বলে যায়—এই টাকা মঠের কোন সৎ কাজে যেন ব্যয় হয়। তারপর মহারাজ মিশনের মিটিং-এ ঐ পাঁচশত টাকা এবং মিশন থেকে আরও কিছু টাকা পাশ করিয়ে নিয়ে বর্তমান প্রেমানন্দ মেমোরিয়ালের নিচে শঙ্করানন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে একতলায় তিনটি ঘর ডিসপেনসারির জন্য নির্মাণ করালেন। ঐ তিনটি ঘরের উত্তর দিকের ঘরে ডিসপেনসারি, মাঝখানে আমি থাকি, দক্ষিণদিকের ঘরে থাকেন দুজন সাধু। উত্তর দিকের বারান্দায় রোগী দেখা, প্রেসক্রিপশন করা চলতে লাগল।

মহারাজ প্রায়ই সকালের দিকে ডাক্তারখানায় এসে সকলকে উৎসাহিত করতেন। বলতেন ঃ "কেমন ঘরগুলি হয়েছে, ১০ বাই ১২ ফুট।" আমি বলতাম ঃ "আজ্ঞা, বেশ ভাল হয়েছে।" ঐ ডাক্তারখানা উদ্বোধনের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় মহারাজ, তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ), সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজ শুধু যে কাজকর্মেই উৎসাহ দিতেন তা নয়, সাধন-ভজন, ধ্যান-জপ, ভজন, পাঠ—সবদিকে ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

মহারাজ চুপচাপ, ধ্যানস্থ, ভাবস্থ হয়ে বসে থাকতেন। আমরা কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতাম। তারপর আমরাও সেখানে বসে স্মরণ-মনন করবার

চেষ্টা করতাম। ভোর ৪টা নাগাদ সবাই তাঁর ঘরে যেতাম। মহারাজ তার আগেই উঠতেন। ধ্যান, জপ ভজনাদি দ্বারা বেশ কিছু সময় কাটত।

মহারাজ ছিলেন বালকস্বভাব, এক-এক সময় খুব হাস্য-কৌতুক করতেন। আবার এক-এক সময় এতো গম্ভীর হতেন যে ভয় হতো সামনে যেতে। মাঝে মাঝে মহারাজ দক্ষিণেশ্বর যেতেন। তাঁর সঙ্গে কখন-কখন আমরাও যেতাম। বলতেন ঃ "সঙ্গে রামনাম সংকীর্তনের বই নে, গানের বই নে, রামনাম করতে হবে, মায়ের নাম করতে হবে।"

মঠে একটি নাগরি গাই ছিল। মহারাজ তাকে খুব ভালবাসতেন, তার জন্য মোটা দুখানি রুটি তৈরি হতো। মহারাজ যখন মঠে থাকতেন নিজে হাতে করে কখন-কখন তাকে খাওয়াতেন। 'নাগরি' বলে ডাকলে কাছে এসে তাঁর হাত থেকে রুটি খেত।

গঙ্গার ঘাট মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে বলতেন। বলতেন, গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার রাখা পুণ্য কাজ।

তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনেছি—কখন-কখন আপন মনে বলছেন ঃ "শিব গুরু, শিব মঙ্গলম্, শিবম্ অদ্বৈতম্।" গঙ্গায় আম দিয়ে বারুণী-স্নান করতেন। সকলকে বলতেন "স্নান কর।"

বেলুড়ের বাজার পর্যন্ত কখন-কখন বেড়াতে যেতেন। যাবার সময় রাস্তায় যদি একটা ঢেলা পড়ে থাকত—পায়ে করে সরিয়ে দিতেন। কখন-কখন আমাদের বলতেন ঃ "ওটা সরিয়ে দে।"

মহারাজ যে কি বিরাট শক্তিধর পুরুষ ছিলেন তা বোঝা দুঃসাধ্য, বোঝানো তো পরের কথা। আমরা সামান্য, তাঁর মহিমা কতটুকুই বা বুঝি আর কতটুকুই বা ধারণা করবার শক্তি আছে! কত ভাগ্য বলে তাঁর দর্শন লাভ, কৃপালাভাদি আমাদের হয়েছে।

আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও তিনি কত স্নেহ করেছেন। আমাকে আদর করে বলতেন ঃ "আমাদের হাউস ফিজিসিয়ান—সিভিল সার্জন।" তাঁর স্নেহের কথা ভাবলে চোখে জল আসে। প্রাণটা ভরে যায়। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন বা যাঁরা দেখেননি সকলের প্রতি তাঁর কৃপা এখনও রয়েছে। জয় মহারাজ! জয় মহারাজ!

(উদ্বোধন ঃ ৯০ বর্ষ ২ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী ভবানন্দ

মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মানসপুত্র। তাঁকে দর্শন করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেই মনে হইতেছিল। পিতাকে যখন দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, তখন মনে হইত মানসপুত্রকে দর্শন করিতে পারিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনের সমতুল ফল হইবে। এই মানসে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর জন্মোৎসবের সময় মঠে আসি এবং স্বামীজীর উৎসব, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা এবং মহারাজের দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। তদবধি মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিবার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা হইতেছিল। অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহা সফল হয় নাই। পরে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর জন্মোৎসবে আমাদের কয়েকজনের মহারাজের কৃপায় তাঁর নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। তারপর একদিন সকালে মহারাজের ঘরে ধ্যান-জপের পর মহারাজকে প্রণাম করিয়া ভয়ে ভয়ে দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলাম। মহারাজ কৃপা করিয়া বলিলেন ঃ "যা, আজই তোর দীক্ষা হবে। এখন কিছুই খাস না, ঠাকুরঘরে গিয়ে বস।" সেই আদেশ অনুসারে ঠাকুরঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। সকাল আটটা কি নয়টার সময় একজন সেবক ধ্যানঘরে ফুল, চন্দন, কোশা-কুশি প্রভৃতি পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ আসিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকেও বসিতে আদেশ করিলেন। মহারাজ প্রথমে পূজাদি সমাপন করিয়া আমাকে দু-চারটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কতক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া আমাকে যথাবিহিত দীক্ষাদি দান করিলেন। আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় মন আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। সে সময় মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন আমরা খুব ভোরে উঠিয়া মহারাজের ঘরে গিয়া বসিতাম। মহারাজও শেষরাত্রি হইতে উঠিয়া তাঁহার শয়নখাটের নিকটে অন্য একটি ছোট খাটে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। সকাল হইয়া গেলে তিনি সকল সাধু এবং ব্রহ্মচারীদের নিত্য ধ্যান-জপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন, সেসব কথা কেহ কেহ

তখনই নোট করিয়া রাখিতেন। তাহার অনেক কথা বর্তমানে 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তকে বাহির হইয়াছে। মহারাজ বলরাম মন্দিরে থাকিলে সেখানে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। তারপর মহারাজের দর্শন পাই—১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে। সেখানেও আমরা খুব ভোররাত্রে মহারাজের ঘরে যাইয়া বসিতাম এবং ধ্যান-জপ করিয়া খুব আনন্দ পাইতাম। মহারাজ ধ্যান-জপের পর সকল সাধুদের লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, জপ এবং তপস্যাদি করিতে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন এবং বলিতেন ঃ "একনাগাড়ে খুব খেটে অন্তত তিনবছর করে দ্যাখ—নিশ্চয়ই ভগবান লাভ করতে পারবি।" ঐ বছর স্বামীজীর জন্মতিথির দিন আমাদের অনেককেই তিনি কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দিলেন। এ সময় অদ্বৈতাশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন পট পরিবর্তন করিয়া নূতন পট স্থাপন করিবার আয়োজন হইল। মহারাজ ঠাকুরের নূতন পট প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহারাজ অদ্বৈতাশ্রমের হলঘরে ঠাকুরের যথাবিহিত পূজাদির পর নিজ হস্তে নূতন পট লইয়া ঠাকুরঘরে আসনে বসাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপর হলঘরে খুব কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তন খুব জমিয়া গেল। মহারাজ এবং হরি মহারাজ উভয়েই সেই কীর্তনে যোগ দিলেন। মহারাজ কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। হরি মহারাজও তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! আমরাও আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে ও গাহিতে লাগিলাম। সে যে কী এক আনন্দের প্রবাহ বহিয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! কেহ কেহ আনন্দে হাসিতে বা কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিলেন। এই আনন্দের হাট অনেকক্ষণ চলিয়াছিল। একদিন হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন ঃ "মহারাজের একটা বিশেষ শক্তি ছিল যে, একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সকলকে তার ভিতর প্রবেশ করাতে পারতেন। এই বিশেষ শক্তি মহারাজ ঠাকুরের কাছে থেকে লাভ করেছিলেন।" বস্তুত মহারাজ যখন যেখানেই থাকিতেন সেখানেই এই বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের প্রভাব অনেকেই অনুভব করিতেন। একদিন মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী বারাণসী সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমের সাধুরা মহারাজ এবং হরি মহারাজের সঙ্গে সঙ্কটমোচনের মন্দিরে গিয়াছিলেন। আমরাও সকলে সেখানে রাম নাম কীর্তন করিয়াছিলাম। যতক্ষণ রামনাম কীর্তন হইয়াছিল ততক্ষণ মহারাজ এবং হরি মহারাজকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। রামনাম কীর্তন করিয়া আমরাও সেদিন এক অপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। এই পরিমণ্ডলে যাঁহারা সেদিন বসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহারাজের

সঙ্গে কয়েকবার শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিবারও সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন দর্শনাদির পর অন্নপূর্ণার মন্দিরে বসিয়া মহারাজের আদেশমতো সকল সাধুরা মিলিয়া বহুক্ষণ কালীকীর্তন করিয়াছিলাম। মহারাজ সকল সময়েই যেন এক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে ডুবিয়া থাকিতেন, মনে হইত। তাঁহার নিকটে কেবল বসিয়া থাকিতেই ভাল লাগিত। এভাবে মহারাজের সান্নিধ্যে কাশীতে কয়েকমাস কাটাইয়াছিলাম। মহারাজ যেখানেই থাকিতেন সেখানে সকলের ভিতর একটা বিশেষ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। বেলুড় মঠে সন্ধ্যারতির পর নিত্যই ভিজিটরস রুমে সাধুরা কীর্তন করিতেন। মহারাজ মঠে থাকিলে কখন-কখন কীর্তনে আসিয়া বসিতেন। একবার রামলালদাদাকে লইয়া কীর্তন খুব জমিয়াছিল। ঠাকুর যেসব গান যেভাবে গাহিতেন সেই ভাবে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া রামলালদাদা গান গাহিয়াছিলেন। মহারাজ রামলালদাদাকে লইয়া খুব আনন্দ করিতেন।

(উদ্বোধন ঃ ৯৫ বর্ষ ১ সংখ্যা)

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী অজয়ানন্দ

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের কথা। আমি তখন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আই. এ. ক্লাসে পড়ি। ঐ সময় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) ঢাকায় এসে প্রায় আট-নয় দিন ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্র আমি তাঁর প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। প্রতিদিন ফরাসগঞ্জে মোহিনীবাবুর (মোহিনী মোহন দাসের) বাড়িতে তাঁকে দেখতে যেতাম। তাঁর অপূর্ব ঈশ্বরপ্রেম এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যের উদ্দীপনাময়ী বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে আমি সাধু হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গেই বেলুড় মঠে যাব—এই সঙ্কল্প নিয়ে একদিন নিভৃতে তাঁকে বললাম ঃ "মহারাজ, আমাকে দয়া করে আপনার সঙ্গেই বেলুড় মঠে নিয়ে চলুন, আমি সাধু হতে চাই।" উত্তরে তিনি বললেন ঃ "তোর তো আই. এ. পরীক্ষা সামনে। আগে ভাল করে পাশ কর। তারপর দেখা যাবে।" এই কথার দুই-তিন দিন পরেই তিনি বেলুড় মঠে চলে গেলেন। আমি পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করতে লাগলাম। কিন্তু সব সময় বাবুরাম মহারাজের কথা মনে হতো। অবশেষে আই. এ. পরীক্ষায় ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে একটি সাংসারিক কাজ উপলক্ষ করে কলকাতায় গেলাম এবং একদিন বিকালে বেলুড় মঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বাবুরাম মহারাজ আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। বললেন ঃ "কিরে বাঙ্গাল, কি খবর?" আমি উত্তরে বললাম ঃ "মহারাজ, আমি আই. এ. পাশ করেছি। এখন আমায় সাধু করে নিন।" তিনি শুনে বললেন ঃ "সে কিরে! বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি সাধু হতে চলে এলি? এখানে চিঠিপত্র লিখে অনুমতি পেয়ে তবে আসতে হয়।" তাঁর কথায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বোধ হয় তাঁর দয়া হলো। বললেন ঃ "দ্যাখ, আমি মঠের কর্তা নই, কর্তা হচ্ছেন মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। চল আমার সঙ্গে তাঁর কাছে।" পূজনীয় মহারাজ তখন পুরনো মঠ-বাড়ির সিঁড়ির নিচের ঘরে বসেছিলেন। বিকাল ৫ টা হবে। কয়েকজন ভক্তও ছিল সেখানে। বাবুরাম মহারাজ আমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন ঃ "রাজা, এ ছেলেটি ঢাকার। আমি যখন ঢাকায় গিয়েছিলাম তখন একে দেখি। সম্প্রতি আই. এ. পাশ করেছে। এখন মঠে সাধু হতে এসেছে।

ছেলেটি সরল। একে তুমি আশীর্বাদ কর আর মঠে রাখো।" রাজা মহারাজ আমাকে দেখে বাবুরাম মহারাজকে বললেন ঃ "ছেলেটি এখনো ছোট আছে। এখন বাড়ি ফিরে গিয়ে আরও কিছুদিন পড়াশুনা করুক আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুক।" এইসব কথা বলবার সময় মহারাজ আমার দিকে কয়েকবার তাকালেন এবং শেষে বললেন ঃ "দ্যাখো বাবা, সাধু হওয়া এত সহজ কথা নয়। যখন সব সময় সর্বক্ষণ ভগবানের জন্য মনে একটা তীব্র ব্যাকুলতা আসবে এবং সংসার জ্বলন্ত অনল মনে হবে, তখন জানবে সাধু হওয়ার সময় এসেছে। মাঝে মাঝে তুমি একটু ভগবানকে ডাকলে আর তোমার চোখে দুফোঁটা জল এলেই মনে করো না যে তোমার খুব উচ্চ অবস্থা আসছে।" বস্তুত, মহারাজ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে আমার মনের সকল সংস্কার জানতে পেরেছিলেন বলে আমার ধারণা।

এরপর ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে যখন আমি কলকাতায় এম. এ. পড়তে আসি, তখন মাঝে মাঝে মহারাজকে দর্শন করতে যেতাম। প্রায়ই দেখতাম বিকালে বলরাম মন্দিরে বহু ভক্তসহ মহারাজ যেন আসর পেতে বসেছেন। এই ভক্তদের বেশির ভাগই অফিস থেকে ছুটির পর মহারাজের কাছে আসতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেখতাম মহারাজ যেন ঐসব ভক্তদের সঙ্গে নানাপ্রকার লঘু বিষয় নিয়ে আনন্দ করছেন, যেমন অমুক দেশের লোক কি খায়, কি পরে ইত্যাদি। কৌতূহলবশত আমি পরে কয়েকজন পরিচিত ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ "আচ্ছা মহারাজ তো আপনাদের সঙ্গে সাধারণত ঈশ্বরীয় বিষয় নিয়ে বিশেষ কোন কথা বলেন না। অথচ আপনারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহারাজের সঙ্গে কথা বলে কি করে আনন্দ পান?" উত্তরে তাঁরা বলতেন ঃ "দ্যাখো, তুমি এখনো ছোট আছ। কাজেই মহারাজকে বুঝবার মতো সামর্থ্য তোমার নেই। তিনি বাইরে থেকে সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করেন। কিন্তু তারই মাঝে তিনি এমন একটা আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে, আমাদের প্রাণ-মন তাতে শীতল হয়ে যায় এবং সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণাও আমরা ভুলে যাই। তবে মহারাজ সাধারণত অযাচিতভাবে কাউকে উপদেশ দেন না। কেউ যদি কোন আধ্যাত্মিক উপদেশ চায়, তবে তাকে সময়মতো মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে হয়, তখন তিনি উপদেশ দেন।"

মহারাজ বলরাম মন্দিরে ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গেও খুব আনন্দ করতেন। একদিন একটি ভক্তের ছেলে, সাত-আট বছর মাত্র বয়স হবে, মহারাজের

সামনে এসে প্রণাম করে পা ধরে বলল ঃ "মহারাজ আমাকে মন্ত্র দিতে হবে।" মহারাজ বললেন, "আর একটু বড় হলে তখন মন্ত্র নিবি। এখন খেলাধূলা করগে যা।" ছেলেটি কিছুতেই মহারাজকে ছাড়তে চায় না। তখন মহারাজ বললেন ঃ "আমার কাছে তো অনেক মন্ত্র আছে, তুই কি মন্তর নিবি? চীনে মন্তর, জাপানী মন্তর, না বিলেতি মন্তর?" ছেলেটি একটু ভেবে বলল ঃ "আচ্ছা চীনে মন্তর দিন।" শুনে আশেপাশে সকলেই হেসে উঠলেন। ছেলেটিও একটু অপ্রস্তুত হয়ে পালিয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে বলি, আমি দীক্ষার জন্য মহারাজকে বহুবার অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি প্রতিবারই একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতেন। কখনো বলতেন ঃ "আজ শরীর তত ভাল নেই।" কখনো বলতেন ঃ "আচ্ছা একটা শুভদিন দেখা যাক।" কখনো আবার বলতেন ঃ "এই ভুবনেশ্বর থেকে এসে তোমাকে দীক্ষা দেব" ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি সবরকম ভাবে ভক্তকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবে দীক্ষা দিতেন। যাহোক, নানা কারণে মহারাজের কাছে দীক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি।

এরপর মহারাজকে দর্শন করি কুচবিহারের রাজার দেওয়ান শৌর্যেন্দ্র মজুমদারের আলিপুরের বাড়িতে। শৌর্যেন্দ্রবাবু মহারাজের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর বাড়িতে মহারাজ ভক্তসঙ্গে খুব আনন্দ করতেন। ভক্তদের ভজন-গান শুনে তিনি ভাবে আবিষ্ট হয়ে যেতেন। তখন সকলেই একটা আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুভব করতেন। শৌর্যেন্দ্রবাবুর বাড়িতেই একদিন ক্রিসমাস ইভ উপলক্ষে রামলালদাদাকে 'ফাদার' সাজিয়ে মহারাজ খুব আনন্দ করেছিলেন। মহারাজকে তারপর দর্শন করি বেলুড় মঠে।

মহারাজ সাধু-ব্রহ্মচারীদের স্বাস্থ্য ও সাধন ভজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সকলেই ভাল পুষ্টিকর খাদ্য পায় এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, এ বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। একদিন মঠে প্রচুর পরিমাণে মাছ আনা হয়েছে। খাবার সময় মহারাজ নিজে সকলকে বেশি বেশি করে মাছ দিতে বললেন। একজন প্রাচীন সাধু ছিলেন নিরামিষাশী। তিনি চাইতেন সব সাধু-ব্রহ্মচারীরাও নিরামিষ খাবে। যা হোক, খাবার সময় যখন মহারাজ সকলকে বেশি করে মাছ দিতে বললেন, তখন একজন সাধু বলে উঠলেন ঃ "মহারাজ, আপনি যে আমাদের এত মাছ খেতে বলছেন, তারপর 'অমুক' মহারাজ আমাদের আর তাঁর কাছে যেতে দেবেন না; বলবেন, 'তোরা আমার কাছে আসিস না, তোদের গায়ে আঁশটে গন্ধ'।" একথা শুনে মহারাজ

গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাত্রে মহারাজ মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটু পায়চারি করছিলেন। এমন সময় সেই প্রাচীন সাধু পুরনো ঠাকুর ঘর থেকে নেমে মহারাজের সামনে এসে পড়লেন। মহারাজ তখন তাঁকে বললেন ঃ "দ্যাখো, শনি-মঙ্গলবার মঠে একটু মাছ ভোগ হয়, তাতে মঠের ছেলেরা একটু মাছ প্রসাদ পায়। তুমি নাকি ছেলেদের এই মাছ খাওয়া নিয়ে নানা মন্তব্য কর। মনে রেখো এটা স্বামীজীর মঠ, বাবাজীদের আখড়া নয়।" তখন সেই প্রাচীন সন্ন্যাসী একটু অপ্রস্তুত হয়ে সেখান থেকে মাথা নিচু করে চলে গেলেন। ছিপ দিয়ে মাছ ধরা মহারাজের নিজের একটা নেশার মতো ছিল। এজন্য তিনি মঠের একটি পুরনো পুকুরে টোপ দিয়ে প্রায়ই ছিপ ফেলে বসতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেখতাম ছিপ জলে ফেলেছেন ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি ভাবস্থ হয়ে যাচ্ছেন। মাছের দিকে এবং ছিপের দিকে মন নাই। মন যেন অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছে।

মঠে বিদেশী কোন লোক মহারাজের দর্শনের জন্য আসলে মহারাজ কোন কোন সময় যেন নিজেকে একটু লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। একদিন দুজন সাহেব মঠে এসেছেন। আমাকে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "Can we see the President now?"—আমরা কি এখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পারি?" আমি তাঁদের নিচে বেঞ্চে বসতে বলে মহারাজকে আগন্তুকদের কথা বললাম। তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন ঃ "শর্বানন্দকে বলো ওদের সঙ্গে কথা বলতে।" আমি শর্বানন্দজীর কাছে তাঁদের নিয়ে গেলাম। শর্বানন্দজী তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে তাঁদের সঙ্গে করে মহারাজের ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম মহারাজ জানালার ফাঁক দিয়ে ছোট ছেলের মতো ঐ দুই জন বিদেশীর দিকে মিটিমিটি করে তাকাচ্ছেন। যেন খুব ভয় পাচ্ছেন। অবশেষে তাঁরা যখন এসে উপস্থিত হলেন তখন কিন্তু মহারাজ তাঁদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আলাপ করলেন। অথচ কিছুক্ষণ আগে তিনি যেন এই কাজটি বেশ কঠিন ও গুরুতর ব্যাপার মনে করে চঞ্চল হচ্ছিলেন।

দেখতাম শরৎ মহারাজ বিভিন্ন সময়ে মঠের নানাপ্রকার সমস্যা নিয়ে মহারাজের কাছে আসতেন এবং তাঁরা দুজনে পরামর্শ করে সব সমস্যার সমাধান করতেন। তখনকার দিনে মঠের পরিচালক সভার বৈঠক খুব কম হতো, আর বৈঠক হলেও মহারাজকে সেখানে নিয়ে যাওয়া একটু কঠিনই ছিল। মহারাজ ঐসকল বৈঠকে যেতে চাইতেন না। কোন একটা ওজর তুলে না

যাওয়ার চেষ্টাই করতেন। কিন্তু মহারাজ না গেলেও শেষ পর্যন্ত মহারাজ ও শরৎ মহারাজ দুজনে মিলে যা সিদ্ধান্ত করতেন মঠের সকলেই তা শ্রদ্ধা সহকারে মেনে নিতেন। মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার ভজন-সঙ্গীত ও বাদ্যানুষ্ঠানে মহারাজকে নিয়ে যাওয়া হতো। তিনি যখনই যেখানে উপস্থিত হতেন সকলেই তখন একটা অপার্থিব আনন্দ অনুভব করতেন। চারিদিকে একটা আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হতো। সময়ে সময়ে ভজন-কীর্তন শুনে তিনি ভাবস্থ হতেন। মহারাজ তাঁর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অনেক সময় অশরীরী আত্মা ও দেবদেবীদের দেখতে পেতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের যে-ছবিটি আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে তা বর্ণনার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য। কিন্তু তবু যাঁরা তাঁকে দেখেননি, তাঁরা এর মাধ্যমে মহারাজের অপার্থিব সত্তার কিছুটা আভাস পেলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সার্থকতা। আমাদের নিকট তাঁর সান্নিধ্যের স্মৃতি একটি অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। যখনই এসব কথা মনে হয়, তখনই মন যেন একটা অজানালোকে চলে যায়।

(উদ্বোধন ঃ ৯০ বর্ষ ৪ সংখ্যা)

মহারাজের স্মৃতিচয়ন

স্বামী অপর্ণানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রথমবার দর্শন করবার সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেল চারটা নাগাদ আমি বেলুড় মঠে যাই। তাঁকে দর্শন করবার পর থেকেই তাঁকে আবার দেখবার জন্য আকুলতা বোধ করছিলাম।

মঠে পৌঁছেই আমি মন্দিরে যাই। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় বললেন ঃ "তুমি কি মহারাজকে দেখেছ? যাও—তাঁকে দর্শন কর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র এবং তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ। মহারাজের কৃপা ও আশীর্বাদ পেলে জানবে যে, তা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকেই আসছে।" যুক্তকরে নতমস্তকে প্রেমানন্দজী বারবার বলতে লাগলেন ঃ "জয় মহারাজ, জয় মহারাজ!"

প্রেমানন্দজীর অনুমতিক্রমে অন্যান্য ভক্তরা ও আমি মঠের দোতলায় উঠে গেলাম। দেখলাম, মহারাজকে দর্শন করার জন্য আরও অনেকে সেখানে এসেছেন। মহারাজ দোতলায় তাঁর ঘরে বসেছিলেন। জনৈক খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী এবং স্বামীজীর শিষ্য পুলিন মিত্রও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বললেন ঃ "পুলিন, অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। একটু গাও!" পুলিনবাবু গাইলেন—

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥..."

এরপর তিনি গাইলেন—

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্কসুন্দর...।"

তারপর—

"ঐ দেখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব শোভন,
ভবজলধির পারে জ্যোতির্ময়...।"

এই গানগুলি শুনতে শুনতে মহারাজ ভগবৎ চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেলেন।

তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। ক্রমে মহারাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। উপস্থিত সবার মনে মহারাজের ধ্যানমগ্ন অপরূপ রূপটি ও সেই দিব্য পরিবেশের রেশ চির-অম্লান একটি ছাপ রেখে দিল।

* * *

এর পরের বার মঠে এসে ওপরের বারান্দায় দেখতে পেলাম মহারাজ আরামকেদারায় গঙ্গামুখী হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর মন অন্তর্মুখী ছিল, তবুও মাঝে মাঝে তিনি জোর করেই আমাদের সাথে কথা বলছিলেন।

সেদিনের তাঁর কথার কিছু স্মৃতি

মহারাজ ঃ তাঁর করুণা ও আশীর্বাদের অভাব নেই। কিন্তু তাঁর সেই কৃপা-পবনটি পাওয়ার জন্য পাল খাটায় এমন আছে কজন? কজন তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী হয়ে মাথা নত করে? লোকের মন তুচ্ছ বিষয়ে ব্যস্ত থাকে। খাঁটি সম্পদটি কে চায়? এরা বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কিছু পাবার জন্য কোন চেষ্টা করে না। এরা চেষ্টা ছাড়াই সবকিছু পেতে চায়। পার্থিব যাবতীয় কাজ লোকে করে উঠতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের চিন্তা করার বেলায় বলে, এসব করার সময় কোথায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "গুরু হাজারে হাজারে মিলবে, কিন্তু শিষ্য দুর্লভ।" উপদেশ দেবার জন্য বহু লোক রয়েছে, কিন্তু তা শোনে কজন? যদি কারো গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকে এবং তা পালন করে, তার সকল সন্দেহ ও বিপদ দূর হয়ে যায়। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকলে ভগবান তার সব দৈন্য দূর করে দেবেন। তার হাত ধরে তিনি ঠিক পথে চালিত করবেন। তাঁর কৃপাকণা যে পেয়েছে তার কিসের চিন্তা? প্রভুর অসীম জ্ঞানভাণ্ডার থেকে চিরকাল ধরে যোগান আসতে থাকবে। ভগবানের জন্য আকুলতা জেগেছে যার মনে তাকে উঠে দাঁড়াতে দাও, চেষ্টা করতে দাও। শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে তাঁর শ্রীচরণে তাকে সকাতরে প্রার্থনা জানাতে দাও, 'হে প্রভু, আমায় কৃপা কর। তোমার করুণা বুঝবার সামর্থ্য দাও।'

তিনি করুণাস্বরূপ। তাঁর করুণা তিনি প্রকাশ করেন তারই কাছে, যে আন্তরিকভাবে তা খোঁজে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের দেন নির্বাসনা, তাঁর প্রতি ব্যাকুলতা এবং উচিত বুদ্ধি। হাজারে হয়তো একজন বহু ভাগ্যবলে ঈশ্বরকে কামনা করে।

ঠাকুর ধনী-গৃহের দাসীর কথা বলতেন। সে তার প্রভুর গৃহ ও সম্পত্তির কথা এমনভাবে বলত যেন, সেসবই তার এবং প্রভুর ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন সে এমনভাবে করত যেন তারা তার কত আপনার, কিন্তু মনে মনে সে ঠিক জানত যে, এর কিছুই তার নয়। আমাদেরও এই পৃথিবীতে থাকতে হবে ও নিজের কর্তব্যটি করতে হবে; কিন্তু মনে-প্রাণে আমাদের এটি বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে যে এসব কিছুই আমাদের নয়। আমাদের সত্যিকার একমাত্র আশ্রয় হলো প্রভুর পাদপদ্ম এবং সেখানেই আমাদের একমাত্র গতি। সর্বপ্রকার অহমিকা ও আত্মসচেতনতা পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে শরণ নিতে হবে। কিন্তু কজন তাঁর চরণে এবং সত্যে শরণ নিতে চায়? সবাই ভাবে যে, সে সকল ভুলের ঊর্ধ্বে। আত্মদম্ভে প্রতারিত মানুষ নিজেকে খুব দামি বলে মনে করে। এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সে বিশ্বাস করতে চায় না। সে কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখে না, তার বুদ্ধি দ্বারা সে কতটুকু মাত্র বুঝতে পারে। একমাত্র মহামায়াই জানেন যে, তিনি কতভাবে মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছেন।

আমরা শুধুমাত্র এটুকু জানি যে, ভগবানকে কখনো সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর ইচ্ছা ও স্বরূপ-প্রকাশ অসীম। তিনি আমাদের মন ও বুদ্ধির অগম্য। আবার তবুও যদি কেউ আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি সেই নির্মল চিত্তের কাছে সহজলভ্য হন।

তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর শরণ নাও, তিনিই সেই অসীম জ্ঞানরাশির দুয়ার খুলে দেবেন। তাঁর শরণাগত হয়ে পার্থিব সকল কর্তব্য করে যাও।

প্রথমে তাঁকে জান। ঈশ্বরানুভূতির পর পৃথিবীতে থাকলেও তুমি ভুলপথে কখনই যাবে না। পৃথিবীর মায়া তোমাকে বাঁধতে পারবে না। তখন জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—যে-পথেই যাও না কেন তুমি এবং অন্যরাও অশেষ উপকার পাবে এবং তোমার নরজীবন ধন্য হবে।

মহারাজ তারপর আবার অন্তর্মুখ হয়ে গেলেন।

* * *

আরেক দিনের কথা। আমরা বিকালে বেলুড় মঠে গিয়েছি। প্রথমেই আমরা পুরনো মন্দিরে গেলাম। নেমে এসে একটি আমগাছের নিচে প্রেমানন্দজীকে জনকয়েক ভক্তের সঙ্গে আলাপরত দেখতে পেলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ ঃ ঠাকুর বলতেন, "একবার একজন একটি ময়ূরকে আফিমের গুলি খাওয়ায়। তারপর থেকে ময়ূরটি প্রত্যেকদিন আফিমের জন্য ফিরে আসত।" ঠাকুরও সে রকম এসব ছেলেদের (ঈশ্বরপ্রেমের) আফিম খাইয়েছেন। তাই ওরা বাড়িতে থাকতে পারে না। ওরা সুযোগ পেলেই এখানে চলে আসে। যাদের তিনি (তাঁর প্রতি) আকর্ষণ করেছেন তারাই ধন্য। যাকে ঈশ্বর বেছে নেন, সেই তাঁকে পায়। কেবল তাঁরই কৃপাবলে মায়ায় গড়া ভ্রান্তি ও বন্ধন খুলে যায়।

প্রেমানন্দজীকে প্রণাম করে গেলাম মহারাজের দর্শনে। এবারও আমরা মহারাজকে দোতলার বারান্দায় আরামকেদারায় উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। তাঁর সামনে মেঝেয় কয়েকজন ভক্ত বসেছিলেন।

জনৈক ভক্ত ঃ মহারাজ, আমি মন একাগ্র করতে পারি না। অনেক চিত্তচাঞ্চল্যকারী চিন্তার উদয় হয়। আমি কি করব? আমি কি কোনও আধ্যাত্মিক জীবনের কঠোরতার সাধনা করতে পারব? আমি কিভাবে পূজা ও ধ্যান করতে পারি?

মহারাজ ঃ তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যান কর। ক্রমে মনে পূজা ও ধ্যান করবার আগ্রহ জন্মাবে। গোড়ার দিকে মন স্ববশে আসতে চাইবে না, কিন্তু তাকে জোর করে, আকুতি-মিনতি করে ধ্যানমগ্ন কর। বিশ্বাস এবং নিয়মিত সাধনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এদুটি ছাড়া কেউই কোন কাজ করতে সক্ষম হয় না।

আধ্যাত্মিক কঠোরতাদির সাধনা এমনভাবে করা উচিত যে, পরিস্থিতি যে রকমই হোক না কেন তুমি নিয়মিত অভ্যাসটি ঠিকভাবে পালন করে যাবে। ঐশ্বরিক চিন্তায় মধুর সন্ধান একবার যদি মন পায়, তবে আর কোন ভয় নেই। সেই রসের রসিক হবার জন্য সৎসঙ্গ করবে। ঈশ্বরের নামামৃত যে আস্বাদন করেছে, তার পক্ষে সেই নাম-জপ ত্যাগ করা কি সম্ভব? তাঁর নামের এমনি শক্তি যে, আন্তরিকভাবেই হোক অথবা যান্ত্রিকভাবেই হোক জপের প্রভাব অনুভূত হবেই। ঠাকুর বলতেন, "ধর একটি মানুষ গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছে। সে স্বেচ্ছায় নদীতে স্নান করতে পারে অথবা দুর্ঘটনাবশত ওতে পড়ে যেতে পারে, আবার অন্য কেউ তাকে নদীতে ঠেলে দিতেও পারে। তার গঙ্গাস্নান তো হবেই।"

তাঁর নামের মহিমা অপার বইকি! মৃত্যুপথযাত্রী অজামিল তৃষ্ণার্ত হয়ে পুত্র 'নারায়ণ'কে জল এনে দিতে বললেন। এভাবেই তিনি মৃত্যুর মুহূর্তে মোক্ষলাভ

করলেন। (শুধুমাত্র তাঁর নামটুকু অন্তিমে স্মরণ করলেই মুক্তি—হিন্দুদের এই বিশ্বাস।)

মানুষের মন সদাই চঞ্চল। নানা কারণেই তা বিক্ষিপ্ত থাকে। সৎসঙ্গ একে বশে আনে। সজ্জনের সহবাস কর ও তাঁদের কথামতো চল। এটি করতে পারলে বহু দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। যদি তোমার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট না হয়, তোমার পক্ষে নিজেকে বহু জাগতিক প্রলোভন থেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাঁর করুণায় তোমার মন সত্যের প্রতি ধাবিত হোক। তাঁর বলে বলীয়ান না হয়ে নিজেকে মায়াজাল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হও!

জীবন নদীর ন্যায় বহমান। যে-দিন চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। যে সময়কে সার্থকভাবে ব্যয় করে, সে ধন্য। বিগত বহু জন্মের বহু পুণ্যকর্মের দ্বারা তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ। প্রভুর পূজা ও ধ্যানদ্বারা এই নরজীবন সার্থক করে তোল। শঙ্করাচার্যের উক্তি—'মনুষ্যজন্ম, মোক্ষলাভের আকুলতা ও সৎসঙ্গ—কেবলমাত্র ভগবৎকৃপায় আমরা এই তিনটি দুর্লভতম সুযোগলাভ করতে পারি।' ঠাকুরের কৃপায় তোমার এই তিনটিই রয়েছে। তাঁকে পাবার জন্য চেষ্টা কর, মনুষ্যজন্ম ধন্য কর! জীবন অচিরস্থায়ী। এর শেষ কখন তা কেউ জানে না। যা তোমাকে অমরত্ব দান করবে সেই সম্পদ লাভ করতে চেষ্টান্বিত হও। অল্পবয়সে ভগবানকে পাওয়ার জন্য বেশি চেষ্টা করা সম্ভব। তাঁকে পেতে হলে কঠিন সাধনার প্রয়োজন। খুঁটি দৃঢ় করে ধরে রাখলে, তার চারিপাশে বেগে ঘুরলেও পড়ে যাবার কোনই ভয় থাকে না।

ঠাকুর বলতেন, "মন্দিরে যখন দেবদর্শনে যাও, ভিখারিদের ভিক্ষা বিতরণ করতেই যদি সময় ফুরিয়ে যায় তাহলে কখনই তুমি প্রতিমা-দর্শন করতে পারবে না। ভিড় ঠেলে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে, বিগ্রহকে পূজা করে নিয়ে তারপর তুমি যা খুশি করতে পার।"

* * *

এরপর যেদিন মঠে গেলাম, স্বামী প্রেমানন্দ বললেন ঃ "মহারাজ 'বলরাম মন্দিরে' আছেন। যতদিন মঠে ছিলেন মঠ যেন আলো হয়েছিল। এখন তিনি চলে যাওয়ায় মঠ অন্ধকার বোধ হচ্ছে। বলরাম মন্দিরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করবে। মহারাজ বৃন্দাবনের রাখালবালক, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ। ঠাকুরের দিব্যলীলায় তাঁর ভূমিকাটিতে অভিনয় করতে পৃথিবীতে এসেছেন। বহু জীবনের

অশেষ সুকৃতিবলেই মহারাজের মতো একজন মহাত্মার কৃপালাভ সম্ভব। তোমরা ধন্য!"

কদিন পর মহারাজের দর্শনার্থী হয়ে বলরাম মন্দিরে গেলাম। পরম স্নেহভরে তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন ঃ "আমি যে এখানে রয়েছি কি করে জানলে?"

আমি উত্তর দিলাম ঃ "আমরা মঠে গিয়ে আপনাকে দেখতে পেলাম না। প্রেমানন্দজী বললেন যে, আপনি বলরাম মন্দিরে রয়েছেন এবং এখানে এসে আপনাকে দর্শন করতে বললেন।"

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন ঃ "বুঝেছি, বাবুরামদা তোমাদের ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।"

কিছু পরেই ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা এলেন। বোঝা গেল যে, 'দাদা' আসাতে মহারাজ খুব খুশি হয়েছেন। তিনি তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন, বসতে আসন দিলেন এবং নিজে তাঁর পাশে বসলেন। ক্রমে ভক্তরা এসে জড়ো হলেন। এসেই সবাই রামলালদাদা ও মহারাজকে প্রণাম করছেন। যদি কেউ কখনো মহারাজকে প্রথমে প্রণাম করছেন তখনই মহারাজ বারণ করছেন ঃ "না না, প্রথমে দাদাকে প্রণাম কর। ইনি আমাদের গুরুবংশের এবং গুরু ও ঈশ্বর অভিন্ন। আমাদের ঠাকুরের বংশের রক্তধারা দাদার ধমনীতে প্রবাহিত।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারের সবার প্রতি ভক্তদের গভীরতর বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই এই কথা কয়টি বলেছিলেন। (রামলালদাদা মহারাজকে কয়েকবার দেখতে যাবার সময় আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, মহারাজ যুক্তকরে দাঁড়িয়ে প্রথমে তাঁকে বসতে দিয়ে তবে নিজে বসতেন।) এই দিনটিতে মহারাজকে যেন বিশেষরূপে ভাবরাজ্যে আরূঢ় মনে হলো। কারণ, রামলালদাদার উপস্থিতি তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

মহারাজ ঃ দাদা, ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।

রামলালদাদা ঃ তা ভাই, সে সময় অন্তত আমি তো তাঁর বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি ভাবতাম তিনি আমাদের খুড়ো। তিনি জগন্মাতার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত; তাই অত লোক তাঁর কাছে আসে।

সত্যি ভাই, তোমরাই তো সেই মহাপুরুষকে যথার্থ চিনলে। তাঁর ত্যাগের

আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি পত্নী, পরিবার সর্বস্ব ত্যাগ করলে। সেজন্যই তো তাঁর করুণায় সেই স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে তুমি অমৃতের অধিকারী হয়েছ এবং এখন সবাইকে দুহাতে অমরত্বের আশীর্বাদ বিলোচ্ছ। আমরা, জাগতিক অর্থে যারা তাঁর আত্মীয়, তিনি যে কে তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু তাঁর কৃপায় আমার এটুকু বিশ্বাস হয়েছে যে, আমরা যারা তাঁর পরিবারে জন্মেছি—তাঁর পাদপদ্মে অবশ্যই আশ্রয়লাভ করেছি। তাঁর মুখে আমি শুনেছি যে, যখন কেউ সত্যলাভ করেন তাঁর পূর্বের এবং পরের সাত পুরুষ মুক্ত হয়ে যায়। আর ভগবান স্বয়ং আমাদের বংশে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন! তাঁর কৃপাবলে ও পূতসঙ্গলাভে আমাদেরও বহু দর্শনাদি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল। এভাবেই তিনি তাঁর প্রতি আমাদের মনে বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মালেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীর সেই দিনটিতে (১ জানুয়ারি, ১৮৮৬) তিনি অন্যান্যদের মতো আমাকেও স্পর্শ করেছিলেন। তাঁর স্পর্শজনিত অপূর্ব অনুভূতি স্মরণ করলেই আমি রোমাঞ্চিত হই। (এই ঘটনাটি সম্পর্কে রামলালদাদা পরে বলেছিলেন, "সেদিন তাঁর স্পর্শদ্বারা তিনি আমাকে সুস্পষ্টরূপে আমার ইষ্টরূপের দর্শন করিয়েছিলেন।") এছাড়া তাঁর সঙ্গে কীর্তন গাইবার সময় তিনি আমাকে যে তন্ময়তা দিতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে জানে, সেই জানে।

তিনি ছিলেন অসাধারণ। সবাইকে সম্মান করা—এই গুণটি তিনি নিজে আচরণ করে দেখিয়ে গিয়েছেন। আমাদের তুচ্ছতম কাজটুকুও করতে বলার সময় এই বিবেচনাবোধের দরুন তিনি অত্যন্ত দ্বিধান্বিত হতেন।

মহারাজ ঃ তা দাদা, গোড়ার দিকে ঠাকুরকে আমরাও বুঝতে পারিনি। বহুবার আমরা তাঁর যথাযথ সম্মান করিনি। কিন্তু তিনি অহেতুক করুণাসাগর। তিনি আমাদের বহু ত্রুটি ক্ষমা করেছেন এবং তাঁর স্নেহ-ভালবাসা দিয়েই আমাদের আপনার করে নিয়েছেন।

সে সময় আমি অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলাম এবং তুচ্ছ বিষয়ে ধৈর্য হারাতাম। ঠাকুর আমায় বললেন, "ক্রোধ হলো আসুরিক। দম্ভ ও ক্রোধ আধ্যাত্মিকতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। তুমি এখানে পবিত্র জীবনযাপন করতে এসেছ। ক্রোধ ও ঈর্ষা ত্যাগ কর।"

একা তাঁর মধ্যেই আমরা আমাদের মা, বাবা, ভাই, বন্ধু—সবকিছু পেয়েছি। কথাগুলি বলে মহারাজ যুক্তকরে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥

মহারাজ চোখ বন্ধ করলেন। কিছু পরে তিনি বললেন ঃ "এমন আকুল করুণাপাথার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ কখনো আসেনি। যারা এই সত্য বুঝেছে ও যাদের তিনি কৃপা করে বুঝিয়েছেন, কেবলমাত্র তারাই তাঁকে জানতে ও বুঝতে পারে। তারা ধন্য!" এই কথা বলে মহারাজ হনুমানের সেই উক্তির উদ্ধৃতি করলেন ঃ "ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, / ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?"

মহারাজ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি আসক্ত। তাঁর কৃপা-পবন বইছে। একটু কষ্ট করে তোমাদের পালটি তুলে দাও। তারপর সেই করুণা-বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে তোমাদের জীবনতরী তাঁর পায়ে গিয়ে কূল পাবে।

ঠাকুর প্রায়ই আত্মপ্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কথা বলতেন। আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহ এবং আত্মোদ্যম ছাড়া কিছুই করা যায় না। তিনি বলতেন, "আমি ভাত রান্না করে তোদের সামনে রেখে দিয়েছি। এখন তোরা এই বাড়া ভাতে বসে যা। নিজের হাতে মুখে পুরে দে।" এটুকু উদ্যমের প্রয়োজন।

তাঁর কাছে সমস্ত মন দিয়ে প্রার্থনা কর। একমাত্র তবেই তোমরা তাঁর জন্য আকুল হবে। ক্ষুধা থাকলে আহার্য উপভোগ করা যায়। ক্ষুধার অভাবে স্বাদু ভোজ্যদ্রব্যেরও আমরা সম্মান রাখি না। এজন্যই লোকে তাঁর নামামৃত আস্বাদন করে না।

এখন যদি ভাব তোমাদের মন ভগবানের দিকে একটু যাচ্ছে, তবে তাঁর প্রতি তোমাদের চিত্ত নিবিষ্ট কর ও সাধন কর। সাধনা করতে থাকলে সাহায্য পাবে। ঠাকুর বলতেন, "মা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রসদ জোগান।" যদি তুমি আগুনের উত্তাপ অনুভব করতে চাও, অনেক দূরে সরে থাকলে চলবে না। উত্তাপ বোধ করতে হলে আগুনের কাছে আসতে হবে।

পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ করবে। এমন কারো কাছে যাও যিনি রাস্তা চেনেন। তাঁর কাছে পথের সন্ধান নাও এবং সেই পথে চল। কেবলমাত্র তবেই তুমি তোমার গন্তব্যে কোনদিন পৌঁছাবে। একমাত্র তাহলেই ভক্তি ও বিশ্বাস জাগবে।

রামলালদাদা বিদায় নিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন। আমরা তাঁকে ও মহারাজকে প্রণাম করলাম। তাঁদের কথা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপার কথা ভাবতে-ভাবতে সেদিনের মতো বলরাম মন্দির ত্যাগ করলাম।

* * *

আবার মহারাজকে দর্শন করতে বলরাম মন্দিরে গিয়েছি। কথোপকথনকালে আমাদের 'মিশনের' কাজের কথা উঠল। মহারাজ বললেনঃ কেউ যদি কর্মফলের প্রত্যাশা না করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তাহলে কর্মে আসক্ত হয় না। স্বামীজী বলতেন, "কাজই পূজা।" সবার পক্ষে কি সবসময় ধ্যান বা ঈশ্বরচিন্তা করা সম্ভব? সেজন্যই ঈশ্বরের সাথে একত্ববোধে পৌঁছানো সহজ করার জন্য স্বামীজী নিঃস্বার্থ সেবার শিক্ষা দিলেন। জানবে যে, সকল কর্মই প্রভুর কর্ম। কাজ করবার সময় নিজেকে ভুলতে শেখ। সকল আধ্যাত্মিক সাধনারই লক্ষ্য হচ্ছে অহংবোধটি বিনষ্ট করা। ঠাকুর বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যতক্ষণ আমরা অহংভাবাপন্ন থাকি, তিনিও দূরে সরে থাকেন। ঠাকুর এই উদাহরণটি দিতেন—"ভাঁড়ারে যতক্ষণ সরকারমশাই রয়েছেন, গৃহকর্তা সেখানে যান না। এমনকি যদি কেউ তাঁর কাছে কিছু চায়, তিনি তাকে সরকারমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন।"

কর্ম, ভক্তি ও বিচারবুদ্ধি—প্রত্যেকটি ঈশ্বরলাভের এক-একটি পথ। সম্পূর্ণ হৃদয়ভরা যে-ভক্তি দিয়ে ভক্ত মন্দিরে তাঁর পূজা করে, সেই আন্তরিক ভক্তি-ভালবাসার সাথে তাকে হীন, দরিদ্র ও আর্তের মাঝে নারায়ণের সেবা করতে হবে। তুমি অপরকে সাহায্য করার কে? কেবলমাত্র যখন প্রভু তোমায় শক্তি দেন তখনই তুমি বাস্তবিক সেবা করতে পার।

তিনি সকল জীবের মধ্যে আছেন—একথা সত্য, তবে নরদেহে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। সেজন্যই স্বামীজী আমাদের মনুষ্যজাতির সেবায় অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই একই ব্রহ্ম নর-নারী ও সব প্রাণীর মাঝে রয়েছেন—এই বিশ্বাস মনে রাখতে হবে এবং সেই বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে জীবরূপী শিবের সেবা করতে শিখতে হবে। এই সাধনা করতে করতে অকস্মাৎ একদিন অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হবে এবং তুমি দেখবে যে, তিনিই মানুষ ও ব্রহ্মাণ্ড এই সবকিছু হয়েছেন। তিনিই এই বিশ্বে এত বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত ও পরিব্যাপ্ত। তুমিও সেই সর্বময় শিব এবং এভাবে জীবের মাঝে শিবের সেবা করতে পার।

একবার ঠাকুর মণি মল্লিকের মেয়েকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কাকে তুমি সবচাইতে বেশি ভালবাস?" সে উত্তর দিল, "আমার একটি ভাইপো আছে। আমি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।" ঠাকুর তাকে বললেন, "খুব ভাল! তোমার ভাইপোকেই গোপাল জ্ঞানে সেবা কর, স্নান করাও, আহার করাও।" সে ঠাকুরের আদেশ পালন করেছিল এবং কালে সেই ভাইপোর মধ্যেই তার গোপাল-দর্শন হয়েছিল। বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে যে কোন আধ্যাত্মিক সাধনা কর; শেষে তা তোমাকে সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

* * *

সপ্তাহখানেক পরে আমি উদ্বোধনে গিয়ে স্বামী সারদানন্দকে প্রণাম করলাম। জনৈক যুবা সন্ন্যাসী কোন কাজের বিষয়ে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করছিলেন। স্বামী সারদানন্দ নিজের মতামত দিয়ে বললেন ঃ "বলরাম মন্দিরে গিয়ে মহারাজকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। মহারাজের কথা ঠাকুরের কথা। মহারাজ আমাদের যা কিছু বলেন তা আমরা ঠাকুরের নিজের নির্দেশ বলেই মনে করি। ঠাকুর ও তাঁর মানসপুত্র এক এবং অভিন্ন।"

আমরা বলরাম মন্দিরে গেলাম। মহারাজ তাঁর ঘরে বসে। ভক্তরাও বসে আছেন। তাঁর চক্ষু অর্ধমুদ্রিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন ঃ

আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য কী? তাঁকেই জানা, তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়া। তাঁর কৃপায় অজ্ঞান-রূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলে যায়, সব সংশয় দূর হয়, যত কর্মফল সব নষ্ট হয়ে যায় যখন তাঁকে, যিনি সাকার আবার নিরাকার, জানা যায়। তাঁর শরণাগত হও ও আন্তরিকভাবে তাঁর কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা কর। তোমরা বাড়িঘর, আরাম—এসব ছেড়ে কেন এখানে এসেছ? আহারে, শয়নে, দাঁড়িয়ে, বসে (সব সময়ই) তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও—"প্রভু, তোমার করুণা অনুভব করার ও বোঝার শক্তি আমায় দাও!"

আমরা এই পৃথিবীতে সবাই পথিক। আমাদের চিরধাম প্রভুপাদপদ্মে। গীতায় (৯/১৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

ভাগ্যহীন সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার পরিবর্তে ভবজালে জড়িয়ে পড়ে। প্রভুর শ্রীচরণেই আমাদের নিত্যধাম। যে করেই হোক না কেন

সেখানে আমাদের পৌঁছতে হবেই। তিনিই একমাত্র সত্য। সেই সত্য লাভ করতেই হবে। তোমার জীবন যেন হেলায় না কেটে যায়। প্রায় সকলেই ভাবে যে, সে নিজে যা সত্য বলে বোঝে সেটিই সবার পক্ষে অনুকরণীয় পন্থা। কখনও বা মানুষ এত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং নিজেকে এত বিশিষ্ট বলে ভাবে যে, সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই 'অহং'-এর ভাবই মানুষকে মায়ার বাঁধনে জড়ায়। এর থেকে মুক্তি নেই, যতক্ষণ না সে অনুভব করছে—'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।'

স্বামীজী এই গানটি গাইতেন ঃ

প্রভু ম্যাঁয় গুলাম, ম্যাঁয় গুলাম, ম্যাঁয় গুলাম তেরা।
প্রভু তু দীওয়ান, তু দীওয়ান, তু দীওয়ান মেরা॥

তিনি আরও গাইতেন, "যো কুছ হ্যায় সো তু হী হ্যায়।" যার ওপর তাঁর কৃপা বর্ষিত হয় সে-ই ভগবানকে জানে। তোমার আদর্শ যে ঈশ্বর-লাভ এ কখনও ভুলো না। তাঁকে জান, তাহলেই অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যাবে। তখনই অনুভব করবে, "ঈশ্বর আমার, আমি তাঁর।"

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—এই তাঁর আশার বাণী।

ঠাকুর বারবার প্রার্থনা করতেন, " হে প্রভু, আমার আশ্রয়! আমি কোনরূপ শারীরিক বা পার্থিব সুখ চাই না। আমাকে বিশ্বাস দাও ও তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আমার অহং নষ্ট করে দিয়ে আমাকে তোমার করে নাও।"

এই যুগে তাঁর চরণে শরণ ভিন্ন অন্য গতি নেই। এই কলিযুগে মানুষের জীবনের সীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আবার এই সংক্ষিপ্ত জীবনেই তাঁকে লাভ করতে হবে। প্রাচীন কালের ন্যায় কঠোর সাধনার সময় এখন নেই। মন দুর্বল এই কারণে মানুষ জাগতিক সুখের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট।

সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও ঈশ্বরলাভের সহজতম পন্থা হলো তাঁর শরণাগত হওয়া। এর অর্থ কি? আমরা কি কিছু করব না? আমরা কি চুপ করে বসে থাকব? না। আমরা প্রার্থনা জানাব; ভগবানের কাছে কেঁদে বলব যে, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে তাঁর জন্য আকুলতা জাগিয়ে তোলেন এবং সুখভোগের

সকল স্পৃহা যেন আমাদের হৃদয় থেকে দূর করেন। প্রার্থনা কর—“হে বিশ্বপিতা, তোমার করুণা আমার সম্মুখে প্রকাশ কর। আমি অসহায়। তোমায় ছাড়া আমার অন্য শরণ নেই। তুমি দুর্বলের একমাত্র শরণ। তোমাকে সর্বদা স্মরণ করার শক্তি আমায় দাও।” যদি কেউ বাস্তবিক তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে তবে সবকিছুই সহজ হয়ে যায়; কিন্তু এটি করাই খুব কঠিন। তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁর চরণে শরণাগতি হওয়া অসম্ভব এবং এই কৃপাকণা অনুভব করতে হলে পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ করতে হবে, শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও আন্তরিক প্রার্থনা করতে হবে।

মন আমাদের বহুভাবে বিপথগামী (পথভ্রষ্ট) করে। আমাদের মনকে সংযত করতে হবে এবং তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। তপস্যার অর্থ কি? তপস্যা হলো দিব্যানন্দ অনুভব করবার জন্য মনকে ঈশ্বরের প্রতি চালিত করা। এযুগে শারীরিক কঠোরতা অভ্যাস করবার প্রয়োজন নেই, যেমন কিনা হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বমুখ হয়ে থাকা। এই যুগের পন্থা হলো—প্রভুর নামোচ্চারণ করবার আকুলতা, সর্বজীবে করুণা ও মমত্ববোধ এবং সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা। নারদমুনি পুণ্যাত্মাদের সেবার দ্বারা ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেবার মাধ্যমে অহংবোধ বিনষ্ট হয়।

এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হলো কাম ও কাঞ্চন ত্যাগ। যারা সাধু হবার জন্য এই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে, কাম ও কাঞ্চন ত্যাগই তাদের ভূষণ এবং এটিই ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়। আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার কালে চিত্ত বহুবিধ প্রলোভনের সম্মুখীন হয়। কাম ও কাঞ্চন, নাম ও যশ চিত্তে বার বার উদিত হয় এবং মানুষকে ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যায়। কামনারূপী এই চোরের সম্পর্কে সাবধান না হলে সে তোমার সকল শুভ বুদ্ধি চুরি করে নিয়ে যাবে এবং তুমি সাংসারিকতার অতল সাগরে তলিয়ে যাবে। কিন্তু অন্যদিকে ঐশী কৃপার সাগর রয়েছে—তাঁকে একবার মাত্র আন্তরিকভাবে ডাকার অপেক্ষা। ঠাকুর বলতেন, “যদি তুমি তাঁর দিকে এক পা এগোও, তিনি তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেন।”

ভগবান কল্পতরু। তিনি তাঁর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আন্তরিক হও, মন ও মুখ এক কর। ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে কোন অবিচার নেই। ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, “আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর ।” কী কঠোর সাধনাই না তিনি করেছেন, যাতে আমাদের পথ সহজ হয়! তাঁর চরণে আশ্রয়

নাও। এই জীবনেই অমৃতানন্দের অধিকারী হও। তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক করো।

* * *

আরেক দিনের কথা। মহারাজ সেবক বরদানন্দকে কয়েকটি গান গাইতে বললেন। গান শেষ হলে মহারাজ বললেন ঃ

ঈশ্বরের নামোচ্চারণ ও মহিমাকীর্তন করতে করতে যার চিত্তে আনন্দধারা অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়, সে-ই ধন্য। তাঁকে সর্বদা স্মরণ কর এবং তোমাদের জীবন সার্থক কর; নয়তো এই মানব-জন্ম বৃথা। ঠাকুর বলতেন, " হে প্রভু, তোমার মায়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তোমার সন্তানেরা মৃতপ্রায়—এদের তোমার সঞ্জীবনী শক্তি দাও, দাও তোমার অমৃতত্ব।" সাধুদের বলি, তোমরা গৃহ ও গৃহের সকল স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ ত্যাগ করেছ। এখন সকল শারীরিক আরাম ভুলে প্রার্থনা জানাও, "প্রভু তুমিই আমার সব, আমার ভরসা ও আমার একমাত্র সম্পদ।" ভক্তদের বলি, তোমাদের ভয় নেই। তোমরা সংসারে থাক কিন্তু জেনো, তিনিই একমাত্র তোমাদের আপনার ধন। তাঁর স্মরণ-মনন কর। তাঁর শরণাগত হও।

(উদ্বোধন ঃ ৯৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সান্নিধ্যে

স্বামী সম্ভবানন্দ

[ইংরেজী থেকে অনূদিত]

দৈবানুকম্পায় আমি রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) চরণপ্রান্তে আশ্রয়লাভ করি। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ খুবই স্বল্পকালব্যাপী। কিন্তু দীর্ঘকাল পূর্বের এই ঘটনাটির প্রভাব আজও আমার জীবনে অম্লান এবং ক্রমবর্ধমান। বাস্তবিকই আমি এটি অনুভব না করে পারি না যে, এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁর আশীর্বাদলাভে আমার জীবন এক অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়েছে—আমি ধন্য হয়েছি।

ইংরেজী ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ মাদ্রাজে (চেন্নাই) আগমন করেন এবং সেখানকার মায়লাপুরস্থ নবনির্মিত ছাত্রভবন ও মন্দিরটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। সে সময় স্বামী নির্মলানন্দজী ছিলেন ব্যাঙ্গালোর মঠের অধ্যক্ষ। তিনি মাদ্রাজ থেকে প্রায় দু-শো মাইল দূরে অবস্থিত ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে এসে কিছু কাল থাকবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধে মহারাজ ব্যাঙ্গালোরে এসে—যতদূর মনে পড়ে, সেবার জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর—এই তিনটি মাস বাস করেন।

ইংরেজী ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আমি ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করি। সুতরাং মহারাজের আগমনকালে আমি শিক্ষানবীশরূপে আশ্রমে উপস্থিত ছিলাম। সেই তিনটি মাস আমার জীবনের পরম মুহূর্ত, কারণ মহারাজের সঙ্গে আমার সেই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১০ এপ্রিল কলকাতায় মহারাজ মহাসমাধিতে লীন হন।

মহারাজের সঙ্গে সহযাত্রীদের একটি বেশ বড় দল থাকত। সেবার ব্যাঙ্গালোরে আসবার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন—স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী বরদানন্দ ও স্বামী অনন্তানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ (সুয্যি মহারাজ), একজন ব্রহ্মচারী এবং আরও দু-চারজন।

মহারাজের ব্যাঙ্গালোরে আসবার প্রস্তুতির অধিকাংশ দায়িত্বই আমাকে এবং প্রায় ছয় বৎসরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অপর একটি ব্রহ্মচারীর উপর দেওয়া হয়েছিল। অতিথিরা যে ঘরগুলিতে থাকবেন সেগুলি পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ করতে আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম এবং কতকটা মানসিক উদ্বেগও বোধ করছিলাম।

আমি মহারাজের আগমন ও তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা কখনই ভুলব না। রেলস্টেশন থেকে যে যানটিতে তাঁকে আনা হয়েছিল সেটি থেকে অবতরণকালে আমার এ-কথাই মনে হয়েছিল যে, আমাদের আঙিনায় আজ একজন রাজপুত্র এসেছেন। স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ আমার পরিচয় দিলেন, "এ একটি নবাগত শিক্ষার্থী।" মহারাজের তখনকার সেই দৃষ্টিপাতেই আমি তাঁর সর্বব্যাপী করুণা অনুভব করতে পেরেছিলাম।

এর পরের সপ্তাহগুলিতে সেই স্নেহধারা আমি আকণ্ঠ পান করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। রোজ সকালে মহারাজকে প্রণাম করবার জন্য তাঁর ঘরে গিয়ে আমি এমন ভালবাসা পেয়েছি, যা ইতঃপূর্বে কেবলমাত্র আমার মায়ের কাছেই পেতাম। প্রায়ই তিনি আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন যেন আমি তাঁর আপন সন্তান। কখনও বা তিনি আমাকে তাঁর সামান্য কিছু কাজ করতে দিতেন; বিনম্র ভঙ্গিতে তিনি হয়তো বললেন ঃ "এই জানালাটা একটু বন্ধ করে দেবে কি?" আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতাম। এমন একজন মহাত্মার আমার প্রতি এমন বিনীত ব্যবহার! আমি বিগলিত হৃদয়ে উত্তরে দিতাম ঃ "মহারাজ, আমাকে আপনি এত দ্বিধার সঙ্গে কেন বলছেন?" তাঁর জন্য আমার তুচ্ছতম সেবাটুকুও তিনি এমনভাবে প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করতেন যে, যেন আমি তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছি। ভালবাসা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল; কারণ তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। প্রেম যেন শতধারে তাঁর হৃদয় থেকে প্রবাহিত হতো। যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যলাভ করত, তার উপরই তা অকৃপণ ভাবেই ঝরে পড়ত। তাঁর সাহচর্যলাভে ধন্য প্রত্যেকেই অনুভব করতেন যে, তিনিই মহারাজের সর্বাধিক স্নেহাস্পদ। প্রত্যেকেরই বোধ হতো যেন তিনি মহারাজের বিশেষ অন্তরঙ্গ।

মনুষ্যেতর প্রাণীও মহারাজের ভালবাসায় সমভাবে সাড়া দিত। আশ্রমে 'জকি' নামে একটি সবার প্রিয় সুন্দর কুকুর ছিল। মহারাজ ওকে খুবই স্নেহ করতেন এবং আহারান্তে কিছু খাবার নিয়ে ওকে ডাকতেন—'জকি, জকি'!

জকি সেই ডাক শুনে ছুটে আসত। মহারাজ স্বহস্তে কুকুরটিকে খাওয়াতেন। সে সময় একথা বলা কঠিন হতো যে, দুজনের মধ্যে কে বেশি আনন্দিত। মহারাজের জকির প্রতি করুণা ও জকির মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা বাস্তবিক দর্শনীয় ছিল। আশ্রমে কয়েকটি ভাল গরু ছিল। মহারাজ গোশালায় গিয়ে তাদের খাওয়া দেখতে ভালবাসতেন।

বিশ্রামের পর মহারাজ বাগান দেখতে বেরুতেন। ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় প্রায় প্রতিদিনই তিনি এটি করতেন। তিনি সব রকমের চারা ও গাছগুলিকে চিনতেন এবং ভালবাসতেন। সত্যি বলতে কি, উদ্যান-বিষয়ক ব্যাপারে তাঁর সত্যিকারের অভিজ্ঞতা ছিল।

ক-দিন পর মহারাজের কিছু সেবা করবার বিশেষ সৌভাগ্য আমাকে দেওয়া হয়। প্রতিদিন একটি ভক্তের বাড়ি থেকে কিছু পরিমাণ 'রসম' (তরল ও অম্লস্বাদযুক্ত দক্ষিণী খাদ্যবিশেষ) আমি নিয়ে আসতাম। ভক্তেরা নিজেদের বিবেচনানুযায়ী সুস্বাদু সামান্য খাদ্যবস্তুগুলি মহারাজকে দেবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি সেগুলি গ্রহণ করে আহার করতেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত সুদামা-প্রদত্ত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করেছিলেন। বাজার থেকে আমি মহারাজের পছন্দ মতো নানারকমের শাক-সবজি কিনে আনতাম। এছাড়া ডাকঘরে গিয়ে প্রতিদিনের ডাক—যার অধিকাংশই মহারাজকে লেখা—নিয়ে আসবার দায়িত্বও ছিল আমার।

এ সময়কার একটি ঘটনা আমাকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। মহারাজ নিজের ঘরে আরামকেদারায় উপবিষ্ট আছেন। ডাকঘর থেকে আমি কিছু চিঠি এনেছি। মহারাজকে সেগুলো দেবার পর নিকটস্থ টেবিল থেকে তাঁর চশমাটি দিতে বললেন। চশমাটি তুলে নিয়ে আমি তা পরিষ্কার করবার প্রয়োজন আছে কিনা দেখছিলাম। "হ্যাঁ, কাঁচগুলো একটু পরিষ্কার করে দাও"—মহারাজ বললেন। র‍্যাকে ঝোলানো তাঁর পশমী চাদরটির এক প্রান্ত এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার জন্য আমি সেদিকে হাত বাড়িয়েছি। "না, না! টেবিলের উপর যে মৃগচর্ম (chamois) রয়েছে, চশমার নোংরা তাতেই মোছা উচিত, শাল দিয়ে নয়।"—মহারাজ বললেন।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল যার প্রভাব আমার জীবনে আজও রয়েছে। ডাকঘর থেকে ডাক নিয়ে আসবার পথেই আমার তা বাছাই করবার কথা—যাতে আশ্রমে পৌঁছেই অতিথি ও আশ্রমবাসীদের চিঠিগুলি ব্যক্তিগতভাবে দিয়ে

দিতে পারি। একদিনের ডাকে আমার নিজস্ব দু-তিনটি চিঠি ছিল। ডাকঘর থেকে ফেরবার সময় আমি সেগুলো পড়ছিলাম। আমার ব্যক্তিগত চিঠি পড়তে আমি এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম যে, প্রাত্যহিক বাছাইটুকু না করেই আশ্রমদ্বারে পৌঁছলাম। মহারাজ তখন বারান্দায় বসে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কথোপকথন করছিলেন। তিনি তখনই তাঁর চিঠির জন্য হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। আমি অপ্রস্তুত ও হতচকিত হয়ে প্রাপকদের নামানুযায়ী সাজাবার প্রয়াসে খামগুলো হাতড়াতে লাগলাম। শীঘ্রই মহারাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বাছাইয়ের কাজটি নিজেই করবার জন্য তিনি চিঠিগুলি আমার কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিলেন। কি লজ্জিত ও দুঃখিতই যে বোধ করেছিলাম! তাঁর সেবার কাজে ত্রুটি ঘটাবার দরুন সেদিন সারাক্ষণ এক বেদনা ও লজ্জা অনুভব করেছিলাম। এবং সেদিনকার সেই কর্তব্যচ্যুতির স্মৃতি আজও আমার মনে অনুশোচনা আনে। আমাদের কাছ থেকে কে কী প্রত্যাশা করেন তার পূর্ব ধারণা করে নিয়ে সম্ভাব্য সব কিছুর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তৈরি করা যে একান্ত প্রয়োজন—সেই অমূল্য শিক্ষা ঘটনাটি সেদিন আমায় দিয়েছিল। এটি এখন আমার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

মহারাজের সঙ্গধন্য প্রত্যেকটি ব্রহ্মচারী এবং সাধুকে মহারাজ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন। তাঁর অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল, সেই কারণে তিনি প্রায়ই কারও কোন দোষ বা ভ্রম তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়প্রবিষ্ট হয়ে কোন ক্ষতি করবার পূর্বেই দেখে নিয়ে তা সংশোধন করে দিতেন। মহারাজ তাঁর সন্তানের হৃদয়ে 'অহং' ভাবের উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সজাগ ছিলেন এবং শীঘ্রই তা সবলে ও সমূলে উৎপাটিত করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, ভক্তদের চিঠিতে সংবাদাদি দেবার সময় তাঁর সেবক স্বামী বরদানন্দ নিজের স্বাক্ষরের নিচে লিখতেন—'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের একান্ত সচিব।' এইরকম একটি চিঠি মহারাজের হাতে গিয়ে পড়ে। মহারাজ তৎক্ষণাৎ কঠোরভাবেই সকলকে ডেকে বললেন ঃ "এ লোকটিকে দেখেছ? 'অধ্যক্ষের একান্ত সচিব'! কে ওকে অধ্যক্ষের একান্ত-সচিব করেছে?" মহারাজ অতঃপর স্বামী বরদানন্দকে ডেকে বহুক্ষণ ধরে কঠোর ভর্ৎসনা করেছিলেন।

মহারাজের ব্যাঙ্গালোরে বাসকালে আমি একেবারে তাঁর পাশের ঘরটিতেই ছিলাম। ভোর চারটায় উঠে তাঁর কলঘরে যাবার শব্দ শুনতে পেতাম। সাধারণত এ সময় তিনি কোন ভজন গুনগুন করে গাইতেন। সেই মৃদুস্বর প্রায় শোনাই

যেত না, কিন্তু গানগুলি এমন ভক্তি-প্লুত স্বরে গাওয়া হতো যে শ্রোতামাত্রই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

মহারাজের আচরণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল—যার জন্য সকলেই অনুভব করত যে, তিনি প্রায়ই কোনও ঐশী শক্তি বা দিব্য-পুরুষের সাথে ভাবমুখে সম্মিলিত হয়ে থাকেন। তিনি প্রায়ই উদ্যানে একাকী পাদচারণা করতেন। একটু নজর রাখলেই দেখা যেত যে মহারাজ মাঝে মাঝেই থামছেন ও যুক্তকরে নমস্কার করছেন, যেন তাঁর সম্মুখে কোনও দিব্য আবির্ভাব ঘটেছে।

মহারাজের বোধশক্তির সূক্ষ্মতাও অলৌকিক ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, আশ্রমে তাঁর উপস্থিতির কথা জেনে ব্যাঙ্গালোরবাসী ভক্তবৃন্দ মহারাজ যা বিশেষভাবে পছন্দ করতে পারেন এমন সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করার বিষয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করতেন। আহারকালে আশ্রমে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদি ছাড়াও বাইরের বহুপ্রকারের ব্যঞ্জন এবং ভোজ্যবস্তু থাকত। মহারাজ ভক্তদের তুষ্ট করবার জন্য সবকিছুই অল্প অল্প করে চেখে দেখতেন। এ থেকেই তিনি বলতে পারতেন যে, স্বাদটি যথাযথ হয়েছে কিনা এবং তাতে বিভিন্ন উপাদানসমূহ (আবশ্যক সবজি ও মসলা ইত্যাদি) ঠিকভাবে নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে কিনা। পরে যখন আহার্যবিশেষের প্রস্তুতকারী কোন ভক্তকে দেখতেন, তিনি তাঁর খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। একদিন সুয্যি মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ) মহারাজের জন্য 'রসম' তৈরি করেন। সবাই জানতেন যে, মহারাজ পেঁয়াজযুক্ত রসম পছন্দ করেন না। সেজন্য সুয্যি মহারাজ বিশেষ যত্নসহকারেই এই বস্তুটি পরিহার করেছিলেন। কিন্তু সেদিন রসম মুখে দিয়েই মহারাজ বেশ জোরের সাথেই বললেন যে, ওতে পেঁয়াজ দেওয়া হয়েছে। সুয্যি মহারাজ পেঁয়াজের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। কিন্তু মহারাজ বারবার ঐ একই কথা বললেন। সুয্যি মহারাজ তখন ঐ রসম প্রস্তুতকরণের প্রতিটি পর্ব স্মরণ করলেন। তবে কি আশ্রমের পাচকঠাকুর নিজে থেকেই পেঁয়াজ দিয়েছে? না! তাহলে কি আনাজপাতি ভাজবার ঘি পেঁয়াজের সংস্পর্শে এসেছিল? তা-ও না। সবশেষে তিনি রসমে ব্যবহৃত ধনেপাতা কুচোবার জন্য যে ছুরিটি ব্যবহার করেছিলেন, সেটি পরীক্ষা করলেন। হ্যাঁ, সুয্যি মহারাজ ব্যবহার করবার ঠিক পূর্বেই তাঁর অজ্ঞাতসারে সেটি দিয়ে পেঁয়াজ কাটা হয়েছিল।

মহারাজের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আমি দেখেছি যার উল্লেখ স্বামী প্রভবানন্দ তাঁর 'The Eternal Companion' গ্রন্থে করেছেন। সেটি হলো

মহারাজের রঙ্গপ্রিয়তা ও কৌতুকবোধ। সারাটি দিন তিনি আমাদের প্রাণভরে হাসাতেন। সংবাদপত্রে 'বলশালী ব্যক্তি' নামক একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপনে ভয়ঙ্কর মাংসপেশীযুক্ত একজন লোকের ছবি ছিল। সেই সঙ্গে এই কথাটি বলা হয়েছিল ঃ 'যদি আমার মতো হতে চাও...।' মহারাজ তাঁর পাচক অথবা সেবক ব্রহ্মচারীকে সেই পেশীবহুল মানুষটির মতো ভঙ্গিমায় দাঁড়াতে বলতেন এবং ঘোষণার সুরে বলতেন ঃ 'যদি আমার মতো হতে চাও'।

মহারাজ স্বামী বরদানন্দের সঙ্গে শব্দের নানারকম খেলা খেলতে ভালবাসতেন। এই খেলাটিতে প্রথম ব্যক্তি এমন একটি শব্দ বা কথা ভাবতে চেষ্টা করবে যার সমছান্দিক একটি শব্দ প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে না পায়। মহারাজ হয়তো বললেন, 'গর্ব'। স্বামী বরদানন্দ ছন্দ মিলিয়ে কোন শব্দ ভেবে না বলতে পারলে তিনি সেবার হারবেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন 'খর্ব' তবে মহারাজকে আরো একটি সমছান্দিক শব্দ বলতে হবে। না পারলে তিনি হেরে যাবেন। একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ স্বামী বরদানন্দের সাথে দেড়ঘণ্টাকাল ধরে খেলতে থাকেন। স্বামী বরদানন্দ ছিলেন রান্নাঘরে এবং মহারাজ বারান্দায়। আমি ছিলাম মধ্যস্থতাকারী—অর্থাৎ শব্দগুলি নিয়ে যাওয়া-আসা করছিলাম। স্বামী বরদানন্দ শেষ অবধি ঐ খেলায় বিরক্ত হয়ে আমাকে দিয়ে মহারাজকে বলে পাঠালেন ঃ "অনেক হয়েছে রাত্রি।" মহারাজ নিজের কদাচিৎ হারবার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখে দ্রুত উত্তরটি বলে পাঠালেন—"ওকে বলো তবে শুভ-রাত্রি!"

সত্যি বলতে কি, প্রায় সারাটি দিন ধরেই এই হাস্য-কৌতুক চলত। এভাবে যেন মহারাজ আমাদের অন্য সবরকম চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। আরতির পর যখন সান্ধ্য-উপাসনার সময় উপস্থিত হতো, সব কিছুই যেন পরিবর্তিত হয়ে যেত। মহারাজের তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ। তাঁর ঘরের বাতির আলো সব কমিয়ে দেওয়া হতো। তিনি যোগাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হতেন। এক সুগম্ভীর প্রশান্তি সমস্ত আশ্রমে পরিব্যাপ্ত হতো। এ সময় তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার কালে সবাই অত্যন্ত সম্ভ্রমযুক্ত হয়ে থাকত। এমনকি স্বামী নির্মলানন্দও—যিনি দক্ষিণভারতে একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন, যিনি বহু কেন্দ্রের সংগঠক এবং একজন ক্ষমতাশালী প্রচারক এবং মহারাজের প্রায় সমবয়সী—তিনিও মহারাজের করুণাকোমল ব্যক্তিত্বের সম্মুখে একটি বালকের ন্যায় হয়ে যেতেন। আরতির পর কোনদিন ভজন গান হতো এবং মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দজীও তা শুনতেন।

মহারাজ ফুল খুব ভালবাসতেন এবং উদ্ভিদ ও পুষ্প-বিষয়ক অনেক তথ্য জানতেন। ভুবনেশ্বর আশ্রমে একটি চমৎকার উদ্যান গড়ে তুলবার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। তিনি আমাকে ব্যাঙ্গালোরের উদ্ভিদশালার (Nursery) কর্মচারীদের কাছ থেকে সবরকম বীজ সংগ্রহ করে ভুবনেশ্বর আশ্রমে রোপণ করবার জন্য সেখানে প্রেরণ করতে বলেন। আমি উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম এবং নানাজাতীয় পুষ্প ও বৃক্ষাদির ল্যাটিন নাম বলতে পারতাম। ব্যাঙ্গালোরে জনপ্রিয় একটি ছায়াঘন পুষ্পিত বৃক্ষ (Cythraxylon Subserratum) ছিল। সেটি ছিল মহারাজের বিশেষ প্রিয়। তিনি সুমিষ্ট মৃদু সৌরভের জন্য এর ফুল ভালবাসতেন। তিনি এর নামটিও পছন্দ করতেন কিন্তু সম্ভবত তা মনে রাখতে পারতেন না। সুতরাং আমাকে প্রায়ই মহারাজের সম্মুখে এই গুরুগম্ভীর শব্দগুলি উচ্চারণ করতে হতো।

মহারাজ পালং ও অন্যান্য নানারকম শাক পছন্দ করতেন। একবার তিনি ব্যাঙ্গালোরে তরকারির বাজারে কত রকমের শাক পাওয়া যায় তা জানতে চান। আমি বললাম যে, আমি সঠিক জানি না, তবে অনেক রকমের থাকা উচিত। "বেশ"—মহারাজ বলে উঠলেন, "তুমি আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবে এবং আমরা যত রকমের শাক পাব কিনব।" কদিন পরেই মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, "আজ আমরা শাক কিনতে যাব।" মহারাজের সঙ্গে শুধু আমিই থাকব পথপ্রদর্শক হিসেবে—মহারাজ বললেন। কি মহাসৌভাগ্য আমার! আমরা প্রায় দু-মাইল দূরে অবস্থিত বাজারের দিকে পদব্রজে যাত্রা করলাম। তিনি সম্মুখে হাঁটছিলেন, পিছনে আমি। নানা দোকানে গিয়ে আমরা সবশুদ্ধ আট-দশ রকম শাক পেলাম। মহারাজ আমাকে এর প্রত্যেকটিই অল্প পরিমাণে কিনতে বললেন। যখন আমি সেই অনুযায়ী কিনতে ব্যস্ত, তিনি বাজারে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। কেনা শেষ হলে মহারাজকে আমি কোথাও দেখতে পেলাম না। ভিড়ে বাবাকে হারিয়ে ফেলা ছোট ছেলের মতোই আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলাম এবং সব জায়গায় ছুটোছুটি করে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। শেষে একটি মজুর আমাকে বলল যে, সে কিছুক্ষণ পূর্বে মহারাজকে বাজার ছেড়ে আশ্রমের দিকে যেতে দেখেছে। ক্ষুণ্নহৃদয়ে ও সেই সঙ্গে এই আশঙ্কায় যে আমি তাঁর পথপ্রদর্শক হিসাবে কর্তব্যচ্যুত হয়েছি—আমি দ্রুত আশ্রমে ফিরে এলাম এবং এসেই সোজা মহারাজের ঘরে গেলাম। তিনি সেখানে বসেছিলেন। আমি তাঁকে হারিয়ে ফেলে কি ব্যাকুলভাবে খুঁজেছি,

সেকথা বলতে মহারাজ হেসে শুধুমাত্র এটুকুই বললেন ঃ "তুমি যে এমন করবে আমি তা ভেবেছিলাম।"

যদিও আমি রোজই মহারাজের দর্শনলাভ করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণে উদগ্রীব ছিলাম তবু আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করবার প্রার্থনা জানাতে দ্বিধাবোধ করতাম। আমার ধারণা ছিল যে, গুরু যোগ্য মনে করলে নিজেই তা বলবেন। আমার বেলায় বাস্তবিকই তাই ঘটেছিল। সুয্যি মহারাজ একদিন আমাকে বললেন, মহারাজ আমাকে ডেকেছেন। আমি তাঁর ঘরে গেলাম। দ্বিতীয় কেউই সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহারাজের পদপ্রান্তে বসলাম। তিনি আমাকে দীক্ষাদান করলেন এবং একটি জপের মালা দিলেন। মালাটি দেবার পূর্বে মহারাজ স্বয়ং কিছুক্ষণ তাতে জপ করে দেন।

আমাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেছেন বলে মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্লাবিত অন্তরে বিদায়গ্রহণকালে মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করতে যাচ্ছি—জপের মালাটি আমার হাতে। "না, না"—মহারাজ সতর্ক করে দিলেন, "জপের মালাটি মন্ত্রপূত। মালা যেন পদস্পর্শ না করে।"

এই প্রসঙ্গে মহারাজ তাঁর নিজের জপমালার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করতেন, তাঁর উল্লেখ করছি। মহারাজ তাঁর মালাটি হাতে নেবার আগে হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর গঙ্গাজল স্পর্শ করতেন। তারপর অত্যন্ত ভক্তিসহকারে মালাটি তুলে নিতেন।

কিছুদিন পরে একদিন মহারাজ আশ্রমের প্রবীণতর ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং আমাকে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য দান করেন। যদিও তখন আমি মাত্র দশ কি এগার মাসের একজন নবাগত শিক্ষার্থী। কৌপীনটি মহারাজ নিজ-হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন।

এর অল্প কিছুকাল পরই মহারাজ ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করেন। তিনটি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। যেন আনন্দোচ্ছল তিনটি দিন! মাদ্রাজে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে মহারাজ উপস্থিত থাকবেন। অবশেষে বিদায়ের সেই নির্মম মুহূর্তটি এলো। মহারাজ এবং মহাপুরুষ মহারাজ মন্দিরে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। তাঁরা চলে গেলেন। সব যেন শূন্য হয়ে গেল।

১০ এপ্রিল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ মহাপ্রয়াণ করেন। শুনেছি অন্তিমকালে তিনি অমৃতসাগরের মাঝখানে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন; এবং

নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চিরসাথিরূপে দেখে তাঁর নূপুরটি তাঁকে দিতে বলেছিলেন, যেন তিনি গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতে পারেন।

আমি বেদ-পুরাণাদি ও কিছু দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু বারে বারেই আমি শাস্ত্রগ্রন্থাদির জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ মহারাজের কাছেই ফিরে এসেছি। যখনই আমি আমার চশমাটি তুলে নিই অথবা ব্যবহার করবার পূর্বে তা পরিষ্কার করি, তাঁর শিক্ষা আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। তাঁর দেওয়া জপমালাটি আমার কাছে তাঁর ও তাঁর প্রভুর শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতীকস্বরূপ। শুধুমাত্র একটি মহান আত্মাই অপরের জীবনকে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্তিত করতে সক্ষম। মহারাজের অসামান্য ব্যক্তিত্বের সেই কয়েকমাসের সান্নিধ্যলাভ আমাকে এমনভাবে পুষ্ট করেছে, জীবনীশক্তি দিয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বলা হয়ে থাকে যে, যখন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় তখন তাঁর স্মৃতির প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে অবশেষে মিলিয়ে যায়। কিন্তু যখন মহাপুরুষেরা দেহত্যাগ করেন, কালের ব্যবধান বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের প্রভাব হয় গভীরতর। মহারাজের সান্নিধ্যে বাস করবার পর আজ চুয়াল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে; গভীর থেকে গভীরতররূপে তাঁর অসাধারণ ও অতুলনীয় ভালবাসার স্মৃতি আনন্দের জোয়ারের মতোই আমার কাছে ফিরে ফিরে আসছে।

(উদ্বোধন ঃ ৯১ বর্ষ ৫ সংখ্যা)

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ। বিগত ১০/০২/১৯৭৮ তারিখে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মঠ-আয়োজিত এক সমাবেশে পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধীশ মহারাজের মূল ইংরেজী প্রসঙ্গের ভাষান্তরিত প্রবন্ধরূপ এখানে প্রকাশিত।]

কোন আনুষ্ঠানিক ভাষণ আমি দিচ্ছি না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনের ঘটনা, যা আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত রয়েছে, মাত্র তারই কিছু বলব। ঘটনাগুলো ষাট বছর কি ততোধিককাল পূর্বের।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি বলা হয় গ্রন্থাগার সংস্করণ, রাজা মহারাজ ছিলেন যেন পকেট সংস্করণ। তিনি যেন অনেক দিক থেকে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এমনকি শরীরের দিক থেকেও—পিছন থেকে দেখে অনেকেই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে কখনো ভুল করতেন। সাদৃশ্য ছিল এতই বেশি।

রাজা মহারাজের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁর মন অধিকাংশ সময়েই কোন জগদতীত রাজ্যে বিচরণ করত। তিনি যেন ভিন্ন এক পৃথিবীতে বাস করতেন। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে তিনি সামান্যই সচেতন ছিলেন। বেশির ভাগ সময়েই তিনি চৈতন্যের সর্বোচ্চস্তরে বিচরণ করতেন। কখন-কখন তিনি তাঁর সেবককে হুঁকায় তামাক দিতে বলতেন। সেবক হুঁকা দিয়ে যেত, মহারাজের কিন্তু সেদিকে খেয়ালই থাকত না। ফলে কিছুক্ষণ বাদেই তিনি সেবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, "আমাকে তামাক দিলে না কেন?" বাহ্যজগৎ যেন তাঁর চেতনায় স্থান পেত না। তামাক দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তিনি নিজের ভাবে এতই বুঁদ হয়ে থাকতেন যে, তামাক পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হুঁশ থাকত না। এভাবে দেখতে পাই বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁর মন খুব সামান্যই জড়িত থাকত।

যদিও তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে পড়াশুনা করেননি, কিন্তু অনেক বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। বিচিত্র নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি

সবাইকে বিস্মিত করত। আমার মনে আছে, তিনি মাদ্রাজে থাকাকালীন আশ্রম ছিল ‘বাণী বিলাস’ বাড়িতে, মহারাজ সন্ধ্যারতির পর বাড়িটির খোলা বারান্দায় বসে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। অনেক ভক্ত আসতেন এবং তাঁর নিকটে এসে বসতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেও, আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কদাচিৎ আলোচনা করতেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর সান্নিধ্যে বসে থাকাই ছিল সকলের কাছে আকর্ষণীয়, কেউই সেই আকর্ষণ ছেড়ে যেতে চাইত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল তখন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭-৮টা নাগাদ শিবরাম আয়ার (পরবর্তিকালে যিনি স্বামী অবিনাশানন্দ) রাজা মহারাজের কাছে আসতেন। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ‘হিন্দু’-র তিনি ছিলেন অন্যতম সহ-সম্পাদক। তিনি এলেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন, “যুদ্ধের খবর কি? জার্মান-সৈন্যরা আজ কোথায়? গতকাল তো তারা ব্রিটিশ সৈন্যদের থেকে এত মাইল দূরে ছিল, আজ তারা কোথায়?” এ ধরনের প্রশ্ন তিনি করতেন। তিনি জার্মান ও ব্রিটিশ-সৈন্যদল চলাচলের সব খবর মনে রেখে শিবরাম আয়ারকে প্রশ্ন করতেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

তখন আরেকজন ভদ্রলোক আসতেন। তিনি কোন সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। রাজা মহারাজ প্রায়ই তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁকে এমন সব প্রশ্ন করতেন যা থেকে ব্যাঙ্কিং ও সমবায় ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য জানা যেত। আরেকজন ভদ্রলোক প্রতিদিন আসতেন। তিনি সরকারের কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের ফুল ফল এবং তাদের প্রয়োজনীয় সার সম্বন্ধে কথা বলতেন। তদুত্তরে মহারাজও ভদ্রলোকের কাছে গাছপালা সার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করতেন। তিনি নিজে যদিও গাইয়ে ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন গানের একজন উঁচু শ্রেণীর সমঝদার। গানের সুর, তাল ইত্যাদি তিনি বুঝতেন এবং তাদের রস গ্রহণ করতেন। তিনি এভাবে বহুবিধ বিষয়ে বিপুল জ্ঞান আহরণ করেছিলেন—বইপত্র না পড়ে শুধু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাপূজা সম্বন্ধে মহারাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, একজন ব্রহ্মচারী পূজার জন্য বাগান থেকে সব সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি তুলছে। তাকে ডেকে বললেন, “তুমি করছ কি? তুমি কি গাছপালাগুলিকে ফুলশূন্য করে দিতে চাও? তোমার ধারণা বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র ঠাকুরঘরেই বসে আছেন এবং বাগানে বেড়াতে আসেন না। এ রকম

আর কখনও করো না। পূজার জন্য কয়েকটা ফুল তুলে অবশিষ্ট সব ফুল বাগানে রেখে দেবে।”

মঠের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মে, বিশেষত ফুলবাগান, ফলের গাছ, সবজিবাগান, গোশালা ইত্যাদি ব্যাপারে মহারাজের খুবই দৃষ্টি ছিল। গোশালায় গোরু বাছুরের জন্য খাবার কি হবে না হবে তাও তিনি ঠিক করে দিতেন। তিনি যে নিজেই শুধু উৎসাহী ছিলেন তাই নয়, তিনি চাইতেন অপর সকলেও তাঁর মতো উৎসাহী হোক। কেউ মাদ্রাজ মঠ থেকে বেলুড় মঠে এলেই রাজা মহারাজ তাকে মাদ্রাজ মঠের ফুলগাছ, ফলগাছ, গোরু ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, “গুরু মহারাজের জন্য যে গাইটা কিনেছিলাম তার কয়টি বাছুর হয়েছে? কতটা করে দুধ দিচ্ছে? যে ফুলগাছটা লাগিয়েছিলাম—সেটা সুন্দর ফুল দিচ্ছে তো?” তিনি বারাণসী থেকে বেলগাছের চারা আনিয়ে মাদ্রাজ মঠে লাগিয়েছিলেন। তিনি জানতে চাইতেন, “বেলগাছটা কত বড় হয়েছে।” তিনি তিনটি আমলকী গাছও লাগিয়েছিলেন। এবং তিনি জিজ্ঞাসা করতেন গাছগুলি কেমন বড় হয়েছে, তারা ভাল ফল দিচ্ছে কিনা। তিনি যখন এই গাছ তিনটি প্রথমে লাগিয়েছিলেন সে সময়ে বাগানের প্রাচীরের ধারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “শুধুমাত্র এই গাছগুলির ফল বিক্রি করেই তোমরা শ খানেক করে টাকা পেয়ে যাবে।” শুনে সবাই আনন্দে হেসে উঠেছিল। গাছপালা সম্পর্কে যারা খবরাখবর সঠিক দিতে পারত না মহারাজ তাদের ধরে নিতেন নিষ্কর্মা।

দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্রের আদান-প্রদান মহারাজ পছন্দ করতেন। তিনি ব্যাঙ্গালোর ও অন্যান্য জায়গা থেকে কত রকমের গাছ এনে বেলুড় মঠের জমিতে লাগিয়েছেন গুরু মহারাজের সেবার জন্য। এভাবে তিনি দক্ষিণভারত থেকে এনে নাগলিঙ্গম গাছ লাগিয়েছিলেন, সেটি এখন বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধ ফুল দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভাল ভাল জিনিস বাংলা দেশে আনতেন, আবার বাংলা দেশের ভাল জিনিস অন্যত্র নিয়ে যেতেন। এমনকি যে সকল দক্ষিণভারতীয় রান্না তিনি পছন্দ করতেন সেগুলি বেলুড় মঠে রান্না করিয়ে গুরু মহারাজকে ভোগ দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিম ফুল থেকে তৈরি রসম ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।

দক্ষিণদেশের খুবই জনপ্রিয় রামনাম সংকীর্তন তিনি বেলুড় মঠে প্রবর্তন

করেছিলেন। তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন কয়েকটি তুলসীদাসের দোঁহা। তিনি সাধুদের প্রত্যেক একাদশী ও রামনবমীর দিনে এই সংকীর্তন করতে বলতেন। আজ পর্যন্ত এই সংকীর্তন শুধু বেলুড় মঠে নয়, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রায় সকল কেন্দ্রে একাদশীর দিন গাওয়া হয়। এভাবে যখনই তিনি দক্ষিণ বা উত্তর-ভারতে পরিভ্রমণে যেতেন তিনি তখনই উত্তর ও দক্ষিণের ভারতীয়দের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়ার জন্য ভাবের আদান-প্রদানের চেষ্টা করতেন। তিনি একবার হরিদ্বারে এবং আর একবার মাদ্রাজে দুর্গাপূজা করিয়েছিলেন। এভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সেরা বিষয়গুলি মিলিয়ে মিশিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন।

ভোর চারটার সময় মঙ্গলারাত্রিকের পর রাজা মহারাজ ধ্যান করতে বসতেন। বেলুড়ে মঠবাড়ির দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় তিনি বসতেন। তাঁর সামনে বসে সকলে ধ্যান করত। ধ্যানের পরে তিনি সকাল সাতটা পর্যন্ত ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। কোন কোন দিন বাবুরাম মহারাজ দেখতেন যে, তরকারি কাটবার কোন লোক নেই। সবাই উপরে মহারাজের কাছে বসে রয়েছে। বাবুরাম মহারাজ নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলতেন, "আচ্ছা রাজা, আজ ঠাকুরের ভোগ হবে কিনা?" মহারাজ শুনেই বলতেন, "বাবুরামদা রেগে যাচ্ছে, তোরা যা যা।"

তিনি কোন কোন লোককে পছন্দ করতেন না। তাদের প্রতি তাঁর যেন এলার্জি ছিল। তিনি যখন মাদ্রাজে ছিলেন, সে সময়ে এই রকমের এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু রাজা মহারাজ সর্বদাই তাকে এড়িয়ে চলতেন। এদিকে ঐ ভদ্রলোকের এক বন্ধু ছিলেন আমাদের মিশনের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের সেক্রেটারী রামস্বামী আয়েঙ্গারেরও ঘনিষ্ঠ। সেই বন্ধু লোকটি যখনই রামস্বামী আয়েঙ্গারের সঙ্গে মঠে আসতেন, মহারাজ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন। একদিন কিন্তু রামস্বামী আয়েঙ্গার যখন মহারাজকে বললেন যে, তাঁর বন্ধুটিও এসেছেন, মহারাজ বললেন, "আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই। ওঁকে অন্য কোন একদিন আসতে বল।" তদনুসারে রামস্বামী আয়েঙ্গার তাঁর বন্ধু ভদ্রলোকটিকে গিয়ে মহারাজের কথা জানালেন এবং তাঁকে অন্য একদিন আসতে বললেন। আশ্চর্য, সেই ভদ্রলোক চলে যাবার ঠিক পরেই একটি গাড়ি এসে হাজির। গাড়িতে বসেছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে রাজা মহারাজ এড়িয়ে চলতেন। লোকটি গাড়ি থেকে নেমেই খোঁজ করেন, "অমুক এখানে আছেন কি?" রামস্বামী আয়েঙ্গার বলেন, "হ্যাঁ, তিনি

এখানে ছিলেন বটে, কিন্তু এইমাত্র চলে গেলেন।” লোকটি হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। বোধ হয় এ রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল যে, দুজনে একই সময়ে মঠে উপস্থিত হবেন—বন্ধু ভক্তটি তো রাজা মহারাজের কাছে যাওয়া আসা করতেন, তিনি ঐ লোকটিকে নিয়ে মহারাজের কাছে হাজির হবেন। তাহলে আর মহারাজ তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সম্ভবত এই ব্যবস্থাটি সম্বন্ধে মহারাজ বুঝে ফেলেছিলেন; সেই কারণেই ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদন করে দিয়েছিলেন এবং পূর্বে যা কখনও করেননি সেদিন তাই করেছিলেন, অর্থাৎ সেই ভক্তটির সঙ্গেও দেখা করতে রাজি হননি। ঐ দিনটি ছাড়া কিন্তু প্রত্যেকদিনই মহারাজ ভক্তটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন।

আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন—মাদ্রাজের নয়, এলাহাবাদের—তাঁকেও মহারাজ অমনি এড়িয়ে চলতেন। মহারাজ একদিন কিছু দূরে লক্ষ্য করলেন যে, ঐ ভদ্রলোকটি আশ্রমের দিকে আসছেন। চট করে তক্ষুনি আশ্রমের ভিতরে চলে গেলেন, বিছানায় শুয়ে পড়ে তিনি সেবককে বললেন, “জ্বরে আমি কাঁপছি। আমাকে কম্বল চাপা দে, আর চেপে ধর।” সেবক মহারাজের শরীর কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তবুও মহারাজের কাঁপুনি হচ্ছিল। ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো তাঁর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছিল। এদিকে ভদ্রলোকটি মহারাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য উপস্থিত হলে সেবক তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, “আজ দেখা হবে না। মহারাজ অসুস্থ।” ভদ্রলোককে অগত্যা চলে যেতে হলো। চলে যাবার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “ঐ ভক্তটি চলে গেছে কি?” যখন শুনলেন যে লোকটি চলে গেছে, মহারাজের জ্বরও ছেড়ে গেল এবং তিনি তামাক খেতে চাইলেন। বাস্তবিকই তাঁর জ্বর এসে গিয়েছিল, দুটো কম্বল দিয়ে শরীর ঢেকে দেবার পরও শরীরের কম্পন হচ্ছিল। তিনি কি করে হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হলেন, আবার কি করেই বা তা থেকে মুক্ত হলেন এটা একটা রহস্যময় ব্যাপার। কিন্তু এটা সত্যি যে ঐ ব্যক্তির উপস্থিতিতেই মহারাজ জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তিনি চলে যেতেই জ্বরের আরাম হয়েছিল।

তিনি যখন কাশীতে বাস করছিলেন সে সময়ে অন্য এক আশ্রমে ভাণ্ডারা হচ্ছিল। সেই আশ্রমের একজন সন্ন্যাসী বিভিন্ন আশ্রমে গিয়ে সমষ্টি ভাণ্ডারার আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। সমষ্টি ভাণ্ডারাতে সকল আশ্রমের সব সাধুকে আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। সন্ন্যাসীটি আমাদের রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে এসে স্থানীয় মোহন্তকে দশটি নিমন্ত্রণের কার্ড দেন—কারণ ঐ আশ্রমে সাধারণত দশজনই

বাস করতেন। মোহন্ত মহারাজ বললেন, "না, না, আমি পঞ্চাশটা চাই।" মোহন্ত মহারাজ পঞ্চাশটি কার্ড চাইলে আমন্ত্রণকারী সন্ন্যাসী বিস্মিত হন, জিজ্ঞাসা করেন, "এখানে কি এত জন সাধু আছেন?" আমাদের মোহন্ত মহারাজ বলেন, "নিশ্চয়ই আছেন।" আমন্ত্রণকারী সন্ন্যাসী পঞ্চাশটি কার্ড দিয়ে চলে গেলেন। ভাণ্ডারার দিন ঐ মোহন্ত মহারাজ সাধুদের সবাইকে ভাণ্ডারায় যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই যেতে অসম্মতি জানায়। রাজা মহারাজ উপস্থিত, সকলেই চায় তাঁর কাছাকাছি থাকতে, ভাণ্ডারায় যেতে সে কারণে আপত্তি। স্থানীয় মোহন্ত বিব্রত বোধ করেন। তিনি তখন রাজা মহারাজকে গিয়ে নিবেদন করেন, "আমি ভাণ্ডারার জন্য পঞ্চাশটা কার্ড নিয়েছিলাম, কারণ এখানে সেই রকম সংখ্যক সাধুই রয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই যেতে আপত্তি করেছেন। আমি একজনকেও পাঠাতে পারলাম না। দেখুন, আমার অবস্থাটা কি করুণ দাঁড়িয়েছে।" মহারাজ বললেন, "ঠিক আছে, তুমি ঘণ্টা বাজাও।" যখন মহারাজ চাইতেন যে, সব সাধু তাঁর সামনে হাজির হবে, সে সময়েই ঘণ্টা দেওয়া হতো। সুতরাং ঘণ্টা দিতেই মহারাজের ঘরের নিচের উঠানে সাধুরা এসে সমবেত হন। মহারাজ উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আদেশ করেন, "সব লাইনে দাঁড়াও, লাইনে দাঁড়াও।" সবাই শ্রেণিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেই মহারাজ আদেশ করেন, "এবার এক দুই তিন করে গোন।" এক, দুই, তিন উচ্চারণ করে গণনা হতে থাকল। ৫০ উচ্চারণ হতেই তিনি বললেন, "ব্যস থাম। ডাইনে ঘোর এবং জোর কদমে চল। ভাণ্ডারায় চলে যাও।" সুতরাং নিমন্ত্রিত পঞ্চাশজনই সমষ্টি ভাণ্ডারায় যোগ দেয়। এ সকল ব্যাপারে মহারাজ ছিলেন খুবই মজার লোক।

মহারাজের জন্মদিনে, তাঁকে ফুলের মালা, ফুলের মুকুট ইত্যাদি দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। পরের দিন তিনি আমাদের সকলকে আদেশ করলেন যে, ঐ মালা, মুকুট ইত্যাদি সব কিছু দিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দকে সাজিয়ে তাঁর চতুর্দিকে কীর্তন করতে। স্বামী শুদ্ধানন্দ উঠানে বসেছিলেন। আমরা মুকুট, মালা ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে সাজালাম। তারপর খোল করতাল নিয়ে তাঁর চতুর্দিকে কীর্তন গাইতে ও নাচতে শুরু করলাম। সে সময়ে মহারাজ ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলেন, যা সেখানে ঘটছে তা দেখে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তিনি এই ধরনের কৌতুক সব করতেন।

মাদ্রাজ মঠে একদিন জনৈক ভক্ত একটি বড় থালা ভর্তি মিষ্টি নিয়ে শশী

মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। শশী মহারাজ সেই থালাটি রাজা মহারাজের কাছে নিয়ে বলেছিলেন, "রাজা খাও।" রাজা মহারাজ বলেন, "আমার শরীর ভাল নেই। পেটের গণ্ডগোল হয়েছে। গতকাল থেকে আমি সাগুজল খাচ্ছি। তুমি এসব জেনেও আমাকে এই সব খাবার খেতে বলছ!" শশী মহারাজ তখন বললেন, "রাজা, তুমি তো খাচ্ছ না। তোমার মাধ্যমে ঠাকুর খাবেন। সুতরাং তুমি এই খাবার খাও।" অতঃপর রাজা মহারাজ নীরবে মিষ্টিগুলি খেতে থাকেন এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ খেয়ে শেষ করেন। এতে কিন্তু তাঁর শরীরের কোন উপদ্রব ঘটেনি।

রাজা মহারাজের দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে শশী মহারাজ তাঁকে বিভিন্ন মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মাদুরাই মন্দিরেও নিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণভারতে কোথাও মন্দিরের গর্ভমন্দিরে—যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, কোন দর্শককে যেতে দেওয়া হয় না। পূজারী ভিন্ন কেউ গর্ভমন্দিরে ঢোকে না। এখন, শশী মহারাজের ইচ্ছা হলো রাজা মহারাজকে নিয়ে গর্ভমন্দিরে ঢুকবেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, সন্ন্যাসী পর্যন্ত সেখানে ঢুকলে তার জাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। রাজা মহারাজ কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেটাই ছিল সমস্যা। সে কারণে শশী মহারাজ রাজা মহারাজকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ও চিৎকার করে বলেন, "আলওয়ার! আলওয়ার!" বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে খ্যাতনামা সাধুসন্ত আছেন তাঁদের বলা হয় আলওয়ার ও নয়নার। আলওয়াররা বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং নয়নাররা শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। শশী মহারাজ ও রাজা মহারাজ দুজনেরই ছিল বিশাল বপু। শশী মহারাজ রাজা মহারাজকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে "আলওয়ার, আলওয়ার" বলে চিৎকার করলে মন্দিরের কেউ আর প্রতিবাদ করল না। শশী মহারাজ রাজা মহারাজকে নিয়ে জগন্মাতার মূর্তির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেন। মুহূর্ত মধ্যে মহারাজ মায়ের সম্মুখে ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই সব দেখে পূজারী যিনি ভিতরে ছিলেন, তিনি পাথরের মূর্তির মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই কৌশলে শশী মহারাজ মহারাজকে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমার যতদূর মনে আছে, বারাণসীতে রাজা মহারাজ একবার রামনাম প্রারম্ভের অনেক আগে—অন্যের আগমনের বহু পূর্বেই একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখেছিলেন। আবার রামনাম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের বেরিয়ে যাবার পূর্বেই সেই বৃদ্ধ প্রথমে চলে গিয়েছিলেন। মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে,

সেই বৃদ্ধই মহাবীর হনুমান। সেদিন থেকে তিনি রামনামের সময় অতিথি মহাবীরের জন্য একটি আসন সংরক্ষণের প্রথা প্রবর্তন করেন।

রাজা মহারাজ তিরুপতি মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দর্শনাদি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল রামু। তিনি রামুকে জিজ্ঞাসা করেন, "এটা কার মন্দির?" রামু বলেন, "এটা রামানুজাচার্য-প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির।" রাজা মহারাজ বলেন, "আমি কিন্তু তা বুঝতে পারছি না। আমি ভাবচক্ষে দেখতে পেলাম জগন্মাতাকে—বিষ্ণুকে নয়। ব্যাপার কি? এমন কেন হলো?" তখন রামু খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন যে, তিরুপতিতে প্রথমে মাতৃমূর্তির মন্দির ছিল। সেখানে প্রচলিত পূজা পদ্ধতির মধ্যেও দেখা যায় যে, মূলবিগ্রহ ছিলেন মাতৃমূর্তি। এমনকি পূজারীও এই সত্য মেনে নেন, তিনি রামুকে বলেন, "ঠিকই, এটি ছিল মাতৃমন্দির। রামানুজ এটিকে বিষ্ণুমন্দিরে রূপান্তরিত করেছিলেন।" এভাবেই চলেছে ইতিহাসের ধারা। ভারতবর্ষে মন্দিরগুলি যেন দুর্গের মতো। সেখানে বিগ্রহের পরিবর্তন হয়, মন্দির এক সম্প্রদায়ের হাত থেকে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়। আমাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই ইতিবৃত্ত। শুধু রাজা মহারাজই তাঁর ভাবচক্ষে জানতে পেরেছিলেন যে, তিরুপতিমন্দির আদিতে ছিল একটি মাতৃমন্দির।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমা দীর্ঘ কয়েক বছর আর মঠে আসেননি। একদিন রাজা মহারাজ তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান মঠে পদার্পণের জন্য।

আমি সঠিক জানি না, কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, দুর্গাপূজার সময়েই দক্ষিণের প্রবেশপথ থেকে মন্দির পর্যন্ত শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীকে অভ্যর্থনা করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখনকার দিনে ঐটিই ছিল মঠের ঢোকার প্রধান প্রবেশ পথ। সেই পথ দিয়ে এসে মা দোতলায় ঠাকুরঘরে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। তোমাদের অনেকেই বেলুড় মঠে গিয়েছ। তোমরা নিশ্চয়ই জান শিবানন্দজী মহারাজ কোন্ ঘরে থাকতেন। সেই ঘরের বড় জানালার ধারেই একটি ছোট বারান্দা। এটি আগে ছিল না। পরবর্তী কালে মহাপুরুষ মহারাজের সুবিধার জন্য বারান্দা তৈরি হয়েছিল। দরজার মতো বড় সেই জানালাটির কাছে শ্রীশ্রীমা বসেছিলেন এবং সেখান থেকেই মঠের উঠানে অনুষ্ঠিত কীর্তনগান শুনেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠানে নাচ শুরু হয়ে যায়—মহারাজও নাচতে থাকেন। ভাবের ঘোরে তিনি বেসামাল হয়ে যাচ্ছিলেন—তিনি ভাবস্থ অবস্থায় পড়ে যাবার মতো হয়েছিলেন। বাবুরাম

মহারাজ তাঁকে ধরে ফেলেন এবং তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসেন। স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমে, এখন সূর্য মহারাজ যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরের ঠিক নিচের ঘরটিতে রাজা মহারাজকে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বাহ্যস্ফূর্তি হয় না। একজন গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে এই সংবাদ দিতেই তিনি নিচে নেমে আসেন এবং মহারাজের বক্ষ স্পর্শ করেন। শ্রীশ্রীমা স্পর্শ করতেই, মহারাজের বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। অবশ্য কেউ কেউ বলে যে, শ্রীশ্রীমা নিজ হাতে মহারাজকে একটু প্রসাদও দিয়েছিলেন—প্রসাদ পেয়েই তিনি ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ফিরে পান। যা হোক শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "রাখাল নাচতে নাচতে ভাবস্থ হয়ে পড়েছিল এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ আমি তার পিছনেই স্বয়ং ঠাকুরকে নাচতে দেখলাম।"

বুয়োনস-আয়ারসে আমাদের একজন সাধু (স্বামী বিজয়ানন্দ) দীর্ঘদিন ছিলেন, তিনি এখন প্রয়াত। যখন মহারাজ বারাণসীতে ছিলেন, তখন তিনিও সেখানে ছিলেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল পশুপতি। একদিন মহারাজ তাঁকে বলেন, "পশুপতি, তুমি তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করেছ?" পশুপতি মহারাজ প্রথমে এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। তিলভাণ্ডেশ্বর হচ্ছেন বৃহৎ আকারের শিবলিঙ্গ এবং পশুপতি মহারাজও বেশ মোটাসোটা মানুষ ছিলেন। সেজন্য রাজা মহারাজ তাঁকে বলেন, "তুমি কি তিলভাণ্ডেশ্বর দেখেছ?" সবাই একথা শুনে হেসে ওঠে। পরে পশুপতি মহারাজও এর মর্ম বুঝে হেসে ফেলেন। মহারাজ মন্তব্য করেন, "বুঝেছ, তবে দেরিতে।"

(উদ্বোধন ঃ ৮৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা)

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী দেবানন্দ

জীবনের প্রথমেই কম বয়সে হাতে পাই ছোট্ট একখানা ধর্মপুস্তিকা—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ'। বইটি এত ভাল লাগে যে বারবার পড়েও আশ মিটতো না। পরে ধীরে ধীরে ঠাকুর-স্বামীজীর আরো বই পাই এবং মনপ্রাণ দিয়ে পড়ি। সর্বধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত ও জ্বলন্ত বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যাঁকে দেখে আত্মহারা হয়েছিলেন, সেই 'ব্রজের রাখাল', ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রাজা মহারাজকে আমি প্রথম দর্শন করি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে, বেলুড় মঠে। তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর। মঠে তখন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ অনেকেই রয়েছেন।

ভগবানের আরাধনা করার আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সংসার ত্যাগ করে বেলুড় মঠে এসেছি জেনে পূজ্যপাদ মহারাজরা যেন খুশি হলেন। রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমার দিকে সস্নেহে তাকালেন, আমি তখন নির্ভয়ে বললাম, "মঠে আমাকে রাখতে হবে, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই।" রাজা মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই একা এলি কি করে? কে তোকে মঠের সন্ধান দিলে?" আমি বললাম, "একা আসিনি, আপনাদের বীরেন মহারাজের কাছ থেকেই সব সন্ধান নিয়েছি। তিনি আমার পিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গেই পালিয়ে এসেছি।" শুনে রাজা মহারাজ বললেন, "বেশ, তুই এঁদের সঙ্গে কথা বল, আমি পরে তোর সব কথা শুনবো।" এই বলে তিনি উপরে উঠে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ তখন আমার কয়েকটি কথা শুনে বললেন, "তোকে তো ধরে নিয়ে যাবে, কি করে থাকবি এই মঠে?" তখন বীরেন মহারাজ নিকটে থাকায় তিনি বললেন, "আমিও এই কথাই বলেছিলাম; কিন্তু ওর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেনেই সঙ্গে এনেছি।" এরপর বীরেন মহারাজ আমার পিতৃদেব, তাঁর সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং আমার সম্বন্ধে আরও কিছু কথা পূজ্যপাদ মহারাজদের বললেন। ব্যক্তিগত কথা বলে সেগুলির উল্লেখ করলাম না।

বীরেন মহারাজের সব কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "বেশ তো, সাধু হবে উত্তম কথা, তবে আরও কিছুকাল শাস্ত্রাদি পড়া ভালো। তাঁকে লাভ করতে হলে জ্ঞানবুদ্ধি থাকা চাই।" উত্তরে বললাম, "আমার শাস্ত্রবিদ্যার দরকার নেই, আপনাদের সৎসঙ্গে থেকেই প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ করতে চাই। আমি ফিরে যাব না।" বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আয়, একটা পথ দেখাচ্ছি; মঠেই থাকবি, আর ঐ... পণ্ডিতের টোলে শাস্ত্র পড়বি। পরে সাধু করে নেব। তিনি পড়াতে রাজি হলে তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।" এই বলে অদূরে ঐ পণ্ডিতের কাছে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ পণ্ডিতজী, যিনি আমার পিতৃদেবকে জানতেন, আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি মঠে ফিরে এসে সবই বললাম। আমার অশ্রুসিক্ত চোখ ও অন্তরের ব্যাকুলভাব দেখে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "বেশ মঠেই থাক, পরে দেশে গিয়ে আরও কিছুদিন পড়াশুনা করে চলে আসবি। তোর অদৃষ্ট ভালো, কেউ তোকে বেঁধে রাখতে পারবে না।"

বেলুড় মঠে কটা দিন বেশ আনন্দেই কাটলো। রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের অপার করুণা ও অসীম স্নেহের পরিচয় এবং তাঁদের অমূল্য উপদেশ পেয়ে ধন্য হলাম। তাঁদের অপার্থিব ভালবাসায় গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী, সেই ভালবাসায় আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হলাম।

একদিন রাজা মহারাজ উপরে তাঁর ঘরে আছেন জেনে আমি গিয়ে তাঁর দরজার পাশে দাঁড়াই। তিনি আমাকে দেখে কাছে ডেকে নিলেন। আমি প্রণাম করার পর কয়েকটি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে একাকী পেয়ে সরলভাবে সবই বললাম। তিনি সাগ্রহে সব শুনে বললেন, "তোর ভাগ্য ভালো, জন্মান্তরের পুণ্যবল আছে। তোকে কেউ রাখতে পারবে না সংসারে। ভগবানকে আশ্রয় ও ভরসা করে যারা ছোট কাল হতেই থাকে, তাদের আর ভাবনা কি? আমাদেরও আশীর্বাদ নিশ্চয়ই থাকবে। এবার তুই ফিরে যা, যখন ঘরে নেবার জন্য এত ধরাধরি করছে তখন গিয়ে আর কিছুকাল পড়াশুনা কর। পরে আবার তীব্র বৈরাগ্য হলেই সব ছেড়ে বের হবি, তোর কোন ভয় নেই।"

রাজা মহারাজের শুভাশীর্বাদ ও পদধূলি মাথায় নিয়ে নিচে নেমে এলাম। মঠের নির্জন, শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ এবং মহারাজদের দুর্লভ সঙ্গ ছেড়ে যেতে হবে ভেবে মর্মাহত হলাম।

পরদিন প্রাতে পূজনীয় মহারাজদের প্রণাম করে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেশে

যাত্রা করলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মহারাজদের নির্দেশমতো বৎসরাধিক কাল পিতৃদেবের কাছে পড়ি। সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একাকী রিক্তহস্তে ১৯১৬ সালের আগস্টে কামাখ্যায় চলে যাই। পরে ১৯১৭ সালের আগস্টে হরিদ্বারে যাই। উত্তরাখণ্ডের এক প্রাচীন মহাত্মার নির্দেশে কনখল রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে উপস্থিত হই। আশ্রমাধ্যক্ষ কল্যাণানন্দ মহারাজ আমার সব কথা শুনে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। নিশ্চয়ানন্দ মহারাজও সব কথা শুনলেন। এঁরা দুজনেই স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য।

একদিন কল্যাণানন্দ মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন, "১৯১২ সালে এখানে রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও হরি মহারাজ এসেছিলেন, কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে এই সেবাশ্রমে ৺দুর্গাপূজা করান। পূজ্যপাদ মহারাজরা উপস্থিত থাকায় ঐ সময় সর্বদা একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া এবং আনন্দস্রোত চলেছিল। ঐ উপলক্ষে সাধুদের এক বিরাট সমষ্টি-ভাণ্ডারাও হয়। পূজাপাঠ, ভজনকীর্তনে এক অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। পূজার তিন দিনই যেন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল। মহারাজরা সর্বদাই এক দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। সেই ধ্যানগম্ভীর ভাবময় অবস্থা দেখে সবাই মুগ্ধ হতেন। ওঁদের ভিতর ঐশী শক্তির বিকাশ সবাই অনুভব করতেন।"

আর একদিন কল্যাণানন্দ মহারাজ রাজা মহারাজের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। সেগুলি আমরা এখন প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে পাই। তাই বাহুল্যভয়ে সেগুলির পুনরুল্লেখ করলাম না।

রাজা মহারাজের সম্পর্কে এইসব অপূর্ব কথা শুনে আমার মনপ্রাণ আনন্দে পূর্ণ হলো। অন্তরে তীব্র আকাঙ্ক্ষাও হলো রাজা মহারাজকে পুনরায় দর্শন করার। আমার শুভ সংকল্প জেনে কল্যাণানন্দ মহারাজ যাবার জন্য আমাকে অনুমতি দিলেন। বললেন, "রাজা মহারাজ মাঝে মাঝে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরেও থাকেন। বলরাম মন্দির ঠাকুর, মা ও তাঁদের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদদের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত। ঐ বাড়ির সবাই ঠাকুর, মা ও মহারাজদের পরম ভক্ত ও সেবক। রাজা মহারাজকে মঠে না পেলে বলরাম মন্দিরে গিয়ে দর্শন করবে।"

অবশেষে ইংরাজী ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে কনখল হতে প্রথমে ৺কাশীধামে গিয়ে পূজ্যপাদ হরি মহারাজের দর্শন ও সৎসঙ্গলাভ করি। পূজ্যপাদ লাটু মহারাজেরও দর্শন এই সময় ভাগ্যে ঘটে। দুটি মাস হরি মহারাজজীর সঙ্গ ও কিঞ্চিৎ সেবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হই।

অক্টোবর মাসে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ৺কাশী হতে বেলুড় মঠে আসি। রাজা মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরেই ছিলেন। পরদিন পথের সন্ধান নিয়ে বাগবাজার বলরাম মন্দিরে যাই তাঁকে দর্শন ও প্রণামাদি করতে। গিয়ে জানলাম তিনি উপরের হল ঘরটিতে একাকী বসে আছেন। আমি তাঁর সেবকের অনুমতি নিয়ে উপরের হলে গিয়ে রাজা মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেই বললাম, "আমি কনখল মিশন থেকে কাশী আশ্রম হয়ে আসছি আপনাকে দর্শন করতে।" তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি আমাকে বিশেষভাবেই আকর্ষণ করলো। তাঁর তেজঃপুঞ্জ আকৃতি, সুন্দর প্রসন্ন আনন এবং অন্তর্মুখী দৃষ্টি দেখে মনে হলো যেন শান্ত সমাহিত অবস্থা। মাথায় হাত দিয়ে তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। তাঁর দিব্যস্পর্শে এক অপার্থিব আনন্দে আমি যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এত দেরি করে এলি কেন? কেমন আছিস?" আমি সংক্ষেপে সবই বললাম। তিনি বললেন, "তোর কথা ভুলিনি, এবার দীক্ষা নিয়ে নে। বল, মার থেকে নিবি, না আমার থেকে নিবি? কি ইচ্ছা তোর?" তখন মা জয়রামবাটীতে, ওখানে যাতায়াতও সহজ নয় ভাবছি। এমন সময় আমার অন্তরের ইচ্ছা বুঝেই মহারাজ বললেন, "বেশ তো, তোকে আমিই মন্ত্র দেব, ভাবনা কি? জয়রামবাটী যাতায়াত এখন খুবই কষ্টকর। তুই মঠে গিয়ে থাক, আমি পাঁজি দেখে শুভদিনেই মঠের ঠাকুর ঘরে তোকে দীক্ষা দেব।"

তাঁর অযাচিত কৃপার কথা ভেবে আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরে গেলো। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মঠে ফিরে এলাম। রাজা মহারাজের কৃপা পাবো জেনে মঠের পূজনীয় মহারাজরাও আনন্দিত হলেন। আমিও দীক্ষার শুভদিনের প্রতীক্ষায় মঠের সুন্দর শান্ত পরিবেশে মনের আনন্দে নিত্য ঠাকুরদর্শন ও সাধুসঙ্গাদি করতে থাকলাম।

রাজা মহারাজ কদিন পর এসে মঠের পুরাতন ঠাকুরঘরে আমাকে মহামন্ত্র দান করলেন। দীক্ষা দিতে আসনে বসেই তিনি যেন ধ্যানস্থ হলেন। দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ তাঁর সৌম্য সহাস্য ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখে আমিও অব্যক্ত আনন্দে আত্মহারা হলাম। এক দিব্যভাবে বিভোর হয়েই তিনি ঠাকুরের পূজা করলেন এবং আমাকে দীক্ষা দিলেন। কিভাবে জপধ্যান করতে হবে সবই বলে দিলেন। আশীর্বাদ করলেন, "তোর অভীষ্ট পূর্ণ হোক, তুই সেই অমৃতের অধিকারী হ, ধ্যানজপে ডুবে যা।" ঐদিন মহারাজ পরে আরও দু-একজনকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষার দিন বিকালে রাজা মহারাজকে প্রণাম করতেই বললেন, "ভুলবি

না, ভগবানলাভই জীবনের একমাত্র আদর্শ। তিনি সর্বদা সর্বত্রই বিরাজমান। খুব মনপ্রাণভরে তাঁকে ডাকবি। তাঁর কাছে যা চাইবি তাই পাবি, তবে যারা তাঁকে চায় তারাই বুদ্ধিমান। যার যেমন ভাব তাঁর তেমন লাভ। মনটাকে এমনভাবে তৈরি করবি যাতে তাঁর ধ্যান, তাঁর স্মরণ-মনন ছাড়া অন্য কোন চিন্তা বা বাসনা মনে স্থান না পায়। খুব আকুল প্রাণে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবি, জানবি সরল পবিত্র হৃদয়ই তাঁর আসন। কলিতে যোগযাগের চেয়ে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। জপের ফলেই মন স্থির হয়ে ইষ্টতে লয় হয়। যখন বহুজন্মের পুণ্যবলে বেরিয়ে আসতে পেরেছিস, তখন সব চিন্তা ছেড়ে তাঁকেই জোর করে ধর। তিনিই সব ভুলভ্রান্তি শুধরে তাঁর দিকেই টেনে নেবেন। কখনো হতাশ হবি না, শরীর মন শুদ্ধ নিষ্পাপ করতে তাঁর ধ্যান-জপ, ভজন ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নেই। জানবি সন্ধিক্ষণ ও নিশীথ রাতের মতো তপস্যার ভালো সময় আর নেই। ঐ সময় সুষুন্না নাড়ী চলে—অর্থাৎ দুই নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তাই মন সহজেই স্থির হয়।” কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ যেন ভাবস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর সুন্দর দিব্যকান্তি ও অন্তর্মুখী ভাব দেখে আমি তাঁর ধ্যান করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, “এবার যা, আমি একটু কাজকর্ম করি।”

বেলুড় মঠে আর একদিনের ঘটনা। রাজা মহারাজ দুপুরে খাবার পর বিশ্রাম করবেন এমন সময় আমাকে তাঁর দরজার পাশে দেখে বললেন, “কিরে মঠে তোর কেমন লাগছে? জপ-ধ্যান হচ্ছে তো?” আমি বললাম, “আপনার আশীর্বাদে ভালই লাগছে, বেশ আনন্দেই আছি। তবে জপ সম্বন্ধে আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে—মালায় বা করে সংখ্যা রেখে জপ করার চেয়ে আমার শুধু মানস জপই ভালো লাগে। মনে মনে শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্বদাই জপ করা অভ্যাস করতে পারলে সংখ্যা রেখে জপ করার দরকার আছে কি?” মহারাজ বললেন, “বেশ কথা, তোর ভালো লাগলে ঐভাবেই নিত্য জপ করবি। যত বেশি সময় পারিস, তাঁর স্মরণ-মনন করে যাবি। মালা বা করে নাই বা জপ করলি। উদ্দেশ্য সংখ্যা রাখা নয়, যত বেশি তাঁর স্মরণ-মনন করতে পারা যায়, ততই ভালো। যার মালা বা করে সুবিধা হয়, সে তাই করবে—বাধা নেই। ঠাকুর বলতেন, ‘পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান। ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার স্থান’।”

এ কথার পর মহারাজ শুয়ে পড়লেন। বললেন, “তুই একটু আমাকে টিপে দে পিঠের দিকটা।” আমি মনের আনন্দে জোরে জোরে টিপতে শুরু করলাম।

জীবনে পূর্বে কোনদিন কাউকে এভাবে সেবা করার সৌভাগ্য হয়নি। তাই দুহাত দিয়েই ভয়ে ভয়ে টিপে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে আমার মুখের ঘাম মোছার জন্য একহাতেও টিপতে হচ্ছে, কারণ, ঘাম যদি ওঁর গায়ে পড়ে মহা অপরাধ হবে। কিছু পরে মহারাজ আমার অবস্থা বুঝেই বললেন, "তোর কষ্ট হচ্ছে, বড় নরম হাত তোর, ঘেমেও যাচ্ছিস। কাউকে কোনদিন টিপিসনি মনে হয়। তুই যা, আমার সেবকদের একজনকে ডেকে দিয়ে তুই গিয়ে বিশ্রাম কর।" অযাচিতভাবে গুরুসেবার সৌভাগ্য লাভ করেও বঞ্চিত হলাম ভেবে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে বিদায় নিলাম।

রাজা মহারাজের নির্দেশমতো আমি কিছুকাল মঠেই থাকলাম। নিত্যই পূজনীয় মহারাজদের দর্শন, প্রণাম ও সৎসঙ্গলাভের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করেছি। তাঁদের কত আশীর্বাদ ও আশ্বাসবাণী লাভ করেছি, যা আজও স্মরণ করি সকৃতজ্ঞ অন্তরে। অমৃতের আস্বাদ পেয়ে তাঁরা পূর্ণ! আমাদের কল্যাণের জন্য কতভাবেই না উপদেশ দিতেন! ধর্মপ্রসঙ্গ করতে করতে যেন এক দিব্য ভাবরাজ্যে চলে যেতেন। ওঁদের পূতসংস্পর্শে এক অনির্বচনীয় শান্তি অনুভব করতাম।

মঠে তখন ঠাকুরঘরে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে গিয়ে সাধুরা ধ্যান-জপে বসতেন। দেড়-দুঘণ্টা ধ্যান-জপ করে পরে রাজা মহারাজের ঘরে গিয়ে সমবেতভাবে ভজন-কীর্তন করতেন, মহারাজ মাঝে মাঝে ধর্মোপদেশও দিতেন। তারপর সবাই পরম তৃপ্তি লাভ করে মঠের কাজকর্মে যোগ দিতেন।

রাজা মহারাজ কয়েকদিন মঠে থেকে আবার বলরাম মন্দিরে চলে গেলেন।

দীক্ষার পরে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, "মা, ঠাকুর, স্বামীজী এবং রাজা মহারাজ—এঁরা সবাই এক, মহাভাগ্যের ফলে রাজা মহারাজের কৃপা তুমি পেলে। নিত্য খুব জপ-ধ্যান প্রার্থনা করবে। সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকবে...।"

কিছুকাল পরে রাজা মহারাজ উড়িষ্যায় চলে যাওয়ায় তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি দিলেন আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করার জন্য। আমাকেও পত্রে জানালেন এ বিষয়ে। ১৯২০ সালের জানুয়ারি, বাংলা ১৩২৬ পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, স্বামীজীর শুভ জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করলেন।

কিছুদিন মঠবাসের পর মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গিয়ে আবার সেবাকার্যে ব্রতী হলাম। পূজা, পাঠ, সেবা ও ধ্যান-জপাদিতে দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটতে লাগলো।

১৯২১-এর জানুয়ারি (বাংলা ১৩২৭) রাজা মহারাজ ৺কাশীধামে এসেছেন জেনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবতিথি-উৎসবের পূর্বেই তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কনখল থেকে কাশী গিয়ে আমি সেবাশ্রমে উঠি। রাজা মহারাজ তখন কাশী অদ্বৈতাশ্রমে রয়েছেন, পৌঁছেই তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানালাম। তিনি কনখল মিশনের সংবাদ এবং কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পরে গিয়ে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ ও অন্যান্য পূজ্যপাদ স্বামীজীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম। দেখলাম বিভিন্ন কেন্দ্রের বহু ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসব্রত নেবার জন্য এসেছেন। পরদিন হঠাৎ কানে এলো মহারাজ নাকি বলেছেন, "যারা সন্ন্যাস নিতে এসেছে তাদের কাউকেই সন্ন্যাস দেওয়া হবে না।" এজন্য সবাই ব্যথিত ও চিন্তিত। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। হঠাৎ আমাকে একাকী পেয়ে পূজনীয় শুদ্ধানন্দ মহারাজ ও জগদানন্দ মহারাজ বললেন, "তোমার একটা শুভ সংবাদ আছে। মহারাজ তোমাকে সন্ন্যাস দেবেন, তুমি তৈরি হও। যা করতে হবে, না হবে—আমাদের কাছ থেকে সব জেনে নেবে।" আমি তো অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কৃপার কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। কারণ অন্তরে একটু ইচ্ছা পোষণ করলেও সন্ন্যাসের কথা মহারাজকে আমি জানাইনি—নিজেকে অযোগ্য ও অনধিকারী ভেবে। তাই উত্তরে বললাম, "আপনারা বুঝি আমায় পরীক্ষা করছেন?" ওঁরা হেসে বললেন, "বেশ, মহারাজের কাছে গেলেই তুমি জানতে পারবে।" পরদিন প্রাতে একাকী রাজা মহারাজকে প্রণাম করতেই বললেন, "তুই তৈরি হ, ঠাকুরের তিথিপূজার দিনই তোকে সন্ন্যাস দেব। সব জেনে বুঝে নে শুদ্ধানন্দের কাছ থেকে।" আমি তো আনন্দে আত্মহারা হলাম! অযাচিতভাবে তাঁর এই অহৈতুকী কৃপা! পূর্বে জেনেছিলাম দীর্ঘদিন যাতায়াত করে ব্যাকুলভাবে ধরলেই তবে তিনি মন্ত্রদীক্ষা বা সন্ন্যাস দিতেন উপযুক্ত বোধ করলে। সহজে তিনি দীক্ষাদি দিতে রাজি হতেন না। বহু-বৎসর চেষ্টা করেও অনেকের ভাগ্যে তাই এ সুযোগ হতো না। শুনেছি মহারাজ বলতেন, "মন্ত্র দেবার ও নেবার পূর্বে গুরুশিষ্যের পরস্পরকে পরীক্ষা করা উচিত, নচেৎ পরে ঠকতে হয়। মন্ত্র নিয়ে অনেকেই জপ-ধ্যান করে না। এজন্য যাকে তাকে দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়।" যাদের প্রবল বিষয়ানুরাগ রয়েছে দেখতেন, মহারাজ তাদের মন্ত্র না দিয়েই ফিরিয়ে দিতেন—সাধু করা তো দূরের

কথা! ইংরাজী ১৯২১-এর মার্চ মাসে, বাংলা ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথিতে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে রাজা মহারাজ আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করায় পরমানন্দের অধিকারী হলাম!

সন্ন্যাসজীবন লাভ করতে পারায় অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ ও রাজা মহারাজের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আমার মতো অযোগ্য ও অনধিকারীর আর অন্য কিছুই সম্বল ছিল না। অযাচিতভাবে পাওয়া মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাসদীক্ষার শুভ দিন দুটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। রাজা মহারাজের অফুরন্ত দয়ার কথা কখনই ভুলতে পারবো না। তাঁর চরণে শুধু প্রার্থনা জানালাম, যেন তাঁর ধ্যানে আজীবন ডুবে থাকতে পারি, রাগ-দ্বেষ-অহংকার যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমি যেন অমৃতত্ব লাভ করে জীবন ধন্য করতে পারি।

১৯২১ সালে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শিবচতুর্দশীর দিনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের পুরানো ফটোখানি পরিবর্তন করে যখন নতুন প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়, তখন রাজা মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং আশ্রমের অন্যান্য সাধুরা—"এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, (তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে॥"—এই গানটি গাইতে গাইতে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে নাচতে এক অপূর্ব-ভক্তিপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন। সেই দিব্য দৃশ্যের স্মৃতি আজও আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে বিভিন্ন দিনে কাশীতে রাজা মহারাজকে সাধুভক্তদের যেসব উপদেশ দিতে শুনেছি, সেগুলির সারাংশ ঃ "তোমরা জপ-ধ্যান একদিনও বাদ দেবে না, মন চতুর্দিকে ছোটাছুটি করলেও তাকে বিবেক-বিচারের সাহায্যে টেনে এনে ভগবানের আরাধনায় লাগাবে, কখনও নিরাশ হবে না; ধৈর্য ধরে নিয়মিত সাধন-ভজন করে যাবে, জানবে কর্মের ফল অনিবার্য। সাত্ত্বিক আহার, সৎসঙ্গ এবং ব্রহ্মচর্যপালনের কথা ভুলবে না। ত্যাগ-বৈরাগ্য, সাধন-ভজন না থাকলে সাধুদের উপদেশ ধারণা হয় না। সাধুদের ভাব ও শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে হলে ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা চাই। মন শুদ্ধ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। সব বাসনা ও আসক্তি মন থেকে উঠে যাওয়া চাই। শুধু থাকবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে লাভ করার। সংসারে বিতৃষ্ণা না এলে তাঁর

উপর টান আসে না। তিনি অন্তর্যামী, তিনি বিচার করেন মন দেখে। তাই মন-মুখ এক করে সরল-ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকতে হবে। ভগবানে যত মন যাবে, তত রিপুর তাড়না কমে যাবে। কর্তৃত্বাভিমান ও মানযশের আকাঙ্ক্ষা মহাবন্ধন সাধুর পক্ষে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও নির্ভর করে মানুষ যদি মনে-প্রাণে খাটে, তবে তার সব অভাব, দুঃখ, ব্যথা ভগবানই দূর করে দেন। তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান যারা আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকে—তাঁর শরণাগত হয়। ভয়, সংশয় ও দুর্বলতা মন থেকে দূর করে দেবে। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লক্ষ জন্মের পাপ এক মুহূর্তেই কেটে যায়। কত মহাপাতকী এই নামের বলেই উদ্ধার হয়ে গেছে। শুধু চাই ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

"মনটাকে তৈরি করো এমনভাবে যাতে কোন কামনা-বাসনা মনে স্থান না পায়। অবশ্য এগুলি ত্যাগ করা সহজ নয়। যারা ভাগ্যবান—যাদের জন্মজন্মের পুণ্যবল আছে তারাই পারে মনকে বশীভূত করতে। ভগবৎকৃপা ও নিজের তীব্র ইচ্ছা থাকলেই সব হয়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগ-বৈরাগ্য না থাকলে তাঁর দিকে ঠিক ঠিক এগুনো যায় না। ভগবানে অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা এলেই ব্রহ্মচর্যপালন করা সহজ হয়। ধর্মপথে উন্নত হতে হলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের উপর নিষ্ঠা রাখা চাই, নচেৎ অগ্রসর হওয়াই কঠিন। নিত্যনিয়ত নিজের মনকে সদ্বিষয়ে নিযুক্ত রাখতে হবে। সাধুসঙ্গ, জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ যত করবে ততই মনের মলিনতা কেটে গিয়ে মন একাগ্র হবে। বিবেক-বিচার জাগ্রত থাকলে কিছুই অসাধ্য বা কষ্টকর নয়। আসক্তি ও মায়ামোহে জীবনের আদর্শ ভুলে গিয়েই মানুষ বারবার জন্মমৃত্যুর যাতনা ভোগ করছে। এমন কাজ করতে হবে যাতে এই জন্মমৃত্যু-যাতনার হাত হতে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আত্মজ্ঞান বা ভগবানলাভ ছাড়া জন্মমৃত্যুর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। অহঙ্কার-অভিমান, মান-যশ ও ভোগবাসনা ছেড়ে যতদিন না তাঁকে আশ্রয় করবে ততদিন সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির কোনই আশা নেই। আসল আনন্দ পেতে হলে ঐ সব ক্ষণিক আনন্দের লোভ ছেড়ে ষোলআনা মন ভগবানকেই দিতে হবে। জাগতিক আনন্দের পিছনে নিরানন্দ আসবেই। মনে যখন যেটা উঁকি মারবে তাকে তখনই দূর করতে হবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা। আসক্তি ও অহঙ্কার থাকতে কিছুই হবে না। মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ। অনেক তপস্যার ফলেই সূক্ষ্ম বাসনা-কামনা জয় করা যায়। ত্যাগ ও সংযমের অভাবেই জিহ্বা অনেক অনর্থ ঘটায়। মন বশে না আসা পর্যন্ত নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলতেই হবে। তাঁতে অনুরাগ ভালবাসা না এলে মনস্থির করা কঠিন। প্রথমে মনটাকে তমঃ, রজঃ

থেকে শুদ্ধ করতে হবে, সত্ত্বগুণে নিতে হবে। পরে তপস্যার ফলে কামক্রোধাদি দমন করা খুবই সহজ হয়। মনকে সর্বদা উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আদর্শে ডুবিয়ে রাখতে হবে, নচেৎ শুধু গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়ালে কিছুই হবে না। মন বসুক আর নাই বসুক সর্বদাই চেষ্টা করে যেতে হবে। ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা থাকলেই মনের শক্তি বাড়বে। নির্জনে একমনে ধ্যান-জপ যতই করবে ততই ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হবে। তাঁর দিকে মন বেশি গেলেই আনন্দ বেশি পাবে। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, তাঁর কৃপা তত অনুভব করবে।”

সাধুদের ভিতর ধ্যান-জপ, ত্যাগ-তপস্যা, জ্ঞান-বৈরাগ্য ও সেবার ভাব যাতে দিন দিন বাড়ে, তার দিকে রাজা মহারাজের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর এবং মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ হয়েও দীর্ঘকাল নিজেও ধ্যানধারণা ও কঠোর তপস্যায় কাটিয়েছেন। সে তিতিক্ষা ও কঠোরতার তুলনা নেই।

মহারাজ বলতেন, “কর্ম জীবনের লক্ষ্য না হলেও চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম সবাইকেই করতে হবে। ভগবানলাভের জন্য বারো-আনা মন সাধন ভজনে রেখে বাকি চার আনা মন কর্মের দিকে দিলেই যথেষ্ট। দুর্লভ মানবজীবন লাভ করে যদি ভগবানলাভের চেষ্টা না থাকে, তবে সে জীবন বৃথা। যারা এই দুর্লভ জীবন হেলায় হারায় তাদের মহা দুর্ভাগ্য। বিবেক-বিচার, জ্ঞান-ভক্তি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যাদের আছে তারাই প্রকৃত মানুষ। সকল সুখশান্তির মূল আনন্দস্বরূপ ভগবানকে দূরে ঠেলে রেখে যারা মিথ্যা তুচ্ছ অসার বস্তুর পিছনে জন্মজন্ম ছোটে—তাদের দুঃখ, ব্যথা, অশান্তির শেষ নেই। ব্যাকুলতা ও অনুতাপ এলেই শতজন্মের ময়লা মন থেকে ধুয়ে যায়। ভোগবাসনা শেষ না হলে তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না।” তিনি বলতেন, “যতই কাজ থাক না কেন তাঁর স্মরণ মনন করতে যেন ভুল না হয়। বাজে চিন্তায় বা বড় বড় প্রশ্নে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবে না। জানবে সুস্থ শরীরই সাধন-ভজনের সহায়। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত নির্মল করা, তা যদি না হয়, তাহলে বুঝবে তোমার ধ্যান-জপ ঠিক হচ্ছে না। মনকে বশে আনাই লক্ষ্য। যার যত বৈরাগ্য তার তত ভিতরে শান্তি, আর যার যত অনিত্য পদার্থে আসক্তি তার ততই ভিতরে অশান্তি। তাঁকে ভুলে মানুষ যতই ‘আমার’ ‘আমার’ করে, ততই দুঃখ, ব্যথা বাড়ে। তাই যারা অনাসক্ত ও তাঁর শরণাগত, তারাই প্রকৃত আনন্দে থাকে। তারা জানে তিনিই সব করছেন—আমরা কিছুই না—শুধু নিমিত্তমাত্র।”

কাশীতে রাজা মহারাজের ঘরে সাধুরা যখন নিত্য প্রণাম করতে যেতেন,

তখন তাঁর মধুর সঙ্গলাভে এক অপার শান্তি সবাই অনুভব করতেন। তপস্যা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তির কত কথা তাঁরা তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেতেন। তাঁর হৃদয়স্পর্শী সরল সুন্দর উপদেশগুলির ভিতর যেন সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আমরা দেখতে পেতাম।

মহারাজের দূরদর্শিতা এবং মানুষ চেনার শক্তি ছিল অসাধারণ। দৃষ্টিমাত্রেই সবার বর্তমান ও ভূত-ভবিষ্যৎ সবই যেন জানতে পারতেন—বলেও দিতেন কখন-কখন। কে কার গুরু, কার কি মন্ত্র সবই বুঝে নিতেন দেখা মাত্র। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহু ঘটনায় আমরাও পেয়েছি। সময়বিশেষে একটু ফস্টিনস্টি করেও ভক্ত ও অন্তরঙ্গদের আনন্দ দিতে দেখেছি। অনেক সময় হাস্য-পরিহাস, গল্প ও রসিকতাদির অবতারণা করেও মহারাজকে আত্মগোপন করে থাকতে দেখা গিয়েছে।

মহারাজ ও তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে পরস্পর যে অপার্থিব প্রেম ও অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় পেয়েছি তা ভাবতে গেলেও আনন্দে বিভোর হই। ওঁদের ভাবাবস্থা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। শুনেছি, মহারাজ কত উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কত অলৌকিক দর্শন ও ভাবসমাধি হতো, মুখমণ্ডলে তখন এক দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হতো, অনেকেই অভিভূত হতেন তখন তাঁকে দর্শন করে।

অনেক সময়েই দেখা যেতো, মহারাজ আত্মস্থ, নির্বিকার, নিমীলিতনয়ন—যেন ধীরে ধীরে গভীর সমাধিতে মগ্ন হচ্ছেন। ওঁর সেই ভাবাবস্থা দেখে আমাদের মনে হতো শাস্ত্রের সেই বাণী—

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥

[জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিতে নিত্যবোধস্বরূপ, কেবলানন্দরূপ, নিরুপম, অসীম, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, সীমাহীন আকাশসদৃশ, নিষ্কল, নির্বিকল্প, অচিন্ত্য পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।]

কখনো দেখতাম, সরল পবিত্র শিশুদেরই মতো তাঁর সরলতা ও বালকভাব। আবার কখনো দেখা যেত ধর্মপ্রসঙ্গ করতে করতে যেন কোন অপার্থিব রাজ্যে চলে গিয়েছেন। তাঁর সর্বতোমুখী অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বুদ্ধির

পরিচয় পেয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও বিস্মিত হতেন। পূজা-পাঠ বা মন্দিরাদি দর্শন করতে করতে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। তিনি উপস্থিত থাকলে রামনাম-সংকীর্তন ও কালী-কীর্তনের সময়ে এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেন আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হতো। আজও সেসব স্মৃতি আমাদের প্রাণে কত আনন্দ দান করছে!

নিত্য সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরাত্রিক ও জপ-ধ্যানাদির পর বেলুড় মঠে ভিজিটার্স-রুমে গিয়ে যাতে সাধুরা সমবেতভাবে ভজন-কীর্তনাদি করেন, তার জন্যও মহারাজের বিশেষ আগ্রহ দেখা যেতো। নিজেও কখনো যোগদান করে সকলকে আনন্দসাগরে ভাসিয়ে দিতেন। সে অপূর্ব দৃশ্য ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

১৯১৯ সালে মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। শিবক্ষেত্র এই গুপ্ত বারাণসীতে তাঁর মঠ স্থাপন করার উদ্দেশ্য সাধুরা এই নির্জন মনোরম তীর্থে থেকে ধ্যান-জপ করবে। নানা দেশ থেকে ভাল ভাল ফল-ফুলের গাছ এনে মহারাজ লাগিয়েছেন। তাঁর খুবই প্রিয় ফল-ফুলের বাগান। দেখলেই মনে হতো যেন সেই প্রাচীন কালে মুনি-ঋষিদের তপোবন। ফল-ফুল, শাক-সবজি, গাছপালার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহারাজ বলতেন, "ওদের সেবাযত্ন করলে ওরা মানুষের মতন নেমকহারামী করে না। ওরা ছায়া ও ফল-ফুলাদি দিয়ে আশীর্বাদ করে, আর দেহমনকেও আনন্দে রাখে।"

ধর্মপথের পথিককে কিভাবে ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে মহারাজ যা বলতেন তার সারমর্ম ঃ "ধর্মপথ অতি দুর্গম। যাদের সৎ বাসনা জেগেছে তাদের উপর ভগবানের অপার করুণা আছে, জানবে। সদিচ্ছা, সদ্‌ভাব লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তো দু-এক জনারই হয় তাঁর আশীর্বাদে। তাঁরা ক্ষণিক সুখলাভের জন্য অনন্ত সুখকে কখনো বলি দেন না। এত দুর্লভ মানব-জীবন পশুর মতো খেয়ে ঘুমিয়ে কতকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করার জন্য নয়। তাঁকে ঠিক ঠিক চাইলে আসক্তি ও ভোগবাসনা ত্যাগ করতেই হবে। আর এ সংসার ভোগ করতে হলে ঈশ্বরকে ছাড়তে হবে; দু-নৌকায় পা দিলেই বিপদ। ভুল বুঝেই মানুষ ভোগের পিছনে ছুটে ছুটে দিন দিন পশু হতে চলেছে। তাই পশুত্ব দূর করে প্রকৃত মানুষ হবার জন্যে মনটাকে নিত্য নিয়ত কশাঘাত করতে হবে। সৎসঙ্গ এবং বিবেক-বিচার লাভের জন্য সর্বদাই চেষ্টা চাই। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এবং বিচার-বৈরাগ্যের দ্বারা জোর করে মনকে বশীভূত করতে

হবে। এজন্য চাই অদম্য অধ্যবসায় ও সাধুসঙ্গ। মনে-প্রাণে যত তাঁর নাম করবে দেহমন ততই শুদ্ধ হবে। ইন্দ্রিয়গুলিও আপনিই সংযত হবে। চিত্ত অশুদ্ধ থাকলে তাঁর কৃপালাভ করা যায় না। কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলি সংযত করতে পারলেই ধ্যান-ধারণা করা সম্ভব হয়। ওগুলি দমন করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। বিবেক-বিচার, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও ধৈর্য না থাকলে উন্নত হওয়া যায় না। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন কখন শেষ হবে তা যখন কেউ বলতে পারে না, তখন পরপারের সম্বল সংগ্রহ করতে কালবিলম্ব করা মহামূর্খতা। আর এও সত্য, সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না পেলে ভগবান লাভ করা অসম্ভব। তাঁর জীবন দেখে, তাঁর উপদেশ শুনে জীবন তৈরি করতে হবে। ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা না থাকলে তাঁদের ভাব বা উপদেশ কিছুই নিতে পারবে না। নিজের বা অপরের কল্যাণ করা তখনই সম্ভব যখন নিজের চরিত্র ঠিক ঠিক তৈরি হবে। সর্বপ্রথম অহঙ্কার-অভিমান দূরে রেখে তাঁর শরণাগত হওয়া চাই। ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ যাতে বাড়ে, তার জন্য ভগবানের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতে হবে। মায়ামোহ, আসক্তি যাতে জন্মজন্ম দুঃখ না দেয়, তার জন্য কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হবে। দুঃখ-ব্যথার পারে গিয়ে অনন্ত সুখ লাভ করার এ ছাড়া অন্য পথই নেই। তাঁর বলে বলীয়ান না হলে কারো শক্তি নেই এই মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার।"

সব কাজের মধ্যেও মহারাজকে সর্বদা অন্তর্মুখী, অনাসক্ত ও নির্বিকার থাকতে দেখা যেত। নির্বিষয় মনই যে মুক্তির কারণ তা বেশ অনুভব করতাম মহারাজের জীবন দেখে। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" ভগবানকে পেয়ে আনন্দে ভরপুর থাকায় অন্য কিছুরই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মহারাজ দুজন সাধুকে ও কয়েকজন ভক্তকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"গরুকে ভাল করে না খাওয়ালে যেমন ভাল দুধ দেয় না তেমনি মনকেও উত্তম খাদ্য না দিলে সে শান্ত বা সংযত হয় না। মনের উত্তম খাদ্য হচ্ছে সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, ধ্যান-জপ, পূজা-পাঠ ও প্রার্থনাদি। নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে সাধনভজন করলেই কৃতকার্য হওয়া যায়। এই জীবনের কিছু স্থিরতা নেই। তাই সময় থাকতেই উঠে পড়ে লাগতে হবে, পরে করার আশা ছেড়ে। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন।' দুঃখ-ব্যথা, জন্ম-মৃত্যুর পারে যেতে হবে, অমৃতের আস্বাদ পেলে চিন্তা-ভয়ের আর কারণ থাকবে না। তাঁর আস্বাদ পেলে এ মরজগতের ভোগসুখ সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে। ভগবান লাভ না হলে তো দুর্লভ মানবজীবন বৃথাই গেল। এ সংসারের কোন কিছুতেই সেই নিরবচ্ছিন্ন স্থায়ী

আনন্দ পাবে না। তাই সময় থাকতে ঠিক রাস্তা ধরে এগুতে হবে। এজন্য চাই আত্মবিশ্বাস এবং অদম্য তীব্র পুরুষকার। কালে বা সময় হলে হবে বলে বসে থাকলে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হবে। জীবনের ভাল সময়টা গোলমালে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে যারা ধর্ম করতে চায়, তারা নিজেদেরই ঠকায়। তাদের মতো মূর্খ আর কে আছে!"

কাশীধামে রাজা মহারাজকে একদিন একাকী পেয়ে নিবেদন করলাম, "আপনার আশীর্বাদ ও অনুমতি পেলে আমি হিমালয়ে গিয়ে কিছুকাল তপস্যা করে জীবন উন্নত ও ধন্য করতে চাই। আপনার কৃপাশিস না পেলে আমার সাধন-ভজন, তপস্যা কিছুই সার্থক হবে না। হিমালয়ের ভাবগম্ভীর পরিবেশ ও নির্জনতার কথা অনেক শুনেছি—তাই নিঃসঙ্গভাবে একাকী থেকে তাঁর আরাধনা করতে চাই, আপনি দয়া করে অনুমতি দিন। এই আমার প্রার্থনা। ছেলেবেলা থেকেই কাজকর্মের চেয়ে নির্জনে ভগবানের আরাধনা করার আকাঙ্ক্ষাই আমার বেশি। আমার ভাগ্যে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা, আপনিই জানেন।"

মহারাজ আমার কথাগুলি শুনতে শুনতে যেন একটু ভাবস্থ হয়ে গেলেন। কিছু সময় পরে বললেন, "বেশ কথা, কনখল সেবাশ্রমের সেবা-পূজাদির কাজ আর কিছুদিন করে পরে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা কর। হিমালয় মহাপবিত্র তপস্যার স্থান। সাধন-ভজন ছাড়া চরম সত্যের পথে কেউ এগুতে পারে না। অহংকার ও কামনাবাসনা থেকে মুক্ত হতে পারলেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। এজন্য চাই তীব্র ব্যাকুলতা, বিবেক-বৈরাগ্য ও পুরুষকার। মনে রাখবি, যে দিনটা যায় সে দিনটা আর ফেরে না। তাই সময়ের সদ্ব্যবহার করবি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কিছুই হয় না। বিবেক-বিচার প্রতি মুহূর্তে জাগ্রত রাখতে হবে। ধ্যান-জপ, তপস্যার নামে যারা আলস্য, জড়তা ও কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেয়—তাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। কাজের ভিতর যথার্থ আনন্দ পেতে হলেও ভগবৎপ্রেমের আস্বাদ পাওয়া চাই, নচেৎ কর্মেও শান্তি নেই—বন্ধন বেড়েই চলে। তাই জ্ঞান-বৈরাগ্য ও সাধন-ভজনের অভাবে সাধুরা পর্যন্ত অহঙ্কার-অভিমান, যশ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে মত্ত থাকে। সব ত্যাগ করেও শেষে ঐ সবে আবদ্ধ হয়, ভুলে যায়—'প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা'—তাই কত দুর্গতি ভোগ করে সংসার ছেড়ে এসেও। তুই বাবা, খুব তপস্যা কর হিমালয়ে গিয়ে, তাঁর ধ্যানে ডুবে যা—জন্মজীবন সার্থক কর। এই আমার আশীর্বাদ। বহু পুণ্যফলে এই কম বয়সে যখন সব মায়ার বাঁধন কেটে বেরিয়ে এসেছিস, তখন আর অন্য

কোনদিকেই তাকাবি না; তাঁকেই জীবনের সর্বস্ব কর। যা, ভয় নেই, তিনি তোকে রক্ষা করবেন।" এই কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ যেন গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। সে এক অপার্থিব দৃশ্য! মহারাজের এই জ্ঞানগর্ভ হৃদয়স্পর্শী কথাগুলি শুনে এক অনাবিল আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হলো।

রাজা মহারাজের নির্দেশে কনখল সেবাশ্রমে গিয়ে সেবাপূজাদির কাজে ব্রতী হই। কিছুকাল পরে আশ্রমাধ্যক্ষ কল্যাণানন্দ মহারাজের অনুমতি নিয়ে হিমালয়ে যাই তপস্যার জন্য। উত্তরাখণ্ডের বহু স্থানে দীর্ঘদিন একাকী নিঃসম্বলভাবে থেকে ভগবানের আরাধনা এবং তীর্থদর্শনে কাটিয়ে প্রায় বারো বছর বাদে বেলুড় মঠে আসি। পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের অফুরন্ত কৃপা ও আশীর্বাদ ছিল বলেই হিমালয়ের ভাবগম্ভীর পরিবেশে একাকী থেকে দীর্ঘ দিন একটু তপস্যা করতে পেরেছিলাম। উত্তরাখণ্ডের সে পুণ্যময় আনন্দস্মৃতি জীবনসায়াহ্নে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে আমার প্রাণে।

১৯২০-২১ সালে লেখা রাজা মহারাজের দুটি আশীর্বাদী পত্র আমি পাই। পত্র দুটি জীর্ণ ও কীটদষ্ট হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা যায়নি। এইজন্য দুটি পত্রেরই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এই স্মৃতিকথা শেষ করছি ঃ

(১) শ্রীমান দেবানন্দ,

কনখল হইতে তোমার লেখা পত্র মাঝে মাঝে আমি পাই। তুমি উত্তরাখণ্ডে দীর্ঘদিন আছো এবং তোমার নির্জনতা ও সাধনভজন ভাল লাগে জানিয়া খুশি হইয়াছি। মহাপবিত্র হিমালয়ে থাকিয়া তপস্যা করা মহাভাগ্যে হয়। তীব্র ব্যাকুলতা ও পুরুষকার থাকিলেই চরম সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। সর্বদা বিবেক-বিচার জাগ্রত রাখিবে। সময়ের অসদ্‌ব্যবহার যেন এতটুকুও না হয়। ঐ সুন্দর সুযোগ তাঁর কৃপাতেই হইয়াছে। না খাটিলে বস্তু পাওয়া যায় না। স্মরণ-মনন, ধ্যান-জপ নিত্যনিয়ত করিলে তোমার কল্যাণ অবশ্যই হইবে। মন যত অন্তর্মুখী হইবে ততই বেশি আনন্দ অনুভব করিবে।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী ব্রহ্মানন্দ

(২) শ্রীমান দেবানন্দ,

এই কম বয়সেই মনটি গড়িয়া লও। অনাবশ্যক কথাবার্তা বা চিন্তা ত্যাগ করিবে। উদ্যম-উৎসাহ সর্বদাই মনেতে রাখিবে। তাঁর উপর ও নিজের উপর কখনো বিশ্বাস হারাইবে না। নিত্যই আকুল প্রাণে তাঁকে ডাকিয়া

যাইবে। এক মুহূর্তও যেন বিফলে না যায়। জানিবে তোমার জন্য সময় দাঁড়াইয়া থাকিবে না। গোনাদিন ক্রমেই ফুরাইয়া আসিবে। তাই ধৈর্য ও উৎসাহ লইয়া সাধন-ভজন করিয়া যাইবে। তাঁর কৃপাশীস যথাসময়েই লাভ করিতে পারিবে। কখনো হতাশ হইবে না। অমৃতের আস্বাদ পাইলে কোন সংশয় বা চিন্তাভয় থাকিবে না। তিনিই পথ দেখাইয়া লইবেন, যদি তাঁর শরণাগত হইতে পারো। তীব্র অনুরাগ ছাড়া ভগবানকে লাভ করা যায় না। জন্মজীবন সার্থক কর তাঁর ধ্যান, জপ, উপাসনায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাসনা তিনি পূর্ণ করুন। তুমি সেই আনন্দের অধিকারী হও। আমি ভাল আছি। আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী ব্রহ্মানন্দ

(উদ্বোধন ঃ ৮২ বর্ষ ৭ ও ৮ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীরাজামহারাজের পুণ্য স্মৃতিকথা

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

তখন বিপ্লবী যুগ। বঙ্গভঙ্গ হইয়াছে, চারিদিকে রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের ছড়াছড়ি। অগ্নিমন্ত্রের পূজারী ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন প্রমুখ শহীদগণ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার তখন কৈশোরকাল। বুদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশমাতৃকার সেবা ও আত্মমুক্তির প্রেরণার উদয় হইতেছে। অনুরাগের প্রথম ঝড়ে হিতাহিত জাগ্রত হয় নাই। বাড়িতে এক নাগা সন্ন্যাসী উপস্থিত। তিনি কৌপীন পরিয়া দিবারাত্র ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করেন। মাঝে মাঝে গঞ্জিকার দরকার হয়। আমিও কৌপীন পরিয়া গায়ে ভস্ম মাখিয়া তাঁহার পার্শ্বের আসন লইলাম। কখনো তাঁহাকে গঞ্জিকা-সেবনে পরিতৃপ্ত করিতাম, কখনো তাঁহার ধুনি জ্বালিবার কাষ্ঠ-সংগ্রহে যাইতাম। এইভাবে দুই-তিন দিন অতীত হইল—খুলিল না চিত্তের দুয়ার! মনে হইল সব ছেলেখেলা!!

অতঃপর সন্ত্রাসবাদীদের খাতায় নাম লিখাইলাম। অভিভাবকেরা আমাকে মেজদার কর্মস্থল শিলচরে পাঠাইলেন। নূতন পরিবেশে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করিলাম। আমাদিগকে প্রেরণা দিত দুইখানি পুস্তক—'ভারতে বিবেকানন্দ' ও 'গীতা'। গোয়েন্দাদের তীব্র দৃষ্টি এড়ানো কঠিন হইল। অগত্যা স্বামী নিগমানন্দের খোঁজ করিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে অরুণাচলে স্বামী দয়ানন্দের বাৎসরিক উৎসবে 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিয়া খুব নাচিলাম, তথাপি হৃদয় মরুভূমিই রহিয়া গেল।

১৯১৪ সালের বন্যা। শিলচরের বিস্তৃত এলাকা জলপ্লাবনে বিপন্ন। বহু লোকের প্রাণহানিও হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছে। স্বামী ভূমানন্দের নেতৃত্বে অশোক মহারাজ, দেবেন মহারাজ, নগেন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেক কর্মী সাধুরা সেবা করিতেছেন। আমরা সাধু দর্শনমানসে ও কর্মপদ্ধতি জানিতে সেবাকেন্দ্রে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। স্বামী ভূমানন্দ বিপ্লববাদী যুবকদের সহিত সাধুদের ঘনিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

কিন্তু আমরা সাধুদের নিকট হইতে *'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'* নিষ্কাম কর্মে জীবনের ইঙ্গিত ও গন্তব্য পথের সন্ধান পাইলাম। দিনের পর দিন অযাচিত সেবাকার্যে তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলাম। রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতির বাহিরে বলিয়া আমরা তখনই সঙ্ঘের অঙ্গ হইতে পারিলাম না।

আমরা শিলচরে ক্ষুদ্রাকারে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলাম। মুষ্টিভিক্ষা-লব্ধ আয় হইতে বাড়িভাড়া প্রভৃতি খরচ চলিত। ক্রমে তহবিলে কিছু অর্থ জমিলে একটি ছাত্রাবাস ও লাইব্রেরি স্থাপিত হইল। এই সময় ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মচারী ধ্রুবচৈতন্যজী (পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ) শিলচরে আসিয়া আমাদের আশ্রমে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। ঐকালে তাঁহার আলোচনাদি শুনিয়া শিলচরবাসীরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মহিমা বিশেষভাবে অনুভব করিল। ঐভাবে আমাদের আশ্রমের ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া ধ্রুবচৈতন্যজী ফিরিলেন।

পর বৎসর স্বামীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ ও শ্রীশ্রীমার প্রিয় সন্তান ভক্তপ্রবর ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য মহাশয়ের শিলচরে শুভাগমন হইল। তাঁহাদের পূতসঙ্গের ফলও অবিলম্বে ফলিল। আশ্রমবাসীদের অনেকে জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য হইলেন এবং কেহ বেলুড় মঠে যাইয়া পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের, কেহ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে সুরেশ এবং গিরীন্দ্রও (পরবর্তী কালে স্বামী অমরানন্দ ও স্বামী প্রেমঘনানন্দ) ছিল।

অতঃপর আমি ব্রহ্মচারী নগেন ও সুরেশের সহিত পত্রালাপ শুরু করিয়া তাহাদের নির্দেশমতো ১৯২১ সনের সরস্বতী পূজার পরদিন বহু দিনের ঈপ্সিত বেলুড় মঠে পৌঁছিলাম। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, কালী মহারাজ, হরি মহারাজ, খোকা মহারাজ এবং হরিপ্রসন্ন মহারাজ স্থূল শরীরে ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

তখন মঠের ম্যানেজার নগেন ব্রহ্মচারী ও মাখন মহারাজ (স্বামী অমলানন্দ)। নিয়মিত জপ-ধ্যান পড়াশুনা ছাড়া মঠে আমাদের কাজ ছিল—মঠবাড়ি ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার রাখা, গোশালা সাফ করা, খড় কাটা, গরুর জাব দেওয়া, কয়লার গুঁড়া দিয়া গুল পাকানো, ফুল বাগান ও সবজি বাগান কোদাল দিয়া কোপানো, গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনা, কুটনো কোটা ইত্যাদি। এসব ছিল তপস্যারই

অঙ্গ। আহার ছিল অধিকাংশ দিনই ভাত, ডাল ও মিষ্টি কুমড়ার তরকারি। কিন্তু মনে হইত কি সুস্বাদু, যেন অমৃত! গাত্রাবরণ ছিল একটি ফতুয়া ও একখানা বোম্বাই চাদর—শীত ও গ্রীষ্মে সমান। শয়ন ছিল মঠের যত্র তত্র—ইহাতেও কোনই দুঃখবোধ হইত না। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের সান্নিধ্যেরই মহিমা। মনে হইত আনন্দধামে বাস করিতেছি।

১৯২১ সালে শিবরাত্রির পরে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ কাশী হইতে বেলুড় মঠে আসিতেছেন, খবর আসিল। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমরা পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য দর্শনের আগ্রহে শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম। বাড়ি ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল। ফুল বাগিচা সবজি বাগান সুন্দর রূপ ধারণ করিল। মনে হইল যেন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে। মহারাজের আগমনের দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে অনেক সাধু হাওড়া স্টেশনে গেলেন। রাজা মহারাজ সেই গাড়িতেই আসিতেছেন কিনা লিলুয়া স্টেশন হইতে জানিয়া আসিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে লিলুয়া স্টেশনে পৌঁছিবামাত্র দেখিলাম ২/৩ জন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী গাড়ি হইতে নামিলেন। তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করিয়া রাজা মহারাজের নাম উচ্চারণ করিতেই একজন বলিলেন —ঐ দেখ, পূজনীয় রাজা মহারাজ platform-এ নেমেছেন, তুমি দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করে এসো এবং মঠ হতে খবর নিতে এসেছ বলতে ভুলো না। মহারাজকে এই প্রথম দর্শন করিলাম এবং সাগ্রহে প্রণাম করিয়া মঠের খবর নিবেদন করিলাম। তিনি গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন।

আমি মঠে খবর দিতে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া বেলুড় বাজার পার হইয়াছি মাত্র। হঠাৎ দেখিলাম একখানা private car আমার নিকট থামিল, রাজা মহারাজ বসিয়া আছেন। তিনি ভিতর হইতে বলিতেছেন, "এই ছেলেটি কি মঠের ব্রহ্মচারী?" সেবকদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে, তুমি কি মঠের ব্রহ্মচারী?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র আপনাদের সঙ্গে লিলুয়ায় আমার দেখা হইয়াছিল।" মহারাজ আদেশ করিলেন—"ছেলেটিকে গাড়িতে তুলে নাও।" কিন্তু গাড়িতে স্থানাভাব থাকায় আমার উঠা হইল না। আমি মহারাজকে বলিলাম, "মঠ তো অতি নিকটেই, আসিয়াই পড়িয়াছি। আপনার দর্শন-অপেক্ষায় সকলে আছেন।" মহারাজ প্রসন্ন হইয়া গাড়ি চালাইতে বলিলেন। এই অযাচিত স্নেহের স্মৃতি জীবনসন্ধ্যায় এখনও অনাবিল শান্তি ও আনন্দ দান করিতেছে।

তখন আমি মঠে ঠাকুরপূজার যোগাড় দিতাম। একদিন একটি সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুল একটি ছোট ডালে ফুটিয়া আছে দেখিয়া ঐ ডালটিসহ ভাঙ্গিয়া ফুলটি হাতে তুলিয়াছি—ঠিক সেই সময় আমার পিছন হইতে রাজা মহারাজ আগাইয়া আসিতেছেন। আমি ভয়ে 'ন যযৌ ন তস্থৌ', আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "ফুল সমেত ডাল ভাঙ্গলে?" আমি বলিলাম, "ডালসমেত ফুলটি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সাজাইয়া দিব।" তিনি বলিলেন, "এই ডালটি এতটুকু বড় হতে এক বৎসর লেগেছে, ভবিষ্যতে ফুল অতি সন্তর্পণে তুলবি। ফুলের সাথে পাতা দিয়ে ফুলদানি ভরতি করে জল দিয়ে বসিয়ে দিবি। গাছও রক্ষা পাবে, প্রভুরও সেবা হবে।"

অন্য দিনের কথা। গোলাপগাছ হইতে গোলাপ তুলিবার সময় রাজা মহারাজ আসিয়া হাজির! তিনি বলিলেন, "দেখ, পাতার আড়ালে যেসব ফুল ফুটে আছে, সেইগুলি শুধু তুলবি, এতে বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না।"

১৯২২ সাল। মহাপুরুষজীর ইচ্ছায় রাজা মহারাজ আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিলেন। তখন পূজনীয় কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) মঠে আছেন, তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মচারীরা গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা কর, তারপর রান্না করে খাও।" রাজা মহারাজ শুনিয়া বলিলেন—"আমার ছেলেরা ভিক্ষা করতে পারবে না। আমি তাদের রোজ ৫ টাকা ভিক্ষা দিব। তাহা দ্বারা ভাঁড়ার থেকে জিনিস নিয়ে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে খাবে।" আমরা তাহাই করিলাম। পূজ্যপাদ মহারাজগণ (ঠাকুরের সন্তানগণ) আমাদের রান্না করা ঠাকুরের প্রসাদ কিয়দংশ নিত্য গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমহাবীরকে সাজাইয়া রামনাম কীর্তনও করা হইয়াছিল।

ইহার পর কিছুদিন গত হইলে আমি রাজা মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার গুরু নই, মহাপুরুষজী তোমার গুরু। তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন।" অথচ সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দিতে চাইতেন না।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মহারাজ তাঁহার এক গুরুভাইকে বলিতেছেন, "তোমরা মঠের কাজ কর্ম কর, আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি।" ঐ সময় আমি নিকটেই ছিলাম। ইহার কয়েকদিন পর মহারাজ মন্দিরে যাইতেছেন, পর্বতবাবু দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পিছু পিছু যাইতেছেন। মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "প্রথমে মঠের ছেলেদের দীক্ষা দিব, তাহার পর তোমার হবে।" আমি সিঁড়িতে ছিলাম, আমাকে

দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যারা দীক্ষা চায়, তাদের সব ডেকে আন, আজ দীক্ষা দিব।" আমি সিঁড়ির নিচেই বরদানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বলিলাম, "মহারাজ আজ দীক্ষা দিবেন, সকলকে ডাকিতে বলিতেছেন।" তিনি শুনিয়া বলিলেন, "অমন কথা তো তিনি (মহারাজ) কখনও বলেন না! তবে কি তিনি শরীরত্যাগ করবেন!" একদিন কথাচ্ছলে মহারাজ তাঁহার গুরুভাইকে বলিতেছিলেন, "আমি সৰ ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা সব বুঝে নাও।" এই দিন কয়েকজনের দীক্ষা হয়। ইহারই তিন-চার দিন পর মহারাজ বলরাম মন্দিরে যাইলেন এবং অসুস্থ হইয়া কয়েকদিন রোগ শয্যায় থাকিয়া শরীরত্যাগ করিলেন। বলরাম মন্দিরেও কয়েকজনের দীক্ষা হইয়াছিল।

এক রবিবার বেলা তিনটার সময় মহারাজ সেবকদিগকে লইয়া গোয়াল পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গিয়াছেন। আমি দেখিয়া আসিয়া গঙ্গার ধারে নাগলিঙ্গম ফুলগাছের নিচে দাঁড়াইয়া আছি। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজা মহারাজ কোথায়?" আমি বলিলাম, "তিনি পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গিয়াছেন, দেখিয়া আসিলাম।" তাহাতে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "যা, বলে আয়—আজ রবিবার অনেক বাহিরের লোক আসবে। ডেকে নিয়ে আয়।" আমি বলিলাম, "আমার ভয় করে।" তিনি শুধু বলিলেন, "আমার নাম করে বলবি। ভয় কিসের?" আমি গিয়া রাজা মহারাজের নিকট মহাপুরুষ মহারাজের কথা বলিতেই তিনি ছিপ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের গুরুভাইদের মধ্যে কি অসাধারণ ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল!

একদিন মহারাজ এক গুরুভাইকে বলিতেছেন, "দেখ, এইসব ছেলেরা বাপমায়ের ভালবাসা ত্যাগ করে এখানে এসেছে, এরা সবাই ভাল ছেলে। আমাদের এদের ভালবাসতে হবে, ভালবাসতে হবে, ভালবাসতে হবে।" তিনবার এই কথা কয়টি বলিলেন। আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম।

মহারাজের জন্মতিথি উৎসব। সকাল হইতে মঠে সব সাধুরা আসিতেছেন। ঐ দিন বশীবাবু তিনখানা ছবি তুলিলেন। একটি—স্নানের সময়, তেল মাখিয়া কাপড়খানা বুকে বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। অন্যটি—ইজিচেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তৃতীয়টি—নিচে আমতলায় চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায়।

স্নানের পর দেবেনদা মহারাজকে একটি ফুলের মুকুট পরাইলেন। ভাল ফুলের মালা গলায় দিলেন, ফুলের পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

মহারাজকে দেখিতে ঠিক যেন একটি প্রতিমার মতো বোধ হইতেছিল। ঐ উৎসবে মঠপ্রাঙ্গণ ভর্তি ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন। প্রচুর মাছ ও পানতুয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহা আনন্দের মধ্য দিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

গুরুবংশের প্রতি মহারাজের অগাধ ভালবাসা ও কর্তব্যজ্ঞান ছিল। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবে রামলালদাদার দুই মেয়ে ও ঠাকুরের বিশেষ পরিচিতা রমণী নাম্নী মহিলা দ্বিতলে ঠাকুরঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ খাইতেছিলেন। ঠাকুরমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া খাওয়া মঠের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া অপরিচিতা ভদ্রমহিলাদিগকে আমি নিচে গিয়া আহার করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ইহাতে উপেক্ষার মৃদুমন্দ হাসি হাসিতে লাগিলেন। আমি এই সংবাদ ঈশ্বর মহারাজকে জানাইলাম। তিনি উপরে আসিয়া বিনয় করিয়া তাঁহাদের অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। তখন একটু কর্কশস্বরে বলিলেন, "যান, নিচে গিয়া প্রসাদ খান।" তাঁহারা ইহাতে অপমান বোধ করিয়া মঠ ত্যাগ করিয়া তখনই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। ক্রমে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ মহারাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি এত মর্মাহত হইলেন যেন তাঁহার বুকে শেল বিদ্ধ হইয়াছে! তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর মহারাজের ডাক পড়িল। তাঁহাকে মহারাজ বলিলেন, "তুমি যে অন্যায় করেছ, তাহার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর! এখনই সকল রকম প্রসাদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাও, যদি তাঁহারা তোমায় ক্ষমা করে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তবে মঠে ফিরিবে, নতুবা ... অন্যত্র চলিয়া যাইবে।" তাঁহারা ক্ষমা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং মহারাজকে একখানা পত্র দিলেন। পরদিন তাঁহাদের পুনরায় মঠে নিমন্ত্রণ করা হইল এবং ঈশ্বর মহারাজকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে হইল। বিদায়কালে মহারাজ প্রত্যেককে একখানা করিয়া কাপড় দিলেন।

মহারাজের মন সর্বদাই উচ্চভূমিতে থাকিত। নিম্নভূমিতে থাকাকালে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গদের সহিত নানারূপ রসিকতা করিতেন। রামলালদাদা রাধার বিরহ ও বৃন্দাসখীর পদাবলী কীর্তন করিতেন। মহারাজ তাহা লইয়া আনন্দে থাকিতেন। আহারের পর রামলালদাদার বিশ্রামের সময়। মহারাজ তাঁহার সেবকদের রামলালদাদার পদসেবা করিতে পাঠাইতেন। একদিন মহারাজের ইঙ্গিতে সেবকগণ রামলালদাদার এমন শক্ত (কঠিন) ভাবে পদসেবা করিল (পা টিপিল) যে, দাদাকে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে হইল। মহারাজ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তোমরা এ কি করছ? দাদাকে ছেড়ে দাও, তিনি ঘুমুবেন যে!"

পূজনীয় হরিপ্রসন্ন মহারাজ প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়াই গঙ্গাদর্শন ও প্রণাম করিতেন। একদিন জনৈক ব্রহ্মচারীকে মহারাজ নির্দেশ দিলেন, "প্রত্যূষে হরিপ্রসন্নের শয্যাত্যাগের পূর্বে তার দরজার সম্মুখে পিছন ফিরে দাঁড়াগে যা।" ব্রহ্মচারী আপত্তি করা সত্ত্বেও মহারাজের আদেশ তাহাকে পালন করিতে হইল। দরজা খুলিয়াই হরিপ্রসন্ন মহারাজ 'হা রাম, হা রাম' বলিয়া পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। মহারাজ কি হইয়াছে দেখিতে আসিবার ভান করায় হরিপ্রসন্ন মহারাজ উত্তর দিলেন—"এসবই আপনার কাজ।" মহারাজ উত্তর করিলেন—"আজকালকার ছেলেরা এইরূপই!"

পূজনীয় শুকুল মহারাজের সঙ্ঘগুরুর প্রতি ভক্তি ছিল অসাধারণ। একবার ঢাকা মঠে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল—আপনি বেলুড় মঠে যান। তিনি শুধু বলিলেন, "রাজা মহারাজ আমাকে ঢাকায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহার আদেশ না পাইলে কি করিয়া যাই?" পরে মহারাজের আদেশ পাইয়া তিনি বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়ায় তাঁহাকে কাশী সেবাশ্রমে পাঠানো হইল। কাশীতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রাজা মহারাজ বলিতেন—"শুকুল মহারাজ মহাপুরুষ, তাঁহার কাছে যাও, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন।"

কৃষ্ণলাল মহারাজ ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী ঢাকা মঠে থাকিতেন। সেখানকার একজন সহকারি কর্মী গৃহস্থ-ভক্ত ও সাধুদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এঁরা তেমন কাজ করেন না, বেশ খান দান থাকেন।" ইহা মহারাজের কর্ণগোচর হইতেই তিনি সাধুদের মঠে ফিরিতে আদেশ দিলেন এবং ঢাকা মঠের যে সকল কর্মী সাধু মঠে ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঢাকা যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহার ফলে ভক্ত ভদ্রলোককে মহারাজের নিকট বহু অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। সাধুদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি মহারাজের গভীর দৃষ্টি ছিল।

(উদ্বোধন ঃ ৭০ বর্ষ ১২ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী বিজয়ানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে প্রথম দেখেছি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে। উনি উড়িষ্যার কোন দিকে যাচ্ছেন, ভদ্রক বা কোঠার। মহারাজ যে কে তখন আমি জানতুম না। প্লাটফর্ম থেকেই দেখলুম যে, গৈরিক কাপড় পড়া, দীর্ঘদেহ, এক সন্ন্যাসী কুচবিহার মহারাজের সাদা রোলস্রয়েস গাড়ি থেকে নামলেন—গলায় চারনালী ফুলের মালা এবং প্লাটফর্মে নেমেই অপর দিকে একটি ট্রেনের কামরার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছনে রয়েছেন কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং শতাধিক ভদ্রলোক। ট্রেনের একটি কামরা থেকে যখন একজন বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন সেই সময় মহারাজ প্লাটফর্মের ওপরেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মহিলা বললেন, "বাবারা, রাখালকে তুলে ধর।" তখন অন্যান্য সাধুরা ঐ দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসীকে অতি সন্তর্পণে তুলে ধরলেন। উনি করজোড়ে শুধু বলতে লাগলেন, "মা, মা, মা!" তখন মহিলা বললেন, "রাখাল, বাবা, তুমি ওখানে গিয়েই আমাকে একটি তার কোরো। আর ছেলেদের বোলো, যেন আমাকে হপ্তায় দুটো করে চিঠি দেয়। গোড়ার দিকে জল ফুটিয়ে খেয়ো। আর ভক্তেরা যা কিছু যত্ন করে পাঠান না কেন, সব খেয়ো না।"

পরে আমি খবর নিয়ে জানলাম ঐ মহিলা হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী, আর ঐ সন্ন্যাসী হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র, তাঁর আদরের রাখাল। একথা শোনার পর আমি একটু চিন্তিত হয়ে যেখানে থাকতুম সেখানে ফিরে গেলুম।

তার পরের বারে আমি মহারাজকে দেখি বেলুড় মঠের ঘাসের জমির ওপর বেড়াতে। তাঁর পাশে ছিলেন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ এবং খোকা মহারাজ। তাঁরা মঠের মন্দির থেকে পুরনো ডাক্তারখানার দিকে ধীরে ধীরে আসছিলেন এবং ফিরে যাচ্ছিলেন। এর পূর্বে এবং পরে মহারাজের হাঁটার মতো ভঙ্গি, যা আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়েছিল, তা আর কারোরই কখনো দেখিনি।

তৃতীয় বার দেখি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় আমি তখন ব্রহ্মচারী হয়েছি। মহারাজ শ্রীশ্রীস্বামীজীর তিথিপূজার পর ভুবনেশ্বর থেকে এলেন। তাঁর মঠে ঢোকা এবং পরে মঠের আমগাছতলায় বেঞ্চির ওপর বসা আমার কাছে একটা উৎসব বলে মনে হলো। একের পর এক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা তাঁকে প্রণাম করার পর আমি সর্বশেষে যখন তাঁকে প্রণাম করলুম, তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "রাজা, এই ছেলেটিরই নাম পশুপতি। তোমাকে এর বিষয় চিঠিতে আগে লিখেছি। এ আগে তোমাকে দেখেছে।" পূজনীয় মহারাজ বললেন, "তুই বুঝি আগে আরো মোটা ছিলি?" আমি জবাবে বললুম, "না, মহারাজ, ঠিক উলটো! আপনিই আরো মোটা ছিলেন।" মহারাজ হাসতে আরম্ভ করলেন। সেই দিন থেকেই আমার ভয় চিরকালের জন্য চলে গেল।

তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের রাজা, সঙ্ঘাধ্যক্ষ। সকলেই তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন আমার প্রিয়তম। তাঁর কাছে আমি পরে অনেক দুষ্টুমি করেছি, যেমন ছোটছেলে বাবার কাছে করে থাকে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় মহারাজ ছিলেন দয়ার সাগর। একটা ছাড়া সব ভুলই তিনি ক্ষমা করতেন। তিনি মিথ্যে কথা একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, "ভয় পেয়ে মিথ্যে বলা হয়তো ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞানত যে মিথ্যা বলে, সে ভগবানের কাছ থেকে সরে গেছে।" আমি বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর কার্যপ্রণালী দেখতুম। দেখেছি, তিনি যে কাজই যখন করতেন, সবটাই অতি সুন্দরভাবে করতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "মহারাজ, আপনি সামান্য সামান্য বিষয়ে এত মন দেন কেন?" উত্তরে মহারাজ বললেন, "বাবা, তোরা জীবনে যাকে সামান্য বলিস, তাকে বড় করে ভাবতে শেখানোর জন্য ঠাকুর আমাকে এই দেহে রেখেছেন।"

ঠিক এই সময়ই তিনি আমাকে ইংরেজী করে বলেন, "Patience with limit is intolerance" (সীমিত ধৈর্য অধৈর্যেরই সমান)।

তারপর আমাকে বললেন, "দেখ, বাবা, তোকে বক্তৃতা এবং রিলিফের কাজে যেতে হয়। কাউকে কখনো কোন জিনিস দিয়ে অপমান করিস না। হেলায় কাউকে কিছু দিবি না, (পূজায়) অঞ্জলি দেবার মতো দিবি (মহারাজ অঞ্জলি দেবার মতো দেখিয়ে দিলেন)। তাতে ফল কি হবে জানিস? তোরও চিত্ত-শুদ্ধি হবে, আর যে নেবে তারও মনে লাগবে না।"

আনন্দ করে, ফষ্টিনষ্টি করে মহারাজ আমাদের অনেক কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তার বেশির ভাগই হলো ব্যক্তিগত। তিনি মনের কথা বুঝতে পারতেন।

মহারাজের শিক্ষা—গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মঠের গিরিশ মেমোরিয়াল-এর দক্ষিণের বারান্দার ধারে মহারাজ একটি ম্যাগনোলিয়া গাছ পুঁতেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন, "বাবা, সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে দু-বালতি করে জল এই গাছটায় দিস।" আমি সেই ভাবেই দিতুম। একদিন তাঁরই আদেশে কলকাতায় বক্তৃতা দিতে আসি এবং ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়; ফিরে এসেই গাছটিতে দু-বালতি জল দিই। পরদিন সকালে মহারাজ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গাছে ঠিকমতো জল পড়েছে কি না এবং নিজে গিয়ে দেখলেন যে ঠিক সময়ে জল দেওয়া হয়নি। তখন কিছু বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, "বাবা, আমি তোর গুরু, তোকে একটা অনুরোধ করলাম, সেটাও পালন করলি না। তোর ব্রত নষ্ট হয়েছে।" আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বললুম, "মহারাজ, আপনিই তো আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন, আমার রাত্রে আসতে দেরি হলো। আমার অন্যায়টা কোথায়?" মহারাজ তাঁর গাম্ভীর্য রক্ষা করে আমায় বললেন, "কাউকে বলে গেলি না কেন?" এর পর তাঁর যে কোন আদেশই হোক না কেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

এই ঘটনার আগে এবং পরে লক্ষ্য করে দেখেছি এবং আজও মনে হচ্ছে—মহারাজের আদেশ দেওয়ার একটা বিচিত্র ধরন ছিল; কোন কাজের আদেশ দেওয়ার সময় বলতেন, "এটা করবি কি?" দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পরে মনে হয়, তিনি এমন মিষ্টিভাবে কথা বলে আমাদের মন গলিয়ে দিতেন যে, তারপর তাঁর আদেশ পালন করতে কোন কষ্ট বা চিন্তা হতো না।

মহারাজের মতো ভালবাসা অন্য কোন মানুষের মধ্যে জীবনে আর দেখিনি। তিনি ভালবাসার জমাট মূর্তি ছিলেন। এখন মনে হয়, তিনি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। এই ভালবাসার শেষ স্তর হচ্ছে অহেতুকী কৃপা। আর অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে এইটিই হচ্ছে প্রেম। মহারাজ জগতের কাছে পরিচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র বলে। তিনি আমার কাছে ছিলেন আমার আশ্রয়দাতা, আমার বাবা, বন্ধু এবং আমার উপদেষ্টা, গুরুদেব। কত কিছু আবদার করেছি, আমাকে খুব কম সময়ই ধমকেছেন। তাঁর ধমকানির ভেতরও ছিল আমাদের পরম কল্যাণের চেষ্টা।

(উদ্বোধন ঃ ৭০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা)

রাজা মহারাজ-স্মৃতিকথা

স্বামী পুণ্যানন্দ

সে ১৯২১ সালের কথা। তখনও মঠে যোগদান করিনি, পাঠ্যাবস্থা। সুদূর মফস্বল শহর থেকে কলকাতা এসেছি। আসবার পূর্বে পূজ্যপাদ স্বামী আত্মানন্দজী (শুকুল মহারাজ) সস্নেহ নির্দেশ দিয়েছেন মঠে রাজা মহারাজকে দেখে আসতে। সেই নির্দেশ আমার নিকট আদেশের মতো। সুতরাং সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও বেলুড় মঠের দিকে রওনা হলাম। মধ্যাহ্নকাল। কুঠিঘাটে নেমেছি, ওপারে বেলুড় মঠ। কি আগ্রহ, কি ঔৎসুক্য নিয়েই না সেদিন মঠের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। কত শ্রদ্ধা, কত ভালবাসা, কত কল্পনা! যথাসময়ে অপর পার থেকে খেয়া নৌকা এসে গেল। নৌকাতে বসে বার বার মনে হতে লাগল, এই সেই মঠ যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা বিদ্যমান। ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, ''তুই আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেখানে রাখবি, আমি সেখানেই থাকবো।'' আর স্বামীজীও 'আত্মারামে'র কৌটা কাঁধে করে এনে এখানে বসিয়েছেন। মনে হলো অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচর ও আদরের মানসপুত্র রাখাল, স্বামীজীর 'রাজা', ভক্তের 'মহারাজ' পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করবো। সেই বিখ্যাত কথাটি মনে পড়লো, ''যে আমার পুত্রকে দেখেছে, সে আমাকেই দেখেছে।''

পুরাতন ঠাকুরঘরে প্রণামাদি সেরে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজীর (তখন ব্রঃ ত্যাগচৈতন্য) সাহায্যে মঠবাড়ির দ্বিতলে উঠে এলাম। গঙ্গার দিকে বারান্দায় দক্ষিণাস্য হয়ে মহারাজ একখানি আরামকেদারায় বসেছেন, দুইদিকে সুদর্শন সেবকদ্বয়; গায়ে গলাকাটা পাঞ্জাবী। অতি মৃদুস্বরে কথা বলছেন। অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছি, এই শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র। স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়নি। শুনেছি, সেই সিংহগ্রীব পুরুষসিংহ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মানুষের হৃদয় জয় করতে পারতেন। রাজা মহারাজকে দর্শন করেও মনে হয়েছিল কি বিরাট ব্যক্তিত্ব। যেন হিমালয়ের তুঙ্গতা এবং বিশালত্ব

তাঁর মধ্যে বিধৃত। স্বামীজী বলেছিলেন—"রাজা একটা দেশ শাসন করতে পারে।" মহারাজকে দেখে স্বামীজীর উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করলাম।

বারান্দায় অনেক ভক্ত বসেছিলেন। মহারাজের সান্নিধ্যে সকলেই পুলকিত, পরিতৃপ্ত। দেবদর্শনের আনন্দ অনুভব করছেন সবাই। অনেক রকম কথাই হচ্ছিল। মহারাজও মাঝে মাঝে কথায় যোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁর মন যেন কথার মধ্যে নেই, এই জাগতিক পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে যেন কোন্ অসীম অনন্ত আনন্দলোকে বিচরণ করছে। মধ্যে মধ্যে গড়গড়ায় তামাক টানছেন, কিন্তু প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এক দিব্যজ্যোতি। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠিকই বলেছিলেন ঃ সন্ন্যাসী দেখবি তো স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখে আয়।

প্রতীক্ষা শেষ হলো। সময় হয়েছে। ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম। অতি সুমধুর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোত্থেকে আসছ?" উত্তর দিলাম। বললেন, "কোন বাড়িতে গেলে বাড়ির যিনি বড় তাঁর সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে হয়। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের দাদা, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ?" ত্রুটির কথা স্বীকার করলাম। বললেন—"যাও দেখা কর।" এমনভাবে কথা কয়টি বললেন যে আজ জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েও সেই মধুর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাচ্ছি। সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি, সেই কমনীয় কান্তি আজও যেন চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। উত্তর কালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণই এ ক্ষুদ্র জীবনের সম্বল হবে—একি তারই ইঙ্গিত?

অতিথি-ভবনের নিম্নতল, যেখানে বর্তমান মঠাধ্যক্ষ বাস করেন, সেখানে মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন। গিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা মহারাজকে প্রণাম করেছি কি না। আমার উত্তর শুনে বললেন ঃ "তবেই হয়েছে, আর কাউকে প্রণাম করতে হবে না।" গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা, কি ভালবাসা! শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে এই দৃষ্টিতেই দেখতেন। স্বামীজী বলেছিলেন, "আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

আবার ফিরে এসেছি গঙ্গার দিকে দ্বিতলের বারান্দায়। এবার মহারাজ যেন একটু সাধারণ ভূমিতে নেমে এসেছেন। একজন ভক্তকে বলছেন—"আজ চচ্চড়ি বেড়ে হয়েছিল, খাবে একটু?" সামনে উপস্থিত পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে বললেন ভক্তটিকে একটু চচ্চড়ি দিতে। তিনি উত্তরে

বললেন—"ভাত নেই।" মহারাজ আনন্দের সঙ্গে বললেন—"হলোই বা।" শেষ কথাটি "হলোই বা" আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও কানে বাজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কি একটা কাগজ নিয়ে সেখানে এলেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বহুদিন পূর্ব হতেই শুনে আসছি; কোথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা জানি না, অন্তত দেখিনি। বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব হচ্ছে। নবমীপূজা। সঙ্ঘজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা মঠে আসবেন পূজা দর্শন করবার জন্য। ভোর হতেই মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমহারাজ একেবারে বালকভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। কত আশার তপস্যা, কত প্রতীক্ষার সাধনা আজ সার্থক হতে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে একদিন যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বালকভাবে রাখালরাজ লীলা করেছেন, অনেকটা সেই ভাব। মহারাজ ছিলেন গুরুগম্ভীর, অত্যন্ত রাশভারী লোক। কিন্তু আজ আর সেই ভাব নেই—একেবারে বালক। তাড়াতাড়ি ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান সেরে একখানি মাদ্রাজী কাপড় পরেছেন। কোমরে জড়িয়েছেন একখানি সুন্দর মাদ্রাজী চাদর। নিজে সব তদারকি করছেন—কোথায় মঙ্গলঘট বসানো হবে, কোথায় মাঙ্গলিক চিহ্ন দেওয়া হবে। আর মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' বলছেন। একবার মঠের দক্ষিণের ফটকে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন—ভাবে বিভোর, মুখে শুধু 'মা' 'মা' ধ্বনি। এদিকে মা আহিরিটোলার ঘাট থেকে স্টীমারে গঙ্গা পেরিয়ে সালকিয়ার ঘাটে এসেছেন এবং সদলবলে ঘোড়ার গাড়িতে বেলুড় মঠাভিমুখে রওনা হয়েছেন। শ্রীশ্রীমহারাজের নির্দেশে সাইকেলের ডাক বসানো হয়েছে—একজন করে সংবাদ নিয়ে আসছে গাড়ি কতদূর এলো। সবাই ব্যস্ত সন্ত্রস্ত—দেবী-অভ্যর্থনার আয়োজনে কোথাও কোন ত্রুটি না থেকে যায়। অবশেষে গাড়ি এসে দাঁড়ালো মঠের দক্ষিণ ফটকে। শ্রীশ্রীমহারাজ নিজে অগ্রগামী হয়ে গাড়ি নিয়ে এসে মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রতিমা দর্শন করবার পর, প্রথমে মহারাজ, পরে অন্যান্য সকলে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। মা কিছুক্ষণ পূজাদি দর্শন করে মহাপুরুষ মহারাজের পুরাতন ঘরে এসে উপবেশন করলেন। আরম্ভ হলো কালীকীর্তন। জমজমাট ভাব। ভাবে বিভোর শ্রীশ্রীমহারাজ গুরুভাই এবং শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে সেই কীর্তনানন্দে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। শুধু মধ্যে মধ্যে পুলক শিহরণ হচ্ছে। কীর্তনের শেষভাগে গান আরম্ভ হলো—"যাই চলো সে নগরে, যেথায় দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।" চারদিকে ভাবের বন্যা বয়ে

চলেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁকে নৃত্য করতে দেখে ভাবে বিভোর অন্যান্যরা তাঁকে ঘিরে নাচতে শুরু করলেন। সম্মুখে শ্রীশ্রীভগবতীর প্রতিমা, পার্শ্বে গঙ্গা, আর উপরে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীমা, মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালরাজ—ব্রজের রাখাল—ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন, ঠিক যেমন ভাবে নৃত্য করতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বর্গসুধানির্ঝর যেন ধরায় অবতরণ করেছে। সে অপূর্ব নৃত্য দর্শন করতে যে যেখানে ছিল সব ছুটে এসেছে, যে পারে নৃত্যে যোগদান করছে, যে পারে না দূরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে। বহুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হবার পর একজন গুরুভাই মহারাজকে ধরে ফেললেন। তিনি জানতেন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল যদি ভাবমুখে জানতে পারে সে কে, তবে এ শরীর সে ত্যাগ করবে। তাই এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভাববিহ্বল হলেই অন্যান্য গুরুভাইরা তাঁকে সাধারণ জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেন। মহারাজকে নিয়ে আসা হলো মঠবাড়ির সিঁড়ির বামদিকে ছোট ঘরটিতে। তাঁর প্রিয় তামাক দেওয়া হলো, পুড়ে ছাই হলো, মহারাজ নল মুখেও দিলেন না। শিহরণ, কম্পন প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার শরীরে সব বর্তমান। চারিদিকে লোকের ভিড়, মুখে কথা নেই, শুধু মধ্যে মধ্যে কাতরকণ্ঠে 'মা' 'মা' রব। ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর শ্রীশ্রীমাকে পাশের বাড়িতে সংবাদ দেওয়া হলো। মা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে একটি ছোট রেকাবিতে কয়েকটি সন্দেশ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আদর করে সন্তানকে বললেন—"রাখাল, খাও বাবা।" মাকে দেখে মহারাজ বালকের মতো হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। মায়ের চোখেও জল। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! মা নিজে একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে আদরের সন্তানকে প্রসাদ দিলেন এবং উপস্থিত সেবকদের সত্বর মহারাজকে কলকাতায় বলরাম মন্দিরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হলো।

কিছুদিন পরে মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—মহারাজ তো ভাব চেপে রাখতে পারেন, কখনও বহিঃপ্রকাশ হতে দেন না, তবে সেদিন কেন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। স্নেহময়ী জননী অশ্রুনয়নে বললেন, "আমি যখন উপরে বসেছিলুম, দেখলুম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন রাখালের হাত ধরে কীর্তনে নাচতেন তেমনি করে একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে চেয়ে নৃত্য কচ্ছেন। তখনই বুঝেছিলুম রাখাল বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এই ভাবে নৃত্য করে তাঁর অদর্শনের বিরহ সহ্য করতে পারবে না। এই বিরহ-যন্ত্রণা তার পক্ষে

অসহ্য হবে। তাই হয়েছিল। তাই তাকে রজোগুণ-প্রধান কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছিলুম।"*

কীর্তনগানের একটি লাইন মনে পড়লো—"যাকে দেখলে পরাণ নেচে ওঠে, হরিনাম আপনি ফোটে, এমন মনের মানুষ মিলে কই।" সেই মনের মানুষই সেই শুভ সন্ধ্যায় মিলেছিল। সত্যই মনে হয়েছিল, "পাই যদি সেই মনের মানুষ আদর করে বুকে লই।" রাজা মহারাজ সে তো অন্তরের অন্তঃস্তলে রাখবার জিনিস। একটি দিন মাত্র তাঁকে দেখেছি, তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনেছি। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী অতীত হবার পর সেই দিনটি আজও আমার জীবনে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়। মনে হয়, আবার যদি সেই দিনটি ফিরে আসে!

(উদ্বোধন ঃ ৭২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা)

---

* এই ঘটনাটিই বর্তমান বইয়ের ২৯১-৯২ পাতায় সংক্ষিপ্ত আকারে আছে মনে হয়—প্রকাশক

ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি

স্বামী বিশ্বানন্দ

একবার শ্রীশ্রীমা দেশে গেলে মহারাজ উদ্বোধন কার্যালয়ে ছিলেন। তখন একদিন তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে রামনাম গাওয়া হলো। মাত্র জনাছয় লোক উপস্থিত ছিল। সেদিন আমি বুঝলাম ভাবসমাধি কাকে বলে। মহারাজের ঘন ঘন ভাব হচ্ছিল। তাঁর শরীর কখনও কম্পিত কখনও স্থির হয়ে যাচ্ছিল। দুটি-একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তিনি এক পরমানন্দ প্রকাশ করছিলেন। সমস্ত স্থানটি যেন আধ্যাত্মিকভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। আমার মনে হলো আমি যেন অন্য কোন লোকে উপনীত হয়েছি। ভজন শেষ হতে বিদায় নেবার পূর্বে প্রেমানন্দ মহারাজের একজন সেবক মহারাজকে প্রণাম করল। সে তার মাথা নত করতেই মহারাজ বলে উঠলেন "বোকা! এখন তুই কোথায় যাবি? এখানে যা ঘটেছে তা ধ্যানের চেয়ে অনেক বেশি।" কথাটির তাৎপর্য সুস্পষ্ট। যেখানে ভগবৎ-চৈতন্য এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে জায়গা ছেড়ে ব্রহ্মচারী কোথায় যাবেন!

মহারাজের উপস্থিতিতে আমরা একথা-কয়টির অর্থ সুস্পষ্ট ধরতে পেরেছিলাম ঃ "গুরু নীরবে থেকে শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যা করেন। আর তাতেই শিষ্যদের সন্দেহভঞ্জন হয়ে যায়।"

(উদ্বোধন ঃ ৮৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

স্বামী ওঁকারানন্দ

একবার হরিদ্বারে খোকা-মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা মহারাজ, আপনি এত কঠোর তপস্যা করছেন কেন? ঠাকুর তো আপনাকে সবই দিয়ে গেছেন।" মহারাজ উত্তর দিলেন—"ওরে খোকা, এসব জিনিস করে নেওয়ার, করে দেওয়ার নয়। তাই করে নিচ্ছি।"

মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাউকে ছাড়তেন না। মঠে রাত তিনটার সময় সব ব্রহ্মচারীদের তুলে দিয়ে ঠাকুরঘরের বারান্দায় ধ্যান করতে বলতেন। নিজে পায়চারি করতেন। একদিন একজন বুঝি বারান্দায় না বসে ঠাকুরঘরের ভিতর বসেছে। তাকে দলে না দেখে মহারাজ তাকে ডেকে পাঠান। যখন শুনলেন যে, ঠাকুরঘরে বসেছিল তখন ধমক দিলেন—"ওখানে ছবি কিনা, দেখছেন না তো, তাই ওখানে বেশ বসা যায়, আর বারান্দায় জ্যান্ত মানুষ ঘুরছে, না?" এইরকম ভাবে তাঁরা খাটিয়ে নিতেন।

*　　*　　*

রাখাল-মহারাজ স্বামীজীকে বিশেষভাবে বুঝতেন। স্বামীজীও তাঁকে সে রকম বিশ্বাস করতেন। তার কারণও ছিল। দুজনের বাল্যবন্ধুত্ব। একটা ঘটনা বলি শোন। স্বামীজী তখন আমেরিকায় যাননি। তাঁর বাবার মৃত্যুর পরে সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে। এমন সময় খবর এলো—আত্মীয়রা জোর করে বাড়ি দখল করবে। শুনেই রাখাল-মহারাজ, জমিদারের ছেলে তো, দু-গাড়ি গুণ্ডা নিয়ে স্বামীজীর বাড়ি হাজির। কোর্টের রায়ে স্বামীজীর জিত হলে তবে চলে আসেন। বন্ধুর বিপদে জান কবুল। বুঝে দ্যাখ, দুজনের মধ্যে কি ভালবাসা!

আরও ঘটনা শোন। একবার স্বামীজী কোন ব্যাপারে রাখাল-মহারাজকে গালাগাল করে ভূত ভাগালেন। রাখাল-মহারাজ নিজের ঘরে গিয়ে খুব কাঁদতে

লাগলেন। বলতে লাগলেন—নরেন শুধু আমাকে নয়, আমার বাপ-ঠাকুরদাকেও ছাড়ে নি। এদিকে স্বামীজীও কিছু পরে সেখানে এসে হাজির। স্বামীজীকে দেখেই রাখাল-মহারাজ তাড়াতাড়ি চোখ মুছে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার? স্বামীজী বললেন—তুই কিছু মনে করিস নি ভাই। রাখাল মহারাজ বললেন—মনে কিছু করব কেন? আমার তো কিছু হয়নি। স্বামীজী বললেন—"দ্যাখ ভাই, রোগে ভুগে-ভুগে আমার এ রকম হয়েছে—শরীর একদম কাহিল হয়ে পড়েছে। তাই মুখ-খারাপ করি।" এ রকমই ছিল ওঁদের ভালবাসা।

স্বামীজী একবার বলরাম মন্দিরে আছেন। উনি ঘুমুচ্ছেন, এ রকম সময়ে ওনাদের বাড়ির ঝি দেখা করতে এলো। রাজা মহারাজ বললেন—"স্বামীজী ঘুমুচ্ছেন, এখন দেখা হবে না।" ঝি একথা শুনে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে স্বামীজীর ঘুম ভাঙল। রাজা মহারাজ স্বামীজীকে ঝি-এর আসার খবর জানালেন। শুনেই স্বামীজী চটে লাল। রাজা মহারাজকে যা-তা বলতে লাগলেন। তারপর একটি গাড়ি নিয়ে সোজা নিজের মায়ের কাছে হাজির। উনি ভেবেছিলেন—মায়ের বোধ হয় শরীর খারাপ হয়েছে বা বিশেষ কোন দরকার পড়েছে, সেজন্য ঝিকে পাঠিয়েছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঝিকে পাঠিয়েছিলে কেন? মা বললেন—কই আমি তো ঝিকে পাঠাই নি। তখন ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল—সে ওদিকে কালী-মন্দিরে গিয়েছিল, ফেরার পথে স্বামীজীকে দেখতে গিয়েছিল। একথা শুনেই স্বামীজী হাউ-হাউ করে কেঁদে আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন—আমি মিছামিছি রাখালকে গালাগালি করলুম। কয়েকদিন পরে স্বামীজীর মায়ের সঙ্গে রাজা মহারাজের দেখা হলো। তাঁর কাছে স্বামীজীর মা স্বামীজী কি রকম কেঁদেছিলেন তা বললেন। শুনে রাজা মহারাজ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

রাজা মহারাজের যথার্থ ব্যক্তিত্ব ছিল। উনি যে ঠাকুরের আর সব সন্তানদের থেকে আলাদা—এটা বেশ বোঝা যেত। সাধারণত বেশি কথা বলতেন না। তবে যখন বলতেন তখন ভাল করেই বলতেন। কথার মধ্যে হিউমার থাকত যথেষ্ট। ওনার শিক্ষা দেবার পদ্ধতি ছিল আলাদা ধরনের। ওঁর শুধু উপস্থিতিতেই যে একটা পরিবেশ আপনা থেকে গড়ে উঠত, তা বেশ বোঝা যেত। ভাবের কথা বলতেন—ভক্তির কথা—ভক্তির নানা দিকের কথা। ওটাই ওনার লাইন ছিল। ঠাকুর ওনাকে বৃন্দাবন থেকে এনেছিলেন কিনা—ব্রজের রাখাল। উনি খুব ভালোবাসতেন ছেলেদের, তবে তা বাইরে বিশেষ প্রকাশ

পেত না। প্রেমানন্দ-স্বামীর মতো তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ বাইরে দেখা যেত না। তবে মাঝে মাঝে যে বেরিয়ে পড়ত না তা নয়। একদিন রাজা মহারাজ বললেন—'দ্যাখ, তোদের যখন কেউ নিন্দে করে, আমার বুকটা কুঁচকিয়ে যায়, আর যখন কেউ তোদের প্রশংসা করে তখন বুকটা বড় হয়ে যায়।' ওনাকে কত কাজ করতে হয়েছিল। মঠকে তো উনিই গড়েছেন, consolidate করেছেন। ঠাকুর-স্বামীজীর পরিচিত ও কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গোড়ায় ওঁকে মানতে চাইত না। পরে ওঁর রূপ খুলে গেল। সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে গেলেন। সত্যি, আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ছিলেন তিনি। ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন।

জীবন দেখতে হয়। বাণীতে আর কত কাজ হয়। জীবন দেখলে সহজে ছাপ পড়ে। খুব সৌভাগ্য যে, ঠাকুরের সন্তানদের দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমাদের কত angularities —আমরা সকলকে ভালবাসতে পারি না। কিন্তু রাজা মহারাজ প্রভৃতিদের দেখেছি—সবার প্রতি তাঁদের কত ভালবাসা! স্বামীজীকে দেখিনি—তবে অন্য কর্তাদের দেখেছি। রাজা মহারাজকে দেখলে আধ্যাত্মিকতা কী, তা বোঝা যেত। বাবা, এগুলিই জীবনের সম্পদ।

* * *

বালির লোকেরা মঠের সঙ্গে গোড়ায় খুব শত্রুতা করেছিল। তারা দরখাস্ত করেছিল যে, এটা মঠ নয়, বাসাবাড়ি; তাই ট্যাক্স মুকুব হতে পারে না। ও ব্যাপারে কোর্টে কেস হয়েছিল। বালির সমস্ত লোক মঠের বিরুদ্ধে। কেস-এর শুনানীর দিন সাক্ষী ছিলেন—রাখাল মহারাজ, বিজ্ঞান-স্বামী ও বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল। এ ঘটনা বিজ্ঞান-স্বামী নিজে আমাকে বলেছেন। বৈকুণ্ঠ সান্যাল সাক্ষ্য দিতে উঠে সব বিরুদ্ধ কথায় 'হাঁ' দিতে লাগলেন। রাখাল মহারাজ ও বিজ্ঞান-স্বামী তো অবাক! কিন্তু হলে কি হবে? সাক্ষ্য দিতে দিতে বৈকুণ্ঠ সান্যাল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে দুম করে পড়ে গেলেন। ফলে সান্যালের কথা অসুস্থ লোকের কথা বলে নথিভুক্ত করা হলো না—রাখাল মহারাজদের কথা রেকর্ড করা হলো এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ইনস্‌পেকশান করার আদেশ দেওয়া হলো। একদিন সকালে ডি-এম হঠাৎ মুখে পাইপ দিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে মঠের মূল দরজার কাছে হাজির। তখন চারিদিকে বেড়া ছিল। স্বামীজী বেঁচে আছেন। ডি-এম. মঠে ঢোকার রাস্তা খুঁজছেন। এ দিকে মঠের কুকুর বাঘা তাঁকে দেখেই রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে এখন যেখানে চা খাওয়া হয়, সেখানে নিয়ে গেল। তারপর স্বামীজী নেমে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি রিপোর্টে লিখলেন—The dog

has showed me the way. So it must be a monastery. ট্যাক্স মকুব হয়ে গেল।

* * *

স্বামীজী রাজা মহারাজকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। আমেরিকা যাবার আগে সেই রাখাল মহারাজ ও হরি মহারাজের সঙ্গেই হঠাৎ দেখা হলো ও কথা হলো। তারপর বিদেশ থেকে কিভাবে কলকাতার মঠে চলতে হবে, কিভাবে সঙ্ঘ গঠন করতে হবে, তাও রাজা মহারাজ ও শশী মহারাজকে স্বামীজী অনবরত চিঠি লিখে নির্দেশ দিতেন। বিদেশ থেকে ফিরে উনি মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজা মহারাজকে তার সভাপতি ও শরৎ মহারাজকে সম্পাদক করলেন। রাজা, ঠাকুরের chosen ব্যক্তি, আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ। স্বামীজী তাঁকে এমন বিশ্বাস করতেন যে, একবার বলেছিলেন—'সকলে আমাকে ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু রাজা আমাকে ত্যাগ করবে না।' স্বামীজী জানতেন, রাজা মহারাজ মঠ ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর (স্বামীজীর) অভিপ্রায় অনুযায়ী রূপ দেবেন। আর শরৎ মহারাজের 'মাছের রক্ত' কিছুতেই তাতে না। তাই শরৎ মহারাজকে আমেরিকার প্রচারকার্য থেকে সরিয়ে এনে মঠের সম্পাদক করে দিলেন। তবে তাঁর মাথার বোঝা নামল।

* * *

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর রাজা মহারাজকে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল! মা-ও কতভাবে উপদেশ দিয়ে, নির্দেশ দিয়ে সঙ্ঘকে সাহায্য করেছেন। তাই ১৯২০ সালে মায়ের যখন দেহত্যাগ হলো, রাজা মহারাজ আকুলকণ্ঠে বলেছিলেন—'গিরিজা, আজ অনাথ হয়ে গেলাম, আজ অনাথ হয়ে গেলাম রে।' নিজের মা চলে গেলে ছেলের যে অবস্থা হয়, রাজা মহারাজেরও সেই অবস্থা। মা নৌকায় করে যেতে যেতে দেখেছিলেন—ঠাকুর কলাবাগানে দাঁড়িয়ে আছেন; তখন মঠের জমিতে কলাবাগান ছিল। সেইজন্যই তো স্বামীজী ঠাকুরকে ওখানে বসিয়েছেন। এই মঠের পিছনে এত আশীর্বাদ, এত ত্যাগ আছে। এ মঠ কি সহজে চলে যাবে? কিছু লোকের অনাচারে বা অত্যাচারে আমাদের কিছু করতে পারবে না।

* * *

রামনাম গানের সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে প্রত্যক্ষ

করেছিলেন—একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রামনাম শুনছেন। তিনি চিনতে পারলেন যে, তিনি মহাবীর। তারপর থেকে রামনামের সময় একখানি আসন রাখার ব্যবস্থা হলো এবং আসনের উপর রামনামের একখানি বইও রাখা হয়।

*   *   *

একবার রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ বসে আছেন। আমিও আছি। রাজা মহারাজ বললেন—তাঁর কি ইচ্ছা বুঝি না। কত লোককে ভাবি খুব ধর্মপথে অগ্রসর হবে, কিন্তু আশ্চর্য, তারাও পড়ে যায়। আর যাদের ভাবি হবে না কিছু, তারা বেশ এগিয়ে যায়। তাঁর লীলা কে বুঝবে?

রাজা মহারাজ তখন খুবই অসুস্থ। বলরামবাবুর বাড়িতে পূর্ব দিকের ঘরখানায় আছেন। এক ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। আমি ছিলাম কাছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ, কেমন আছেন? মহারাজ উত্তর দিলেন, 'তাঁর সঙ্গে (শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে) একদিন কাটালে যা আনন্দ হয়, তাতে মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ হয়ে যায়।' পরে আবার বললেন—'এবার বিধির বিধান শেষ হলো।' আমাকে ভুবনেশ্বর যাওয়ার জন্য বললেন। আমি উত্তর দিলাম—মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাবো। মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। বোঝা গেল, এবার মহাপ্রয়াণের সংকল্প, টলানো যাবে না।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ—স্বামী ওঁকারানন্দ
প্রকাশক ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া)

মাতৃসমীপে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী ঈশানানন্দ

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন সকালে তিনি উদ্বোধন বাড়িতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তখন বেলা ৯টা হইবে। মা দক্ষিণের ঘরে খাটের উপরে পা ঝুলাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আমাকে বলিলেন, "শরৎকে বলে রাখালকে শরতের ঘর থেকে ডেকে আনো।" আমি ঐ কথা শরৎ মহারাজকে বলায় পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ আগে আগে আমি তাঁহার পিছনে পিছনে মায়ের নিকট আসিলাম। আমি দেখিতেছি—মহারাজের পা দুটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মহারাজ মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি লইয়া বলিতেছেন, "মা, রাধী কেমন আছে? এ রাধী, রাধু কোথায়?" মা মহারাজের দাড়ি ধরিয়া চুমু খাইয়া, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে রাধুর অসুখের কথা বলিলেন। তারপর মা মহারাজের শরীর সুস্থ আছে কিনা, তাঁহার সঙ্গের ছেলেরা কেমন আছে ইত্যাদি কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। মহারাজ সংক্ষেপে জবাব দিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং শরৎ মহারাজের ঘরে গিয়া বসিলেন। দেখিলাম, মহারাজ ঘামিয়া উঠিয়াছেন।

মা আমাকে যেমন যেমন বলিলেন, সেই ভাবেই একটি রেকাবিতে কয়েকটি বিস্কুট, কমলালেবু ও মিষ্টি সাজাইয়া মায়ের হাতে দিলাম। মা রেকাবিটি ঠাকুরকে একটু দেখাইয়া, নিজে সামান্য জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "রাখালের হাতে দিয়ে এসো।" আমি শরৎ মহারাজের ঘরে গিয়া রাখাল মহারাজের হাতে প্রসাদের রেকাবিটি দিলাম। শরৎ মহারাজ বলিলেন, "মায়ের প্রসাদ একাই সব খাবেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "শরৎ, তুমি তো রোজই মায়ের প্রসাদ খাচ্ছ। আবার এতেও ভাগ বসাবে? তা, নাও; তুমি হলে মায়ের দ্বারী, তোমাকে সন্তুষ্ট না করলে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "সে তো আপনিই নিযুক্ত করেছেন, দাদা।" দুই গুরুভ্রাতা মহা আনন্দে প্রসাদ খাইতে লাগিলেন। আমি কুঁজো হইতে দুই গ্লাস জল দিয়া আসিলাম।

(মাতৃসান্নিধ্যে ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

মহারাজের স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ

(শ্রদ্ধা লুইস কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং স্বামী চেতনানন্দ কর্তৃক অনূদিত)

একদিন সকালে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ তাড়াতাড়ি তার ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তার ঘর ও বিছানা অগোছাল ছিল। তিনি মঠের মাঠে মহারাজকে দেখতে পান। তিনি মহারাজকে প্রণাম করার পরেই, মহারাজ হঠাৎ বললেন, "আমাকে তোর ঘরে নিয়ে চল। আমি দেখব তুই কোথায় শুস।"

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ লজ্জিত হয়ে বললেন, "মহারাজ, আপনি একটু পরে আসুন। আমি আপনাকে এ সময়ে আশা করিনি এবং আমার ঘর অগোছালো—আপনাকে অভ্যর্থনা করবার অনুপযুক্ত।

মহারাজ ঃ "দেখ, তুই সব সময় আমার উপস্থিতির অপেক্ষা করবি।"

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ বুঝলেন মহারাজের কথার নিগূঢ় অর্থ। মহামান্য অতিথি ভগবানকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সবাই সদা প্রস্তুত থাকবে।

*　　*　　*

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে একটা তুচ্ছ ব্যাপারে তিনি মহারাজের তীব্র ভর্ৎসনা পেয়েছিলেন।

একদিন স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ পূজা করছিলেন, আর মহারাজ ঠাকুর ঘরে বসেছিলেন। পূজাকালে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ প্রদীপ ও ধূপ জ্বালতে দুই/তিনটা দেশলাই-কাঠি ব্যবহার করেন। পূজাশেষে মহারাজ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দকে বার বার ভর্ৎসনা করলেন, তাঁর একাগ্রতার অভাবের জন্য—কেন তিনি একটা কাঠির বদলে দু-তিনটা কাঠি ব্যবহার করেছেন।

(বেদান্ত এণ্ড দি ওয়েস্ট—১৪২ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

স্বামী প্রণবানন্দ

১৯১৩ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে মঠে গিয়ে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রথম দর্শন করি। তখন তিনি মঠের সামনের মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। আমার বন্ধু পূর্ব থেকে মঠে যাতায়াত করতেন। তিনি ইশারা করে জানালেন—ইনিই বড় মহারাজ। আমি তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, "কে?" আমার সঙ্গী বললেন যে, এ ছেলেটি আমার সঙ্গে এসেছে আপনাদের দর্শন করতে। আমি হাত জোড় করে দাঁড়াতেই তিনি হেসে বললেন যে মঠে অনেক বড় বড় সাধু আছে। এরূপ হাসিমাখা, উজ্জ্বল, প্রশান্ত মূর্তি আমি জীবনে আর দেখিনি। তারপর তিনি আস্তে আস্তে মঠের ভিতরে চলে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছন পিছন গেলাম। মঠে আরও অনেক সাধুকে এবং স্বামীজীর শয়ন ঘর দেখে ফিরে এলাম।

১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামীজীর জন্মোৎসব দিনে মহারাজকে দ্বিতীয়বার দর্শন করি। স্বামীজীর উৎসবে কাজ করবার জন্য ভলাণ্টিয়ার হিসাবে অন্যদের সঙ্গে আমি কলকাতা হতে মঠে গিছলাম। সেদিন স্বামীজীর শয়ন ঘরের সামনে গঙ্গার ধারের বারান্দায় কালীকীর্তন হচ্ছিল। মহারাজ সেখানে উপস্থিত থেকে মায়ের নাম শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে "মা, মা" বলছিলেন। কালীকীর্তন শুনবার কালে আমার নজর সব সময় মহারাজের উপর ছিল। গান শুনে মানুষের এরূপ অন্তর্মুখীন ভাব হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। ঠাকুরের সময়ের একজন গৃহিভক্ত কীর্তনের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছিলেন। তিনি মঠেই ডাক্তারি করতেন এবং থাকতেন। ছোটবেলা থেকে আমার গানবাজনার শখ ছিল। ডাক্তারবাবু তামাক খেতে গেলে একজন ব্রহ্মচারীর নির্দেশে আমি তবলা বাজালাম। প্রায় বেলা বারটায় কীর্তন শেষ হলো। মহারাজ ধীর স্থির ভাবে পূর্বের মতো অর্ধনিমীলিত নেত্রে বসেছিলেন। শেষে তিনি টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। উৎসবের পরেও দু-তিন দিন ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে মঠেই ছিলাম।

পূর্ব থেকে আমার মঠে সাধু হবার ইচ্ছা ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাও আমি ইতঃপূর্বে পেয়েছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে দু-চারটি প্রশ্ন করে বললেন, "মঠে রাখাল ও বাবুরাম আছে। সেখানে গিয়ে তুমি সাধু হও।" তখনকার দিনে মঠে সাধু হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। মঠে কাকে রাখা হবে না হবে তা বাবুরাম মহারাজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। তিনি কিছুদিন ধরে বিশেষ পরীক্ষা না করে কাকেও সাধু করতেন না। অন্য সব ভলাণ্টিয়ার চলে গেলেও আমাকে স্বামীজীর মন্দিরের সামনে দেখে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "কি হে তুমি যে এখনও রয়েছ? যাও—চলে যাও।" সে সময় ধীরানন্দ মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করলেন। তখন আমি বললাম যে এনার সামনে মা আমাকে মঠে সাধু হবার জন্য বলেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে ধীরানন্দ, মা বলেছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" তাতে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "তাই নাকি; আচ্ছা, থাক। দেখা যাক।" সেদিন থেকে মঠেই থেকে গেলাম।

তখন মঠের অবস্থা ভাল না থাকায় সকল সাধু-ব্রহ্মচারীকেই উঠান পরিষ্কার করা, গঙ্গা থেকে জল তোলা, বাগান করা, গোয়াল পরিষ্কার ইত্যাদি সব কাজ করতে হতো। প্রত্যহ দুবেলা মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। কিন্তু কোন কথাবার্তা হতো না। কিছুদিন পরে মহারাজ আদেশ দিলেন যে নূতন ব্রহ্মচারীদের ভোরে তাঁর ঘরে গিয়ে ধ্যান করতে হবে। ভোর ৪টায় উঠে হাতমুখ ধুয়ে সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হতাম। তিনি ছোট খাটটিতে বসে ধ্যান করতেন, আর আমরা মেঝেতে বসতাম। এই নিয়ম অনেকদিন ছিল। মহারাজের জীবজন্তুর প্রতি প্রীতি দেখে অবাক হতাম। তখন মঠে অনেক গরু ছিল। মহারাজ প্রত্যহ সকালে কিছু রুটি ও কলা নিয়ে এক একটা গরুর নাম ধরে ডাকতেন এবং ঠিক সেই গরুটি দৌড়ে এসে মহারাজের হাত থেকে খাবার নিয়ে চলে যেত।

আমি এক সময় স্বামীজীর মন্দিরে পূজা করতাম। সে সময় আমার এক বন্ধু আমাকে একটি শিবলিঙ্গ দেওয়ায় তাহাও আমি স্বামীজীর মন্দিরে রেখে নিত্য পূজা করতাম। সে কথা কোন সূত্রে মহারাজের কানে যায়। একদিন উদ্বোধনে আমি মহারাজের পদসেবা করছিলাম। কিঞ্চিৎ নিদ্রার পর আপন মনে মহারাজ বললেন, "উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবঃ ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।...।। বুঝলি।" আমি না বলাতে তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকটি তিনবার বলে অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। তাতে বুঝলাম যে আমার শিবপূজার কথা তাঁকে কে বলে দিয়েছে।

অন্য একদিন মহারাজ গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলেন। কিছু বলবার জন্য আমিও তাঁর সঙ্গে ঘুরছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে, কিছু বলবি?" আমি— "আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ। যৎসামান্য সাধন-ভজন করছি, কিন্তু কিছু বুঝছি না।" মহারাজ—"হরিভাই অনেক সাধন-ভজন করেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবি।" দু-একদিন পরে আমি হরি মহারাজকে সব কথা বললাম। তিনি বললেন, "তুমি এত বোকা! আমিও তাঁরই দিকে তাকিয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু করে দিতে পারেন।" আর একদিন সন্ধ্যায় মহারাজের কাছে যেতে তিনি বললেন, "কিছু বলবি?" আমি— "হাঁ মহারাজ। আপনার আদেশ মতো হরি মহারাজের কাছে আমি গিয়েছিলাম এবং সব কথা বলেছিলাম। তিনি আবার আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েদিলেন এবং বললেন যে আপনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু করে দিতে পারেন।" তাতে মহারাজ বললেন ঃ "দেখ বাবা, করে দিলে স্থায়ী হয় না। আধার চাই। যে যেমন করছ করে যাও। সময়ে হবে।" তাঁর কথা শুনে আমি তৃপ্তি পেলাম।

১৯২০ সালে ঠাকুরের জন্মদিনে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে নূতন করে ঠাকুরের ফটো প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজ ঠাকুরকে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। হলঘরে কীর্তন হচ্ছিল। হঠাৎ মহারাজ বললেন, "জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ বলরে আমার মন" গানটা গাও। অপর কাহারও জানা না থাকায় আমি গাইলাম। আমি তন্ময় হয়ে গাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি মহারাজ, হরি মহারাজ ও অন্যান্য সকলে দাঁড়িয়ে পড়েছেন এবং নৃত্য করতে করতে গানটি গাইছেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ আসন গ্রহণ করলেন। নামামৃতের ঘোর তাঁর অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

এই সঙ্গে মহারাজের আর এক দিনের অদ্ভুত নৃত্যের কথা মনে পড়ে। মঠে থাকবার সময় ঠাকুরের জন্মদিনের পরে সাধারণ উৎসবের দিনে তাঁর সেই অদ্ভুত নৃত্য দেখেছিলাম। আন্দুলের কালীকীর্তন পার্টি কীর্তন করেছিল। শেষের দিকে তারা নিম্নলিখিত গানটি নেচে নেচে গেয়েছিল ঃ

আর কেন মন এ সংসারে যাই চল সেই নগরে।
যথায় দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।।
পক্ষভেদের ক্ষয়োদয় নাইক চাঁদের সে পুরে।
নাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভোগপিপাসা পূর্ণানন্দ বিহরে।।
সে নগরে বাস করে যে প্রেমিক ধন্য কয় তারে।
তারা সাকারকে করে নিরাকার নিরাকার সাকার করে।।

মহারাজ সেখানে বসে গান শুনছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন। সে কি মাতোয়ারা নৃত্য! যেন আনন্দের স্রোত বয়ে যেতে লাগল।

১৯২১ সালে আমি হৃষিকেশে কয়েক মাস তপস্যার জন্য ছিলাম। মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে। তিনি আমাকে লিখলেন যে ভুবনেশ্বর গুপ্তকাশী। এ স্থান সাধন-ভজনের খুব অনুকূল। তুমি শীঘ্র এখানে চলে এসো। চিঠি পেয়েই আমি মঠ হয়ে ভুবনেশ্বর চলে যাই। সেখানে আমি মহারাজের আশাতীত আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

স্বামী তেজসানন্দ

যে সময়ের ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি, তাহা ইং ১৯১৭ খ্রীঃ গ্রীষ্মাবকাশ। সেইবার বি-এ পরীক্ষার পর আমার বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে ৺পুরীধামে গমন করি। আমার পক্ষে সেই প্রথম তীর্থদর্শন। কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত করিবার বাসনা অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচরগণের পুণ্যদর্শন-লাভের জন্যও প্রাণে একটা তীব্র প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলাম।

প্রথম হইতেই কি জানি কেন, এক অজ্ঞাত প্রেরণায় ঐ-সকল গ্রন্থাদি পাঠ করিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের 'মানস-পুত্র' শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। মহারাজ-সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ 'কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম, ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে।' 'আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কি না, তাই ঠোঁট নড়ে। এ সব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে হোমা-পাখির কথা আছে; সে পাখি আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখনও আসে না।... এসব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা—কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।' 'মাকে বলেছিলাম, মা! আমার তো আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে—একটি শুদ্ধ ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।' তাইতো রাখাল সেখানে আসিলেন। কিন্তু আমার মন কেবলই ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজের পুণ্যদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত এবং কোন শিক্ষিত

বাঙালীকে দেখিতে পাইলেই জিজ্ঞাসা করিতাম, 'রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ ৺পুরীধামে আসিয়াছেন কিনা?'

হঠাৎ একদিন এক বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট শুনিতে পাইলাম—শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ এখন এই পুরীধামেই রহিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—তিনি 'শশী-নিকেতন' নামক একটি বাড়িতে অপরাপর সন্ন্যাসিসহ অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণে একদিকে যেমন প্রাণে অত্যধিক উল্লাসের সঞ্চার হইল, অপরদিকে নৈরাশ্য ও দৈন্য আসিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কেবলই এক চিন্তা—তাইতো, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন, যদি তিনি আমাকে তাঁর নিকট যাইতে না দেন, তাহা হইলে যে আমার বুক ভাঙিয়া যাইবে। এইরূপে সন্দেহ ও শঙ্কার দোলায় মন সর্বদা দুলিতে লাগিল। মনে করিলাম, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ নাও করেন, অন্তত তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়া তো আসিতে পারিব। এইরূপ নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন মন লইয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্র-দর্শনান্তে সেই পূর্বকথিত 'শশী-নিকেতনে'র দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উহা ভিতর হইতে বন্ধ। ভাবিলাম, আমার পক্ষে তো এত বড় বাড়িতে প্রবেশ করাও সম্ভব নয়। আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, হাঁকডাক করিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করাও নিতান্ত ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়। ক্ষুণ্ণমনে ঐ স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় একজন লোক ঐ রাস্তা দিয়ে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এই বাড়িতে কি করে যাওয়া যায়?" তিনি বলিলেন, "সেজন্য ভাববেন না। আমি এর ব্যবস্থা করছি।" —এই বলিয়া 'বরদাবাবু, বরদাবাবু' বলিয়া তিনি ডাক দিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ উৎকট চিৎকার শুনিয়া আমি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, ওরাই বা কি মনে করিবেন! এতটা হাঁকডাক করিয়া মহারাজকে দর্শন করিতে যাওয়াও আমার পক্ষে নিতান্তই বেয়াদবি। যাহা হউক, ইত্যবসরে পলিতকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক (ইনিই বরদাবাবু—উক্ত বাটীর তত্ত্বাবধায়ক) আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া আমাকে বিনীতভাবে ও স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মহারাজকে দর্শন করতে এসেছেন?" আমার পক্ষে তখন কেবল "হ্যাঁ" এই উত্তর ভিন্ন অন্য কিছুই বলিবার সামর্থ্য ছিল না। প্রাণের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল—যেন যুদ্ধ চলিয়াছে। প্রাণবায়ু সজোরে বক্ষ-পঞ্জরে আঘাত করিতে লাগিল। মনে হইতেছিল, আমি এইভাবে একাকী এখানে আসিয়া ভাল করি নাই; সঙ্গে অপর কেহ থাকিলে ভাল হইত।

ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, বহির্বাটীর সুপ্রশস্ত বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়া এক সৌম্যদর্শন গম্ভীরমূর্তি দিব্যপুরুষ নলসংযোগে ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়ের চিত্তোন্মাদনকারী সুমিষ্ট সুরভি সান্ধ্য সমীরণ বহন করিয়া সেই স্থানটিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজের সমুন্নত দেহ, স্নিগ্ধদৃষ্টি, তপস্যাপূত শান্ত গম্ভীর প্রেমোজ্জ্বল মূর্তি সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বড়ই মধুর বলিয়া মনে হইতেছিল। অদূরে উক্ত বারান্দায় গৈরিকধারী কয়েকজন সন্ন্যাসীও উপবিষ্ট। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজের চরণযুগল মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে পড়িয়া রহিলাম। আজ প্রাণে কি আনন্দ! কত যে উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া দীর্ঘকালের পর এই দেহখানি অমৃতসিন্ধুর শান্তিসৈকতে আজ বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। যে চরণপ্রান্তে বিশ্রামলাভের জন্য নিদারুণ অশান্তি ও তীব্র বেদনা প্রাণের পরতে পরতে অনুভব করিয়াছি, আজ অহেতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুর হাত ধরিয়া আমাকে সেই শান্তিধামে টানিয়া আনিয়াছেন!

প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি অতি স্নেহভরে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোকে কোথায় দেখেছি, না?" আমি তো এ প্রশ্ন শুনিয়া অবাক! আমাকে তিনি কবে কোথায় দেখিলেন? ভাবিলাম, হয়তো তিনি আমার মতো অন্য কাহাকেও দেখিয়া ভুলবশত ঐরূপ বলিতেছেন। আমি বলিলাম, "না, মহারাজ, আপনার সঙ্গে তো আমার এই প্রথম দেখা। আমি তো আপনাকে পূর্বে আর কোথাও দেখিনি।" তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোকে কোথায় দেখেছি। তা, তুই এতদিন আসিসনি কেন?" আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। একে তো পূর্বে কখনো দেখা হয় নাই, তারপর আবার এতদিন আসি নাই কেন, তজ্জন্য অনুযোগ! তিনি এমনি স্নেহমাখা স্বরে এই কয়টি কথা আমাকে বলিলেন যে, আমার ভিতরের সমস্ত দুরু দুরু ভাব, অস্থিরতা, সঙ্কোচ, সন্দেহ এককালে কোথায় চলিয়া গেল। যেন কত দিনের পরিচিত; জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যেন ইঁহার সঙ্গে আমার কি এক গভীর আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে! কবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে সত্যই লিখিয়াছেন ঃ

'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর-সৌহৃদানি।।'

—কোন রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া, কোন শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী ব্যক্তি যখন উন্মনা হইয়া উঠেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তাহার চিত্ত-ফলকে দৃঢ়াঙ্কিত প্রিয়জনের মধুর স্মৃতি অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়াছে।

আমি আর সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্ষণপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কোথায় উঠেছিস? খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে?" আমি বলিলাম, "এক পাণ্ডার বাড়িতে উঠেছি। ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিত্য 'আনন্দবাজার' থেকে কিনে এনে ভোজন করি।" তিনি বলিলেন, "সে তো ভালোই।"

মহারাজ ঃ কতদিন এখানে থাকবি?

আমি ঃ এই স্নানযাত্রা পর্যন্ত। আমার বৃদ্ধা ঠাকুর-মা আছেন। রথযাত্রার সময় অত্যধিক ভিড় হয় বলে স্নানযাত্রা দর্শন করেই তিনি চলে যাবেন। আমিও তখন ঐ সঙ্গে চলে যাব।

মহারাজ ঃ আচ্ছা, একজন লালটুকটুকে সাধু দেখবি?

আমি ঃ (ভাবিলাম—এই তো মহারাজকে দেখিতেছি। আবার নূতন কোন্ সাধুকে দেখব? যাহা হউক, মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম) তিনি কখন আসবেন?

মহারাজ ঃ তা বলা শক্ত। কখন আসবেন, তার ঠিক নেই। তুই যদি দুবেলা এখানে আসিস, তবে তিনি যখনই আসুন, এক সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তোরও তো আর কোন কাজ নেই।

আমি ঃ আচ্ছা মহারাজ, আমি তাই করব!

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকিরণে সমস্ত ঘরবাড়ি উদ্ভাসিত। আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেছি, তিনি স্নেহভরে বলিলেন, "এস"।

তারপর যে কয়দিন ৺পুরীধামে ছিলাম, প্রায় প্রত্যহই দুইবেলা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট 'শশী-নিকেতনে' যাইতাম এবং সেই লালটুকটুকে সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। মহারাজ আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন সত্যসত্যই গৌরকান্তি একজন সন্ন্যাসীকে প্রাগুক্ত ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম; শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "যা, এঁকে প্রণাম কর। ইনিই সেই সাধু?" আমি তাঁহার পাদ-বন্দনা

করিলাম। ইনিই শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম শিষ্য ও লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ। তিনি অসুস্থ হওয়ায় স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য সে-বার ৺পুরীধামে আসিয়াছিলেন। আমার ভাগ্যে মহাপুরুষদ্বয়ের দর্শন এই প্রথম। এই 'সাধুদর্শন' উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ আমার ৺পুরীধামে অবস্থান-কালে কয়েকদিন কেমন করিয়া প্রত্যহ তাঁহার পূতসঙ্গদানে এ জীবনের ঊষর ক্ষেত্রে চির আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া স্নেহবারি-সিঞ্চনে অন্তর্নিহিত সুকুমার বৃত্তিসমূহ ধীরে ধীরে মুকুলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়-মন শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে।

আমরা যে কালে বলরাম মন্দিরে যাতায়াত করিতেছি, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেই কালের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিলাম, যাহার সাহায্যে মহারাজের সরলতা, রঙ্গপ্রিয়তা প্রভৃতি দিকগুলির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বলরাম মন্দিরের হলঘরে বসিয়া আছি। এমন সময় দেখিলাম শ্রীযুক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় (যিনি তাঁহার বিরাট গোঁফের জন্য সচরাচর 'কাইজার'-নামে অভিহিত) তদানীন্তন কলকাতা রঙ্গমঞ্চের প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীঅপরেশ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীযুক্ত অপরেশবাবুর ঘাড়টি ডানদিকে একটু বাঁকা ছিল। কিয়ৎকাল মহারাজের সঙ্গে কথাবার্তার পর 'কাইজার' তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতাসহ মহারাজকে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ! আপনি ইচ্ছা করলে তো সবই করতে পারেন। এই অপরেশের ঘাড়টি একটু বাঁকা; থিয়েটার করতে বড় অসুবিধা হয়। তার ঘাড়টা সোজা করে দিতে পারেন?" মহারাজ সেই কথায় মৃদু হাস্য করিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। বলা বাহুল্য, এই ব্রহ্মবিদ্ আনন্দময় পুরুষের সান্নিধ্যে সকলেই কিরূপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করিত, ঘটনাটি তাহারই একটি নিদর্শন।

সদানন্দময় মহারাজের স্বভাবটি ছিল শিশুর মতোই সরল। ছোট ছোট বালকদের সহিত এমনই রঙ্গরস করিতেন যে, তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন সেই কালে তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া গিয়াছেন।

এইরূপ একদিন বলরাম মন্দিরে গিয়াছি। সেদিন মহারাজ মহানন্দে ছোটদের সঙ্গে খেলায় রত। তিনি হলঘর এবং বারান্দার মধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছেন এবং ছেলের দল মহারাজের পিছু লইয়াছে। হঠাৎ মহারাজ তাঁহার নিজের

ঘরটিতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ছেলের দল কোলাহল করিতে লাগিল। এদিকে মহারাজ ঘরে ঢুকিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন। ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার শয়নঘরে একটি বিকটাকৃতি মুখোশ ছিল। তিনি সেটি পরিয়া আপাদমস্তক কালো কম্বলে আবৃত করিলেন এবং হঠাৎ দরজাটি খুলিয়া এক 'হুম' শব্দ করিয়া হলের মধ্যে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিকট মূর্তি দেখিয়া ছেলের দল চিৎকার করয়া উঠিল। হঠাৎ ঐরূপ দেখিয়া আমরাও ভয়ে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে যখন সেই বিকট আবরণ দূরে ফেলিয়া মহারাজ আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন চারিদিকে হাসির তুফান ছুটিতে লাগিল। ঘটনাটি সেদিন যাহাদের প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, বালকস্বভাব মহারাজের বালকভাবটি তাহাদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

একদিন মনে খুব অশান্তিবোধ করায় বলরাম-মন্দিরে যাইয়া মহারাজকে অকপটে বলিয়াই ফেলিলাম, "মহারাজ, আমার কি একটা যেন হয়েছে। সর্বদা আপনার কাছে এসে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। সেজন্য পড়াশুনা করতে পারি না।" তিনি আমার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সে কি রে, পড়াশুনা করবি না তো কি মূর্খ হয়ে থাকবি? এখন থেকে বেশ করে পড়াশুনা করবি।" আমি তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া ছাত্রাবাসে ফিরিলাম। আশ্চর্যের বিষয় তখন হইতেই মন অনেকটা হালকা হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে পাঠ্যপুস্তকও মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলাম। এই ঘটনার পর অনেকদিন আর মহারাজকে দর্শন করিতে যাই নাই—পরীক্ষাও অতি সন্নিকট। মহারাজের কথামতো আমি পড়াশুনা লইয়া খুবই ব্যস্ত রহিয়াছি। তাই মহারাজকে অনেকদিন দর্শন করিতে আসিতে পারি নাই।

একদিন শিবরাত্রির প্রায় দুইদিন পর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মঠের ঠাকুরঘরে (পুরাতন ঠাকুরঘর) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরঘরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছি। ঠাকুরঘরে তখন কেহই ছিলেন না। আমি ধ্যান করিতেছি, এমন সময় মনে হইল, ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে সহসা যেন কেহ আমার সম্মুখে ভারী পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এইরূপ মনে হওয়ায় আমি চোখ খুলিয়া তাকাইবামাত্রই দেখিলাম, আমার সম্মুখে পূজ্যপাদ মহারাজ স্বয়ং দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমন্দিরে পরম পূজ্যপাদ মহারাজকে এইভাবে সম্মুখে দেখিয়া আমি এককালে বিস্ময়ে ও আনন্দে নির্বাক হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিতে

উদ্যত হইলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, "থাক, মন্দিরে প্রণাম করতে নেই।" তৎপরে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিবার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি রে, তুই এতদিন আসিসনি! Long absence! এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?"—বলিয়াই বলিলেন, "যা যা, নিচে রামলাল-দাদা আছেন। তাঁকে প্রণাম করগে যা।" মহারাজের অপার স্নেহে আনন্দে আমার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল!

মহারাজ এখন বেলুড় মঠে রহিয়াছেন। দীক্ষা হইতেছে না বলিয়া মনে ভয়ানক অশান্তি হইতেছে। সত্বর পিতৃ-আদেশে দেশেও ফিরিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া একদিন বেলুড় মঠের পুরাতন দ্বিতলবাটীর সম্মুখে অবস্থিত গঙ্গায় স্নান করিবার পাকা ঘাটের সিঁড়ির একপ্রান্তে বসিয়া মনের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলাম। আর মনে মনে গঙ্গা-সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—মহারাজ ভিন্ন অপর কাহারও নিকট হইতে এ জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করিব না, ইহাতে যদি জীবনে কখনও দীক্ষা নাও হয় তাহাতেও দুঃখ নাই, তিনিই আমার জীবনে একমাত্র গুরু। ভাবিলাম—আজ শেষবার মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিব। মহারাজ তখন মঠের দ্বিতলগৃহের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গিয়া সাশ্রুনয়নে দীক্ষার কথা জানাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"পরশু তোর দীক্ষা হয়ে যাবে, দেখিস এ কথা আর কাউকেও যেন বলিসনি।" আমি আনন্দে আটখানা হইয়া হোস্টেলে ফিরিলাম, কিন্তু মহারাজের নিষেধাজ্ঞায় কি মহাবিপদে পড়িলাম! কেমন করিয়া দীক্ষাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিব, তাহা এক সমস্যা হইয়া উঠিল।

আমি দীক্ষার কথা না বলিয়া নীরদকে (স্বামী অখিলানন্দ) কয়েকটি জিনিস আমার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। সে তো জিনিসের তালিকা দেখিয়াই বুঝিয়া ফেলিল যে, আমার দীক্ষা হইবে; সে তখনই আমার অপর বন্ধুটিকে সব বলিয়া দিল এবং তাহারও দীক্ষার সামগ্রীর সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে উভয়ে মঠে উপস্থিত হইলাম, সেদিন আমাদের তিনজনেরই দীক্ষা হইবে। পূর্বের সেই ঠাকুর-মন্দিরের পশ্চিমস্থ পশ্চাৎ দিকের ঘরে দীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা তিনজনে পূর্বদিকের বারান্দায় ফল-পুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত স্ব-স্ব পাত্র সম্মুখে লইয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে দু-জনের ডাক পড়িল। তাহাদের দীক্ষা-সমাপনান্তে আমার ডাক পড়িল। আমি ত্রস্তপদে

সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট আসনে মহারাজের সম্মুখে আসিয়া বসিলাম। সর্বপ্রথমে জনৈকা মহিলা ভক্তের দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্যে একটি হোমের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই হোমাগ্নিতে প্রদত্ত হবি ও বিল্বপত্রের সুগন্ধে ঘরটি তখনও ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, মহারাজকে প্রণাম করিয়া মন কতকটা স্থির করিয়া দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম এবং আমার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার রাতুল চরণে ঢালিয়া দিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। যথারীতি দীক্ষাদি হইয়া গেল; তিনি আমাকে গুরুদক্ষিণা দিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—আমি মনে মনে নিজেকেই দক্ষিণা হিসাবে দিয়াছি বলিয়া চিন্তা করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না রে, কিছু ফলাদিও দক্ষিণা-হিসাবে দিতে হয়।" তিনি আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহা ভাবিয়াই আকুল। যাহা হউক, আমি পাত্র হইতে একটি ফল লইয়া মহারাজের হাতে দিলাম। তিনিও আমার শীর্ষদেশ স্পর্শ করিয়া স্বীয় মন্ত্র জপ করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আজ পবিত্র সুরধুনীতীরে ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের কৃপার অধিকারী হইয়া মনে আনন্দের অবধি রহিল না। আমার মতো অকিঞ্চন একজন যুবককে তিনি চিরকালের জন্য আপনার করিয়া লইলেন—ইহার চেয়ে অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? বেলুড় মঠের সেই স্মরণীয় দিনের পুণ্যস্মৃতি জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

(স্মৃতি-সঞ্চয়ন, স্বামী তেজসানন্দ
প্রকাশক ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচরগণের মধ্যে প্রথমেই শ্রীশ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কথা মনে পড়ে। তাঁহাকে প্রথম কবে দর্শন করিয়াছিলাম তাহা ঠিক মনে নাই। তবে বেশ মনে পড়ে যে একদিন বরাহনগর হইতে আমার সমবয়সী একটি বন্ধুসহ গঙ্গাপার হইয়া বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। বোধ করি, ইহা ১৯১৬ কি ১৯১৭ সালের ঘটনা।

সাধুদর্শন করিতে গেলে কিছু ফল সঙ্গে লইয়া যাইতে হয় বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাই দুইটি ডাব (চার পয়সায়) ক্রয় করিয়া মঠে উপস্থিত হইলাম। খেয়াপার হইয়া গঙ্গাঘাটে উঠিবার সময় দেখিলাম গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি বেঞ্চের উপর একটি সাধু উপবিষ্ট এবং তাঁহার সন্নিকটে কয়েকজন অল্পবয়স্ক সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া কেন যেন মনে হইল যে তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী হইবেন। আমরা দুইবন্ধু তাঁহার পদতলে ডাব দুইটি রাখিয়া প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিবামাত্র তিনি উপস্থিত জনৈক সাধুকে বলিলেন—"এই দুটি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়ে আয়—"। আমরা একটু আশ্চর্য হইলাম। কেননা, ইহার পূর্বে যখনই কোন সাধুর জন্য ফল-মিষ্টান্নাদি নিয়া গিয়াছি তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন যে উহা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য আনিয়াছি কি না। কোন সাধু বা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য আনীত হইলে সেই দ্রব্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হইত না। এস্থলে এই ব্যতিক্রম দেখিয়া স্বাভাবিকরূপেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরে জানিয়াছি যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মানসপুত্র—শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন সত্ত্বা ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের আর একটি আচরণে আমি আরও বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার সঙ্গী যুবক বন্ধুটিকে তাহার নাম, ধাম ও অন্যান্য পরিচয় সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেও আমার

দিকে একবারও তাকাইলেন না। হঠাৎ আমার দিকে তাঁহার সেই দিব্যচক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, "তোকে তো চিনি!" ইহা বলিয়াই আমার সেই বন্ধুটির সহিত আবার অন্য কথা বলিতে লাগিলেন। আমিও অবাক! কেননা, ঐদিনই তো আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম। মঠে যোগ দিবার পর জানিয়াছিলাম যে ভবিষ্যতে কৃপাদানে ধন্য করিবেন এরূপ কিছু কিছু সৌভাগ্যবানকে তিনি অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

ইহার পর আর দুই-তিন বৎসর তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। ১৯১৯-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য ৬কাশী আসি। সেই সময়ে হঠাৎ আমার পূর্ব-পরিচিত ও সহপাঠী (ভবিষ্যতে স্বামী অখিলানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দের) সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা হয়। ৬বিশ্বনাথ ও ৬অন্নপূর্ণার অতি নিকটে অবস্থান করিলেও এখন পর্যন্ত উহাদিগকে দর্শন করিতে যাই নাই। কিন্তু তাহারা, বিশেষত নীরদ নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত একদিন সে আমাকে শ্রদ্ধেয় হরি মহারাজ বা স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট আনিয়া হাজির করিল। তাঁহার গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা ও সহানুভূতি-সূচক কথা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমার একান্ত অলক্ষ্যে আমার ভিতরে ধর্মের সেই প্রসুপ্ত ভাব জাগিতে লাগিল। পূর্বে এইটুকু মাত্র জানিতাম—রাজনীতির সহিত কিছু ধর্ম থাকা প্রয়োজন যাহাতে মনের ও চরিত্রের দৃঢ়তা আসে।

ধর্ম বিষয়ে আমি তখন অতিশয় অজ্ঞ ও সংশয়বাদী। পাশ্চাত্য দর্শন পড়িয়া মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভগবান কখনই দর্শনগম্য নহেন, তিনি যুক্তি-তর্কেরই বিষয়। তবে তাঁহাকে চিন্তা করিলে মনে কিছু নৈতিক শক্তি আসিতে পারে—এই মাত্র।

মনের এইরূপ সংশয়াকুল অবস্থায় পূজ্যপাদ হরি মহারাজের দর্শন পাইলাম। তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রভাবে মনের সংশয় ধীরে ধীরে দূর হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল ভগবান শুধু যুক্তি-তর্কের বিষয় নন। উপযুক্ত সাধন-ভজনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করাও সম্ভব। তাঁহাকে অনেকে দর্শন করিয়াছেন। সাধন-ভজন ও সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব। পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে একদিন উহা নিবেদন করিলাম এবং দীক্ষা দিয়া তিনি যাহাতে আমাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন তজ্জন্য মনের আকুতি জানাইলাম। কিন্তু তিনি গম্ভীর হইয়া স্মিতহাস্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া শুধু বলিলেন, "আমরা তো কাউকে দীক্ষা দিই না।" অত্যন্ত বিষণ্ণ ও

হতচিত্ত হইয়া সেখানেই বসিয়া রহিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি পরক্ষণেই কৃপাপূর্বক বলিলেন, "তোমাকে আমরা এমন একজনের নিকট পাঠাবো যিনি আধ্যাত্মিকতায় আমাদের সকলের চেয়ে অনেক উচ্চে।"

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। পাঠ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা (তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি) মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তবুও পূজ্যপাদ হরি মহারাজের আদেশে পাঠ সমাপ্ত করিতে কলকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহারই নির্দেশে একদিন সকালে বাগবাজারের বলরাম মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম, দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির পাশে একটি ছোট ঘরে একটি ক্ষুদ্র তক্তপোশের উপরে শ্রীশ্রীমহারাজ বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে অল্প কয়েকজন ভক্ত। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া আমিও তাঁহাদের পাশে বসিলাম। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। আশ্চর্য হইয়া শুনিলাম যে এখানেও সেই বিশ্বযুদ্ধের কথাই আলোচিত হইতেছে। উপস্থিত ভক্তদের একজন জার্মানপক্ষ অপর একজন ইংরাজপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন ও উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ জয়ী হইবে—উত্তেজিত হইয়া এরূপ তর্ক করিতেছেন। শ্রীশ্রীমহারাজ যেন উহা খুবই উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার সেই ছোট্ট গড়গড়ায় ধূমপান করিতে করিতে একবার এদিকের পক্ষ ও পরক্ষণেই অপর পক্ষ গ্রহণ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত উহাতে যোগ দিতেছেন। আমি তো দেখিয়া অবাক! আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি? ইনি তো আমাদেরই ন্যায় রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত! ইনি আবার কিরূপে পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দজী অপেক্ষা অনেক উন্নত ইত্যাদি অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরেই দেখি যে সেখানকার আবহাওয়া একেবারে অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ আর কোন কথা না বলিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের কথা নিবেদন করিতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি সহসা উঠিয়া পড়িয়া রাস্তার দিকের সরু বারান্দায় গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্বের মূর্তি আর নাই। আমি চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, কোন এক অজ্ঞাত ভয় ও বিস্ময় যেন আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ বোধহয় কৃপা করিয়াই তিনি আমার সম্মুখে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমিও ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "মহারাজ, পূজনীয় হরি মহারাজ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।"

আর কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। শ্রীশ্রীমহারাজ সস্নেহে আমার দিকে একটু তাকাইয়া শুধু বলিলেন, "বাবা, ভগবানই একমাত্র সত্য!" জানি না, কিভাবে তিনি একথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মনে প্রচুর শান্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠ আর সমাপ্ত হইল না। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম কৃপায় কয়েক মাস পরে মঠে যোগদান করিলাম। আমার ন্যায় আরও কয়েকজন যুবক সেই সময়ে মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম স্নেহে আমরা বর্ধিত হইতে লাগিলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) মাঝে মাঝে উদ্বোধন হইতে মঠে আসিতেন। পূজনীয় অভেদানন্দজী মহারাজও দীর্ঘ ২৫ বৎসর আমেরিকা প্রবাসের পর মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে মঠ তখন ভরপুর। আমাদের আর কিছু চাহিবার আছে বলিয়া তখন মনে হইত না। ইঁহাদের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা আমরা যথাসাধ্য করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একজন সাধু ত্রস্তব্যস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, "ওহে, শুনেছ, মহারাজ আসছেন। এইবার তোমরা মঠের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্কের দর্শন পাবে।" তাঁহার কথার অর্থ তখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। শ্রীশ্রীমহারাজকে ইতঃপূর্বে দুইবার তো দেখিয়াছি। সুতরাং তাঁহা হইতে আর নূতন কি পাইব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখিলাম নানাদিক হইতে সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া মঠে সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই এক কথা—"মহারাজ আসছেন, মহারাজ আসছেন!" তাঁহার নিকট হইতে না জানি, তাঁহারা কি মহারত্নের সন্ধান পাইবেন!

যথাসময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ আসিয়া পৌঁছিলেন। সত্য সত্যই দেখিলাম মঠের আবহাওয়া একেবারেই বদলাইয়া গেল। পূর্বে উহা স্বর্গীয় ছিল, এখন উহা বহুগুণ অধিক দিব্যভাবে পূর্ণ হইল। কতক্ষণে মহারাজের দর্শন পাইবেন, কতক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে দু-একটি কথা শুনিতে পাইবেন, ইহার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। শুধু সাধু বা ভক্ত নন, নানাদিক হইতে শিল্পী, সাহিত্যিক ও অন্যবিধ গুণিগণও মঠে সমবেত হইতে লাগিলেন। আমরা, নবাগত ব্রহ্মচারীরা, তখনও ইহার অর্থ সম্যক বুঝিতে পারি নাই।

এই সময়ে দেখিতাম অতি প্রত্যূষে শ্রীশ্রীমহারাজ শয্যাত্যাগের পর তাঁহার নিত্যকর্মাদি সমাপন করিয়া মঠের দ্বিতলে গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি

আরামকেদারায় আসিয়া বসিতেন। আমরা, নবাগত ব্রহ্মচারীরা, তৎপূর্বেই সেখানে আসিয়া দুই সারিতে বসিয়া জপ-ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। তবুও তাঁহার উপস্থিতিতেই আমাদের জপ-ধ্যান জমিয়া যাইত।

অধিকাংশ সময় তিনি আনমনা দৃষ্টি লইয়া স্থিরভাবে চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন। কখন-কখন বা আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে আমাদের দুই সারির মধ্যে পাদচারণা করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ যখন আরামকেদারায় বসিতেন তখন দেখিতাম তিনি সর্বদাই ভাবস্থ। তাঁহার চক্ষু দুটি ফ্যাল্‌ফ্যালে—শ্রীশ্রীঠাকুরের ডিমে-তা-দেওয়া পাখির অবস্থার মতো। কোনদিকে লক্ষ্য নাই। কি যে দেখিতেছেন বা কি যে শুনিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার নিকটেই একটি গড়গড়া থাকিত। সেবক কলিকাতে তামাক সাজিয়া অতি সন্তর্পণে উহা বসাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ গড়গড়ায় দু-একটি টান দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃতে পড়িয়াছি যোগীর চক্ষু নাকি ঐরূপ হয়। শ্রীশ্রীমহারাজকে যাঁহারা ঐ অবস্থায় না দেখিয়াছেন তাঁহারা উহা কতদূর ধারণা করিতে পারিবেন জানি না, কিন্তু আমরা সত্যই পূর্বের বহু জন্মের সুকৃতিবলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আবার সেই স্বর্গীয় চক্ষের দৃষ্টি একবার যখন কাহারও উপর পড়িত তখন তাহার হৃদয়ে আনন্দস্রোত বহিয়া যাইত। কেন যে এরূপ অনুভূতি হইত তাহা কেহই বলিতে পারিত না। কিন্তু ঐরূপ ভাগ্যবান দু-একজনের মুখে শুনিয়াছি যে সেই দৃষ্টি একবার পড়িলে অন্তত একদিন তাঁহারা আনন্দ-প্লাবিত হইয়া রহিতেন ও যদি মহারাজ কখনও কাহাকেও স্পর্শ করিতেন তাহা হইলে অন্তত তিন দিন ধরিয়া সেই দিব্যানন্দের ঢেউ তাহার ভিতর বহিয়া যাইত।

দীর্ঘ সময় এইভাবে কাটিয়া যাইত। সূর্যোদয় হইলে প্রথমে শ্রীশ্রীমহারাজের গুরুভ্রাতাগণ ও পরে মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের জপ-ধ্যানাদি সারিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে আসিতেন। দেখিতাম, পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অভেদানন্দ মহারাজ ভূমিষ্ঠ হইয়া "সুপ্রভাত" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হইয়া ও পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার সদ্যোধ্যানোত্থিত, উন্মনা চক্ষু দুটি লইয়া হাতজোড় করিয়া "সুপ্রভাত, মহারাজ সুপ্রভাত" বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিতেন। মহারাজ প্রত্যেককেই "সুপ্রভাত" বলিয়া প্রণামের প্রত্যুত্তর

দিতেছেন। শুধু মহাপুরুষ মহারাজের বেলায় "সুপ্রভাত, তারকদা, সুপ্রভাত" ইত্যাদি বলিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় বলিয়াই বোধ হয়, এরূপ করিতেন।

ইহার পর অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও সহিত দু-একটি কথা বলিয়া, কাহারও সহিত বা একটু 'ফস্টিনস্টি' করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। কিন্তু দেখিতাম সকলের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইত।

সকালে কাজের ঘণ্টা পড়িলে আমরা নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাইতাম। শ্রীশ্রীমহারাজও সামান্য কিছু খাইয়া মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহাকে এ সময়ে যে মূর্তিতে দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিবার নয়। দেখিতাম, শ্রীশ্রীমহারাজ ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সেবক তাঁহার মাথায় একটি ছাতা ধরিয়া অতি দ্রুতপদে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। কেন জানি না, তখন মনে হইত, শ্রীশ্রীমহারাজের শরীর যেন দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। চলিবার সময় তাঁহার পা-দুটি যেন ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। তাঁহার এ মূর্তি যখনই দেখিবার সৌভাগ্য হইত, তখনই একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতাম।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর আমরা আবার শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট মিলিত হইতাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহারাজের গুরুভ্রাতাগণ, সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দজী), শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দজী) প্রভৃতি স্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যগণ ও অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ যাঁহারাই তখন মঠে থাকিতেন, সকলেই আসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। কেহ বা চেয়ারে বসিতেন, কেহ বা আমাদের সহিত মেঝেতে বসিয়া যাইতেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া থাকিবার পর, শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের বলিতেন, "তোদের কার কি প্রশ্ন আছে, কর, না হয় পেসনকেই (হরিপ্রসন্ন মহারাজ বা বিজ্ঞান মহারাজকেই) কর।" আমাদের মুখে প্রায়ই কোন প্রশ্ন যোগাইত না, তখন মহারাজ নিজেই আমাদের হইয়া বিজ্ঞান মহারাজকে প্রশ্ন করিতেন। দেখিতাম, ছোট ছেলে মাস্টারের নিকট পড়া দিবার সময় যেমন ভয়ে জড়সড় হয়, বিজ্ঞান মহারাজও সেইরূপ অতি সংকোচের সহিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। পরে ঐ প্রশ্নই আবার অন্যান্য মহারাজগণকে করা হইত। তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবানুযায়ী উহার যথাযথ উত্তর দিতেন। প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সুন্দর বলিয়া

মনে হইত এবং আমাদের নিকট একটি নূতন আলোকপাত করিত। কিন্তু সর্বশেষে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন উহার উত্তর দিতেন, তখন মনে হইত, ইহাই তো উহার শেষ উত্তর, ইহা না হইলে উহা হয়তো কিছু অপূর্ণ থাকিয়া যাইত।

এইরূপে একদিন শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "তোরা প্রশ্ন কর তো, ভগবানকে দর্শন করলে তার অবস্থা কিরূপ হয়।" ঐভাবে প্রশ্নটি সকলের নিকট ঘুরিল। সকলেই অত্যন্ত চমৎকার উত্তর দিলেন, কিন্তু পরিশেষে যখন মহারাজ বলিলেন, "কেন, উপনিষদের সেই শ্লোকটি বল না—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'॥"—(তাঁহাকে দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া যায়, সর্ব সংশয় দূর হয়, সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।) তখন মনে হইল—ইহাই তো ঠিক উত্তর, ভগবদ্দর্শন হইলে এইরূপই তো হইবার কথা।

এইরূপ সকালে বিকালে শ্রীশ্রীমহারাজের চরণপ্রান্তে বসিয়া আনন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন একটি বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। স্বামী শুদ্ধানন্দজী তখন মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক, বেলুড় মঠের কিছু কিছু কাজও তিনি দেখিতেন। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত, নিরভিমান ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং আমাদের সকল কাজে আন্তরিক উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমরা সকলে শ্রীশ্রীমহারাজের অমৃতোপম কথা শুনিতেছি, তিনি মঠের কর্মপরিচালক ও আর একজন সাধুকে লইয়া হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটু উত্তেজিতভাবেই বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে।" শ্রীশ্রীমহারাজ অন্তর্দ্রষ্টা, তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন ও বলিলেন, "বল সুধীর (শুদ্ধানন্দ মহারাজ), তোমার কি বলবার আছে?" তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এই সকল ছেলেরা আপনার নিকট বসে আপনার উপদেশ শুনছে। অথচ, মঠের কাজকর্ম করতে হলে এরা প্রায় কেউ কিছু করে না। এইভাবে চললে, আমাদের পক্ষে মঠের কাজ চালানো খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। মহারাজ, তাই আপনার কাছে নিবেদন, আপনি দয়া করে আমাদের অনুমতি দিন যে যারা কাজ করতে চায় না তাদের আমরা যেন মঠ থেকে বের করে দিতে পারি।"

শ্রীশ্রীমহারাজ এতক্ষণ তাঁহার কোন কথার উত্তর দেন নাই, কিছু পরে যখন তিনি (শুদ্ধানন্দ মহারাজ) বলিলেন, "মহারাজ, আর একটি নিবেদন, আমরা

বের করে দিলে ওরা যেন আপনার এখানেও আশ্রয় না পায়।" তখন মহারাজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি একটু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বলছো, সুধীর? তোমাদের কেবল কাজ আর কাজ; এই সব ছেলে যার জন্যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, যার জন্যে সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছে, তার কতদূর কি হলো—তোমরা কি কখনও ওদের তা জিজ্ঞাসা কর? কখনও কি খোঁজ নাও, এরা কে কতটুকু ধ্যান-জপ করে? আমি তো দেখছি এরা প্রায় কেউই কিছুই করে না। কেউ বা একটু আরাত্রিকে যায়, আবার কেউ বা তাও যায় না। এই জন্যেই তো আমি এদের নিয়ে বসি। ...কোথায় তোমাদের পূর্ব সাধন-ভজনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এদের এ বিষয়ে একটু সাহায্য করবে, না, কেবল কাজ আর কাজ!"

এমন সময়ে একজন প্রাচীন মহারাজ ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "এরা তো সবই জানে, আমাদের কাছে কি আর শিখবে?" শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "কি বলছো ভাই...? এরা কতটুকু জানে? এই তো সবে ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসেছে! তোমরা যদি এদের কিছু না দাও, এরা কোথা হতে শিখবে? দেখ ভাই, কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। এই দেখ না, দলে দলে ছেলেরা হরিভায়ের (তুরীয়ানন্দজীর) সেবার জন্য কাশী ছুটছে। আর এখানে তোমার আমার একটি সেবক পাচ্ছি না! এরা সেখানে কিছু পায়, তাই যাচ্ছে। আর আমরা এখানে এদের কিছু দিতে পারছি না।" পরে সুধীর মহারাজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আর সুধীর, তুমি এদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে অনুমতি চাচ্ছো, তা তোমরা করতে পার, কিন্তু আমার দরজা এদের জন্যে সর্বদা খোলা থাকবে, আমি কাউকে তাড়িয়ে দিতে পারব না। তোমরা কেবল কাজের কথা বল, কিন্তু আমি তো দেখছি, এখন আমাদের এমন কয়েকজন সাধুর প্রয়োজন, যারা শুধু ধ্যান-ভজন নিয়েই থাকবে।"

আমরা মহারাজের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তাঁহার অপরিসীম দয়া, আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত হইলাম।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাদিগকে পিতার অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি নবাগত আমাদের কয়েকজনকে একদিন মহারাজের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই সব ছেলেরা নূতন এসেছে। এরা তোমার নিকট দীক্ষা নিতে চায়; এরা সকলেই ভাল ছেলে। তুমি দীক্ষা দিলে এরা কৃতার্থ হবে।" কিন্তু

মহারাজ তখন সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না। পরে অন্য এক সময়ে যখন আমরা তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, তখন হঠাৎ বলিলেন—"তোরা দীক্ষা চাস? তা বাবা, আগে জঙ্গল পরিষ্কার কর। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষাদি শিক্ষা কর। তারপর দীক্ষার কথা বলিস, জঙ্গলে বীজ ফেলে কি হবে?"

কিন্তু শ্রীশ্রীমহারাজ অতি কৃপাপরবশ হইয়া এবার আমাদের কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্য দিলেন। ব্রহ্মচর্যের পরের দিন যখন আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, তখন অতি স্নেহপূর্ণ চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্, কালী (স্বামী অভেদানন্দ) বলছে যে তোরা তো আমাদের মতো কখনও ভিক্ষা করলি না, সাধুজীবনের কঠোরতাও বুঝলি না, তা এখন যখন তোদের ব্রহ্মচর্য হলো তখন তোরা তিন দিন ভিক্ষা করে খা। এ তো ভাল কথা, কি বলিস?" আমরা মহারাজের অন্তরের কোমলতার কথা বুঝিতে পারিলাম ও বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, নিশ্চয়ই আমরা তিনদিন ভিক্ষা করে খাবো।"

শ্রীমৎ অভেদানন্দজী মহারাজ দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের সাধন-ভজনের সময় কত কঠোরতা করিয়াছেন। কতদিন অর্ধাশনে, অনশনে বা সামান্য ভিক্ষায় তাঁহাদের দিন কাটাইতে হইয়াছে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া এ কথা আমাদিগকে ও পূজনীয় মহারাজদিগকে প্রায়ই বলিতেন এবং আমরাও আমাদের বর্তমান সাধন-ভজনের সময় ঐরূপ কিছু কঠোরতা কেন করিব না—ইহা লইয়া শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। কিন্তু আমাদের শরীর ও মন যে উহার অনুকূল নহে, দেশের হাওয়াও যে বর্তমানে অনেক বদলাইয়াছে—বহুদিন প্রবাসে থাকায় একথা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না। অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ ইহা বুঝিতেন এবং আমাদিগকে ঐরূপ কঠোরতা করিতে নিষেধই করিতেন।

যাহা হউক, যথাসময়ে আমরা ভিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে যাইতেছি, এমন সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজের একজন সেবক আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ এখনই তোমাদের সকলকে (নূতন ব্রহ্মচারীদের) ডাকছেন।"

আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি পূর্ববৎ সস্নেহে বলিলেন, "তোরা ভিক্ষা করতে যাচ্ছিস তো?" আমরা বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ!" তদুত্তরে তিনি কোমল হইতে আরও কোমল হইয়া বলিলেন, "দেখ, তোদের ভিক্ষার জন্যে সূয্যি (সূর্য মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দ, শ্রীশ্রীমহারাজের সেবক) আজ এই পাঁচ টাকা দিয়েছে। তোরা এই দিয়েই আজ বাজার হতে চাল প্রভৃতি

কিনে নিয়ে আয় এবং মঠের এক গাছের নিচে বসে রান্না করে খা। তাহলেই তোদের ভিক্ষার কাজ হবে।”

আমরা শ্রীশ্রীমহারাজের অন্তরের কথা বুঝিলাম; এবং সেইরূপ বাজার হইতে চাউল প্রভৃতি আনিয়া সেইদিন ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করিয়া খাইলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও আমাদের নিকট আসিয়া “ভিক্ষান্ন পবিত্রান্ন” বলিয়া আমাদের নিকট হইতে উহার কিছু চাহিয়া খাইলেন। পরের দুইদিনও, যতদূর মনে পড়ে, আমাদের ভিক্ষার ব্যাপার ঐরূপেই সমাধা হইয়াছিল। বাহিরে একদিনও যাইতে হয় নাই।

এইরূপ মাতৃবৎ কোমল অন্তঃকরণ লইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদিগকে পরিচালিত করিতেন।

এ বৎসর আমাদের কাহারও আর দীক্ষা হইল না। পর বৎসর, ১৯২১ সালে, শ্রীশ্রীমহারাজ ৺কাশী যাইবার পথে কয়েকদিনের জন্য মঠে আসিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কাশীর উভয় আশ্রমের মধ্যে কি লইয়া বহুদিন হইল একটা গোলমাল চলিতেছে। উহা মিটাইবার জন্য স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজকে সেখানে লইয়া যাইতেছেন।

যথাসময়ে মহারাজ ৺কাশী রওনা হইয়া গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম, ঐ বিষয়ে তিনি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, শুধু তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভায় সেখানকার উভয় আশ্রম আলোকিত করিয়া বসিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সকালে বিকালে এবং সময় পাইলেই অন্য সময়েও তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও আলাপনে নিজদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল গোলমাল, ভেদ-বিবাদ মিটিয়া গেল। সেখানে যাঁহারা কর্মযোগী তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বামীজীর শিষ্যও ছিলেন—যাঁহারা কখনও সন্ন্যাস লইবেন না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—তাঁহারাও একে একে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আর যাঁহারা কর্মকে সাধন-ভজনের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও স্বামীজীর প্রবর্তিত নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে আপনাদিগকে তাহাতে নিবেদিত করিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের আধ্যাত্মিক প্রভাবে শুধু আমাদের আশ্রম দুটি নয়, সমগ্র কাশীধাম আনন্দে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এই সময়ে ৺কাশী অদ্বৈত আশ্রম হইতে জনৈক সাধু তাঁহার এক গুরুভ্রাতাকে এ বিষয় লিখিয়া জানাইলে তিনি আনন্দে ভরপুর হইয়া ঐ চিঠিখানি লইয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে

উহার মর্ম নিবেদন করিলেন। আমরা দেখিলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ঐ চিঠিখানি তাঁহার হাত হইতে চাহিয়া লইলেন এবং পুনঃ পুনঃ উহাতে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তা হবে না? তা হবে না? যাঁকে চকিতে দর্শন করলে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়, তাঁকে যিনি সতত দর্শন করছেন, তাঁর উপস্থিতিতে ঐরূপ হবে না! ঐরূপ হবে না! লিখে দাও শ্রীশ্রীমহারাজের ঐ পুণ্য সঙ্গ হতে কেউ যেন বিচ্যুত না হয়। সকলকে প্রাণ ভরে তাঁর এই পুণ্য সঙ্গ উপভোগ করতে বলো।"

আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলাম। বুঝিলাম, ইঁহারাই ইঁহাদের পরস্পরকে বুঝিতে সক্ষম। আমরা আর কতটুকু বুঝিতে পারি!

যথাসময়ে ৺কাশীকে আনন্দরসে ভরপুর করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি খুবই উদার। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "তারকদা, এবার আমি এদের (আমাদের দেখাইয়া) দীক্ষা দেবো ঠিক করেছি। তবে এবার আর খালি হাতে হবে না। প্রত্যেককে ১০১ টাকা করে দক্ষিণা দিতে হবে, কি বলেন?" মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের রহস্য বুঝিতেন, তিনিও মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিকই তো, খালি হাতে কেন দেবে? এরা ১০১ টাকা যোগাড় করুক।" তাঁহারা উভয়েই জানিতেন, আমরাও জানিতাম, উহা যোগাড় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

যথাসময়ে আমাদের দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষান্তে আমরা শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিলাম; কিন্তু ১০১ টাকা দিয়া নহে, সামান্য কিছু ফুল-ফল দিয়া, যাহা শ্রীশ্রীমহারাজই নিজ হাতে আমাদের তুলিয়া দিয়াছেন। আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলাম। তাঁহার স্নেহময় দৃষ্টিতে, তাঁহার দিব্য স্পর্শে আমাদের হৃদয় ভরপুর হইয়া গেল। কিন্তু তখন আমরা ভাবিতে পারি নাই যে, এই আনন্দ এক ভবিষ্যৎ মহা নিরানন্দের সূচনা করিতেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ এবার "হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া" দিতেছেন। নির্বিচারে তাঁহার শেষ স্নেহের কণাটুকু দিয়া তিনি আমাদের সকলকে ধন্য করিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পর ব্যক্তিগত কাজে আমাকে একটু পূর্বাশ্রমে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে একদিন একাকী বসিয়া আছি, হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখখানি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, ইনিই আমার সর্বাপেক্ষা আপন, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আমার গুরু, আমার ইষ্ট, আমার জীবনের একমাত্র পথ-প্রদর্শক। খুব সম্ভব, ইহারই পরের দিন মঠ হইতে আমার

এক বন্ধুর চিঠি পাইলাম—"মহারাজ কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শীঘ্র চলিয়া আইস।" আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরদিনই চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সমস্ত মঠ নীরব, নিথর। সকলেই যেন কি এক মহা অশুভের আশঙ্কা করিতেছেন। বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীমহারাজ অসুস্থ হইয়া আছেন। আর দলে দলে সাধুগণ সেখানে তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিতে ছুটিতেছেন। আমরাও সেখানে গিয়া তাঁহার পুণ্য-দর্শন পাইলাম। ইহার দু-একদিন পরে শুনিলাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত সকল সাধুকে পূর্বরাত্রে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া দিব্য আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি যে সেই ব্রজের রাখাল, যাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দিব্যচক্ষে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিতে দেখিয়াছিলেন, ভাবমুখে এই কথা তিনি পুনঃ পুনঃ সকলকে শুনাইয়াছেন। অন্যান্য মহারাজগণ বুঝিলেন, আমরাও বুঝিলাম—এইবার তাঁহার লীলা-সংবরণের দিন আসিয়াছে। ইহার দুইদিন পরেই ১৯২২-এর ১০ই এপ্রিল। তিনি লীলা-সংবরণ করিয়া দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে মঠে আমরা কয়েকটি অল্পবয়স্ক সাধু বসিয়া আছি। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন—"ভাই, মহারাজ চলে গেলেন। আমার কিন্তু ভাই, মনে হতো মহারাজ আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।" তখন আর একজন বলিলেন, "আমারও ভাই ঐরূপই মনে হতো।" (অর্থাৎ তাহাকেও শ্রীশ্রীমহারাজ সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসিতেন।) আর একজনও অনুরূপ কথা বলিলেন। তখন আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিক বয়স্ক একজন সাধু বলিলেন—"দেখো, মহারাজের ভালবাসা ছিল অগাধ সমুদ্রের মতো। তারই দু-এক বিন্দু জল ছিটিয়ে তিনি আমাদের পরিতৃপ্ত করতেন। আর আমরা ভাবতাম—গোটা সমুদ্রটিই বুঝি আমরা পেয়ে গেছি। কিন্তু, সমুদ্র—যে-সমুদ্র সে-সমুদ্রই থেকে গিয়েছে।" এইরূপ ছিল তাঁহার কামগন্ধহীন সর্বকল্যাণকারী অফুরন্ত, অপূর্ব ভালবাসা।

ইহার বহু বৎসর পরে আমরা কনখলে (হরিদ্বারে) গিয়াছিলাম। সেখানে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় কল্যাণ মহারাজ, আমরা যাহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মতিথি দিবসে কিছু কিছু বলিতে বলিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ৺কাশী প্রভৃতির কথা উঠিলে আমি একটু হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ খুব চালাক ছিলেন।" ইহাতে কল্যাণ মহারাজ খুব ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি তাঁকে কি বুঝেছ,

ছোকরা? তিনি চালাক ছিলেন? স্বামীজী ছিলেন সূর্যের মতো। তাঁর কাছে আমরা কেউ ঘেঁষতে পারতাম না। আর মহারাজ ছিলেন চন্দ্রের মতো। তাঁর স্নিগ্ধ আলোয় আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হতাম। তাঁর কথা আমরা সকলেই শুনতাম। তিনি শুধু সঙ্ঘকর্তা বলে নয়; আমরা প্রত্যেকেই জানতাম, তিনি আমাদের যা বলেছেন, তা আমাদেরই পরম কল্যাণের জন্য। এজন্য নির্বিচারে আমরা সকলে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি বুদ্ধিমান বা চালাক ছিলেন বলে নয়।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া সেদিন আমরা অন্তরে অন্তরে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, ইহাই হইল শ্রীশ্রীমহারাজের যথার্থ পরিচয়।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্নেহের অভিব্যক্তির কথা এখানে একটু লিখিলে, বোধহয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উহা ছিল সাধারণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, আমরা দেখিয়াছি, তাহার প্রতি একেবারে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেন। সে হয়ত দিনের পর দিন অন্যের সহিত তাঁহার সামনে বসিয়া আছে। তিনি সেই সকল ব্যক্তির সহিত হয়ত কথা কহিতেছেন বা তাহাদের লইয়া অন্য নানা প্রকারের আনন্দ করিতেছেন, কিন্তু সেই স্নেহভাজনের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইতেছেন না। হঠাৎ একদিন তাঁহার সেই দিব্য অমৃতবর্ষী চক্ষু লইয়া তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। আর দিনভর সেই আনন্দের রেশ তাহার হৃদয়ে রহিয়া গেল। আর যদি কৃপা করিয়া তিনি তাহাকে একবার স্পর্শ করিতেন তো সে আনন্দ অন্তত তিনদিন তাহার মনে স্থায়ী হইয়া রহিল! ইহা কোন অতিরঞ্জন বা কল্পনার কথা নয়। উপভোক্তাগণের নিজমুখে আমরা ইহা শুনিয়াছি এবং উহার একটু-আধটু ছিটা-ফোঁটা আমাদেরও সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। এইরূপই ছিল এই অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক ভালবাসা—যাহার কণামাত্র পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

(পুণ্যস্মৃতি ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম প্রেসিডেন্ট। সঙ্ঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে যাকে 'রুল' (rule) করা, শাসন করা বলে, সেরকমভাবে তিনি সঙ্ঘকে চালাতেন না। বেশির ভাগ সময়ই তিনি মৌন থাকতেন, কথা কম বলতেন। তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘ এইভাবে চলেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে 'লেখাপড়া' বলে তা তাঁর খুব বেশি ছিল না। সেদিক দিয়ে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান' হবার উপযুক্ত। তবে তিনি এন্ট্রান্স ক্লাস অবধি পড়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর বলতেন ঃ "রাখালের রাজবুদ্ধি, সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।" তাই স্বামীজী এই 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য' পরিচালনার ভার মহারাজের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'মহারাজ' বলতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বোঝায়, যেমন 'স্বামীজী' বললে স্বামী বিবেকানন্দকে বোঝায়। অথবা তাঁকে বলা হয় 'রাজা মহারাজ'। 'রাজা' নামটি স্বামীজীর দেওয়া। ঐ যে ঠাকুর বলতেন রাখালের রাজবুদ্ধির কথা, তাঁর রাজ্য-চালনার ক্ষমতার কথা। তা থেকেই স্বামীজী বলতেন ঃ "রাখাল আমাদের রাজা।" আরেকটি কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 'মানসপুত্র'। সেজন্য তাঁকেই স্বামীজী সঙ্ঘের নেতৃত্বে বসিয়েছিলেন এবং বসিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

মহারাজ কারো প্রতি নির্মম ব্যবহার করতে পারতেন না এবং অপর কেউ করছে দেখলে তিনি ব্যথা পেতেন। তাঁর স্বভাব ছিল এতই কোমল। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। ঠাকুরের মতো খেলার সময় ধর্মবিষয়ক গান গাইতেন। অনেক বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল। আবার স্বামীজীর মতো তিনিও তাঁর সঙ্গীদের নেতা ছিলেন। তবে ঠাকুর অখ্যাত গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, গ্রামের বাইরে তাঁদের কোন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু মহারাজ জন্মেছিলেন সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে।

ঠাকুর বলতেন ঃ "সংসারী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার কান

ঝালাপালা হয়ে গেল। মন এত ঘোরতর সংসারী লোকের সঙ্গে থাকতে পারে না। একটি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে যদি আমার কাছে থাকত তাহলে বেশ আনন্দে থাকা যেত।" একদিন দেখলেন বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। হৃদয়কে সেই দর্শনের কথা বলতে তিনি বললেনঃ "মামা, তোমার ছেলে হবে।" পরে একদিন ভাবচক্ষে দেখলেন—গঙ্গায় একটি পদ্ম ভাসছে, তার ওপর বালক শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এক বালকসখার সঙ্গে নাচছেন। রাখাল মহারাজকে যখন প্রথম ঠাকুর দেখলেন তখনই তাঁর মনে হলো—এই তো সেই ছেলেটি, যাকে কৃষ্ণসখারূপে তিনি গঙ্গায় দেখেছিলেন। দৈববাণী শুনেছিলেনঃ "রাখাল তোমার মানসপুত্র। তোমার কাছে থাকবে, তোমার ভাবের ধারণা করতে পারবে।"

ঠাকুরের কাছে আসবার আগেই রাখালের বিবাহ হয়েছিল। অল্পবয়স থেকেই তাঁর সংসারে মন নেই দেখে তাঁর বাবা, যিনি একজন বিষয়ী লোক, স্থির করলেন ছেলের মনকে সংসারে আকৃষ্ট করতে হলে তাঁকে বিয়ে দিতে হবে। দৈববিধানে বিয়ে হলো একটি ভক্ত-পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। ঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত মনোমোহন মিত্রের বোনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মনোমোহনই মহারাজকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর তাঁকে চিনলেন। কিন্তু তা প্রকাশ না করে তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ করলেন। মহারাজও অন্তরে ঠাকুরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেন।

মহারাজ বাল্যে মাতৃহারা হওয়ায় বিমাতা তাঁকে লালনপালন করেছিলেন। কিন্তু বিমাতা সাধারণ বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করেননি, মহারাজকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। ঠাকুরকে প্রথম দেখেই মহারাজ ঠাকুরের ভিতর যেন তাঁর স্বর্গগতা মাকে দেখতে পেলেন এবং মাতৃভাবে ঠাকুরকে গ্রহণ করলেন। বিচিত্র ব্যাপার! স্বামী শিবানন্দও ঠাকুরকে মাতৃভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে মহারাজ যেমন ঠাকুরের সঙ্গে অসঙ্কোচে ব্যবহার করতেন, অন্য পার্ষদরা তা করেননি। ঠাকুরকে তিনি প্রথম থেকেই একান্ত আপনার করে নিয়েছিলেন। ঠাকুরও প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গে সেইমতো ব্যবহার করেছেন।

ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় মহারাজ যুবক, অল্পবয়সী নন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল চার-পাঁচ বছরের বালকের মতো—ছোট ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করে সেইরকম। ঠাকুর পরবর্তী কালে বলেছেন, রাখাল খেলার মাঝে ছুটে এসে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং আশ্চর্যের কথা, ছোট ছেলেরা যেমন মায়ের স্তন্যপান করে মহারাজও তেমনি ঠাকুরের স্তন্যপান

করতেন! বিচিত্র হলেও আসলে ঠাকুরের মধ্যে তিনি মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দর্শন করেছেন বলেই এই ব্যবহার তাঁর পক্ষে ছিল শোভন।

পরবর্তী কালে শুনেছি, মহারাজের চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গি অনেকটা ঠাকুরের মতো ছিল। পিছন দিক থেকে দেখলে মহারাজকে ঠাকুর বলে ভ্রম হতো। পিতাপুত্রের যেমন সাদৃশ্য থাকে সেইরকম। ঠাকুরের সংসর্গে আসার আগেই তাঁর মনে ধর্মভাব প্রবল ছিল এবং সেই প্রেরণাবশে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরের কাছে আসার অল্পদিন পরেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। আগে থেকেই দুজনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ঠাকুরের সান্নিধ্যে তা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হলেও ঠাকুরের কাছে আসার পরে ঠাকুর মন্দিরে গেলে মহারাজও সঙ্গে যেতেন এবং ঠাকুরের দেখাদেখি মা কালীকে প্রণাম করতেন। ব্রাহ্মসমাজের কট্টর সদস্য স্বামীজী তা দেখে জনান্তিকে মহারাজকে বলেন ঃ "তুমি না ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছ, সেখানে দেবদেবীকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ। তুমি যে করছ এতো কপটতা।" বন্ধু হলেও স্বামীজীর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সামনে তিনি যেন ঐ কথায় জড়সড় হয়ে গেলেন, কোন জবাব দিতে পারলেন না। ঠাকুর তাঁর সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য স্বামীজীকে বললেন ঃ "তুই ওকে বকেছিস? তুই না মানিস, ওকে বারণ করিস কেন?" ঠাকুরের কথায় স্বামীজী নিবৃত্ত হন। সগুণভাবে ভগবানকে আস্বাদন করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে ছিল বলে সেই ভাবটিই মহারাজের ব্যবহারে ফুটে উঠেছিল।

ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব যেমন স্বামীজীকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল, তেমনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে মহারাজও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে কতকটা মুক্ত হলেন। কিন্তু দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব চিরকাল ছিল। স্বামীজী বলতেন ঃ "আমি জানি, সবাই আমাকে পরিত্যাগ করলেও রাখাল কখনো করবে না।" মহারাজের ওপর তাঁর এমনই বিশ্বাস ছিল।

লেখাপড়ায় মহারাজের মন ছিল না, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। সেই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়েই স্বামীজী প্রথম থেকেই তাঁকে সঙ্ঘের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ঠাকুর স্বয়ং স্বামীজীকে সঙ্ঘনেতা নির্বাচন করে গিয়েছিলেন। স্বামীজী আবার তাঁর উত্তরাধিকারিরূপে মহারাজকে নির্বাচন করেছিলেন। কিভাবে এই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন তার কিছু কিছু দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। ঠাকুরের কাছে যখন মহারাজ ছিলেন তখন তাঁর দ্বারা

অনুপ্রাণিত হয়ে ধ্যান-ধারণা, কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন। তারপর ঠাকুরের স্থূলশরীর সংবরণের পর তাঁর অন্যান্য সন্তানদের মতো মহারাজও তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় পাহাড়ে পর্বতে তপস্যায় চলে যান। আরও উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তপস্যায় নিমগ্ন হন। তপস্যাপ্রবণ ঐ ভাবটি বরাবরই তাঁর ভিতর প্রবল ছিল।

মহারাজ ছিলেন ধনীর সন্তান। তিনি আজন্ম বিলাসে লালিত। ঠাকুরের কাছেও তিনি অতি যত্নে বড় হয়ে উঠেছেন, কিন্তু পরে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন, নানা জায়গায় তপস্যায় কাটিয়েছেন। বৃন্দাবনের কাছে কুসুম সরোবর আছে। সেখানে সাধুদের ত্যাগ না করে উপায় নেই! কারো কিছু থাকলে চোর-ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে। কারো কাছে একটি কম্বল থাকলেও চোরে এসে নিয়ে যাবে। সেখানে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে তিনি শীত কাটাতেন, যা চোরেও নেবে না। আর ভিক্ষার মধ্যে পাওয়া যেত শুধু রুটি, তাই জলে ভিজিয়ে নরম করে তিনি খেতেন। দিনান্তে এই ভোজন, আর বাকি সময় ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকা। তিনি আর স্বামী তুরীয়ানন্দ একসঙ্গে তপস্যায় ছিলেন। যে-ঘরে মহারাজ থাকতেন সেই ঘর আমরা পরে দেখে এসেছি। ঠাণ্ডা পাথরের বাড়ি। শীতের সময় দারুণ ঠাণ্ডা। আশপাশে দরিদ্র লোকদের বাস। কোন সাধু ভিক্ষা করতে গেলে তারা আর কি দেবে! তারা শুকনো রুটি দিত, তাতেই জীবনধারণ। কিন্তু মহারাজের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এমনই তপস্যার ভাব মহারাজের চিরকাল ছিল এবং পরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ভিতর যাতে এই ভাব সবসময় জাগ্রত থাকে এইজন্য জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন তিনি। তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো, কখনো রূঢ় কথা বা নীতিবাক্য বলে তিনি শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু এমন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন, তারা শুধরে যেত। এমনকি সাংসারিক বিষয়েও পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি এমন উপদেশ দিতেন যে, লোকে অবাক হয়ে যেত। এইজন্য মহারাজের কাছে সবরকমের লোক আসত। ভগবানের পথের পথিক যাঁরা তাঁরা তো আসতেনই, আবার বিষয়ী লোকেরাও বৈষয়িক পরামর্শ নিতে আসতেন। ঠাকুর যে বলেছিলেন, রাজা একটা রাজ্য চালাতে পারে—সেই রাজ্য চালাতে হলে সবরকম লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়—তা তিনি পারতেন।

মহারাজ সঙ্ঘের নিয়মকানুনের বড় একটা ধার ধারতেন না। কিরকম করে তিনি সঙ্ঘ চালাতেন সে সম্বন্ধে প্রাচীন সাধুদের মুখে আমরা শুনেছি, বিশেষ করে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠের গোড়ার

দিকে সঙ্ঘের পরিচালকবৃন্দের অন্যতম এবং যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary) ছিলেন। সঙ্ঘ পরিচালনার জন্য পরিচালকবৃন্দের মাঝে মাঝে মীটিং-এ বসা প্রয়োজন হয়। মহারাজ মঠের প্রেসিডেন্ট, তিনি না বললে কি করে মীটিং হবে! শুদ্ধানন্দ মহারাজ বললেন ঃ "মহারাজ, আমাদের একটা মীটিং ডাকা দরকার।" মহারাজ উত্তর দেন ঃ "এখন থাক, আমার শরীরটা ভাল না।" তিনি মীটিং পছন্দ করতেন না। বলতেন ঃ "মীটিং-এর নামে আমার জ্বর আসে।" সহজে মীটিং করতে তিনি রাজি হতেন না, অনেক সাধাসাধি করলে তবে রাজি হতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠে হয়তো উপস্থিত নেই, পরিচালকদের অন্যান্যরা বললেন ঃ "মহারাজ, একটা মীটিং করা দরকার।" মহারাজ বললেন, "সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) নেই তো মীটিং কি করে হবে?" মিটিং যখন হয় মহারাজ চুপ করে বসে থাকেন আর একটু একটু তামাক খান। সবাই আলোচনা করছেন, মহারাজ কিছু বলছেনই না। সব তর্ক-বিতর্ক শেষ হলে হয়তো স্বামী শুদ্ধানন্দ বললেন ঃ "মহারাজ, এখন সিদ্ধান্ত কি হবে?" মহারাজ বলে দিলেন ঃ "এই কর।" যা বলে দিলেন তাই লেখা হলো। মহারাজ অত যুক্তিতর্কের ভিতর যেতেন না কিন্তু সকলেই জানত যে, এই পুরুষের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। তর্কের ভিতর দিয়ে নয়, অতীন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে তাঁর এই সিদ্ধান্ত। কাজেই বিনা দ্বিধায় সকলে তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতেন। মহারাজের পরিচালনা ছিল এইরকম। তাঁকে সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং সে-শ্রদ্ধা ভয়মিশ্রিতও বটে! সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর নির্দেশকে কেউ লঙ্ঘন করার কথা চিন্তা করতে পারতেন না।

একবার বাবুরাম মহারাজ মঠের সবজিবাগান থেকে কোন ভক্তকে দু-একটা লাউ দিয়েছেন। বাগানের কাজ বাবুরাম মহারাজই করেন, তিনি দু-একটা লাউ কাউকে দিতেই পারেন। কিন্তু মহারাজ শুনে তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। বাবুরাম মহারাজ প্রথমে বুঝতে পারছেন না কি ব্যাপার। তারপর মহারাজের কাছে গিয়ে বলছেন ঃ "বল, কি তোমার মনের ভাব।" মহারাজ কিছু বললেন না, চুপ করে আছেন। বাবুরাম মহারাজ বুঝলেন, ভক্তকে লাউ দেওয়া তাঁর অন্যায় হয়েছে। তখন মহারাজের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বললেন ঃ "ভাই, ক্ষমা কর।" মহারাজের চেয়ে বাবুরাম মহারাজ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু মহারাজের কাছে এইরকম নত হয়ে থাকতেন। মহারাজের ভাব হচ্ছে, মঠের সম্পত্তি ঠাকুরের সম্পত্তি। সেই সম্পত্তির ওপরে কারো অধিকার নেই, এমনকি স্বামী প্রেমানন্দেরও নয়। এদিক দিয়ে দেখলে, মহারাজ নিজেও কর্তৃত্ব করতেন না।

একবার একটা বিশেষ কারণে মঠের কিছু দেনা হয়েছে? কিরকম দেনা? এক ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা নেওয়া হয়েছে, পরে শোধ হয়ে যাবে। স্বামী সারদানন্দ এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যস, মহারাজ গুম হয়ে গেলেন, আর কথাবার্তা নেই। কি হয়েছে কিছু বলেন না। শেষকালে বললেনঃ "শাকের কড়ি মাছে যাবে?" সারদানন্দ মহারাজ বললেন ঃ "আর এ রকম হবে না।" এইরকম ছোটখাট ব্যাপারেও মহারাজের শাসন ছিল বড় কঠিন। এক চুল এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। তাঁর নির্দেশ ছিল—মঠ-মিশন যেন কোনদিন ধার করে কিছু না করে। তাঁর ইচ্ছায় একটি পয়সা কোথাও ঋণ করবার উপায় ছিল না। তিনি বলতেন ঃ "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা কিভাবে ঋণশোধ করবে? কার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে? এসব চলবে না।" এইভাবে মঠ-মিশন প্রথম থেকেই স্বনির্ভর হয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষা পেয়েছে মহারাজের কাছ থেকে।

এইরকম ঘটনা আরও আছে। শশী মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন মঠ-মিশনের একজন দিকপাল। দক্ষিণ ভারত তিনি উজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি মাদ্রাজ মঠে মহারাজকে নিয়ে যেতেন এবং তাঁকে ঠাকুরের সমমর্যাদা দিতেন। একবার তাঁর কি কথায় বা কাজে মহারাজের মনে একটু অসন্তোষ হয়েছে, কিন্তু কথায় কোনকিছু প্রকাশ করেননি। শুধু শশী মহারাজ মাদ্রাজ যাবার জন্য বললে তিনি আর মাদ্রাজে যেতে চাইলেন না। শশী মহারাজ বুঝলেন, তাঁরই কোন ভুল হয়েছে। তিনি এসে মহারাজের পায়ে পড়ে বললেন ঃ "রাজা, তোমার এ কি বুদ্ধি! আমি কি একটা মানুষ যে, আমার ওপর তুমি রাগ অভিমান কর? আমার মতো কত শশী তোমার প্রস্রাবে বেরিয়ে যায়!" মহারাজ তাঁর বিনয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। আবার মাদ্রাজ গেলেন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের এমন শ্রদ্ধা ছিল বলে সঙ্ঘ এইভাবে গড়ে উঠেছে।

ঠাকুর তাঁর সন্তানদের চিহ্নিত করে প্রত্যেকের জন্য এক-একটি বিশেষ স্থান দিয়ে গিয়েছেন। মহারাজকে স্বামীজীর পরেই সঙ্ঘনেতা নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং। তিনি 'ঠাকুরের সন্তান'—এই ছিল তাঁর পরিচয়। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে তাঁর চেয়ে আরও বিদ্বান অনেকেই ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতাও ছিল না, কখনো সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেননি। কিন্তু আইন-কানুন ভাল জানতেন। তাঁর বাবা জমিদার ছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি শাসনবুদ্ধি পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, কখন কি করতে হয়। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক

শক্তিই ছিল প্রধান। এই আধ্যাত্মিকতার বলেই তিনি সকলকে প্রভাবিত করতেন, সঙ্ঘকে সেইভাবেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

একবার কাশীতে সেবাশ্রম ও অদ্বৈত আশ্রমে সাধুদের ভিতর কোন এক বিষয়ে মনোমালিন্য হয়েছে। সকলেই তো মানুষ, মাঝে মাঝে তাই ভুল বোঝাবুঝি হয়। সাধুদের পরস্পরের মধ্যে বনিবনার অভাবে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। সকলে মহারাজকে বললেন ঃ "আপনি না গেলে সুরাহা হবে না, আপনাকে যেতে হবে।" মহারাজ যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলেন। গিয়ে কাউকে শাসন করা বা পরামর্শ দেওয়া নয়, কোন বিচার বিতর্ক বা আলোচনা নয়, তিনি জপ-ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দেখাদেখি সকলেই বিবাদ-বিতর্ক ভুলে জপ-ধ্যান করতে লাগলেন। কার দোষ, কার অন্যায়—এসব কোন কথাই হলো না। দেখা গেল, তাঁর সান্নিধ্যে পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে সব শান্ত হয়ে গিয়েছে। মহারাজের নেতৃত্বের ছিল এই ধারা। কাউকে বুঝিয়ে স্বমতে নিয়ে আসা নয়, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অপরকে তাঁর অনুবর্তী করতেন। বলতেন, আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কোন কারণে আধ্যাত্মিকতার ত্রুটি হয়, তখনই নানারকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তাই যাতে আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হয় তা করলেই সব শান্ত হয়ে যাবে। কার কি শক্তি, কে কিভাবে সঙ্ঘে কাজ করছে, কাকে কিভাবে চালাতে হবে—সব তিনি জানতেন। কাকে দিয়ে কোন্ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করানো যায় তা তিনি যেমন জানতেন, তেমনি করিয়েও নিতেন। কোন বক্তৃতা না দিয়েও মহারাজ ছিলেন সঙ্ঘে সর্বজয়ী। এটি তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

মহারাজ অনেক সময় কলকাতায় বলরাম মন্দিরে থাকতেন। মঠে তখন খুব ম্যালেরিয়া হতো। বালকস্বভাব মহারাজ ম্যালেরিয়ার ভয়ে মঠে আসতেন না। একবার তিনি খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলেন, সেই থেকে ছেলেমানুষের মতো ভয় হয়েছিল। ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলে তিনি গঙ্গাস্নানেও যেতেন না। তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতে হতো। তেমনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি সত্ত্বেও সহজে মায়ের কাছে যেতেন না। ছোট ছেলে যেমন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে সঙ্কোচ বোধ করে মহারাজ মায়ের কাছে সেইরকম সঙ্কোচ বোধ করতেন। ছেলেমানুষের মতো তাঁকে ধরে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। মা বাইরে থেকে ফিরেছেন, স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে সাধুরা অনেকে গিয়েছেন। মহারাজ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, কাছে যাচ্ছেন না। সকলে

ধরে তাঁকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন 'মা, মা, মা' বলতে বলতে প্রণাম করে তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন। মায়ের সামনে তিনি কোন কথা বলতে পারতেন না। তাঁর প্রবল অনুভূতি কে বুঝবে? একবার মা বললেন ঃ "আমার ভার এক যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) বইতে পারত, আর শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) পারে।" একজন বলছে ঃ "কেন মা, মহারাজ?" মা বললেন ঃ "না, ওর অন্য ভাব, ও এত ঝামেলা সইতে পারে না।"

ছেলেবেলা থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর আনন্দে কেটেছে। তিনি দীর্ঘ জীবন পাননি, কিন্তু সঙ্ঘের সূচনা থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে শরীরত্যাগ পর্যন্ত সঙ্ঘের পরিচালনা করেছেন—আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে বাইশ বছর। মহারাজ কেবল তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সঙ্ঘ পরিচালনা করেছেন, আর কোন কিছুর প্রয়োজন তাঁর হতো না। স্বামীজীর দেহত্যাগ হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। স্বামীজী যখন ছিলেন তখন মহারাজের ওপরেই তিনি সব ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে কোন ব্যাপারে স্বামীজী নিজে সিদ্ধান্ত নিতেন না, শুধু বকুনি দেওয়া ছাড়া। স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক হিসাবে সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ পরিচালনার কাজ করতেন। মহারাজ ঐসবের ভিতরেই যেতেন না। কিন্তু সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন এবং সর্বত্র তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকত। অথচ মানুষ তাঁকে মনে করত, তিনি বিলাসী। বাইরে বোঝা যেত না, এইরকম অদ্ভুত ছিল তাঁর ব্যবহার। মহারাজ তো একেবারে মহারাজ! সবসময় রাজারাজড়ার মতো ব্যবহার। দোলের সময় তিনি খুব আনন্দ করতেন। একবার দেখেছি, আবির এসেছে আর আবির গোলবার জন্য ভক্তরা পাঠিয়েছেন গোলাপজল। তিনি ঐ আবিরগোলা গোলাপজল চারদিকে ছড়াচ্ছেন। এ মহারাজের পক্ষেই সম্ভব। আমরা দেখলাম, আনন্দের হাট বসেছে। অবশ্য তখন সংবাদপত্রে লেখবার লোক ছিল না যে লিখবে—সাধুরা গোলাপজল ছোড়াছুড়ি করছে।

মহারাজ ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে ভালবাসতেন। মহারাজের মাছ-ধরা মহাপুরুষ মহারাজ পছন্দ করতেন না। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ বলে মহারাজ তাঁকে ভয় করতেন। তিনি দেখলে বকবেন এবং তিনি দেখতে পাবেন বলে অন্যদের বলতেন ঃ "ছিপটা নিয়ে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে পুকুরধারে যা। আমি পরে যাচ্ছি।" সাধুরা সেভাবেই লুকিয়ে যেতেন। আর মহারাজ কিছুক্ষণ পর দুহাত নাড়াতে নাড়াতে যেতেন যেন হাতে কিছু নেই। মহাপুরুষ মহারাজ যে বুঝতেন

না তা নয়, বুঝতেন এবং হাসতেন। মহারাজ সঙ্ঘের নেতা, তা বলে বড় ভাইকে কি সম্মান কম করবেন? তাই তাঁর সামনে দিয়ে ছিপ নিয়ে যাওয়া চলে না। তাঁর ব্যবহারের এমনই একটা সুন্দর মাধুর্য ছিল। এটি দেখবার জিনিস, শেখবার জিনিস।

মহারাজ বলতেন ঃ "আমরা ঠাকুরের প্রেমে একসঙ্গে আবদ্ধ হয়ে এই সঙ্ঘ গড়েছি। সুতরাং এই সঙ্ঘের ভিত্তি হলো প্রেম। প্রেম যদি অক্ষুণ্ণ থাকে সঙ্ঘও অক্ষুণ্ণ থাকবে।" তিনি বারবার একথা বলতেন এবং সেইভাবেই সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতেন, আর সকলের ভিতর যাতে এই জিনিসটি প্রেরণারূপে কাজ করে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। এটি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। সঙ্ঘের নেতা হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন প্রেমস্বরূপ, তেমনি সঙ্ঘকে পরিচালনা করেছেন তাঁর অপূর্ব প্রেমের মাধ্যমে।

মহারাজের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। একবার গিরিশবাবুর ভাই অতুলবাবু এক বন্ধুকে মঠে নিয়ে গিয়েছেন। বন্ধুটি কখনো মহারাজকে দেখেননি, তাই সাধু দেখবার জন্য অতুলবাবু তাঁকে মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। মহারাজের কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তখন ছেলেদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করছেন। এ রকম অনেকক্ষণ কাটল। অতুলবাবু ভাবছেন, বন্ধুকে নিয়ে এলাম সাধু দেখাতে আর সাধুর যে কি 'মুড'—একটিও ধর্মকথা বলছেন না, খালি ছেলেদের নিয়ে রঙ্গরস করছেন। বন্ধুটি কি মনে করবে! এ রকম অনেকক্ষণ বসার পর যখন বন্ধুটি উঠছেন তখন মহারাজ বলছেন ঃ "ওগো আমাদের আবার ভাল কথাও হয়।" বন্ধুটি হাতজোড় করে চলে গেলেন। অতুলবাবু ভাবছেন, না জানি বন্ধুটি কি ভাব নিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে বন্ধুটি বলছেন ঃ "আজ একজন আনন্দময় পুরুষকে দেখলাম। শুনেছি যাঁরা আত্মানন্দের সন্ধান পান তাঁরা আনন্দময় হন। এমন আনন্দময় পুরুষ কখনো দেখিনি, আজ দেখলাম।"

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা আমরা তাঁর একজন সেবকের কাছ থেকে শুনেছি। মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে আছেন। তাঁর ঘরের সামনে বৈঠকখানায় অনেক সময় তিনি পায়চারি করতেন, কখনো সেখানে বসতেন। একদিন মহারাজ বৈঠকখানায় বসে আছেন, হঠাৎ সেবকদের বললেন ঃ "তোরা ভিতরের দিকের দরজাগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে বাইরে যা।" তিনি কেন এমন কথা বললেন তারা জানে না। তাদের ঔৎসুক্য, কি ব্যাপার! কিছুক্ষণ পরে তিনটি অল্পবয়সী

ছেলে ভিতরে ঢুকে মহারাজের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছে। কি কথা হচ্ছে সেবকরা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, খুব হাসি-তামাশা আর হৈহৈ হচ্ছে। এভাবে অনেকক্ষণ চলল, তারপর তারা চলে গেল। এবার মহারাজ সেবকদের ডাকলেন। দরজা খোলা হলো।

ঘটনাটি হলো—তিনজন যুবক কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে। তখনকার আধুনিক ছেলে, তারা ঠাকুর-দেবতা, সাধু-সন্ন্যাসী মানে না। এসব বিষয়কে তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপ করে। তারা একটা হোটেলে উঠেছে। কি কি দ্রষ্টব্য আছে জানতে চাওয়ায় হোটেলের মালিক বলেছে ঃ "এখানে কি আর এমন আছে? মন্দির আছে, উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, আর বেলুড় মঠের সাধু আশ্রম আছে। সেখানে যে-মহারাজ আছেন তিনি রাজার মতো আড়ম্বরে থাকেন। তাঁর সোনার গড়গড়া, আর কি ঠাটবাট!" ছেলে তিনটি বলল ঃ "কেন তাঁকে কেউ শিক্ষা দিতে পারে না?" হোটেলের মালিক বলল ঃ "তিনি কত বড় মানুষ! তাঁর কাছে গিয়ে কে কি শিক্ষা দেবে?" ছোকরা তিনজন বলল ঃ "আচ্ছা আমরাই দেখব।" তাই তারা এসেছিল মহারাজকে 'শিক্ষা' দিতে। মহারাজের কাছে এসে তারা খুব আদর আপ্যায়ন পেল। শুধু তাই নয়, তারা যেমন তাদের সঙ্গে ঠিক তেমনি করে তিনি হাসি-তামাশা করলেন। তারা দেখল, মহারাজ তো এসবেও আমাদের হারিয়ে দেবেন। তখন মহারাজের কাছে মাথা নুইয়ে তারা চলে গেল। শিক্ষা দিতে এসে মহারাজের কাছেই তাদের শিক্ষা নিতে হলো—দিনের পর দিন! তাদের সেই উদ্ধত ভাব চলে গেল। শান্ত বিনয়ী হলো। মহারাজের শিক্ষা দেওয়ার ধারা ছিল এইরকম।

তিনি যেন কি করে লোকের ভিতরটা জানতে পারতেন। ঠাকুর যেমন বলতেন ঃ "কাচের আলমারির ভিতরে জিনিস থাকলে যেমন দেখা যায় তেমনি তোমাদের ভিতরটা আমি দেখতে পাই", মহারাজেরও সেইরকম একটা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রত্যেকের ভিতরটা দেখতে পেতেন এবং যে যেমন তার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করতেন। আবার এত লাজুক ছিলেন যে, কেউ আসছে শুনলে তিনি দেখা করতেই চাইতেন না। বলতেন, আমার জ্বর আসছে। কিন্তু যে দর্শনের সুযোগ পেত—প্রশ্ন না করেও তাঁর কাছে বসে সে প্রভাবিত হয়ে যেত। এ রকম ঘটনা অনেক আছে। আমরাও আমাদের অপরিপক্ক বুদ্ধি নিয়ে মহারাজের কাছে যখন যেতাম তখনো তিনি বেশ গল্পসল্প, হাসি-তামাশা করতেন। সৎপ্রসঙ্গও হতো। আর যেদিন অন্য মুড সেদিন বলতেন ঃ "বাবু,

আমার পেটটা বড় খারাপ।" বুঝতাম, আজ আর কথা টথা হবে না। প্রণাম করে চলে আসতাম।

তিনি কখন কিরকম থাকবেন তার ঠিক নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্বের এমন অদ্ভুত প্রভাব, যে-কেউ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারত না। যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন তাঁরা ছিলেন এক-একজন দিকপাল, কিন্তু তাঁর কাছে এলে তাঁরা সব যেন একেবারে স্তিমিত। মহারাজের বেশ কয়েকজন সেবক ছিলেন। তাঁদের ভিতর কেউ গাইয়ে, কেউ বাজিয়ে, কেউ ভাল রান্না করেন, কেউ তাঁর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন। খুব আসর জমিয়ে থাকতে তিনি ভালবাসতেন, যখন যেখানে যেতেন সেখানে কেবল আনন্দের হাট নয়—মহাতীর্থস্থান হয়ে যেত।

মহারাজ কাজকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সাধন-ভজনকে ব্যাহত করে নয়। তিনি মঠে থাকলে সকলেরই তাঁর কাছে বসে গল্প করা, ভজন করা চাই। সকলেই মহারাজের সান্নিধ্যে থাকতে ভালবাসতেন। বাবুরাম মহারাজকে মঠের কাজ চালাতে হয়। তিনি একদিন বললেন ঃ "এত বেলা হয়ে গিয়েছে ছেলেগুলো এখনো কেউ কাজে যায়নি, কি করে মঠের কাজ চলবে?" মহারাজ সেদিন অন্য মুডে ছিলেন। বললেন ঃ "বাবুরাম-দা, এরা যে ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে সে কি কেবল ঘরঝাঁট দিতে, বাগান করতে, তরকারি কুটতে? এদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছু দেখছ?" এমনভাবে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন যে, শুনে বাবুরাম মহারাজ স্তম্ভিত। আবার পরে ছেলেদের বলছেন ঃ "যাও, কাজ না করলে কি করে হবে? এ রকম চলবে না।"

আবার যখন তিনি সাধন-ভজনের কথা বলতেন তখন আর অন্য কথা নয়। সে জায়গার হাওয়াই তখন যেন বদলে যেত। এমন জোর দিয়ে তিনি বলতেন। তাঁর ওপর তাঁর গুরুভাইদের এবং সব সাধুদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। সবাই জানত যে, মহারাজ যা বলবেন তাতে কোন ভুলচুক থাকবে না। সঙ্ঘে যতদিন তিনি নেতারূপে ছিলেন—সেই শেষদিন পর্যন্ত সকলেরই ধারণা ছিল যে, মহারাজের সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করার মতো। কারণ, তা সবসময় সঙ্ঘের কল্যাণের জন্য।

কেউ তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মহারাজ যা বলতেন সে বিনা বিচারে, বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করত। কারণ, সে জানত মহারাজের মতো কল্যাণকামী তার কেউ নেই। সঙ্ঘে মহারাজের সঙ্গে কারও মতভেদ ছিল না।

মহারাজ যা বলতেন সকলে নতমস্তকে তা মেনে নিত। এই মহারাজই আবার যখন স্বামীজীর নেতৃত্বাধীনে কাজ করেছেন তখন যেন শশব্যস্ত হয়ে থাকতেন। স্বামীজীর বকুনি তো আমরা কল্পনা করতে পারি না। এমনও হয়েছে যে, সেই বকুনি সহ্য করতে না পেরে মহারাজের চোখে জল পড়েছে। ঠাকুরের মানসপুত্রের চোখের জল! স্বামীজী শশব্যস্ত হয়ে বলছেন ঃ "রাজা, আমাকে ক্ষমা কর।" মহারাজ তখন সাষ্টাঙ্গ হয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করছেন, স্বামীজীও সাষ্টাঙ্গ হয়ে মহারাজকে প্রণাম করছেন। গুরুভাইদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ ছিল দেবতাদেরও দ্রষ্টব্য। এ আমাদের কল্পনারও বাইরে। স্বামীজীকে যেমন মহারাজ শ্রদ্ধা করতেন, স্বামীজীও মহারাজকে ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা করতেন। অনেকেরই জানা আছে যে, স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করে বলেছেন ঃ "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু", আবার মহারাজ স্বামীজীকে প্রণাম করে বলেছেন ঃ "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমঃ পিতা।"

স্বামীজী বলেছেন ঃ "রাখাল, পড়াশুনা করতে হবে।" একদিন স্বামীজী একটা পুরনো ইংরেজি বই পড়ে বললেন ঃ "বইটি ভারি সুন্দর।" মহারাজ যেখানে যান বইটি তাঁর সঙ্গে থাকে, কতটুকু পড়া হলো তার ঠিক নেই। স্বামীজীর কথা এইরকম বিনা দ্বিধায় তিনি সবসময় মেনে চলতেন, জানতেন—ঠাকুরের নির্বাচিত সঙ্ঘনেতা স্বামীজী। স্বামীজীর আদেশ ঠাকুরেরই আদেশ। আবার স্বামীজীও ঠাকুরের মানসপুত্র বলে মহারাজকে বলতেন ঃ "রাজা আমাদের ভিতর আধ্যাত্মিকতায় রাজা।"

মহারাজের যাঁরা সাক্ষাৎ শিষ্য একসময় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে মনে করতেন যে, তাঁরা একটু উচ্চতর থাকের। স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে বলেছিলেন ঃ "বাবুরাম-দা, তুমি চেলা করো না, তাহলে রাজার চেলা আর তোমার চেলায় লাঠালাঠি চলবে।" বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দকে মঠ-মিশনে বলা হতো "মঠের মা"। তাঁর এত প্রবল আকর্ষণ ছিল যে, তিনি চেলা করলে আর রক্ষা ছিল না। স্বামীজী তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে বুঝে বলেছিলেন ঃ "তুমি চেলা করো না।" বাবুরাম মহারাজ কখনো দীক্ষা দেননি। তাঁদের পরস্পরের সম্বন্ধ এমন ছিল যে, সেখানে কোন সঙ্ঘর্ষের অবকাশ ছিল না। এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে শাসন কেবল প্রেমের শাসন। ছোটখাট ব্যাপারেও মহারাজের সেই প্রেমের শাসন কম ছিল না। একবার তাঁর সেবকদের একজন, যিনি মহারাজের সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর চিঠিপত্র লিখতেন,

একজন ভক্তের কাছে একটি ভাল কলম চেয়েছেন। মহারাজ সব লক্ষ্য রাখতেন। বললেন ঃ "তুই কেন চাইলি?" তিনি বললেন ঃ "আমার নিজের তো কলম দরকার নেই, আপনার চিঠিপত্র লিখি, সেজন্যই চেয়েছি।" মহারাজ বললেন ঃ "আজ কলম চাইবি, কাল আরেকটা জিনিস চাইবি, চাইতে চাইতে চাওয়া অভ্যাস হয়ে যাবে।" তীব্র ভর্ৎসনা! এতটুকুও ত্রুটি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর দৃষ্টি সবসময় ত্যাগে এমন প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, কোন জায়গায় এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে তিনি সহ্য করতেন না।

ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সেই আশৈশবের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি সর্বত্র যেন ঠাকুরকে দেখতেন, সেইভাবে ব্যবহার করতেন। সমাধির কথা আমরা শুনি, কিন্তু কারো সমাধি হয়েছে এমন লোক দেখা যায় না। মহারাজের জীবনে সমাধি অহরহ দেখা যেত। মহারাজ তামাক খেতেন। সেবক গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গিয়েছেন। মহারাজ স্থির হয়ে বসে আছেন, তামাক পুড়ে যাচ্ছে—কোন দৃষ্টি নেই। সেবক এসে আবার বদলে দিয়ে গেলেন। তিনি বসে আছেন গড়গড়ার নল মুখে, কিন্তু সমাধিস্থ। তাঁর তামাক খাবার দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝেছেন যে তামাক খাওয়া একটা উপলক্ষ মাত্র। তাঁর মন তখন গভীরভাবে সমাধিস্থ। এই দৃশ্যটি সকলের মনকে এত অভিভূত করত যে, সেজন্য দৃশ্যটির ফটো রেখে দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই ভাবটি সকলের মনে গভীর ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা এনে দিত। মুখটা একটু উঁচু করে তিনি এমনভাবে হাঁটতেন, তাঁর চলনভঙ্গি আমাদের মনে বিশেষ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করত। যখন তিনি পায়চারি করতেন তখন সিংহের মতো আপনভাবে পায়চারি করতেন।

ঠাকুরের সন্তানদের এই যে আত্মভোলা অন্তর্মুখী ভাব, এটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। বড় বড় নাম করা সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, বড় বড় পণ্ডিত আছেন, খুব সুন্দর বক্তা আছেন, কিন্তু এই আত্মবিস্মৃত ভাব, অন্তরে একেবারে ডুবে যাওয়া—এ অন্যত্র দুর্লভ। এটি ঠাকুরের একেবারে নিজস্ব ভাব।

মহারাজ স্থূলশরীরে নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতি সঙ্ঘে আজও ওতপ্রোত হয়ে আছে। কারণ, মহারাজ ছাড়া সঙ্ঘকে ভাবা যায় না। তাঁরই তপস্যা যেন ঘনীভূত হয়ে এই সঙ্ঘকে ধরে আছে।

(উদ্বোধন ঃ ৯৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা)

দ্বিতীয় পর্ব

মহারাজের স্মৃতি

বশী সেন

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

পঞ্চাশ বছরেরও অধিক পূর্বে আমি মহারাজকে প্রথম দেখি হাওড়া স্টেশনে। তিনি স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে ফিরছিলেন (১৯০৬ সাল)। আমরা ছাত্ররা ঠিক করলুম গাড়ি থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিজেরাই উহা টেনে নিয়ে যাব গন্তব্যস্থলে। আমি এখনও অনুভব করি তাঁর আশীর্বাদযুক্ত হস্তের স্পর্শ আমার মাথায় যখন আমি তাঁর পদধূলি নিয়েছিলুম।

তারপর মহারাজকে দেখি ১৯১০ সালে। তিনি এসেছিলেন আমার গুরু স্বামী সদানন্দকে দেখতে বোসপাড়া লেনে। সিস্টার নিবেদিতা ঐ বাড়ি ভাড়া করেন, যাতে বিভূতি ঘোষ, আমার ভাই টাবু ও আমি স্বামী সদানন্দের শেষ অসুখের সময় সেবা করতে পারি। মহারাজ বললেন, "আমি ভুবনেশ্বরে মঠ তৈরি করবার জন্য একখণ্ড জমি কিনেছি।" স্বামী সদানন্দ হাত জোড় করে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ঐ মঠের দারোয়ান হতে চাই।" মহারাজ সস্নেহে বললেন, "বাছা আমার, আগে সেরে উঠ।" এই পাঁচটি শব্দ এমন মধুর, স্নিগ্ধ ও প্রেমপূর্ণ ছিল যে উহা শোনামাত্র আমাদের হৃদয় প্রায় গলে গেল।

লোকে আমাদের তিনজনকে "সদানন্দের কুকুর" বলত; এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন সাধুরা আমাদের তিনজনকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন। ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী সদানন্দের দেহত্যাগের পর, আমি মহারাজকে প্রায়ই দেখতুম যখন তিনি বেলুড় থেকে কলকাতায় আসতেন। তিনি বলরাম মন্দিরে অথবা মায়ের বাড়িতে থাকতেন—যা ছিল ৮ বোসপাড়া লেনের কাছে। আমি তখন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করি, তাই ইচ্ছামতো মহারাজের কাছে যেতে পারতুম না। ঐজন্য মহারাজ আমাকে নাম দিয়েছিলেন, "Season flower."

অতি সামান্য সেবাও যদি কেউ প্রকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে করত, তিনি কখনও

উহার স্বীকৃতি দিতে ভুলতেন না। একবার আমাকে তাঁর জন্য এক ছিলিম তামাক সাজতে বলা হলো। তাঁর তিন সেবক আমাকে তাড়াতাড়ি করবার তাগাদা দিতে লাগলেন, কিন্তু যতক্ষণ না তামাক সাজা ঠিক ঠিক হচ্ছে আমি তা মহারাজের কাছে নিতে রাজি হলুম না। তারপর মহারাজ গড়গড়ায় প্রথম টান দিয়ে আমার পিঠে স্নেহভরে এক চাপড় মেরে বললেন, "তুই যদি আমাকে এরূপ এক ছিলিম তামাক দিস তাহলে আমি তোকে সন্ন্যাস দেব।"

অন্য এক সময় আমি আমার জন্মস্থান বিষ্ণুপর থেকে মহারাজের জন্য একটা বড় মাছ নিয়ে যাই। ট্রেন বিলম্ব হওয়ায় আমি বলরাম মন্দিরে যখন মাছ নিয়ে পৌঁছুলুম, একজন সেবক বিরক্তির সঙ্গে আমাকে বললেন, "তোমার মাছ ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আজ আর একজন ভক্তও মাছ নিয়ে এসেছিল, তারও অনেকটা আমরা বিলিয়ে দিয়েছি। ভগ্নহৃদয়ে আমি মহারাজের কাছে গেলুম। তিনি প্রথমেই বললেন, "বশী, তুই বিষ্ণুপুর থেকে আমার জন্য কি এনেছিস?" আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, "মহারাজ, আমি একটা মাছ এনেছি। কিন্তু আপনার সেবকরা বলল যে আপনার আজ মাছে কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আপনি বেশ কিছু মাছ বিলিয়ে দিয়েছেন।" মহারাজ তখনই বললেন, "বিষ্ণুপুরের মাছ খুব ভাল।" সেবকদের ডেকে তিনি নির্দেশ দিলেন, "বশীর মাছ ভালভাবে পরিষ্কার করে রান্না কর, আর কেউ যেন এ থেকে কিছু সরিয়ে না নেয়।" আমি শেষে খুশি মনে বাড়ি ফিরলুম।

ছাতা ও চটির ঘটনা। ডাঃ কাঞ্জিলাল মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবেন। তিনি আমাকে একটা ছাতা ও এক জোড়া চটি কিনতে বললেন, কারণ তিনি উহা মহারাজকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দেবেন। আমি কলকাতার বাজার থেকে সব চেয়ে সেরা ছাতা কিনলাম এবং ন্যাশানাল ট্যানারির মালিক স্যার নীলরতন সরকার, কারখানার উৎকৃষ্ট চামড়া দিয়ে চটি তৈরি করে দিতে রাজি হলেন। দীক্ষান্তে মহারাজ বেলুড় মঠের পুব দিকের উপরের বারান্দায় এলেন। আমরা সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ছাতার দাম শুনে তিনি বিস্ময়ে বললেন, "২৫ টাকা! এ টাকা দিয়ে তো একখানা গহনা কিনতে পারা যায়।" কাঞ্জিলালের দ্বিতীয় দান চটি পেয়ে মহারাজ খুব খুশি এবং তিনি সব সময় তা ব্যবহার করতেন। তিনি বার বার বললেন, "বশী, তোর কেনা চটি বেশ আরামদায়ক।"

একদিন মহারাজ আমাকে তাঁর দাড়ি কামাতে পারব কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললুম, "মহারাজ, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি

পারব।” আমার মনে হয়েছিল যদি আমি হঠাৎ ক্ষুর দিয়ে একটু কেটে ফেলি তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। Bose Institute-এ যাবার পথে আমি রোজ মহারাজকে কামাতে যেতুম। মেঘলা দিনে তিনি দাড়ি কামাতে চাইতেন না। একদিন সকালে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি সোজা কাজে গেলুম এই ভেবে যে আজ মহারাজ আমার সেবা নেবেন না। আমি রাতে যখন তাঁকে দেখলুম, মহারাজ তাঁর মুখে হাত ঘসছেন এবং মুখ দিয়ে “উঃ!” শব্দ করলেন। আমি উচিত শিক্ষা পেলুম। বুঝলুম মহারাজের সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি। বলরামের বাড়ির একটি ছোট মেয়ে স্বামী শংকরানন্দকে জিজ্ঞাসা করে, “মহারাজের নাপিত এত সুন্দর পোশাকে আসে। ও অত দামি পোশাক কোথায় পায়?” স্বামী শংকরানন্দ তাকে বলেন, “ও হলো বড় মহারাজের নাপিত। তাই ওর অত দামি পোশাক।” আমি আর একটা নূতন নাম পেলুম, “বড় মহারাজের নাপিত।”

আমি মহারাজকে ম্যাসাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি খুব জোরের সঙ্গে ম্যাসাজ পছন্দ করতেন। যারা নরম হাতে ম্যাসাজ করত, তিনি বলতেন, “ওরা আমাকে ম্যাসাজ করে যেন পোষা বিড়ালের গায়ে হাত বুলাচ্ছে।” তিনি আমার হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে চাপ দিয়ে জানাতে চাইতেন তাঁর কতটা শক্তি আছে। আমি নিজের হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতুম। পরে একদিন হঠাৎ মনে হলো যে আমার ঐরূপ চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা। আমি শেষে জোর করে হাত টেনে নেবার চেষ্টা ছেড়ে দিলুম, এতে মহারাজ আমার প্রতি একটু মধুরভাবে হেসেছিলেন। পরে আমি যখনই মহারাজের হাত ম্যাসাজ করতুম, তিনি আমাকেও একটা জোরে চাপ দিতেন।

একদিন আমি ম্যাসাজ করছি; তখন তিনি সাধনার কথা বললেন ঃ “তুই কি মনে করিস যে ভগবান লাভের জন্য কোন নির্দিষ্ট মূল্য আছে যে এত তপস্যা, এত জপ, এত দান করলে তাঁকে পাওয়া যাবে? জোর করে তাঁর দর্শন আদায় করা যায় না।” আমি তখন নিয়মিত সাধনা করতুম না। তারপর মহারাজ বললেন, “তুমি যদি নিয়মিত ধ্যান, জপ অভ্যাস না কর, তুমি অনুভূতি এলে ধরে রাখতে পারবে না।”

একদিন মহারাজ জগদীশ বোসের গবেষণা দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—যাতে বাইরের উত্তেজনা উদ্ভিদের প্রাণে সাড়া দেয়। তিনি যখন Bose Institute-এ এলেন, আমরা উদ্ভিদের উপর পরীক্ষা করে দেখালুম এবং তিনি খুব

আগ্রহ করে সব দেখলেন। সেদিন সারা সন্ধ্যা তাঁর মন গবেষণাগারে যা দেখেছিলেন তাতে নিবিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "কখন-কখন ঠাকুর ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন না। তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাসহীন জায়গায় পা ফেলতে ফেলতে যেতেন যাতে ঘাসের ব্যথা না লাগে। তখন আমরা বিশ্বাস করতে পারতুম না যে ঘাসেরও সংবেদনা আছে। কিন্তু আজ যা দেখলাম, তাতে বুঝলুম যে ঠাকুরের দর্শন ও অনুভূতি বাস্তবিক সত্য।" একটু পরে তিনি বললেন, "তোর এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়িস না। তুই এর দ্বারা সব কিছু পাবি।"

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে দুঃসংবাদ এলো—মহারাজের কলেরা হয়েছে। আমি উহার সত্যতা জানবার জন্য বলরামের বাড়িতে দ্রুত গেলাম। আমি তাঁর ঘরে উঁকি মেরে দেখলুম। তিনি যদিও অন্য দিকে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ওখানে?" আমি পরিচয় দিয়ে বললুম যে আমি কি হাওয়া করব? তিনি বললেন, "হাঁ।" তাঁর অনুমতি পেয়ে আমি অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর সেবা করবার সুযোগ পেলাম।

মহারাজের শরীর ত্যাগের দুদিন আগে তিনি দিব্যভাবে ছিলেন এবং উপস্থিত সকলের প্রতি প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন। সেই প্রথম তাঁর মুখ থেকে শুনলুম তিনি কে এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল। এই অবিস্মরণীয় দৃশ্য মহারাজের জীবনীকাররা বর্ণনা করেছেন, তাই আমি আর বললুম না। সে সময় যে পরমানন্দ আমরা অনুভব করেছিলুম, তা এতকালের ব্যবধানেও ম্লান হয়ে যায়নি। তিনি আমাদের হৃদয় ভরপুর করে দিয়ে গেছেন।

মহারাজের শরীর ত্যাগের এক ঘণ্টা আগে, তিনি কথা বলা বন্ধ করলেন এবং মনে হলো তিনি নিজেকে কোন এক অজ্ঞাত রাজ্যে তুলে নিয়েছেন যা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমি মৃদুভাবে তাঁর হাত বুলাচ্ছিলুম এবং ভাবছিলুম যে তিনি কি এখনও মনে রেখেছেন তাঁর সেই ক্রীড়াচ্ছলে বুড়ো আঙ্গুলের চাপ। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলুম—সেই মৃদু কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ চাপ—আমার প্রতি মহারাজের শেষ দান।

(বেদান্ত এণ্ড দি ওয়েস্ট, ১৪২ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

শ্রী পি শেষাদ্রি, বি-এল্, এম্-এল্

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে। কন্যাকুমারী-দর্শনার্থ মহারাজ কেরল-প্রদেশে আগমন করেন। আলওয়া-নামক শহরে তিনি ভক্তবৃন্দ সহ প্রথম পদার্পণ করিলেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া মহারাজ বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "কাল অপরাহ্নে আমি কিছু বলিব।" মহারাজ প্রায় সর্বদাই অন্তর্মুখীন হইয়াই থাকিতেন। সেইজন্য তিনি এইরূপে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বলায় অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পরদিন শ্রদ্ধাশীল বহু ভক্ত মহারাজের বাক্যামৃত-পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভক্তসভায় আসিয়া ইংরেজিতে এক ঘণ্টাকাল অনর্গল বলিলেন। তীর্থযাত্রার প্রয়োজন, তীর্থমাহাত্ম্য, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা, গুরুর আবশ্যকতা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি সাধক-জীবনের অতি প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক উপদেশ তিনি সরল অথচ শক্তিপূর্ণ ভাষায় প্রদান করিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শুনিলেন। আধ্যাত্মিক অনেক বিষয়-সম্বন্ধে সুগভীর উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি উপস্থিত সকলকে মন্ত্রহীন দীক্ষা দিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরে তিনি কোট্টয়ম্ প্রভৃতি শহর দেখিয়া হরিপাদে আসিলেন। কেরলদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সর্বপ্রথম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই আশ্রমে তিনি দুই একদিন বিশ্রাম করিলেন। কয়েকজন ভক্তের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উত্তরাখণ্ডে তপস্যানিরত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লইয়া তপস্যা ও লোকসেবায় জীবনযাপন করেন।

শ্রীমহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হরিপাদে ব্রাহ্মণগণ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ ও সরল স্বভাব মহারাজের

ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার জন্য পাল্কি আনয়ন করিলে তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "আমার কি বিবাহ? আমি বরের ন্যায় পাল্কিতে যাইব না।" তিনি মোটরে গেলেন।

এক দিন অপরাহ্ণে তিনি আশ্রমের পশ্চিমভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় কয়েকজন হরিজন আশ্রমের পূর্বভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজকে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইল না; কিন্তু তিনি উঠিয়া স্বয়ং তাঁহাদের নিকট গিয়া বসিলেন এবং শিষ্যগণ-প্রদত্ত বস্ত্রগুলি তাঁহাদিগকে দিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার দর্শন ও অযাচিত কৃপা পাইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন। হরিপাদে আমার বৃদ্ধ পিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহারাজের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইলেন। আমার পিতৃদেব মহারাজকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ; শুধু ঈশ্বর-নাম জপ করিবেন। আপনার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।" এই প্রসঙ্গে আমার পিতা প্রায়ই বলিতেন, "এইরূপে মহারাজের নিকট আমিও দীক্ষালাভ করিয়াছি।" আমার ভগিনী প্রণাম করিলে মহারাজ তাঁহাকে প্রসাদ দিতে আদেশ করিলেন।

হরিপাদ হইতে মহারাজ কোল্লম্ নামক শহরে গমন করিলেন। সেখানে অনেকে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন একজন নাস্তিক। আগন্তুক সকলেই মহারাজকে প্রণাম করেন। কিন্তু ঐ নাস্তিক ভদ্রলোক প্রণাম করিলে মহারাজ অতিশয় জোরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "ঈশ্বরকে স্মরণ করিও, ঈশ্বরকে স্মরণ করিও।" সেই ব্যক্তির বন্ধুগণ ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন।

সেই শহর হইতে মহারাজ মোটরযোগে অনন্তশয়নে শুভাগমন করেন। এখানকার ইউনিভার্সিটি কলেজের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি দ্বিতল বাটী তাঁহার অবস্থানের জন্য ঠিক করা হয়। সেখানে অনেকে শ্রীমহারাজের দর্শনলাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দর্শনার্থীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। মহারাজের মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, ইহা যেন নির্মল, মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় প্রশান্ত, গম্ভীর, নির্বিকার ও ভাবময়। এইরূপ আকৃতি আমি এই পর্যন্ত আর দেখি নাই। মহারাজের সহিত পূজনীয় তুলসী মহারাজ, অমূল্য মহারাজ, সুরেশ মহারাজ এবং অন্যান্য অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত ছিলেন। তিনি কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে বিভোর হইয়া চলিলেন এবং তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে যাইয়া বসিলেন। তিনি উত্তরাস্য হইয়া নিজ আসনে বসিয়া

রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী নির্মলানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি মহারাজকে প্রণাম করিয়াছি কি না। প্রণাম করার সুবিধা ছিল না বলায় তিনি আমাকে এবং আর দুইজন ভদ্রলোককে মহারাজের নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি হরিপাদের অধিবাসী শুনিয়া মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন, "হরিপাদের লোক! ভক্ত লোক!" পরে তুলসী মহারাজ বলিলেন, "ইহারা আপনাকে এক মানপত্র প্রদান করিতে চায়।" তখন মহারাজ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। ইউরোপীয় ফ্যাশন আর ভাল লাগে না।" স্বামী নির্মলানন্দজী আবার বলিলেন, "ইহাদের বড়ই আগ্রহ আপনি সেই পত্রের উত্তর দেন।" ইহা শুনিয়া মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি তো জান যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই। ঠাকুরের কৃপাই আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সম্বল।" তাঁহার কথায় আমাদের সকলেরই মনে হইল, মহারাজ এক অসাধারণ মহাপুরুষ। সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা ছিল বলিয়া সকল হিন্দুগৃহের দ্বারদেশে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মহারাজ খুবই আনন্দিত হইলেন।

পরদিন সকালে আমি গিয়া প্রণাম করিলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ তো?" "ভাল আছি" বলায় তিনি খুশি হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ।" এইরূপ প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় তাঁর সহিত কথাবার্তা হইত এবং আমার মনে হইত যে তাঁর অব্যর্থ আশীর্বাদে আমি সর্বপ্রকারেই ভাল আছি। একদিন বিকালে তুলসী মহারাজকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনের জন্য কি কি জিনিসের দরকার হইবে?" তিনি মহারাজের নিকট গিয়া এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ তখন প্রসন্নগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র লইয়া ঠাকুরের ধ্যানপূর্বক তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি কৃপা করিয়া সেই স্থানে লোককল্যাণের জন্য অধিষ্ঠান করিবেনই করিবেন। বেলুড় মঠে শ্রীস্বামীজী কি করিয়াছিলেন তাহা তো তোমার জানা আছে। আর কোন জিনিসের দরকার নাই।"

পরদিন রবিবার। সকাল হইতেই অনন্ত-শয়ন শহরের অনেক ভক্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ পূর্বদিনের কথামতো গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র লইয়া কিছুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে ধ্যান করিয়া ঠাকুরের পূজা করিলেন। তাঁহার তৎকালীন মুখভাব অবর্ণনীয়! এত অভাবনীয় দিব্য কান্তি ও দীপ্তি তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়াছিল যে উহা দেখিয়া সকলে

অভিভূত হইলেন। তাঁহার পুণ্য দর্শনে দর্শকগণের মনে উচ্চভাবের উদয় হইল। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া প্রত্যেকেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

মানপত্র প্রদানের সময় কেবলমাত্র মহারাজ এক কেদারায় বসিলেন, আর সকলেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মানপত্র যখন পঠিত হইতেছিল তখন মহারাজের মুখ একেবারে নির্বিকার! উহা পড়া হইয়া গেলে স্বামী নির্মলানন্দজী ইংরেজিতে উত্তর স্বরূপ শুধু বলিলেন, "শ্রীশ্রীমহারাজ আপনাদিগকে তাঁহার আশীর্বাদ জানাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" তুলসী মহারাজ ওজস্বী বক্তা ছিলেন। কিন্তু সেই দিন মহারাজের প্রভাবে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ঐটুকুমাত্র বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সভাভঙ্গ হইল এবং মহারাজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। অনন্তর স্বামী নির্মলানন্দজীর তত্ত্বাবধানে সুরেশ মহারাজ পূজা ও হোম করিলেন।

মহারাজের সঙ্কল্পশক্তি কল্পনাতীত ছিল। সেদিন কে জানিত যে এই আশ্রম ভবিষ্যতে অভূতপূর্ব শক্তির আধার হইয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিবে। প্রথমত সাহায্যদাতার সংখ্যা অল্পই ছিল এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু মহারাজের আশীর্বাদে অনেকে অযাচিত ভাবে আসিয়া মুক্ত হস্তে দান করায় এই অঘটন ঘটিল। এই আশ্রমের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, কারণ মহারাজের আশীর্বাদের শক্তি সীমাহীন।

মহারাজের অনন্তশয়নে অবস্থানকালে অনেকে তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। আশ্রমের জন্য যিনি জমি দান করিয়াছিলেন সেই অরুণাচলম্ পিল্লে মহাশয় পঙ্গু বলিয়া দ্বিতলে উঠিতে অপারগ ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ নিজেই নিচে আসিয়া মধুরবাক্য ও স্নেহদৃষ্টিতে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া প্রসাদ দিতে বলিয়াছিলেন। ঐ ভদ্রলোক মহারাজের কৃপার কথা শতমুখে বলিতেন। তাঁহার আত্মীয়গণ সকলেই ভক্ত ছিলেন এবং আশ্রমের কাজে সাহায্য করিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এইখানে ইহাও বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই ভদ্রলোক বঙ্গদেশে টেলিগ্রাফ মাস্টারের কাজ করিতেন এবং তখন হইতেই তাঁহার মন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্গমহিলাদের ভক্তি, ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মানুরাগ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আর একজন অমায়িক নিষ্ঠাবান ভক্ত মহারাজের নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী কতকটা উন্মাদ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মনোবেদনার সীমা ছিল না। তিনি অতি কাতরভাবে মহারাজের চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরম দয়াল মহারাজ তাঁহাকে কন্যাকুমারীতে যাইতে

বলিলেন। সেখানে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া মহারাজ তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। মহারাজের অনুগ্রহে তাঁহার নিষ্ঠা-ভক্তি দিন দিন বাড়িতে থাকে। অবশেষে তিনি ব্রহ্মচারী হইয়া আশ্রমে অবস্থান করেন। তাঁহাকে সন্ন্যাসপ্রদানের কথা উঠিলে তিনি বিনীত ভাবে বলেন, "আমি সেই পবিত্র আশ্রম অবলম্বন করিতে এখনও অনুপযুক্ত।" এই ভক্ত অনন্তশয়নের আশ্রম নির্মাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইহা উল্লেখযোগ্য যে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ই ইহার পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং ইহার সাফল্যের জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীঅরুণাচলমও তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই জমি দান করেন। হৃষীকেশ বাবুর প্রতি মহারাজের অশেষ কৃপা ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, কর্মকুশলতা প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহাকে দেখিলেই মহারাজের মুখ প্রফুল্ল হইত এবং তাঁহার সঙ্গে তিনি অনেক কথাবার্তা কহিতেন। এই অশেষ গুণালঙ্কৃত বিদ্বান ও ভক্তিমান ব্যক্তি আশ্রমনির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই অকালে দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশ্রমের চিন্তা তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল।

মহারাজের শুভাগমনের চতুর্থ দিন সকালে আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। সেইদিন অপরাহ্নে দুই ঘটিকার সময় আবার তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "নির্মলানন্দ স্বামী যাহা বলিবেন তাহা শুনিও। তাহাতে তোমার ভাল হইবে।" মহারাজের কথা শিরোধার্য করিয়া স্বামী নির্মলানন্দজীর নিকট গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত শীঘ্র যাইতেছ কেন?" আমি বলিলাম, "আজ আমাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণের দিন, সেইজন্য আমাকেও যাইতে হইবে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, পুরস্কার বিতরণ হইয়া গেলে শীঘ্র চলিয়া আসিও।" এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমি তখন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। মহারাজের নিকট আসিবার দিন সকালে আমি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট যাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, "তোমাকে ডাকিব মনে করিয়াছিলাম। আমাদের বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভার তোমার উপর অর্পণ করিতেছি।" তাঁহার নিকট এক সপ্তাহের ছুটি প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন। আমার মহারাজের সহিত কন্যাকুমারী যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভার আমার উপর ন্যস্ত হওয়ায় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিলাম। মহারাজ মাত্র চারপাঁচ দিন

অনন্তশয়নে থাকিবেন। সেই সময় তাঁহার পবিত্র সঙ্গ ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে মন চাহিল না। আবার প্রধান শিক্ষকের নিকট গিয়া প্রতিশ্রুত কাজ করিতে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলাম। এক কথায় আমি ভীষণ বিপদে পড়িলাম। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় অপ্রত্যাশিত ভাবে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম। জুবিলী টাউন হলে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বারদেশে প্রধান শিক্ষক দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "অনর্থক তোমাকে কষ্ট দিলাম বলিয়া বড়ই দুঃখিত; হাইকোর্টের বিচারক শ্রীযুক্ত মুত্তুনাথকম্ জেদ করায় তাঁহার উপর ধন্যবাদ-প্রদানের ভার অর্পণ করা হইয়াছে।" তখন আমার মনে হইল ঠাকুরের কৃপায় এবং মহারাজের আশীর্বাদেই ইহা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক আমি শীঘ্রই মহারাজের গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিনই কন্যাকুমারী যাত্রা। সেদিন সকালে স্বামী নির্মলানন্দজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্কুলের বড়দিনের ছুটি কবে আরম্ভ হইবে?" "এক সপ্তাহ পরে"— আমি এইরূপ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "তবে ছুটি হইলে কোল্লমে গিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিও। আমরা শীঘ্রই সেখানে যাইব।" স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিলাম। সেই জন্য মহারাজের সঙ্গে কন্যাকুমারী গমন করিতে পারিলাম না। কিন্তু সেখানে মহারাজের অবস্থানের কথা বন্ধুদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম। তাহার কিঞ্চিৎ এখানে বিবৃত করিতেছি ঃ

মহারাজ এক সপ্তাহ কাল কন্যাকুমারীতে ছিলেন। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনি ভক্তগণ সহ মন্দিরে যাইতেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যুজ্জ্বল ও প্রফুল্ল দেখাইত। "মা ব্রহ্মময়ী" বলিয়া অতি মধুর স্বরে জগদম্বাকে ডাকিতেন। কখন-কখন সঙ্গী সাধুদিগকে মার গান গাহিতে বলিতেন। একদিন অনেক কুমারী মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষপূর্বক আহার করাইলেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিলেন। উহা এক অপূর্ব দৃশ্য! মন্দিরে যাইবার সময় দরিদ্রদিগকে পয়সা দিতে সঙ্গী সেবকগণকে আদেশ করিতেন। তাঁহার বাসভবনের উপরিতল হইতে কখন-কখন তিনি পয়সা ফেলিয়া দিতেন এবং অনেক ভিক্ষুক তাহা লইতে কাড়াকাড়ি করিত দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইতেন। কন্যাকুমারী তীর্থেও কয়েকজন ভক্তকে তিনি দীক্ষা দেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নির্মলস্বভাব, নিষ্ঠাবান, সরলপ্রাণ স্বামী সুখানন্দজী অন্যতম।

কন্যাকুমারী এবং অনন্তশয়নের আশ্রম দেখিয়া মহারাজের চিত্ত বিশেষ আকৃষ্ট হইল। মাদ্রাজে ফিরিয়া সেখানকার মঠাধ্যক্ষের নিকট এই দুই স্থানের মহিমা কীর্তন করিয়া মহারাজ বলিলেন, "কেন এখানে পড়িয়া আছ? কন্যাকুমারী এবং অনন্তশয়নের আশ্রমে কিছুকাল বাস করিলে তুমি শান্তি ও আনন্দ দুই-ই লাভ করিবে।" কথাটি আমি সেই অধ্যক্ষ মহারাজের মুখ হইতেই শুনিয়াছি।

মহারাজের পুণ্যস্মৃতি লইয়া আমি কয়েকদিন তাঁহার দর্শনের আশায় কাল কাটাইতেছিলাম। এত স্বল্পভাষী কোন মহাপুরুষকে আমি কখনও দেখি নাই। এইরূপ মিতবাক্ হইয়া দীর্ঘকাল কেহ থাকিতে পারে, ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল। বালকদিগকে দেখিলে মহারাজের বিশেষ আনন্দ হইত। বালকদিগের সহিত তাহাদেরই একজন হইয়া তিনি হাস্য করিতেন, কৌতুক করিতেন, খেলা করিতেন, লড়াই করিতেন এবং নানাপ্রকার রঙ্গ করিতেন। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া পরমহংসেরা বালকদিগের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসেন—ঠাকুরের এই কথা মনে পড়িল।

৪ পৌষ বৈকালে মহারাজ কোল্লম্ প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন সকাল হইতেই তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। মহারাজকে প্রণাম করিলে গঙ্গাজলের একটি ঘট তাঁহার ঘরে রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বলিলেন। তাঁহার আদেশপালনে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। কোল্লম্ শহরে মহারাজ দশ দিন ছিলেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় আমি তাঁহার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতাম। এক দিন বিকালে আসিয়া মহারাজকে বাহিরে দেখিতে পাইলাম না। সেই জন্য স্বামী নির্মলানন্দজীর নিকট গিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম। অনেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রশ্ন করিলে স্বামীজী তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিতা সহকারে উহাদের যথোচিত উত্তরপ্রদান করিলেন। হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজকে বিকালে প্রণাম করিয়াছ কি?" "না, করি নাই" বলাতে তিনি জোর করিয়া বলিলেন, "এখনই প্রণাম করিয়া এস।" তখনই আমি বুঝিলাম যে স্বামী নির্মলানন্দজী আমার সকল কাজ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন। বিকালে মহারাজকে প্রণাম করিতে পারি নাই—তিনি বুঝিতে পারিয়া আমার ত্রুটি মার্জনা করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে আমি মহারাজের ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি হস্তসঞ্চালন করিয়া তাঁহারই সামনে বসিতে আমাকে বলিলেন। অদূরে উপবেশন

করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহার সেই মুখমণ্ডল তখন এক অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহা মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় প্রখর তেজঃপুঞ্জ বিকিরণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ দেখিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারিলাম না। আর একবার মাত্র এই মুখভাব দেখিয়াছি, সেই কথা যথাস্থানে বলিব। শেষে অনন্যোপায় হইয়া উঠিয়া তাঁহার চরণে আবার প্রণত হইলাম। তিনি মাথা নাড়িলেন। এইরূপ করার অর্থ এখন পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমি বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

আর একদিন সকালে আমাকে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "স্নান করিয়াছ?" "করিয়াছি" এইরূপ বলায় তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বেশ! বেশ! এইরূপ নিত্যই সকালে স্নান করিয়া পূজা ও জপ করিবে, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।" ইহা এক প্রকার দীক্ষাদান বলিয়া আমার মনে হইল।

প্রতিদিন বিকালে কিয়দ্দূর ভ্রমণ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেই সময়ে প্রায়ই স্বামী নির্মলানন্দজী সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মহারাজ সদর দরজা ছাড়িয়া অন্য পথে বাহিরে যাইতেন। কেন না, মহারাজ আসিলেই সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিবেন এবং প্রশ্নোত্তর বন্ধ হইবে। কিন্তু একদিন বিকালে মহারাজ হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বামী নির্মলানন্দজী এবং অন্যান্য সকলেই সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজ এক কেদারায় বসিলেন এবং সকলকে বসিতে বলিলেন। প্রশ্নোত্তর বন্ধ হইলে এক ব্যক্তি মহারাজের উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া স্বামী নির্মলানন্দজী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "নূতন বিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আগ্রহই তোমার এই কথায় প্রকাশ পাইতেছে। এক নূতন লোক আসিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর কেমন ইহা জানিতেই তুমি এই প্রকার বলিতেছ, কিন্তু তোমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মহারাজ এখানে আসেন নাই। তিনি আমাদের মহামহিমান্বিত মহর্ষিগণের ন্যায় এক মহাপুরুষ। তাঁহার নিকট ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে সমিৎপাণি হইয়া আসিতে হইবে। তোমাদের জন্য ইংরেজি ভাবের সহিত পরিচিত আমরাই যথেষ্ট। আমি কিন্তু জানি যে, যথার্থ জিজ্ঞাসুদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে মহারাজ সর্বদাই প্রস্তুত। তোমাদের উন্নতির জন্য তিনি দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিবেন, ইহা আমি ভাল করিয়াই জানি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে যথার্থ জিজ্ঞাসু এবং মহারাজের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে কৃতসংকল্প যাহারা, তাহারা দাঁড়াও। মহারাজের নিকট

আমি তোমাদিগকে পরিচয় করাইয়া দিব। কে আছ? উঠ।" কিন্তু কাহারও উঠিতে সাহস হইল না। তখন অতি তীব্র স্বরে স্বামী নির্মলানন্দজী বলিলেন, "এই কি তোমাদের আন্তরিকতা? ছি! ছি! আমার কথা যে সত্য তাহা এখন বুঝিয়াছ কি?" এইরূপ কথাবার্তার সময় মহারাজ একেবারে নির্বিকারই ছিলেন, যেন আর কাহারও সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

॥ ২ ॥

একদিন মাদ্রাজে এক রামানুজী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষের পত্র লইয়া দীক্ষাগ্রহণের জন্য আসিলেন। মহারাজ পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "নির্মলানন্দ স্বামীকে বলিলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" আগন্তুক ভক্তটি নির্মলানন্দজীকে এই কথা বলিলে তিনি অতিশয় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমি মহাপুরুষদের কথার বাহক (gramophone)-মাত্র, মন্ত্র-তন্ত্র দিতে একেবারেই অক্ষম। এই প্রকার গুরুভার আমি কখনও গ্রহণ করি না। মহারাজও এই কথা জানেন। তুমি মহারাজেরই শরণাপন্ন হও।" সেই ভদ্রলোক এই সব কথা মহারাজের নিকট বলিলে, মহারাজ পুনরায় রহস্য করিয়া বলিলেন, "নির্মলানন্দ স্বামী মন্ত্রদীক্ষা দিতে পারেন। তাঁহার নিকটেই যাও।" সেই ভক্ত আবার নির্মলানন্দ স্বামীর নিকট গিয়া এই কথা নিবেদন করিলে নির্মলানন্দজী পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কোন-কোন নবীন সাধু মন্ত্রদীক্ষা দিতে ব্যস্ত। তাঁহারা সেই শক্তির অধিকারী বলিয়া অহংকার করেন। কিন্তু আমি অন্তরে জানি আমার সেই ক্ষমতা নাই। ইহা মহারাজও জানেন, মহারাজের কথায় ভুলিও না। তাঁহাকেই আশ্রয় কর।" এইরূপে কয়েকদিন ভদ্রলোকটির আসা-যাওয়ার পর একটি দিন ঠিক করিয়া মহারাজ তাঁহাকে সেই দিন আসিতে আদেশ দিলেন। সেই দিন তাঁহাকে মহারাজ দীক্ষা দিলেন। ঐ ভক্ত অতিশয় জ্ঞানী ও বিনয়ী ছিলেন। পরে তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা নিয়া স্বামী পরমাত্মানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান করেন।

১১ পৌষ বিকালে আমি হোটেল হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিলাম যে মহারাজ বাহিরের বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছ?" "Hotel হইতে" এইরূপ উত্তর দেওয়ায় তিনি বলিলেন, "হোটেলে কেন গিয়েছিলে?"খাইতে গিয়াছিলাম বলায় মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "Hotel-এ কি কি জিনিস পাও?

দুধ পাওয়া যায়?” “না” বলিলে মহারাজ আমাকে বসিতে বলিলেন। তাঁহার সম্মুখে বসিতে নারাজ হইয়া আমি হলঘরে গিয়া বসিলাম। মহারাজ আমার পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কি কি জিনিস হোটেলে পাওয়া যায়?” তখন আমার মনে হইল যে মহারাজ আমার নিকটতম পিতা, মাতা, একান্ত হিতকর্তা। আমরা এইরূপ কথা বলিতেছি দেখিয়া নির্মলানন্দ স্বামী নিকটে আসিয়া আর একবার আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি বাংলা জানি, ইহা শুনিয়া মহারাজ আমাকে বাংলায় কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। নির্মলানন্দ স্বামীর উৎসাহে সাহস পাইয়া আমিও সেই ভাষায় উত্তর দিতে থাকিলাম। বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিবার বিষয়েও মহারাজই আমার দীক্ষাগুরু। পরে মহারাজ নিজ আসনে বসিয়া নির্মলানন্দ স্বামীকে বলিলেন, “এই বালক খুব দুর্বল। তাহাকে কেন হোটেলে পাঠাইতেছ? সেখানে দুধও নাই। এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।” নির্মলানন্দ স্বামী উত্তর করিলেন, “সে বড়ই আচারনিষ্ঠ। সে তো আমাদের খাদ্য খাইবে না।” কিন্তু করুণায় বিগলিত মহারাজের কথা শুনিয়া নির্মলানন্দ স্বামী তখনই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, রান্না শেষ হইলে রান্নাঘরে আমাকে খাইতে দিতে হইবে এবং আমি খাইয়াছি শুনিলেই নির্মলানন্দ স্বামী আহারে বসিবেন। মহারাজের ও নির্মলানন্দজীর কারুণ্য অহেতুক।

ঐ সময় আমার প্রায়ই রাত্রে ঘুম হইত না। মহারাজের দিব্যসঙ্গ লাভ করিলেও এ পর্যন্ত মন্ত্রদীক্ষা না হওয়ায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি প্রতিদিন দেখিতাম, রাত্রিতে সকলে নিদ্রা গেলে মহারাজ বাহিরে আসিয়া পাদচারণা করিতেন।

আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে মহারাজের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করিতাম। এই ভাবেই আমার রাত্রি কাটিত। আমার জানা ছিল না যে নির্মলানন্দ স্বামী আমার জন্য সব ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছিলেন। এক রাত্রে আমাকে ডাকিয়া তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিবে?” আমি উত্তর দিলাম, “আমাকে আপনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আমার তো লইবার খুবই ইচ্ছা আছে।” তখন তিনি বলিলেন, “দীক্ষার জন্য গুরুর নিকট প্রার্থনা না করিলে দীক্ষা পাওয়া যায় না। মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিলে না কেন?” আমি চুপ করিয়া রহিলাম। স্বামী নির্মলানন্দজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার দীক্ষা নিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে কি?” আমি এই মাত্র বলিলাম, “আপনি অবশ্য আমাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে লইতে খুবই ইচ্ছা আছে।”

নির্মলানন্দজী আমাকে মহারাজের নিকট লইয়া গিয়া আমার দীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। মহারাজ বলিলেন, "আমার শরীর আজ অসুস্থ। কাল সুস্থ বোধ করিলে দীক্ষা দিব।" স্বামী নির্মলানন্দজী আমাকে বলিলেন, "কাল সকালে যথারীতি স্নান করিয়া কফি বা কিছু না খাইয়া আসিও। সঙ্গে কিছু ফলমূল আনিবে। মহারাজ দীক্ষা না দিলেও দুঃখিত হইও না।"

আমার তৎকালীন মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অনেক দিনের একান্ত ইচ্ছা সফলপ্রায় বলিয়া হৃদয়ে অসীম আনন্দ। গুরুদক্ষিণা দিবার যথেষ্ট সম্বল ছিল না বলিয়া আমার অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখ। আমার হাতে এক টাকা মাত্র ছিল। এক অকৃত্রিম বন্ধু (তিনিও গরীব ছিলেন) আমার দীক্ষার কথা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং ফলমূল-ফুল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিকাদি সমাপ্ত করিয়া আসিয়া দেখিলাম নির্মলানন্দজী একাকী বারান্দায় বসিয়া আছেন। বস্ত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি কিনিব কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "কিসের জন্য?" হরিপাদের ভক্তগণ এইরূপ দক্ষিণা দিয়াছেন, সুতরাং আমিও ঐরূপ দিব ইচ্ছাপ্রকাশ করায় বলিলেন, "তোমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। মহারাজ তোমাকে কেবলমাত্র ফল দিতেই আদেশ করিবেন।" আমি কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিবোধ করিলাম না। আমি ভাবিলাম, আর সকলেই দক্ষিণা দিয়াছেন, কেবলমাত্র আমি দেখিতেছি এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম। এই প্রকার ভাব মনে আসিবামাত্র নির্মলানন্দজী বলিলেন, "তোমার যখন এত ইচ্ছা তখন এক টাকা দিও।" কথাটি শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি যে কেবল আমার মনের কথা জানিতে পারিলেন তাহা নহে, আমার হাতে মাত্র একটি টাকা ছিল তাহাও জানিতে পারিলেন! নির্মলানন্দজী আমাকে এবং আর একজন দীক্ষার্থীকে সর্ববিধ পূজোপকরণের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে একজন সাধু আসিয়া জানাইলেন, মহারাজ আজ অসুস্থতাবশত কাহাকেও দীক্ষা দিতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া তুলসী মহারাজের মুখভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কেবল দুই-একটি বালকের দীক্ষা! তাহাতেও মহারাজের এত ঔদাসীন্য!" তিনি নিজেই মহারাজের নিকট গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হইয়াছিল আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না, তবে কিছুক্ষণ পর মহারাজ পূজার ঘরে আসিয়া দীক্ষাপ্রার্থীদের একজনকে ডাকিলেন। তাঁহার দীক্ষার পরই

আমার ডাক পড়িল। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে মহারাজ আমাকে উত্তরাস্য হইয়া বসিতে বলিলেন, তিনি পূর্বাস্য হইয়াই রহিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল দীক্ষার সময় তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব। সেই সময়েও তাঁর মুখমণ্ডল প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের মতোই ছিল। প্রায় আধঘণ্টা তিনি মৌনাবলম্বী ছিলেন, আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। তিনি আমাকে বলিলেন, "দক্ষিণ হস্ত নিচে রাখিয়া বামহস্ত পাত্রবৎ রাখ।" আমি কিন্তু বামহস্ত নিচে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দেখাইলাম, কারণ গঙ্গাজল নিবার জন্য তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমি ভাবিলাম বামহস্তে গঙ্গাজল-গ্রহণের বিধি নাই। কিন্তু তিনি নিজে দেখাইয়া আমাকে পূর্ববৎ আদেশ করিলেন। আমি সেইরূপ করিলাম। অনেক পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তন্ত্রশাস্ত্রে পাত্রের অভাবে ঐরূপ বিধান আছে। নিচে দক্ষিণহস্ত থাকায় বামহস্তে গ্রহণ করায় দোষ নাই। অনন্তর বামহস্ত পাত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে দক্ষিণহস্তে গঙ্গাজল লইয়া 'ওঁ বিষ্ণু, নমো বিষ্ণুঃ, গঙ্গা বিষ্ণুঃ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শরীরের কয়েকটি ভাগে জল প্রক্ষেপ করিতে বলিলেন; আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম, আবার মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক গঙ্গাজল পান করিতে বলিলেন, তাহাও করিলাম। অনন্তর তিনি বলিলেন, "হৃদয়মধ্যে শ্বেতপদ্ম ভাবনা করিবে—তাহার ভিতরে ও বাহিরে জ্যোতি। পদ্মের মধ্যে ইষ্টদেবতা জ্যোতির্ময়রূপে বিরাজ করিতেছেন।" মহারাজ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে ইষ্টদেবতার বসন, ভূষণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল তিনি যেন স্বয়ং ইষ্টমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমাকে বলিতেছেন। সর্বশেষে তিনি মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ করিয়া আমাকে তদ্রূপ বলিতে আজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রটি শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কারণ, উপনয়নের পর আমার পিতৃদেব যে মন্ত্র আমাকে দিয়াছিলেন, যে মন্ত্র তিনিও তাঁহার সন্ন্যাসী পিতৃদেব হইতে লাভ করিয়াছিলেন—এ যে আমাদের পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত কুলমন্ত্র! মহারাজ তাহাই আমাকে দান করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "এই মন্ত্র অন্তত হাজার বার সকাল ও সন্ধ্যায় জপ করিবে। তাহা ছাড়া বসিতে, খাইতে, চলিতে, শুইতে, সর্বোপরি যে কোন কাজ করিতে গেলে সর্বদাই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, ইষ্টদেবতার স্মরণ করিবে। সকালে উঠিয়া রাত্রিকালে পরিহিত কাপড় ছাড়িয়া শুদ্ধ কাপড় পরিয়া জপ করিবে। তারপর যথারীতি স্নান-সন্ধ্যাদি করিবে। সায়াহ্নে সন্ধ্যাবন্দনার পর জপে বসিবে। এইরূপ দুই তিন বৎসর করিলে তুমি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবে।" পরে তিনি বলিলেন, "তোমার

ফলের একটি আমাকে দাও।" আমি প্রণাম করিয়া ফল তাঁহাকে দিলাম। অমূল্য মহারাজকে ডাকিতে বলায় আমি তাঁহার নিকট গেলাম।

সর্বসমেত তিনজনের সেইদিন দীক্ষা হইল। আমার পর যে ভক্ত দীক্ষা নিলেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তিনি একজন কেরলীয় ব্রাহ্মণ। ধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপকগণও মুগ্ধ হইতেন। তিনি তখন Intermediate ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। বিবাহিত হইলেও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন। কয়েক বৎসর পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী আগমানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হন। ছাত্রাবস্থায়ও তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল। দিন দিন সেই শক্তি বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সংস্পর্শে অনেক ধর্ম-পিপাসু লোকের জীবন ধন্য হইল। সেই ভক্ত যেদিন দীক্ষাগ্রহণ করেন তাহার পূর্বদিন সকালে মহারাজকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ভক্তিলাভ কিরূপে হইতে পারে?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "বিকাল তিনটার সময় আসিও।" ইহাতে ভক্ত কিছুটা বিস্ময়বোধ করিলেন। কারণ স্বামী নির্মলানন্দজী বা স্বামী শঙ্করানন্দজীর অনুমতি ব্যতীত ব্রহ্মচারী সেবক কাহাকেও মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেন না। তজ্জন্য সেই ভক্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহারাজ নিজেই তিনটার সময় ভক্তকে ডাকিয়া আনিবার জন্য সেবক ব্রহ্মচারীকে পাঠাইলেন। ভক্তটি ঘরে আসিয়া মহারাজের পদে প্রণত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তারপর অনেকক্ষণ বিভোর হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। অনন্তর মনুষ্যজন্মের সার্থকতা, গুরুর প্রয়োজন, মন্ত্রের শক্তি, ধ্যান প্রভৃতি বিষয়ে অমূল্য কার্যকর উপদেশ দিলেন। ভক্তটি বাহির হইবার সময়ই নির্মলানন্দজী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সকল সমাচার অবগত হইলেন। নির্মলানন্দজী বলিলেন, "তোমাকে দীক্ষা দিতে মহারাজকে কেন ধরিলে না? এই দুর্লভ সুযোগ ব্যর্থ করা উচিত নয়।" পরে তাঁহার দীক্ষার জন্য নির্মলানন্দজী সব ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন আমার দীক্ষা হয় সেদিন মহারাজের ঘরে বসিয়া প্রাপ্ত মন্ত্রটি হাজারবার জপ করিতে উক্ত স্বামীজী আমাকে বলিলেন, আমিও তাহাই করিলাম। দীক্ষার পর নির্মলানন্দজী আমার সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা জপ করিবার কথা ছেলেটিকে বলিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি তাহাকে এইরূপ বলিয়া দিও, মালাও পাঠাইয়া দিও।" তখন নির্মলানন্দজী বলিলেন, "পূর্বেই আমি পাঠাইয়া দিয়াছি।" পরে আমার দিকে

চাহিয়া বলিলেন, "আমি যে দুইটি মালা তোমার পিতার জন্য পাঠাইয়াছি তাহার একটি তুমি ব্যবহার করিও।" দীক্ষার সময় মহারাজ আমাকে হাতে অঙ্গুলিদ্বারা জপ করিতে শিখাইয়াছিলেন। সেইদিন দ্বিপ্রহরে মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আগমানন্দ স্বামী ও আমি আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিলাম।

ওখানে থাকিবার সময় একদিন এক ভদ্রলোক আসিয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া নাস্তিক্যবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। মহারাজ হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঈশ্বর আছেনই আছেন। আর তর্ক করিও না।" তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি শান্ত হইলেন এবং মহারাজকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিকালে স্বামী নির্মলানন্দজী আগন্তুকদের সংশয়-নিরসন করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমরা একটা special motor-boat এর্নাকুলম্ যাইবার জন্য engage করিয়াছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে।" পরদিন সকালে আমি মহারাজের পাদপদ্ম প্রণাম করিলে তিনি প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতেছ কি?" আমি বলিলাম, "হাঁ, মহারাজ।" তিনি খুশি হইলেন। নির্মলানন্দজী পরে মহারাজের পায়ে পড়িয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় মহারাজকে স্বামী নির্মলানন্দজী অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। আমাদের কাছে বারংবার নির্মলানন্দজী বলিতেন, "ঠাকুরের মতোই আমরা মহারাজকে দেখিয়া থাকি। মহারাজকে দেখিলে ঠাকুর বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ঠাকুর কিরূপ ছিলেন যদি জানিতে চাও তাহা হইলে মহারাজকে ভাল করিয়া জান।"

নির্মলানন্দজীকে কত কথা বলিয়া সেবা ও যত্নের প্রতিশ্রুতি দিয়া মহারাজকে লইয়া যাইবার অনুমতি পাইলাম। এখানকার অনেক ভক্তকে কৃপা করিবার জন্যই এত সাধ্য-সাধনা করিয়া আমি মহারাজকে আনয়ন করিয়াছি। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় নির্মলানন্দজীর মুখে গাম্ভীর্য, তেজ ও ওজস্বিতা প্রকাশ পাইল। পরমুহূর্তে মহারাজের নিকট গিয়া তিনি একেবারে ভাবান্তরিত হইয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি হইলেন! এইবার প্রণাম করিলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুলসী, কখন যাইতে হইবে?" তুলসী মহারাজ বলিলেন, "এখনই।" সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ দণ্ড লইয়া বাহির হইলেন। এমনই ছিল তাঁহার

শিশুসুলভ সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা। তখনও যাত্রার সব বন্দোবস্ত হয় নাই। মহারাজ বাহির হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া সকলেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি motor-boat এর নিকট উদাসীনভাবে দাঁড়াইলেন। ত্রিকুন্নপ্পুলৈ নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমি চলিয়া যাইব বলিয়া মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনি কৌতুক করিয়া বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে আসিবে এইরূপই কথা ছিল; এখন অর্ধপথে তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছ! তাহা ভাল নহে।"

আমি বলিলাম, "আমাকে বাড়ি যাইতেই হইবে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ি কোথায়?" আমি বলিলাম, "হরিপাদ।" তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আমারও হরিপাদ যাইবার ইচ্ছা হইতেছে।" পরে বলিলেন, "আমার নিকট সর্বদা পত্র দিও। যেখানেই আমি থাকি না কেন, বেলুড় মঠের ঠিকানায় পত্র দিলে নিশ্চয় পাইব।" ইহাই তাঁহার শেষ কথা। মাদ্রাজে পৌঁছা মাত্র মহারাজের আদেশে পূজনীয় অমূল্য মহারাজ আমার নিকট এক আশীর্বাদপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শনলাভ আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় অনুগ্রহ বলিয়া আমি মনে করি। ইহা আমার নিজের কোন গুণের জন্য নহে, তাঁহার কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইয়াছে, এই আমার বিশ্বাস।

(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ ৭ ও ৮ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতিকথা

শ্রী পি শেষাদ্রি, এম্-এল্

(দক্ষিণ-ভারতের কতিপয় ভক্তের নিকট হইতে লেখক-কর্তৃক সংগৃহীত)

॥ ১ ॥

মহারাজের কথা প্রথম শুনিয়াছিলাম জনৈক ভক্তের নিকটে। সাত্ত্বিক স্বভাবের জন্য তাঁহাকে সকলে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি শশী মহারাজকে প্রথমে দর্শন করেন। শশী মহারাজ তাঁহার বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় ঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভোগের মধ্যে ঘৃত দেওয়া হয় নাই বলিয়া রামকৃষ্ণানন্দজীও ঐদিন ঘি খান নাই। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর দিব্যস্পর্শে এই ভক্তটির ধর্মজীবন বিকশিত হয়। ঐ স্পর্শ ছয় মাসের জন্য ফলপ্রদ হইয়াছিল বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে মাদ্রাজ মঠে গিয়া তিনি মন্ত্রদীক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে উক্ত স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে একজন জীবন্মুক্ত নিত্যমুক্ত মহারাজজী আছেন। তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লওয়াই উচিত।" পরে মহারাজের নিকট দীক্ষার কথা লিখিয়া একটি পরিচয়-পত্র ভক্তটির হাতে দিলেন। মহারাজ তখন পুরীধামে শশি-নিকেতনে ছিলেন। ভক্তটি এক বন্ধুর সহিত মহারাজের দর্শনের জন্য সেখানে গেলেন। স্বামীজীর পত্র পাইয়া মহারাজ সেই ভক্তকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ সেই দুই জন ভক্তকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবান কেন আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন?" তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন নাই। মহারাজ অবশেষে নিজেই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্য।" এই সরল ও সুমধুর উত্তর শুনিয়া ভক্তদ্বয় অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। এই ভক্ত মহারাজের নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। মহারাজের প্রত্যেকটি পত্র তিনি অমূল্য রত্নের ন্যায় যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ একখানা পত্র পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেই পত্রের মর্ম এইরূপ—"ভগবানের ধ্যান কৃত্রিম বা ক্লিষ্টভাবে করিবে না।

তাঁহাকে সুকোমল শিশুর মতো মনে করিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিবে। সরল ভাব অবলম্বন কর" ইত্যাদি। এই ভক্তটি অনেক সরকারি কার্যে খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ইনি স্বামী পরানন্দ নামে পরিচিত হন।

আর একজন ভক্তের কথা বলিব। তিনি হরিপাদ আশ্রমের জন্য জমি দান করিয়া সেই আশ্রমের প্রথম ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দজীর পত্রসহ তিনি দীক্ষার্থ বেলুড় মঠে গেলে মহারাজ তাঁহাকে পরদিন আসিতে বলেন। সেইদিনও তিনি উপস্থিত হইলে তাহার পরদিন আসিতে আদেশ দেন। এইরূপে তিন দিন চলিয়া গেলে ভক্তটি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে মহারাজের নিকটে আনিয়া বলিলেন, "এই ভক্তটি বহু দূর হইতে—ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আসিয়াছে, আর আপনি তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতেছেন না।" তখন মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার এত দয়া হইলে আপনি স্বয়ং তাহাকে দীক্ষা দিন।" স্বামী প্রেমানন্দজী উত্তর দিলেন, "কিন্তু সে আমার নিকট আসে নাই। আপনার নিকটই দীক্ষার প্রার্থনা জানাইয়াছে। যদি আমার নিকট আসিত তবে সেই দিনই দীক্ষা দিতাম।" মহারাজ বিনয়পূর্ণস্বরে বলিলেন, "ভাই, আমি অসুস্থ ছিলাম। যাহা হউক, কালই দীক্ষা দিব।" পরদিন দীক্ষা দিয়া সেই ভক্তকে মহারাজ কৃতার্থ করেন। এই ভক্তটি পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া স্বামী চিৎসুখানন্দ নামে পরিচিত হন।

আর এক জন ভক্তের কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি তখন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে তহশিলদার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তীর্থযাত্রা-ব্যপদেশে তিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে গিয়া স্বামী নির্মলানন্দজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহার পরামর্শে বেলুড় যাইয়া মঠের ঘাটে জিনিসপত্র রাখিয়া গঙ্গাস্নান করেন। পরে অতিথিনিবাসে গিয়া ভিজা কাপড় রৌদ্রে মেলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে একটি খামের ভিতর রক্ষিত ১৫ টাকা তিনি গঙ্গার ঘাটে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু স্নানান্তে তাহা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি তখনই সেখানে ছুটিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। মহারাজ মঠের উপর তলায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "নিচে গঙ্গাতীরে একটা কাণ্ড হইতেছে। সেখানকার সাধুকে সাবধান হইয়া সব দেখাশুনা করিতে বল।" সেবক তাঁহার আদেশ-অনুসারে কাজ করিলেন। মঠের উঠানে যে সাধু ছিলেন, তিনি দেখিলেন, একটি নৌকা তীরে আসিলে মাঝি

তীর হইতে কোন এক জিনিস লইয়া আবার নৌকায় উঠিতেছে। সেই সাধু ঐ লোকটিকে ডাকিলেন। সে তীরে আসিলে তিনি তাহাকে খামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে স্বীকার করিল যে সে একটা খাম তীর হইতে আনিয়াছে এবং উহা সে অর্পণ করিল। এই সময় ভক্তটি উহা খুঁজিতে আসিলেন। তিনি সাধুর নিকট ঘটনাটি বলিলে খামটি ফেরত পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজের আদেশে সেই ভক্তটি মহারাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আমি গৃহস্থ হইয়াছি, আমি গৃহস্থ হইয়াছি।" মহারাজের কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভক্তটি বিস্মিত হইলেন। তখন মহারাজ নিজেই কথাটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "কেহ কেহ এখানে আসে, যারা নিজেদের জিনিসগুলিও রক্ষা করিতে অক্ষম। সেইজন্য ঈশ্বর-ধ্যান ছাড়িয়া আমাকে তাহাদের জিনিসপত্র রক্ষা করিতে হইতেছে।" সেই ভক্তটি তাঁহার ত্রুটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে মহারাজের সেবকের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে ভক্তটির আগ্রহ হয়। কিন্তু সেবক সন্ন্যাসী বলিলেন যে, মহারাজের অনুমতি ব্যতীত কোথাও তিনি যাইতে পারিবেন না। এই সময়ে সকলেই চা পান করিতেছিলেন। মহারাজ ও মহাপুরুষজী একসঙ্গে এদিক-ওদিক পাদচারণা করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে চায়ের টেবিলের নিকট যাইয়া কিঞ্চিৎ চা পান করিতেছিলেন। ভক্তটি বলিবার উপক্রম করিলেই মহারাজ চলিয়া যাইতেন। তিন চারিবার এইরূপ হইলে মহাপুরুষজী মহারাজকে বলিলেন, "এই লোকটির প্রার্থনা সফল করুন।" তখন মহারাজ ভক্তটিকে বলিলেন, "তুমি দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা করিতেছ? আচ্ছা, আমি সব ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

এই ভক্তটি জীবিত আছেন। মহারাজের কথা স্মরণ করিলে তিনি এখনও ভাবে তন্ময় হইয়া যান।

॥ ২ ॥

(১৯১৬ সালের ২৭ নভেম্বর, ত্রিবাঙ্কুরের আলওয়া শহরে ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ)

তীর্থভ্রমণে অনেক উপকার। তীর্থস্থানে সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ করবার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ সময়ে সাংসারিক চিন্তাটা কম থাকে; একটানা ঈশ্বরচিন্তা করা সম্ভব হয়।

কাশী পরম পুণ্যক্ষেত্র; বহু সাধু, মহাপুরুষ বাস করেন। সাধুসঙ্গ করবার বিশেষ সুবিধা। ওখানে একটা নিরন্তর আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বোঝা যায়। গৃহীদেরও সাধন-ভজন করবার সব রকম সুবিধা আছে। কাশীতে কিছুকাল বাস করা সকলেরই পক্ষে খুব ভাল।

বৃন্দাবনও কাশীর মতো একটি পবিত্র তীর্থস্থান। বৃন্দাবনে রাতদিন ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন অনেক সাধু ও ভক্ত আছেন। সকলেরই অন্তত একবার এই সব পবিত্র তীর্থদর্শন করা উচিত।

ঈশ্বরের নাম-জপ করা খুবই ভাল। তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। নাম-জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টের স্মরণও করা উচিত। এই স্মরণ-পূর্বক জপ খুব উপকারী। মনে অন্য চিন্তা রেখে শুধু মুখে নাম উচ্চারণ করলে কোন বিশেষ ফললাভ হয় না। অধিকারিভেদে ইষ্টদেবতা স্থির করে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন। অধিকারী অনুসারে ইষ্টদেবতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকেন। স্বয়ং জ্ঞানলাভ করবার আগে গুরুর উপদেশ-অনুসরণ করাই শ্রেয়। গুরুর উপদেশ যতই পালন করবে ততই হৃদয় নির্মল হবে।

গুরুর উপদেশ ব্যতীত সাধন করা প্রায়ই দুঃসাধ্য। অসামান্য মনোবলসম্পন্ন অতি বিরল কোন-কোন লোকের পক্ষে হয়ত গুরুর প্রয়োজন তত নেই। কিন্তু গুরুর আশ্রয় নিয়ে সাধন করাই শ্রেয়স্কর; ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয় থাকে না। কিন্তু গুরুলাভ না হওয়া পর্যন্ত অলস হয়ে বসে থাকা কোনও মতে উচিত নয়। সাধন করে যেতে হবে—যথাসময়ে গুরু নিজে এসে উপদেশ দেবেন।

নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করে। স্ত্রী, সন্তান প্রভৃতি সকলকে ঈশ্বরের সম্পত্তি বলে জানবে। এই ভাব ঠিক ঠিক পোষণ করতে পারলে তোমাদের সমস্ত কাজই আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

ধ্যান অভ্যাস করলে অনুভূতি হচ্ছে বলে তোমরা নিজেরাই প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারবে। কেবল শাস্ত্রপাঠ ও বৃথা তর্ক করলে কোনও লাভ হয় না। ধ্যানে চিত্ত শুদ্ধ হবে; আর চিত্ত শুদ্ধ হলে ঈশ্বর-লাভ হবে। তোমাদের সমস্ত শক্তি ও পৌরুষ সাংসারিক বিষয়ের জন্যই তোমরা ব্যয় করছো। ঈশ্বর-ভজনের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করছো না। এইভাবে জীবন ব্যর্থ করা উচিত নয়। ঈশ্বর-ভজনে ও ভক্তি-সাধনায় লেগে যাও। সময়ের অপব্যয় করো না। আমাদের জীবন তো ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈশ্বরের আরাধনাই আমাদের প্রধান

কর্তব্য। কাজের মধ্যেও ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। দিনের মধ্যে শুধু কোন একটা সময়ে ঘরের কোণে বসে চোখ বুজলেই যথেষ্ট নয়। তখন তো জাগতিক চিন্তাই তোমাদের মন অধিকার করে বসে থাকে।

দ্বৈতভাব থেকে সাধন আরম্ভ করাই প্রশস্ত। এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হলে তোমরা আপনা আপনি সহজেই অদ্বৈতে পৌঁছুবে। ঈশ্বরকে প্রথমে বাহিরে দেখাই ঠিক; পরে তোমাদের অন্তরেও তাঁকে দেখতে পাবে। আনন্দের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত ধ্যানের অভ্যাস ছাড়বে না। সেই অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত দ্বৈতভাবই অবলম্বন করতে হবে।

সমাধি-অবস্থায় কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই দেখতে পাবে। তখন মন ঈশ্বরময় হয়ে যাবে। সমাধির স্বরূপ বর্ণনা করতে পারা যায় না।

(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা ও ৫৫ বর্ষ ১ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীমহারাজের কথা

শ্রী—

প্রথম দিন দর্শনের পর থেকেই প্রতিবারে বলতেন, "মশাই, আবার আসবেন, আবার আসবেন।" কিছুদিন যাতায়াতের পর একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমি মঠের ফটকের বাইরে, আর মহারাজ প্রভৃতি ভিতরে রয়েছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। একদিন সকালে মহারাজকে বললাম, "এতদিন আসছি, এখনও মনে হচ্ছে বাইরে পড়ে আছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "ওসব কথা আমার সঙ্গে নয়, বাবুরাম মহারাজকে বল গে।" আমি ভাবলুম। ওঁকে জানিয়েছি, আর কি দরকার? কিন্তু এই হলো প্রথম অপরাধ।

স্নানের পর মহারাজকে প্রণাম করব, কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলুম না। চায়ের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি তিনি উপর থেকে নেমে এলেন। তারপরই আরম্ভ হলো বেঞ্চে বসে বিচার। মহীতোষ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি অনেকে দাঁড়িয়ে। মহারাজ বলতে লাগলেন, "মশাই কি বলে শুনুন। তুমি যা বললে ওর moral (নীতি) কি বুঝেছ? এখান থেকে গিয়ে বাড়িতে কি recapitulate (পুনরাবৃত্তি) কর? যাও ঘোষ পাড়ায়, যাও, তিন দিনে করে দেবে; ভক্ত হও, ভক্ত হও।"

হরি মহারাজ কেবল বলতে লাগলেন, "ঠিক ঠিক।" মহারাজ—"মশাই, মহাপুরুষদের কথা—'সাধ করে পরেছি ফোঁটা, পুঁছব কেমন করে গো' (রামপ্রসাদ)।" এর পর অনেকক্ষণ আরও কি কি যে বললেন, আমার মাথায় ঢুকল না, মাথা কেমন করতে লাগল। তিন দিন মাথায় বেদনা হয়ে রইল। ভাবলুম, কি এমন গুরুতর অপরাধ করলুম যার জন্য এতটা বিরক্ত হলেন? অনেকেই তো এ রকম বলেছেন, ওঁরাও তো ঠাকুরকে বলেছেন, তবে আমার উপর এতটা কেন? কথাশেষে মহীতোষ মহারাজ আমাকে বললেন, "ওটা আপনার উপর দিয়ে হয়ে গেল। অনেক সাধুর পর্যন্ত আক্কেল হলো।" এই অপরাধের গুরুত্ব দীর্ঘ ৪০ বৎসরেও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। প্রসাদ পেয়ে ভিজিটরস রুমে (Visitor's room) ঝুম মেরে পড়ে আছি, না নিদ্রা—না জাগরণ। হঠাৎ একজন সোজা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস

করলেন, "আপনার নাম কি? আপনাকে মহারাজ উপরে ডাকছেন।" উপরে লাইব্রেরি ঘরে মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বসে এবং বাবুরাম মহারাজ পেছনে দাঁড়িয়ে। যত চিঠিপত্র খোলা হচ্ছে—জবাব দেওয়া হবে। যাওয়া মাত্র মহারাজ বললেন, "মশাই আমাদের উপর রাগ করেছে, আমাদের সঙ্গে কথা কবে না, আমাদের মিটিং-এ যাবে না।" আমি বললুম, "আমি কি এমন কথা—?" অমনি বলে উঠলেন, "বলনি!" আরও চলত। বাবুরাম মহারাজ আমাকে চোখটিপে চুপ করতে বললেন। আমিও তাই করলাম। তারপর বিকেলে নিচে পূর্বদিকের বারান্দায় প্রশ্নোত্তর ক্লাস হচ্ছে। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ বেঞ্চে বসে আছেন, নিচে সতরঞ্চে আগন্তুকগণ "কার কি জিজ্ঞাস্য আছে জিজ্ঞেস করুন, বলে দু-একটা কথার পর মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?" আমি জবাব দিলাম, "না, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।" তখন মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মশাই, এই যে কেউ কেউ বলে, 'এখানে এতদিন আসছি কিছু হচ্ছে না', এর মানে কি?" তিনি উত্তর করলেন, "তারা আরও চায়, পেট ভরছে না।" মহারাজ বললেন, "আচ্ছা মশাই, এও তো হতে পারে—তা দেওয়া যাচ্ছে পৌঁছুচ্ছে না, দেরি হচ্ছে।" তিনি বললেন, "হাঁ তাও হতে পারে।" এর বহুদিন পরে যখন মহাপুরুষ মহারাজ মঠের প্রেসিডেন্ট, আমি একদিন বললুম, "মহারাজ, অনেকের জন্যে আপনাকে অনুরোধ করলাম, কৈ আমার নিজের জন্যে তো কিছু বলা হলো না।" তিনি বললেন, "আবার কি দাগার উপর দাগা বুলুবে? তোমাদের যা করবার তা মহারাজ, মা-ঠাকরুণ, বাবুরাম মহারাজ এঁরা সব করে গেছেন।"

মহারাজ—(জনৈক ভক্তকে) "একসঙ্গে (স্বামী-স্ত্রী) থাকতে গেলে মিলেমিশে থাকতে হয়। তা না হলে একজনকে তফাৎ হতে হয়।" (অপর একজনকে) "পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হলে মিলেমিশে থাকতে হয়।" (কুঞ্জলালকে) "চুপ করে বসে থাকা ভাল নয়, একটা কিছু কাজ করা ভাল। যাও, পাতকুয়ার তলার ঘাস ছেঁড়গে।" খানিক পরে একজনকে পাঠালেন, "যাও, ডেকে নিয়ে এস, আর ঘাস ছিঁড়তে হবে না।" পশ্চিমদিকের চায়ের টেবিলে বসে গাইলেন, "বনকুসুমের মধুর সৌরভে তোমায় রাখিব সখা হে।" (জনৈক ব্রহ্মচারীকে) "তোমাকে ভুবনেশ্বরে পাঠালুম ধ্যান-ভজন করবে বলে। তুমি বার বার লিখতে লাগলে, 'আমার কাশী যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।' যাও কাশীতে গিয়ে রোগীদের গু ঘাঁটগে।"

একদিন একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন, "কি ব্রহ্মচারী, পান খাওয়া হচ্ছে যে?"

ক—মামাকে একদিন শ্মশানে যেতে বারণ করলেন। বললেন, "ওতে লোক hard-hearted হয়ে যায়।" একদিন দেখলাম, অভেদানন্দ স্বামীকে নৌকায় তুলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। তারপর word-making খেলতে বসলেন। হেরে যাচ্ছেন দেখে একজন বললেন, "মহারাজ, হেরে যাচ্ছেন।" মহারাজ জবাব দিলেন, "মশাই, এ জগতে জেতাটা কিছু নয়, হারাই ভাল।" একদিন জনৈক ভক্তকে বললেন, "এই তো প্রণাম করলেন, আবার কেন? মশাই, পেন্নাম ফেন্নামে কিছু নেই, ভালবাসাটাই জিনিস। নাক টিপেই বস, আর যাই কর, সত্যি কথা কইতে জিব বেরিয়ে যাবে।" জনৈক গৃহী ভক্তকে বললেন, "ভোগ কি আর করবে?" অপর একজনকে বললেন, "একমুঠো টাকা রোজগার করতে কত কষ্ট করতে হয়, আর ভগবান লাভ করতে কষ্ট করতে হবে না? 'যৎ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।' মশাই, আমি আর কাকে কি বলব? সাক্ষাৎ দেখছি, যে একবার রামকৃষ্ণের দুয়ারে মাথা ঠুকেছে, ঠাকুর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন।" জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁরে, অমুকের খবর জানিস।" ভক্ত—"না মহারাজ, তার স্বভাব খারাপ হয়েছে, আমরা আর তার সংস্রবে থাকি না।" মহারাজ— "সে কি রে, তোদের ভালবাসা কি বেশ্যার ভালবাসা? আমি তো কারুর দোষ দেখি না।" ভক্ত (কথাপ্রসঙ্গে)—"তা বলে কি পরিবারের মতে চলতে হবে? সে যা বলবে, তাই শুনতে হবে?" মহারাজ—"সে কিরে, শুনবি না? সে যে সুখস্থান।" অপর ভক্তকে—"যা বললুম (সাধন ভজন সম্বন্ধে) যদি কর তো পাবে সুখ, নইলে অন্যরকম করতে হবে। কর্মফল ভুগতেই হবে। কলিকাল! তিন পাদ পাপ, এক পাদ পুণ্য।" একদিন বললেন, " পোড়া ম্যালেরিয়ার জ্বালায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। তা নইলে এমন সোনার মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে কি, মশাই?" একদিন বলছেন, "সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে এলাম, কৈ ভবিষ্যৎ বলতে পারে এমন লোক তো দেখলাম না মশাই।" পরে জনৈক ভক্তকে—"কুষ্ঠি-ফুষ্ঠি ওসব যদি করবে তো এখানে কেন? তাদের কাছে যাও।"

একব্যক্তি সাতজনের কাছে মন্ত্র নিয়েও শান্তি পান নি। মহারাজ তাঁকে বললেন, "বেশ, এখন কি করছ?" উত্তর—"এখন কোনটাই জপ করি না।" মহারাজ—"বেশ আরও ভাল।" প্রশ্ন—"এখন কি করব?" মহারাজ—"এখন ওই সাতটা মন্ত্রেরই একবার করে জপ করবে। যেটা ভাল লাগবে, সেইটাই জপ করবে বেশি করে।"

কোন এক ভদ্রলোক পুরোহিত জ্যোতিষীর উৎসাহে শেয়ার কিনে বিপন্ন

হয়ে মহারাজের শরণাগত হয়। রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল বাবুর বাড়িতে মহারাজ রামলালদাদাকে বললেন, "এই এসেছেন। এখন বাড়ি ঘর যায়।" বলে জপ করে দিলেন। লোকটি সে যাত্রা কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেল। মহারাজ তাকে বলেছিলেন, "কেন তুমি একাজ করেছিলে? অমুক চাটুয্যে করে, তার মাগ ছেলে নেই; সে এক। তুমি ছা-পোষা মানুষ, তুমি কেন একাজ করতে গেলে? এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলে কি? কারু দেখাদেখি করতে গিছলে? কে তোমাকে একাজ করতে বললে? কেউ উৎসাহ দিয়েছিল? রাতারাতি বড় মানুষ হতে গিছলে? পয়সা করাটা কি এতই সহজ? একখান ইংরেজি বইয়ে পড়লাম, 'বিধবার সর্বস্ব হরণ', ইত্যাদি কত কি করতে হয়। জান না এযুগে যাঁরা সৎপথে থাকবে তাঁদের রুকু মাথায় তেল জুটবে না।"

এক জনের বাড়িতে কলেরায় একদিনে দুটি মৃত্যু হয়। মহারাজ তাকে বললেন, "পড়ে গেলে কি পড়ে পড়েই কাঁদতে হবে। উঠতে হবে না?"

একজনকে ঘি খেতে বলেছিলেন। সে বললে, "আগে খেতুম, এখন বাড়ি করে দেনা হয়েছে, তাই বন্ধ।" তিনি বললেন, "ঐটে লোকে বড় ভুল করে, শেষে ধনেপ্রাণে মারা যায়।" সে ব্যক্তির কাকার ঐ দশা ঘটেছিল।

একজনের সম্বন্ধে বললেন, "—কে ভাল মানুষ পেয়ে সব্বাই ঠকায়।"

একদিন জনৈক ভদ্রলোক বললেন, "মহারাজ কোঠারের সেই বাবাজী মরে গেছে।"

মহারাজ তাতে বললেন, "জান তুমি মরে গেছে? মরে গেছে?"

এক দিন জনৈক ভক্তকে দেখাইয়া মহারাজ বললেন, "এই লোকটির বাইরে সাদা ভেতরটা গেরুয়া।" মহারাজকে জনৈক ভক্ত বললেন, "মহারাজ, আগে স্বামীজীর উৎসবে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হতো, এখন সব ভক্তরা বসে পড়ছে।" মহারাজ একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, "দেখুন, এটা যখন আরম্ভ হয় তখন দরিদ্র ছিল। এখন চতুর্দিকে কলকারখানা হয়ে তারা দুমুঠো খেতে পায়। এখন এরাই দরিদ্র—ছা-পোষা লোক সংসারে খেতে পায় না।"

একজন মহারাজকে অনুযোগ করে বললেন, "মহারাজ, আপনি সকলের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করেন, কাউকে ভগবানের কথা বলেন না।" উত্তরে তিনি বললেন, "দেখুন এরা সব সংসারে জ্বলে পুড়ে এখানে আসে, আনন্দ পাবে বলে। "একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, "এ এক রকম বেশ, মশাই, কারু ভেতর

দেখবার জো নেই—কে কতদূর এগিয়েছে বোঝবার জো নেই।" শরীরের কথায় একদিন বললেন, "কখন রোগা কখন মোটা। কি হবে কতগুলো মেদ বাড়িয়ে?"

জনৈক ভক্তকে—"তোমার পরিবারের গর্ভাবস্থা। এলোপ্যাথি কেন করছ? হোমিওপ্যাথ দেখাও না।" অপর একজনকে—"রোগটা কি, ডাক্তারকে দিয়ে diagnosis ঠিক করে নিয়ে তারপর যেমন case (অসুখ) বুঝবেন সেই রকম করা ভাল—এলোপ্যাথি, কি হোমিওপ্যাথি, কি কবিরাজী।" শ্রীযুত শ্যামদাস কবিরাজকে—"কবিরাজ মশাই, একটা কথা বলব, শুনবেন?" কবিরাজ—"কি, বলুন।" মহারাজ—"ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা।" জনৈক ভক্ত কোন জ্যোতিষীর ভুল ধরেছিলেন। মহারাজ তাঁকে বললেন, "শেষটা এই হলো—বিদ্যার অহঙ্কার!" কোন ভক্ত কলকাতায় থেকেও এক বৎসর মহারাজের সাথে দেখা করেন নি। গুরু যখন ডাকবেন তখন দেখা করবেন—এই প্রতিজ্ঞা। মহারাজ যখন বলরাম মন্দিরে তখন তাঁকে ডেকেছিলেন। তিনি ছোট ঘরটিতে ঢুকলেন—পক্ককেশ। মহারাজ খানিক চেয়ে থেকে বললেন, "ও—এস, ভেবোনা, এক একবার আসবে, এখানে বেড়িয়ে যাবে।"

আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ?" তিনি বললেন, "ভাল নয়।" মহারাজ—"কেন?" উত্তর—"আর ধ্যান হয় না।" মহারাজ—"একবার করে সকালে বসবে।"

খোকা মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি বিশ্বাস কর, আর তোমাকে খাটতে হবে না।"

একদিন বললেন, "যে কোন বিষয়েই হোক, একেবারে মগ্ন হয়ে যেতে হয়। তা নইলে হয় না। দেখুন মশাই, এই হলদে গাঁদাগুলো লাল গাঁদার সঙ্গে থেকে লাল হয়ে গেল।" জনৈক ভক্ত তাঁর মাকে জগন্নাথ দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজ তখন পুরীতে। তিনি বার বার বললেন, "তোমার মায়ের জগন্নাথ দর্শন হলো।"

একজনের ছেলের চরিত্রদোষ হয়েছিল। মহারাজ বললেন, "তিনি কেন যে অত strict হয়েছেন! আর সে (ছেলেটা) দই খেয়ে ভাঁড় ফেলে দিক না।" জনৈক ভক্তকে—"ননীলাল, সব ভোলা যায়, ভগবানকে ভোলা যায় না।" আর একজনকে —"জপধ্যান parallel (পাশাপাশি) যাবে। এখন এই রকম কর, এর পর বলে দেব।" মঠে স্বামীজীর মন্দিরে মূর্তিটি দেখে বললেন, "স্বামীজীর এই মূর্তিটি বেশ, অ্যালানে ভাব।"

একদিন কুকুর উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে দেখে বললেন, "মায়ের আমার কত মুখেই খেতে ইচ্ছা হয়।" জনৈক ভক্তকে, "ভগবানের কাছে কিছু চাইবে না। ভক্তি পর্যন্ত না চাইতে পারলে ভাল হয়।" কাশীতে একজনকে বললেন, "মশাই, সংসারে মাগছেলেরা খেতে পাচ্ছে না, আর উনি এখানে এসে রাবড়ী ওড়াচ্ছেন!" অপর ভক্তকে—"সাধন-ভজনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য চাই।" এই প্রসঙ্গে বললেন, "এক পয়সার চিংড়িমাছ এনে গুষ্টিশুদ্ধ খাবে। ঈশ্বর দেখতে গিয়ে ভূত দেখে বসে থাকে।" অপর ভক্তকে—"ডিস্‌পেপসিয়াটাও (অজীর্ণটাও) ম্যালেরিয়া। poisonটা (বিষটা) ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। চা খেয়ে ম্যালেরিয়া কমে না। ম্যালেরিয়ার জায়গায় সকালে খালি পেটে থাকতে নেই, একটু কিছু খেতে হয়। গরম জলটা পেটে পড়ে, তাই।" এই প্রসঙ্গে একজনের কথা তুলে বললেন, "চা খেয়ে খেয়ে লিভারটি একেবারে খারাপ করেছেন।" গঙ্গাতীরে প্রতিপদের চন্দ্রোদয় দেখে ভক্তিভরে বার বার 'জয় জয়' বলে প্রণাম করতে লাগলেন। জনৈক ভক্ত উৎসবের সময় মঠে নাগরদোলায় চড়তে চাইছিলেন না। মহারাজ তখন তাঁকে বললেন, "এর একটা মানে আছে।"

এক ব্যক্তির কাকার অসুখ, বাঁচবার আশা নেই। তিনি মহারাজকে বললেন, "মনটা ভাল নয়, কাকা বোধ হয় বাঁচবেন না।" তিনি বললেন, "ওতে কি তোমার অসুবিধা হবে? জেনে রেখো এখানে চিরদিনের জন্য কেউ নয়।"

"যে রকম দিনকাল পড়েছে একটু কৃপণ হওয়া ভাল, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভাল নয়।"

জনৈক ভক্তকে চা ফুঁ-দিয়ে খেতে দেখে বললেন, "মশাই, এখনকার ডাক্তারদের মতো চায়ে ফুঁ দেওয়া ভাল নয়, ওতে পেট ফাঁপে।" একজনকে বললেন, "সকলেরই একটু exercise (ব্যায়াম) করা দরকার।" তখনই আর একজনকে বললেন, "তোমার দরকার নেই, তোমার active life (খাটুনির জীবন)।" জনৈক ভক্তকে একদিন বললেন, "রাত্রে কি খাও?" "আজ্ঞে, ভাত খাই।"—"রুটি খেও, ওতে একটু বল রাখে। যবের আটায় হাতির মতো বল হয়।"

কাশীতে একদিন বলেছিলেন, "ভোগ কি আর করবে?" অন্য সময়ে—"ভোগ করবে, কৃতজ্ঞ হয়ে ভোগ করতে হয়। বিবিধ সুখের পর অন্তে পরমপদ—এওতো শাস্ত্রে আছে?"

"মশাই, তীর্থে এসেছেন, তা-ও মাছ খাচ্ছেন। তীর্থে এসেও কি মাছ না খেলে নয়। কাশীতে এসেছেন শরীর শোধরাতে, বাজারের মাংস কিনে

খেয়েছেন। যদি মাংস খাবার ইচ্ছেই হয়েছিল, আমাকে বললেন না কেন, আমি দুর্গাবাড়ি থেকে পুজো দিয়ে বলিদানের মাংস আনিয়ে খাওয়াতাম।”

মহারাজ কারও পত্র পেয়ে বললেন, “কিছু হয়ে থাকে তো তা নিয়ে আবার ঢাক পিটে বেড়ান কেন?” শরৎ মহারাজকে বললেন, “লিখে দাও ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে মনটাকে তুলে নিতে।” আর একদিন বলেছিলেন, “মশাই এই সব লোকের self-respect (আত্মসম্মান জ্ঞান) নেই। আবার যেখানে নিমন্ত্রণ হয়, সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়, ভাবে না যে অত লোকের আয়োজন হয়েছে কি না।”

কুঞ্জবাবু—“মহারাজ, অমুক বাবু বললেন, মহারাজের ভালবাসা ভোলবার নয়।” মহারাজ মুখখানা লাল করে গম্ভীর হয়ে বললেন, “কুঞ্জলাল, ভালবাসতে পাল্লুম কৈ? ভালবাসতে কি জানি? ভালবাসতে কি শিখেছি?” একদিন বললেন, “এখনকার থিয়োরি মশাই, brain থেকে হজম হয়।” আর একদিন একজনকে বলেছিলেন, “(ভগবৎ) প্রসঙ্গ ভাল, প্রসঙ্গ চাই, প্রসঙ্গ দরকার।”

পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ জনৈক ভক্তকে বললেন, “ধর্মের first step (প্রথম সোপান) হলো Character (চরিত্র)। Characterটি ভাল হওয়া চাই। Sex-এর ধারণা পালটে দিতে হবে।”

পুরীতে অপর একজন ভক্তের কথার উত্তরে বললেন, “আপনি কি history লিখবেন নাকি মশায়? কোথায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ, কোথায় কি করে বেড়াচ্ছেন? যান বিমলাময়ীর মন্দিরে গিয়ে বসে চণ্ডীপাঠ করুন গে, যান।” আর একজনকে বললেন, “তাকে বোলো যেন তার গর্ভধারিণীকে রোজ সকালে উঠেই প্রণাম করে। আর যে মন্ত্র নিয়েছে, তা যেন জপ করে।”

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, “শুনেছি, কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিলেও মহাপুরুষের কাছে সেই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করে নিয়ে জপ করলে বেশি ফল হয়।” মহারাজ তৎক্ষণাৎ জিব কেটে হাত নেড়ে বললেন, “ও আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে নেই।” এই ব্যক্তির মা বাটীতে মহারাজকে নিয়ে খাওয়াবার ইচ্ছে করায় তিনি বলেছিলেন, “ কেন আর মিছে খরচ-পত্র করবে, এখানেও তো সেই তোমাদেরই খাচ্ছি।” সে ব্যক্তির মায়ের গঙ্গাযাত্রার সময় পুত্রকে মঠে পাঁচ টাকা দিতে বলে যান। মহারাজ শুনে বললেন, “ঐ টাকা দিয়ে আমি কাশীতে সধবা-ভোজনের ব্যবস্থা করে দেব; কাশীতে সধবা-ভোজনের খুব ফল।”

মহারাজ একদিন বলেছিলেন। "যখন সাধু হয়েছি, তখন গাছতলাই সার করেছি, এ ঘর আর ও ঘর কি, যে ঘরই দিক না! পয়সা থাকাও দোষ, না থাকাও দোষ।"

কেদারবাবুকে বললেন, "মশাই, মঠে আসবার নেশাটা রাখবেন।" অপর একজনকে—"তোমার কি change-এ (বায়ু পরিবর্তনে) যাবার অবস্থা? তার চাইতে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে পড়ে থাক।"

একদিন বলেছিলেন, "এক একবার স্বর্গ থেকে এসে দেখে যাব ছেলেরা সব কি করছে।"

মঠে প্রেমানন্দ-ধাম নির্মিত হবার আগে স্থানাভাবে ছেলেরা যে যেখানে পারে পড়ে থাকতো দেখে বলেছিলেন, "মশাই নরমুণ্ড সব গড়াগড়ি যায় দেখে প্রাণটা কেমন করে।"

আর একদিন মহারাজ ভাবমুখে বললেন "ভার দেয় কে? ভার নেয় কে? ভার দিলে ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে পড়ে থাকতে হবে না?"

একদিন জনৈক ভক্তকে বললেন, "ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত এক রকম সময়, আবার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একরকম যায়। যখন খিদে ছিল, তখন ভিক্ষে জোটেনি। ঝরনার জল আজলা আজলা খেয়েছি পেট ভরাবার জন্য। তাতে খিদে আরও বেড়ে যেত। আর এখন হজম করতে পারি না, এখন চারদিক থেকে নেমন্তন্ন আসছে।"

মহারাজ এক দিন বললেন,

"শুদ্ধমনে কারু কল্যাণ কামনা করলে হবে না?" "কাশীতে বেঁচেও সুখ মরেও সুখ।" "মন স্থির হলে তো হয়ে গেল।" "ননীলাল, এঁরা অনেক কষ্ট করে (উৎসবের) আয়োজন করবেন, বেলা হলে বা পরিবেশনের কিছু ত্রুটি হলে রাগ করো না।"

"কেউ যদি সারা জীবনের মধ্যে একবারও ভগবানকে সর্বান্তকরণে ডাকে তো তার জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।"

"কোন এক ভদ্রলোকের স্ত্রী তাঁর স্বামীর নিন্দা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলরাম মন্দিরে যান, মহারাজ (অন্তরে) তা জানতে পেরে তিনি কিছু বলবার আগেই তাঁর স্বামীর অশেষ প্রশংসা করে বললেন, "শিবতুল্য লোক।"

অপর একজনকে বলেছিলেন, "তুমি এখন কত পাও?"

"আজ্ঞে একশ দশটাকা।"

"কিছু বাঁচে?"

"আজ্ঞে না।"

"দশ টাকাও ফেলে রাখতে পার না? আমার এক দিদিমা বুড়ি ছিলেন, তিনি অল্প পয়সায় গুছিয়ে চালাতেন!"

"তোমরা ঐটে বড় ভুল কর, ঋষিদের মধ্যেও অনেকে বিবাহিত ছিলেন।"

একবার মহারাজের ঘরে প্রসঙ্গক্রমে হরিমহারাজ বললেন, "সমাধি করিয়ে দেওয়া যায় না?" মহারাজ তখন পীড়িত। তিনি বললেন, "হুঁ, তাও করিয়ে দেওয়া যায়।"

একজন গৃহিভক্ত, ছেলে মেয়ের বাপ, এখনও তিনি জীবিত। মহারাজ তাঁর সম্বন্ধে বললেন, "বাহাদুর ছেলে বাবা, তিন তিনবার সমাধি!" একদিন মহারাজ তাঁকে ধ্যান ঘরে চাবি দিয়ে নিজের কাছে চাবি রেখে দিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর খুলে দিলেন।

দুইজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এক আপিসে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে তর্ক হয়—'ঈশ্বর আছেন কি না।' উভয়ে আপিসের কাজের পর বড়বাজার থেকে নৌকাযোগে মঠে উপস্থিত হয়ে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন কি?" মহারাজ উত্তর দেন, "কৈ, ঈশ্বর বলে একটা কিছু তো দেখিনি।" এতে তাঁরা বড়ই খুশি হয়ে বললেন, "উনিই যখন দেখেননি তখন আমাদের তো কথাই নেই।"

একদিন মহারাজ জনৈক সাধুকে বলেছিলেন, "ঠাকুর নিয়ে বেশ আছো, তা লোকে স্ত্রী নিয়েও বেশ আছে!" যখন সংসারের খাটুনিতে অবসন্ন হয়েছি তখন বলেছেন, "কেন কর্মযোগ!" আবার এক সময়ে বললেন, "কাদের জন্যই বা কচ্ছ?" কাউকে বললেন, "সাধু হয়েছিলে কি কতকগুলো বাড়ি করবার জন্যে?"

জ্যোতিষের বই লেখার জন্য বললেন, "আরে রাম রাম! কি অবিদ্যার আলোচনা করছে?" জনৈক সাধুর সম্বন্ধে বলছেন, "As a Sadhu he is perfect but as a worker he is a failure." (সাধু হিসেবে তিনি খুব চমৎকার, কিন্তু কর্মী হিসেবে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি)।

বেলতলায় একটি ছেলে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে ধ্যান করছিল। মহারাজ

তাকে বললেন, "উত্তরমুখো হয়ে বোস, যখন আল্লা নাম জপ করবি তখন পশ্চিমমুখো হয়ে বসবি।"

একজন ব্রহ্মচারী চন্দ্রকিরণে বসে ধ্যান করছিলেন। মহারাজ ওরূপ বসতে নিষেধ করে বললেন, "চন্দ্রকিরণ কামবর্ধক।"

একদিন মঠের ঘাটে স্নান করছি। রামবাবুর ছেলে ঋষিকে খানসামা স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। ছেলের পায়ে ঠাকুরের কবচ ঠেকাতে সে তুললে। চাকর ও সবাই দেখলো। মহারাজ বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে ডেকে পাঠালেন। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কে আজ পুজো করেছিল?" একজন বললেন, "আমি।" মহারাজ—"তুলে রাখা হয়নি?" "ভুলে গেছলাম।" মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিক পরে বললেন, "এ ছেলে বড় সোজা ছেলে নয়।" এর অল্পদিন পরেই ছেলেটির দেহত্যাগ হয়। এই কবচ ঠাকুরের দারুণ গাত্রদাহ নিবারণের জন্য মহাপুরুষ মহারাজের পিতা তাঁকে ধারণ করতে দিয়েছিলেন।

একদিন বিকেলে মহারাজ ঘরের সামনের বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট, দুধারে সাধুভক্তরা দণ্ডায়মান। জনৈক ভক্ত এসে মহারাজকে প্রণাম করলে তিনি তাঁকে বললেন, "এঁদেরও (অন্যান্য সাধুদের) প্রণাম করুন; নইলে এঁরা আবার মনে করবেন, ওঁকেই খালি সকলে প্রণাম করে, আমাদের কেউ করে না।"

"রাম নাম বড় শুদ্ধ নাম।"

"মানুষ কি করবে? কি দোষ, ভগবানই ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে দিয়েছেন, মানুষ কি করবে বলুন।"

একদিন রামবাবুর শিষ্য হরিমোহন সিংহকে বললেন, 'মোহনদা, রামবাবুর ঋণ শোধবার নয়।'

জনৈক ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি মঠকে দান করতে চান। বাবুরাম মহারাজ মহারাজের নিকট একথা উত্থাপন করলে তিনি বললেন, "বাবুরামদা, শেষটা এই হলো? ওরা আমাদের কাছে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখলে, আর আমরা কি না গ্রহণ করা শিখলাম।"

কোন এক ভদ্রলোক বিপদে পড়ে মহারাজকে লিখলে তিনি তার উত্তরে লিখলেন, "মাঝি যেমন উত্তাল তরঙ্গে কিছুতেই নৌকাকে বিচলিত হতে দেয় না, আপনার অবস্থাও সেইরূপ।"

এক ব্রাহ্মণ প্রায় রবিবারই প্রচুর তরকারি পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতেন।

একদিন মহারাজ দেখে বললেন, "এ বেশ মশাই, আমরা তপস্যা করি আর আপনারা সরবরাহ্ করুন, যেমন আগে ছিল।"

"কি হলো, দয়াধর্ম কি পৃথিবী থেকে উঠে গেল?"

"এদেশের বিধবাদের যত্ন করা উচিত, ওঁরা ব্রহ্মচারিণী।"

একদিন সন্ধ্যের পর মহারাজ পূর্বদিকে নিচের বারান্দায় থামে ঠেস দিয়ে ছোট বেঞ্চে বসে আছেন। জনৈক ভদ্রলোক নিচের সিঁড়িতে বসে বললেন, "আমার একটু জিজ্ঞেস করবার আছে।"

উঃ—"কি, বলুন।"

প্রঃ—"আমার কাছে গুটিকতক ছেলে থাকে, তাদের কি রকম আহার দেব, মাছ মাংস?"

উঃ—"রুই মাছের মুড়ো।"

প্রঃ—"মাংস?"

উঃ—"সপ্তাহে একদিন।"

প্রঃ—"পেঁয়াজ?"

উঃ—"ঐ মাংসের সঙ্গে, আলাদা নয়।"

প্রঃ—"মহারাজকে একটা কথা বলব?"

উঃ—"বলুন।"

প্রঃ—"আজ্ঞে, কিসে প্রাণে শান্তি হয়?"

উঃ—"দেখুন, সত্যি কথা কইবেন, বাপ-মায়ের সেবা করবেন, more or less (অল্পবিস্তর) ভগবানকে ডাকবেন, এই। সংসারে আর কিছু নেই।"

একজন ভক্তকে, "মশাই জানবেন, আমি মনে করলে আপনাদের ওখানকার সকল লোককে এক দিনে ভক্ত করে দিতে পারি। জানলেন মশাই? জানলেন? আমার এমন ক্ষমতা আছে।" এই বলে খিল খিল করে হাসতে লাগলেন।

বাবুরাম মহারাজ এক জনের সম্বন্ধে মহারাজকে বললেন, "ভক্তলোক।" মহারাজ—"ভক্ত করে নাও।"

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবঃ।"

দেহত্যাগের পূর্বে পীড়িত অবস্থায় মাস্টার মহাশয়কে বলেছিলেন, "তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিই সার, কি বলেন?"

মহারাজ বলরাম মন্দিরে। এক শনিবার দেখা করতে গেলাম, সেবক বললেন, "মহারাজের চিঠিপত্রের জবাব দেবার জন্য এক প্যাকেট ডাকের চৌকো খাম, ও দলিলপত্র রাখবার খানকতক মোটা কাগজের মজবুত খাম আনবেন।" পরের শনিবার খাম নিয়ে গেলাম, সেবককে দেখতে পাইনি, হলঘরে একেবারে মহারাজের কাছে উপস্থিত হলাম। মোটাবুদ্ধি, ভাবলুম, মহারাজ খুশি হবেন। প্রণাম করে খামগুলি সুমুখে রাখলুম। কিন্তু উল্টো ফল হলো। জিজ্ঞাসা করলেন, "কে একে আনতে বলেছিল?" সেবকের নাম করলাম। ডাক পড়ল। সেবক উপস্থিত হলে মহারাজ বললেন, "তুমি একে এই সব আনতে বলেছিলে? এসবের জন্য তুমি এখান থেকে পয়সা পাও না? জান তুমি, ওর খরচ কত? তোমাদের জন্য আমি জ্বলে পুড়ে মলুম। এরপর তোমরা বড়লোকের মোসাহেবি করবে। যাও, গেরুয়া ছেড়ে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করে সংসার করগে যাও।"

আমি তো মহা অপ্রস্তুত, বললুম, "আমারই দোষে উনি বকুনি খেলেন।" মহারাজ তাতে বললেন, "তুমিও ভাল করনি, তোমার এ রকম indulgence (আশকারা) দেওয়া ভাল হয়নি। তুমি একজন পুরানো ভক্ত।"

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির উত্তর দিকের ঘরে দুজনে উপস্থিত। আমি তো একেবারে ঘাড় হেঁট, সেবকের মুখের দিকে চাইতে পারি না। সে ঘরে মহারাজের পূর্বতন একজন সেবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সব কথা বলায় তিনি হেসে বললেন, "আমাদের ওরকম কত হয়; ওর জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না।"

শান্তি হলো না। শনিবার যাব কিন্তু তার আগেই পোস্টকার্ডে লিখলুম, "তিনি আপনার বেশি 'আপনার' লোক, তাই তাঁকে বকলেন। আমায় তো বকলেন না।"

পরের শনিবার উপস্থিত হতেই সেবক বললেন, "আমি শুয়েছিলুম; মহারাজ আপনার চিঠিখানা এনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখ রে দ্যাখ, কি লিখেছে দ্যাখ'!"

দেহ রাখবার কিছু পূর্বে ছেলেরা সব ঘিরে বসে কাঁদছে। তিনিও সাধারণ মানুষের মতো কেঁদে বলে উঠলেন, "তোরা সব কাঁদছিস কেন রে? তোদের ভাবনা কি? ভয় কি? তোদের ঠাকুর রইলেন।" আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না।

একদিন জিজ্ঞেস করলুম, "মশা কামড়ায়, মশারির ভিতর কি ধ্যান করা যায়?"

উত্তর—"হাঁ। আমরা জপ করতাম, ঘুম পেলে দাঁড়িয়ে জপ করতাম, আসন ছাড়তাম না।"

একদিন বললুম, "ধ্যান করব কি? বাড়ির কাছে একটা বাঁশঝাড় আছে ঐটে সুমুখে এসে হাজির হয়।"

উত্তর—"ঐটেই ধ্যান করবে।"

আর একদিন—"কিছু করবার আগে একটু ভাববে।" একজন লাল দীঘির জল খায় শুনে বললেন, "কলকাতার street dust-এ (রাস্তার ধুলোয়) এমন bacilli (রোগবীজাণু) নেই যা ওতে নেই। ও জল খেও না।"

একজন ঠাকুরঘরে গেলেন আর নেবে এলেন দেখে তাকে বললেন, "কি, গেলে আর চলে এলে! ঠাকুরের সঙ্গে 'শেকহ্যাণ্ড' করে এলে নাকি?"

একদিন বললেন, "শনিবার কালী দর্শন করতে হয়। তাই দক্ষিণেশ্বরে গেছলাম।"

আর একদিন—"তোমরা এখানে আসবে, কিছু খেয়ে এসো। তাতে কোন দোষ হবে না। নইলে ঐ খাওয়ার দিকে মনটা পড়ে থাকে।"

অন্য একদিন—"কেবল ডাল আর ভাত (দরকার), কি বল, ননীলাল, কি বল?"

" 'মা জাগ, মা জাগ' বলে কুণ্ডলিনীকে জাগাতে হয়।" একদিন একজনকে, 'পেন্নাম ফেন্নামে কিছুই নেই' বলায় তিনি বললেন, "কেন ত্রিসন্ধ্যা?" তাতে মহারাজ বলে উঠলেন, "আচ্ছা; 'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?' আচ্ছা।"

একদিন বললেন, "এই সব এখন চুপটি মেরে বসে আছেন, এর পর নিজ মূর্তি ধারণ করবেন।"

একজনকে—"চোখ চেয়ে ধ্যান করবে।"

(উদ্বোধন ঃ ৪৮ বর্ষ, ১, ২ ও ৪ সংখ্যা)

ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দ প্রসঙ্গ

শ্রীকালীসদয় পশ্চিমা

ইংরেজি ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে আমি পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাগবাজার ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীট (বলরাম মন্দির) হইতে তিনি আমাকে যে পত্রখানি লিখেন তাহাতে স্পষ্ট নিষেধ নাই—মনে করিয়া ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হইবার পূর্বেই বেলুড় মঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণেশ্বরের রাস্তায় কুঠিঘাটের খেয়ায় গঙ্গা পার হইয়া যখন মঠে পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। জনৈক সাধু আমাকে অতিথিশালায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর (স্বামী শিবানন্দ) সকাশে পাঠাইলেন। মহাপুরুষজী কামরার ভিতরে গভীর মনোযোগ সহকারে পত্র লিখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি চাই? বিনীতভাবে বলিলাম—আমি মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) চিঠি পেয়ে এসেছি।

—মহারাজ পত্র দিয়েছেন, তাঁর কাছে যাও। এখানে কি? আমি ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম, তাই তো, বলরাম মন্দিরেই আমার প্রথম খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ বলরাম মন্দিরে ছুটিয়া যাইবার উপায়ও নাই। অপরাধীর ন্যায় আস্তে আস্তে কহিলাম—কিন্তু এখন যে দুপুর বেলা।

—ও, প্রসাদ পেতে চাও? বেশ তো, ভাণ্ডারির কাছে যাও।

পূর্বোক্ত সাধুটি অদূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে চলিয়া আসিতে ইঙ্গিত করাতে আমি বাহির হইয়া আসিলাম। শুধু দুপুরে নয়, রাত্রিতেও মঠে অবস্থান করিয়া দুবেলা প্রসাদ পাইলাম।

পরদিন সকালবেলা আমাকে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে জনৈক সন্ন্যাসী একটি চলতি নৌকা ডাকিয়া মঠের ঘাটে ভিড়াইলেন। কিন্তু কলকাতায় আমার এই প্রথম আগমন, পথঘাট কিছুই জানা নাই, একাকী কেমন করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইব—মনে মনে এরূপ ভাবিতেছি, এমন

সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক সেবক-সঙ্গে ঘাটে আসিয়া সেই নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। পূর্বরাত্রিতে তাঁহার অনুমতি না লইয়াই মঠে অবস্থান করিয়াছি—উহাতে অবশ্যই অপরাধ হইয়াছে এবং তিনিই বা কি মনে করিতেছেন—ভাবিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তাঁহার সম্মুখে যাইতেই যেন সঙ্কোচবোধ হইল। কিন্তু বাগবাজারে তো আমাকে যাইতেই হইবে। সুতরাং নিরুপায়ভাবে নৌকায় উঠিলাম এবং নিজেকে লুকাইবার উদ্দেশ্যে অপরিচিতের ন্যায় মঠের দিকে মুখ ফিরাইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু যেখানে ভয়, সেখানেই বিপদ। মহাপুরুষজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া এবং ঠিক আমাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমার বাড়ি না সিলেট? তুমি রাত্রিতে মঠে ছিলে?

—হাঁ মহারাজ।

—মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ? তা হতে পারে না। তাঁর শরীর অসুস্থ—জ্বর। তোমার সঙ্গে মহারাজের দেখা হতে পারে না; বুঝেছ?

আমি নীরব থাকিয়া মনে মনে ভাবিলাম কি আর করব। দীক্ষাদির আকাঙ্ক্ষা করে কি আর হবে। সামনে মঠ দেখছি, আর গঙ্গার উপরে একই নৌকায় মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে বসে রয়েছি; এতেই সব হয়ে গেছে। এর বেশি আমার ভাগ্যে নেই। জয় ঠাকুর!

উপরিলিখিত কথাগুলি একবার মাত্র বলিয়াই মহাপুরুষজী ক্ষান্ত রহিলেন না। কমপক্ষে পাঁচ ছয় বার আমাকে বলিলেন—বুঝেছ, মহারাজের সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারে না।

যথা সময়ে নৌকা কুমারটুলীর ঘাটে পৌঁছিলে, মহাপুরুষজীর সেবক ব্যাগটি আমার হাতে দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন, আর আমি মহাপুরুষজীর অনুসরণ করিলাম। তিনি হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন এবং এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া সেই একই কথা খুব জোরের সহিত বলিতেছেন। পথিমধ্যে একবার শুধু জনৈক ভক্তের বাড়িতে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং একটি কালীবাড়িতে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। তদ্ভিন্ন আর কোথাও না থামিয়া সোজা বলরাম মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিষেধাত্মক বাক্য কানে বর্ষিত হইলেও এমন পথপ্রদর্শক পাইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম বিধি হয়ত বাম নহেন। দোতলায় উঠিয়া মহাপুরুষজী আমার হাত হইতে ব্যাগটি লইলেন এবং মহারাজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক আমাকে কোন কিছু না বলিয়াই দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

জুতা, ছাতা ও বিছানাপত্র এক কোণে রাখিয়া নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণভাবে পাশের হলঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। তথায় কয়েকজনকে দেখিয়া মনে হইল তাঁহারাও যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝিতে বাকি রহিল না, ইঁহারা মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং অবিলম্বে মহারাজ তথায় দর্শন দিবেন। আমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। দরজার কাছে একটুখানি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া লইতে না লইতেই দেখি বারান্দার উপর দিয়া তেজঃপুঞ্জ-কলেবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ—নেত্রযুগল কখনও অর্ধনিমীলিত, কখনও বা প্রসারিত করিয়া—ভাবাবেশে ধীর মন্থর গতিতে হলঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমার নিকটে আসিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। এই আমার প্রথম দর্শন! তিনি কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন—যাও বাবা! মহাপুরুষের কাছে যাও, আমার শরীর অসুস্থ।

আমি তো শুনিয়াই অবাক। তবে কি ইতোমধ্যেই আমার সম্পর্কে উভয়ের কথাবার্তা হইয়াছে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি মহারাজের ঘরের দিকে যাইয়া দেখিলাম প্রবেশপথে মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। অতি সহজে তাঁহাকে পাইয়া মহা আনন্দে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন—এই যে, তোমায় আবার দেখছি এখানে।

—মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—মহারাজ পাঠিয়েছেন? কেন? তোমার কি চাই?

—দীক্ষা চাই।

—দীক্ষা চাই! সে আবার কি? তোমার নাম জানি না, ধাম জানি না, কিছুই জানি না—দীক্ষা কি করে হয়! একি বাজারের মাছ পান বিক্রি, যে পয়সা ফেলে দিলে, আর নিয়ে গেলে।

আমি তখন তাঁহাকে আমার নাম-ধাম বলিলাম, মিউনিসিপ্যাল অফিসে চাকুরি দ্বারা জীবিকার্জনের এবং করিমগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা যথাসম্ভব বিবৃত করিলাম। ঐ সমস্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন—ঐ যা করছ—ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ—তৃষ্ণার্তকে জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান—ঐ আমাদের দীক্ষা। ক্রীং ফ্রিং, ঐ সব ভটচাযদের কাছে, আমাদের কাছে নয়।

দীক্ষা সম্পর্কে আমি কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলাম। আমার ঐ বুদ্ধিতে আঘাত করা হইতেছে ভাবিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি কহিলেন, তুমি দীক্ষা চাও? আমি তোমায় ...এই মন্ত্র দেব। তুমি নেবে?

হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলাম—হাঁ মহারাজ! তাই নেব।

তখন নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন—শুধু ঐটি দেবো, আর কিছুই দেবো না। তুমি নেবে?

আমি পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলাম—হাঁ মহারাজ! তাই নেব।

তখন কহিলেন—তবে দীক্ষা কি, আমায় বল।

আমি মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। এই সংকট মুহূর্তে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) তথায় আসিয়া উপস্থিত। আমার মুখের ভাব দেখিয়াই সম্ভবত বুঝিলেন যে আমি বিপন্ন, তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ! ও কি চায়?

মহাপুরুষজী কহিলেন—দীক্ষা চায়।

তখন কৃষ্ণলাল মহারাজ সানুনয়ে বলিলেন—দিন না মহারাজ, দিন।

মহাপুরুষজী উত্তর করিলেন—হাঁ, তাই দিতে বসে আছি আর কি!

কৃষ্ণলাল মহারাজ এরপর চলিয়া গেলেন; কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ আমি মেজের উপর বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সৌম্যদর্শন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ধীরপাদবিক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার উপর স্থিরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন মহাপুরুষজী আমাকে দেখাইয়া বলিলেন—মহারাজ, ও তো দীক্ষা চায়। একথা শুনিয়া মহারাজ যেন একটু শ্লেষভরে এবং বেশ জোরে জোরে কহিতে লাগিলেন—এই তো নাম জাহির করতে এসেছে ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। আমি ভিতরে ভিতরে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি আমার দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—বাবা! তোমাদের পূর্ববঙ্গের লোক—সব আমার জানা আছে, দীক্ষার সময়ে খুবই আগ্রহ দেখায়, শেষে আর কিছু করতে চায় না; তাদের দল বাড়াতে এসেছ?

প্রতিবাদের সুরে আমি উত্তর করিলাম—না মহারাজ! ওদের দল কেন বাড়াব? বিপরীত দলই বাড়াব। তখন আবার একটু শান্তরূপ ধারণপূর্বক কহিলেন—উপযুক্ত হলে আমরা ডেকে এনে দীক্ষা দিই। আমি বলিলাম—আমি কি এমন উপযুক্ত হব মহারাজ, যে আমায় ডেকে এনে দীক্ষা দেবেন? উহাতে তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—বলছি হবে, বলছি হবে। তখন মহাপুরুষজী একবার আমার দিকে একবার মহারাজের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! ওকে আশীর্বাদ করুন, ও করিমগঞ্জে ঠাকুর স্বামীজীর

কাজ করছে, ওকে আশীর্বাদ করুন। মহারাজ অতিশয় শান্ত ও সমাহিতভাবে আশ্বাসভরে বলিলেন—হাঁ হাঁ, আশীর্বাদ তো করাই রয়েছে। তখন মহাপুরুষজী আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন—এই তো তোমার দীক্ষা হয়ে গেল! আর formal (আনুষ্ঠানিক) তা হয়ে যাবে। ক্ষণকাল পরে মহারাজ করুণাপূর্ণ স্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন—বাবা, সমস্ত বিশ্বজগৎ থেকে মনটাকে গুটিয়ে কূটের উপর নিয়ে রাখা, সে কি একটুখানি কথা, সে কি একটুখানি কথা।

বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। "কূটস্থমচলং ধ্রুবং" গীতার শ্লোকটি মনে পড়িল, কেবলি ভাবিতে লাগিলাম 'দীক্ষা' 'দীক্ষা' করিয়াছি, কিন্তু উহার আসল তাৎপর্য কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছি? ঐ চিন্তাধারায় আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরে আমি একাকী বসিয়া রহিয়াছি, মহারাজ কিংবা মহাপুরুষ কেহই তথায় নাই।

ঘরের বাহিরে আসিয়া আমি বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতে শুনি, পাশের একটি কক্ষ হইতে মহাপুরুষজী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ওহে! শুনে যাও, মহারাজকে বল, তিনি যদি অনুমতি করেন তো আমি ঢাকায় গিয়ে তোমায় দীক্ষা দেব। অপরদিকের বারান্দায় মহারাজ পায়চারি করিতেছিলেন; তাঁহাকে যাইয়া বলিতেই তিনি উত্তর দিলেন—হাঁ হাঁ, অনুমতি তো করাই রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঐদিন রাত্রির ট্রেনে মহাপুরুষজী স্বামী অভেদানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া কিছুদিনের জন্য ঢাকা যাইতেছিলেন। মহারাজের উত্তর মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি আমাকে সুবিধামতো ঢাকায় যাইতে বলিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গেই যাইতে চাহিলাম। উহাতে মহাপুরুষজী খুব হাসিতে হাসিতে কহিলেন, কি, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে! এই সময়ে মহারাজ আমাকে ডাকিয়া, কহিলেন—ওহে, মহাপুরুষ তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন, সে ইচ্ছা আমার নয়। বুঝেছ? এ কথা মহাপুরুষজীকে নিবেদন করিতেই তিনি কহিলেন—তবে আমি কি করতে পারি বল। দীক্ষার ব্যাপার ওখানেই আপাতত চাপা পড়িল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার আর ঢাকা যাওয়া হইল না।

মহারাজ আমাকে বারংবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়াতে মহাপুরুষজীর নির্দেশানুযায়ী আমি বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ স্বয়ং আমাকে লইয়া গিয়া বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে

কয়েকদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তথা হইতে বলরাম মন্দিরে যাতায়াত খুব সহজ, সুতরাং নিত্য মহারাজের দর্শন ও সঙ্গলাভের অতি উত্তম সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া গেল। আট দশ দিন আমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে কাটাইলাম। কখনও শিশুর ন্যায় সরল চপল, আবার কখনও অতিশয় গুরুগম্ভীর, কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছি। একদিন দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উপরে তুলিয়া লীলায়িত ভঙ্গিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলি কেমন আছ? আবার পরমুহূর্তেই দীক্ষা-সম্পর্কে আমার মনের ভিতরে যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা বুঝিয়া অতি কঠোর ভাব অবলম্বনপূর্বক কহিলেন—আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। পরস্পরের মধ্যে আমরা সচরাচর যেমন করিয়া থাকি, তেমনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি খেয়েছ ?

আমার উত্তর শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন—বাঃ তবে তো বেশ খেয়েছ।

অপর একদিন থাকিয়া থাকিয়া তিনবার আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার সঙ্গে তো দেখা হয়ে গেছে—আর কেন, এখন ওকে চলে যেতে বল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার উত্তর শুনিয়া পরে চুপ করিয়া রহিলেন। আমার নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ সম্পর্কে একদিন পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন—তাতে কি হয়েছে, অত তাড়াতাড়ি কেন রে বাপ! বিদায়ের পূর্বরাত্রে এ বিষয় আমি আবার উত্থাপন করিলে উত্তর পাইলাম—মহাপুরুষ ফিরে না এলে তো কিছু হবার নয়, বাবা। দিন কয়েক মাত্র মহারাজের সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আমাকে জীবনে অপূর্ব শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছে।

আমার বেলুড় আসার মূল উদ্দেশ্য আপাতত সিদ্ধ না হইলেও মনে প্রভূত আনন্দ লইয়া কর্মস্থলে ফিরিলাম এবং পৌঁছানোর সংবাদ মহারাজকে পাঠাইলাম। তদুত্তরে তিনি তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে জানাইলেন। উহার কিছু কাল মধ্যেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহারাজের তিরোধানের পর স্বামী শিবানন্দের সহিত আমি পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ ইংরেজির ১২ মে তারিখের একখানি চিঠিতে তিনি লিখেন যে, যথার্থই মহারাজ আমায় কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মহারাজের অন্তর্ধানের ফলে তাঁহার তখন দীক্ষাদানাদি ব্যাপারে উদ্যম কিংবা উৎসাহ নাই, কিন্তু আমি যেন নিরুৎসাহ না হইয়া মহারাজের উপদেশানুযায়ী জীবনযাপন করি ইত্যাদি।

২১/৬/১৯২২ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে লিখিলেন—"... আমার দীক্ষাদান আর কিছুই নহে ঃ কেবল সেই জগন্নাথ, জগৎপতি, কলিকলুষনাশক, যুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচার্য, যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন পূর্বোক্তরূপে ঐ নাম ভক্তি-প্রীতির সহিত জপ করিবে। ..."

১৩/৭/২২ তারিখের পত্রে তিনি আমায় জানাইলেন যে ৩ আগস্ট একটি দীক্ষার দিন আছে, তবে ঐ দিনটিতে আমার সুবিধা হইবে কি না এবং তিনিও মঠে থাকিবেন কি না নিশ্চয় বলিতে পারেন না। যাহা হউক, চিঠিপত্রে ও তারযোগে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নির্দিষ্ট দিনে আমি মঠে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাতে অবগাহনপূর্বক মন্দিরে যাইয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, এবার যেন প্রত্যাখ্যাত না হই। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি কালীসদয়বাবু? আপনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান? তবে আসুন।

তাঁহাকে অনুসরণপূর্বক মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে উপনীত হইলাম। মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই প্রহৃষ্টভাবে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—তোমায় তো আমি খুব জানি, তোমায় তো আমি খুব চিনি, তোমায় তো আমি অনেক দেখেছি। তাঁহার এরূপ প্রফুল্লভাব দর্শনে আমি মহা আনন্দিত হইয়া বলিলাম, মহারাজ! গত ফেব্রুয়ারি মাসে বলরাম মন্দিরে মহারাজ ও আপনার সহিত আমার অনেক আলাপ হয়েছিল। একথা শুনিবামাত্র তিনি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তভাবে কহিলেন—সে কথা কি আর বলতে! মহারাজ আজ স্থূল শরীরে নেই, আমরা সব কি আর বেঁচে আছি, এখন আর কথা বলব কার সঙ্গে।

আমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য মনে মনে অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পুনরপি শান্তভাব ধারণকরত তিনি আমাকে আশ্বাসদানপূর্বক বলিলেন—এসেছ, বেশ হয়েছে, এখন মঠে থাক, দীক্ষা হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট দিনে দীক্ষা হইয়া গেল। বিদায় লইবার কালে বলিয়া দিলেন যেন চিঠিপত্র লিখি। তদবধি নিয়মিতভাবে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিতাম, তিনিও উত্তর দিতেন।

(উদ্বোধন ঃ ৫৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা)

পূর্ববঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

১৯১৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগ। পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠের দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঢাকার শ্রীবীরেন্দ্র বসু (মহারাজের শিষ্য) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঢাকা যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দও 'মহারাজ'কে ঢাকা ও ময়মনসিংহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, "কোন তীর্থস্থান উপলক্ষ করে না গেলে আমার আসন টলবে না। যদি আমাকে ৺কামাখ্যাধামে নিয়ে যেতে পার, তাহলে আমি যেতে রাজি আছি।"

আমি এবং বীরেনবাবু উভয়েই খুব আনন্দের সহিত ইহাতে স্বীকৃত হইলাম। আমরা মহারাজকে ৺কামাখ্যা যাওয়ার দিন দেখিতে বলিলাম। জ্ঞান মহারাজের ঘরে বসিয়া মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ কথাবার্তা বলিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ রাজা মহারাজকে পূর্ববঙ্গের ভক্তদের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যাওয়ার কথা ঠিক হইবার পর আমি ময়মনসিংহের ভক্তদের লিখিয়া দিলাম পূজ্যপাদ মহারাজদের বাসস্থানের জন্য একটি ভাল বাড়ি ঠিক করিতে।

মহারাজদের ৺কামাখ্যা রওনার তারিখেই কিছু মেওয়া ফল লইয়া আমি রওনা হইয়া গেলাম। ময়মনসিংহে পৌঁছিয়াই জানিতে পারিলাম যে, কোন ভাল বাড়ি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। আমাদের সমস্ত বাড়িটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এবং চুনকাম করিয়া মহারাজদের বাসস্থানের জন্য ঠিক করা হইল এবং মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্যের বাড়ি হইতে কয়েকটা ভাল তাঁবু আনাইয়া আমাদের বাড়ির সংলগ্ন পুষ্করিণীর ধারে খাটানো হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ ৺কামাখ্যাতে তিন রাত্রি বাস করিবেন, ইহা পূর্বেই ঠিক করা ছিল; অতএব তাঁহাদের রওনা হইবার তারিখ অনুসারে তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য একজনকে ৺কামাখ্যাধামে এবং কিছু ফল মিষ্টিসহ কয়েকজন ভক্তকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ফুলছরী ঘাট স্টেশনে পাঠানো হইল।

শ্রীশ্রীমহারাজ সকলকে লইয়া ১৩২২ সনের ৬ মাঘ (১৯১৬ খ্রীঃ ২০ জানুয়ারি) শুক্রবার বেলা দশটা / সাড়ে দশটার সময়ে ময়মনসিংহে পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী অম্বিকানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী হরিহরানন্দ, অবিনাশ মহারাজ, গোঁসাই মহারাজ, ব্রহ্মচারী বিনোদ, পুঁটিয়ার বিভূতিবাবু, ঢাকার বীরেনবাবু। ময়মনসিংহে তাঁহাদের আগমন-বার্তা পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। স্টেশনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বিপুল উৎসাহের মধ্যে তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া আসা হইল।

আমাদের বাসাতে দুইটি প্রকোষ্ঠ-যুক্ত একটি দালান ছিল। উহার বড় প্রকোষ্ঠ শ্রীশ্রীমহারাজের থাকিবার জন্য এবং ছোট প্রকোষ্ঠটি বাবুরাম মহারাজের থাকিবার জন্য ঠিক করা হইয়াছিল। নূতন লেপ তোষক পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাতেই মহারাজদের বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। এই সময় আমার ইচ্ছা হইল—বাবুরাম মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো রাখিব, কিন্তু মহারাজের ঘরে রাখিব না। দেখিব—মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর কোন আবশ্যকতা বোধ করেন কি না। ঘরে ঢুকিয়াই ফটো না দেখিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ফটো রাখিবার জন্য আদেশ দিলেন। আমিও তখনই একখানা ফটো রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম।

মহারাজের আগমনে এক অনির্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস আমাদের মনে বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই অফুরন্ত আনন্দের জের এখনও পর্যন্ত আমার হৃদয়ে খেলিতেছে। মহারাজগণ বাসায় পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলেন। আহার করিবার সময় প্রথম গ্রাস হাতে তুলিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ প্রায় দুই মিনিট কাল আমাকে এত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন যে আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, এই অপার্থিব দয়া শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অপার কৃপার নিদর্শন।

আহার করিয়া মহারাজগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে স্বামী শঙ্করানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজদের বিকালবেলা বেড়াবার জন্য কি গাড়ির বন্দোবস্ত করেছ?" কাজের গোলমালে গাড়ির বন্দোবস্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এই কথা জানাইয়া তখনই গাড়ির বন্দোবস্ত করা হইতেছে বলিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের এই কথোপকথন শুনিয়া শঙ্করানন্দজীকে বলিলেন, "এখন গাড়ি আনবার কোন দরকার নেই। চল, আজ পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি।"

মহারাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী সকলেই হাঁটিয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়াইতে চলিলেন। আমাদিগের বাসার পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়া, সাহেব কোয়ার্টারের প্রশস্ত এবং পরিষ্কার রাস্তা ধরিয়া আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে চলিলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ এক সময়ে ঐ স্থানে প্রায় ৮/১০ মাইল প্রশস্ত ছিল। এখন ঐখানে নদটি অতি অল্প-পরিসর, কিন্তু বিস্তৃত চড়াভূমি এখনও বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় বলিয়া ওখানে কোন বসতি নাই। ৮/১০ মাইল-ব্যাপী ধু ধু প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষাদি আছে। নদের ঐ স্থানে আসিয়া প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "এখানে এসে আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে।"

শ্রীশ্রীমহারাজ যে কয়দিন ময়মনসিংহে ছিলেন প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে—তাল মান লয় সহ ভজন গান করিতেন। ঘরের মাঝখানে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। ঘরের ভিতরে বসিয়া এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া বহু লোক এই ভজন-সঙ্গীত শুনিতেন এবং এই দুই মহাপুরুষের ধ্যানস্থ মূর্তি সন্দর্শন করিয়া সকলে ধন্য হইতেন।

অপরাহ্ণে বাবুরাম মহারাজ 'মহারাজে'র কক্ষে আসিয়া কথাবার্তা বলিতেন এবং অনেক শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেন।

মহারাজগণ ময়মনসিংহে পৌঁছিবার পরদিন বিকেলবেলা স্থানীয় দুর্গাবাড়িতে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। শহরের গণ্যমান্য বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ নিজে তো কিছুই বলিলেন না, অপর কাহাকেও কিছু বলিতে আদেশ করিলেন না। তৎপরিবর্তে তাঁহার আদেশানুসারে কেবল শ্রীরামনামকীর্তনই হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লাইব্রেরির মতিবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীমহারাজের দ্বারা তাঁহাদের লাইব্রেরির নবনির্মিত ঘরের উদ্বোধন করা হউক। এ কথা মহারাজকে নিবেদন করা মাত্রই তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং রবিবার দিন সন্ধ্যার সময় এই নূতন লাইব্রেরি-ঘর উদ্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজদের তথায় লইয়া যাওয়া হইল। লাইব্রেরির উত্তরাংশে ঠাকুরঘর করিবার জন্য একটি প্রকোষ্ঠ ছিল এবং তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো একটি বেদির উপর সাজানো হইয়াছিল। উহা দেখিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "আমিই ঠাকুরের আরতি করব।" এই কথায় সকলে আনন্দে উৎফুল্ল

হইয়া উঠিলেন। মহারাজ স্বয়ং আরতি করিলেন এবং পরে হলঘরে একটু বসিলেন। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের অনুমতি লইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে অনেক উপদেশ দিলেন।

সোমবার দিন প্রাতঃকালেই মহারাজ ঢাকা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিছানাপত্র বাঁধিবার আদেশ দিলেন এবং বিছানাপত্র বাঁধাও হইয়া গেল। আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ; ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আজই চলে যাবার উদ্যোগ করছেন বলে তোমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে, তোমার এই টান বুধবারের বেশি থাকবে না, আর আজ মহারাজের যাওয়া হবে না।" আমাকে এইভাবে অভয় দিয়াই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের কক্ষে চলিয়া গেলেন। বাবুরাম মহারাজের অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ ঢাকা যাওয়া স্থগিত রাখিলেন এবং বুধবার প্রাতঃকালে যাওয়ার সময় স্থির হইল।

বিছানা খুলিবার আদেশ দিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।" তখন বেলা ৮টা / ৮.৩০ মিঃ হইবে। রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে, তাই অল্প একটু ঘুরিয়া আসিবার জন্য শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজকে লইয়া আমাদের বাসার পূর্বদিকের রাস্তা দিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে গেলাম। তথায় পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ প্রথম দিনের মতো বলিয়া উঠিলেন, "এখানে এসে আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে।" ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধন্য, যেখানে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের মন বারেবারেই অনন্তে মিশিয়া যাইতেছিল।

সোমবার প্রাতঃকালে আর ভজনগান হয় নাই। বিকালবেলা মহারাজ সকলকে লইয়া ঘোড়ার গাড়ি করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে নীরদ মহারাজের ভজনগান হইয়াছিল। বিকালবেলা পূর্বদিনের মতো ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী মাধবানন্দ তথায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ পুরোপুরি পাঁচদিন ময়মনসিংহে ছিলেন। এই পাঁচদিনে ময়ময়নসিংহের শিক্ষিত লোকদের এবং ছেলেদের ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বহু প্রসার লাভ করে এবং কালে এখান হইতে পাঁচজন ত্যাগী যুবক সাধু হইবার জন্য বেলুড় মঠে যোগদান করেন।

বুধবার (১১ মাঘ) প্রাতঃকালে ১০টার সময় মহারাজ সদলবলে ঢাকা রওনা হইলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে ঢাকা গিয়াছিলাম। ঢাকা স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিলে তথাকার ভক্তেরা অত্যন্ত উৎসাহ-সহকারে মহারাজদের অভ্যর্থনা করিলেন। স্টেশনে প্রায় ৩/৪ শত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় মহারাজদের থাকিবার জন্য কাশীমপুরের জমিদার শ্রীসারদা রায়চৌধুরীর কায়েতটুলীস্থিত বসতবাটীটি নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। মহারাজদের তথায় লইয়া যাওয়া হইল। ঢাকায় মহারাজগণ যতদিন ছিলেন, আমিও ততদিন তাঁদের সঙ্গে ঐ বাড়িতেই ছিলাম।

ঢাকায় পৌঁছিবার পরদিনই প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "গত রাত্রে দেখলাম ঠাকুর এইখানে নৃত্য করছেন। ঠাকুরই তাঁর নিজের প্রচারকার্য নিজেই করছেন। আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।" ঢাকাতে পৌঁছিবার পরদিনই মহারাজের শরীর অসুস্থ হয়। এইজন্য প্রথম তিন চার দিন তিনি বাহিরের লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন নাই। বাবুরাম মহারাজই একটি বড় হল-ঘরে সমবেত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। মহারাজের শরীর সুস্থ হওয়ার পরে তিনিও আসিয়া প্রাতঃকালীন বৈঠকে যোগ দিতেন। ঢাকার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকে এই সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন শিক্ষিত ত্যাগী যুবক সাধু হইবার জন্য বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীমহারাজের ঢাকা যাইবার ৫/৬ দিন পরে ঢাকার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিস্ সাহেব মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য আসেন। মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'তুমি গিয়ে নির্মলকে (স্বামী মাধবানন্দ) বল যে, আমি তাকে বিস্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছি।' মহারাজের আদেশের কথা শুনিয়া নির্মল মহারাজ তখনই বিস্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি সহজ এবং সরল ভাষায় ঠাকুরের কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বিস্ সাহেব ইহাতে খুব আনন্দিত হইলেন। খানিকক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমহারাজও তথায় আসিলেন। তিনি কিছু সময় ওখানে বসিয়া চলিয়া আসিলেন। বিস্ সাহেব মহারাজকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহার দর্শনেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মহারাজদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় কার্জন হলে শ্রীশ্রীমহারাজের অনুমতি লইয়া প্রথমত স্বামী

মাধবানন্দ একটি বক্তৃতা দেন, পরে বাবুরাম মহারাজও ছাত্রদের নিকট ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে জীবন গঠন করিবার জন্য খুব উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঢাকায় বিখ্যাত সেতারবাদক ভগবান সেতারী এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম সেতারী উভয়ে একদিন বিকালবেলা অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীমহারাজকে সেতার বাজাইয়া শুনাইয়াছিলেন। ইঁহাদের বাজনা শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঐদিনই কুমিল্লার বিখ্যাত বংশীবাদক আফতাবুদ্দিন মিঞা শ্রীশ্রীমহারাজকে তাঁহার বংশীবাদন শুনাইয়াছিলেন। এই বংশীবাদনও অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

ঢাকা আসিবার পর হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৮টা / ৮.৩০ মিঃ হইতে বেলা ১০.৩০ মিঃ / ১১টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৩ টা হইতে রাত্রি প্রায় ৮/৯টা পর্যন্ত সমবেত ভক্তদের সঙ্গে অনবরত কথা বলিয়া ১২/১৪ দিন পরে বাবুরাম মহারাজের শরীর খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একদিন রাত্রি ৮.৩০ মিঃ/৯ টার সময় সমবেত ভক্তদের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া বাবুরাম মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্যের ভঙ্গি করিলেন। তখন তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার সেই অপরূপ রূপ এখনও আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত আছে।

এই সময়েই শ্রীশ্রীমহারাজ ঢাকার বর্তমান মঠ-বাড়ির ভিত্তি স্থাপন করেন। ঢাকাতে ২০/২৫ দিন থাকিবার পরে শ্রীশ্রীমহারাজকে কাশীমপুরের জমিদার সারদাবাবুর বাড়িতে লইয়া যাওয়া হয়। আমি এবং ঢাকার আরও কয়েকজন ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে সেখানে যাই। সকলে ঢাকা হইতে প্রাতঃকালে রেলে জয়দেবপুর রওনা হইলাম। কাশীমপুর জয়দেবপুর হইতে ছয় মাইলের হাঁটা পথ। এই পথটুকু যাইবার জন্য সারদাবাবু জয়দেবপুর স্টেশনে ৬টা হাতি পাঠাইয়াছিলেন। একটি হাতির উপরে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ বসিয়াছিলেন, অপর পাঁচটা হাতির উপরে ৪জন করিয়া বসিয়া যাওয়া হইয়াছিল। কাশীমপুর পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আহারাদির পর বিকালবেলা আবার হাতির উপর চড়িয়া সকলে মিলিয়া ঐ গ্রামেরই সংলগ্ন এক বিরাট গভীর জঙ্গল দেখিতে গেলাম। পরদিন প্রাতঃকালে কাশীমপুর গ্রাম-সংলগ্ন একটা ছোট নদীতে বড় বড় চিতল মাছ ধরা দেখিবার জন্য মহারাজদের লইয়া যাওয়া হয়। হাতিতে চড়িয়াই সকলে তথায় গিয়াছিলাম। তথায় একবার জাল টানিতেই ৬টা বড় চিতল মাছ উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ খুব খুশি হইলেন।

এই দিনই শ্রীশ্রীমহারাজ সারদাবাবুকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। সারদাবাবুর একমাত্র পুত্র আত্মহত্যা করে। এই দুর্ঘটনায় সারদাবাবু অত্যন্ত শোকসন্তপ্তচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। আজ মহারাজের কৃপালাভ করিয়া তাঁহার দুঃখের বোঝা অনেকটা লাঘব হইল। বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সারদাবাবুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "আজ একটি বিল্বমঙ্গলের অভিনয় হলো।" মহারাজ এখানে সারদাবাবুর কয়েকজন আত্মীয়কেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই কাশীমপুরেই বাবুরাম মহারাজ আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলতেন, রাখাল (শ্রীশ্রীমহারাজ) ত্রিগুণাতীত।"

কাশীমপুরে হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহারাজদের সকলের ফটো তোলা হইয়াছিল। মহারাজ কাশীমপুরে তিন দিন কি চার দিন ছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঢাকাতে আরও কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জের ভক্তেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে নারায়ণগঞ্জে লইয়া যান। মহারাজগণ কনট্রাকটর নিবারণবাবুর বাড়িতে অবস্থান করেন। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিবার পরদিনই শ্রীশ্রীমহারাজ নাগমহাশয়ের বাড়ি দেওভোগ গ্রামে যান। তথায় পৌঁছিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ির দক্ষিণদিকে অবস্থিত পুকুরের ধারে বসিয়া একটু বিশ্রাম করেন। সেইখানে একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট নাগমহাশয়ের ভক্তির কথা বলিতে গিয়া বলিলেন, "তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরের বেড়াতে একবার উই ধরে বেড়ার কতক অংশ খেয়ে ফেলে, কিন্তু নাগমহাশয় কিছুতেই ঐ উইগুলি মেরে বেড়াটা পরিষ্কার করতে দিলেন না।" তিনি উই-এর ভিতরেও জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিতেন, এইজন্য তাহাদের আহারে বিঘ্ন ঘটাইতে দেন নাই।

মহারাজ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এ ভক্তির পরাকাষ্ঠা, highest (উচ্চতম) ভক্তির লক্ষণ।"

শ্রীশ্রীমহারাজের আগমন উপলক্ষে গ্রামের এক সংকীর্তনের দল নাগমহাশয়ের বাড়িতে আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহারাজগণ সকলে পুকুরপাড় হইতে নাগমহাশয়ের বাড়িতে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ সংকীর্তনের দলের সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং মহারাজকেও বলিলেন, "মহারাজ, একটু নাচ।" বাবুরাম মহারাজের অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ একটি গানে টান দিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্য করিবার চেষ্টা করিতেই মনে হইল—নিচে হইতে ঢেউয়ের মতো কিছু একটা মহারাজের বুকের উপর উঠিয়া গেল।

আমার মনে হইল— মহারাজের শরীরটা যেন অনেক লম্বা হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার বক্ষও যেন অনেক স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ যেন পড়িয়া যাইবেন বলিয়া মনে হইতেছিল। স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজের পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মহারাজকে ধরিবার উপক্রম করিতেছিলেন। আমি মহারাজের পাশে দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার উত্তোলিত দুই হাত হঠাৎ জোর করিয়া নিচের দিকে চাপিয়া ধরিলেন। সেই সঙ্গে ভাবটা যেন নিচের দিকে নামিয়া গেল। মহারাজও একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ওখানে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়াইয়া বাবুরাম মহারাজের দিকে তাকাইয়া "বাবুরামদা, চল" এই বলিয়াই সংকীর্তনের স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজের সঙ্গে সকলেই চলিয়া আসিলাম। চকিতের মধ্যে যে মহাভাবের খেলা হইয়া গেল তাহা হয়তো অনেকেই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। এমন প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস মহারাজ মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে দমন করিয়া ফেলিলেন! নাগমহাশয়ের বাড়ি হইতে সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ সাধারণত বয়স্ক বা বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ কেবল যুবকদের সঙ্গে আলাপ করিতেন।

বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, "আমি স্বামীজীর চেলা। স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, তুই গ্রামে গিয়ে সকলকে ঠাকুরের কথা শোনাবি। যুবকদের মন সংসারে আসক্ত হয়নি, তাই তারা ঠাকুরের কথা ধারণা করতে পারে। এইজন্যই আমি যুবকদের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলি।"

মহারাজগণের নারায়ণগঞ্জে অবস্থানকালে চট্টগ্রাম হইতে একজন ভক্ত আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে তথায় লইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন। বাবুরাম মহারাজ যাইতে রাজি হইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত থাকাতে শ্রীশ্রীমহারাজ বাবুরাম মহারাজকে কিছুতেই চট্টগ্রাম যাইতে দিলেন না। নারায়ণগঞ্জে ৭/৮ দিন থাকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ সকলকে লইয়া কলকাতা রওনা হইলেন। আমরা বহু ভক্ত তাঁহাদিগকে স্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইলাম। স্টীমার ছাড়িয়া দিলে আমরা অনেকেই কাঁদিয়াছিলাম, দেখিলাম বাবুরাম মহারাজের চোখেও জল। যতদূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল, আমরা দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলাম; দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজও আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন।

* * *

মহারাজগণ কলকাতায় চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আমিও কলকাতা যাই। কার্য উপলক্ষে আমাকে তখন প্রতি মাসে বা প্রতি দুইমাসে একবার কলকাতায় যাইতে হইত এবং কলকাতা গেলেই ৫/৬ দিন আমি মঠে থাকিতাম। সেই সময় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট শ্রুত বিশেষ বিশেষ উক্তিগুলির কয়েকটি এখানে নিবেদন করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমি শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের সেই পুরোনো বুলি ঃ "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" একদিন শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে বলেছিলেন, "তিনি তো গুরু।" একদিন বলিতেছিলেন, "সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত মন, সমাধি—এ না হলে কি সাধু হয়?" আর একদিন বলিতেছিলেন, "ঠাকুর বলতেন—তোরা ঈশ্বরের দিকে যত এগিয়ে যাবি, আমার ভালবাসা তোদের উপর ততই বেশি পড়বে। তখন কি আর এ কথার অর্থ বুঝি!" আর একদিন বলিতেছিলেন, "মানুষ মনের সবটা বাজে খরচ করে ফেলছে, যদি পাঁচ মিনিটও ভগবানের নাম করত।"

আর একদিন মঠবাড়ির দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির নিচের ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ এবং তাঁহাদের আরও দুএকজন গুরুভাই সকলে বসিয়া আছেন এমন সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ "গোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তি" কথা কয়টি এরূপ ভাবের সহিত উচ্চারণ করিলেন যে উপস্থিত মহারাজগণ শ্রীশ্রীমহারাজ এ বিষয়ে আরও কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। মহারাজ কিন্তু আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিলেন, "তুমি বড় কৃপণ।" মহারাজও অমনি "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ" এই কথা জোরে উচ্চারণ করিয়া সকলকে হাসাইয়া দিলেন, কিন্তু "গোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তি" সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না।

শ্রীশ্রীমহারাজের মঠে অবস্থানকালে নিয়ম ছিল নূতন সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ শেষ রাত্রি ৪টার সময় মহারাজের ঘরে তাঁহার নিকট বসিয়া ধ্যান করিবে। একদিন আমার ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ধ্যানের শেষে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "সর্বদা মনে মনে ভগবানের নাম করা কি প্রকার সাধন?" উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ সাধন।'

একদিন বলরামবাবুর বৈঠকখানার হলঘরে বিকালবেলা শ্রীশ্রীমহারাজ পায়চারি করিতেছেন, আমি তথায় গিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে বসিয়া মহারাজকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজ কেবল "জিতেন" এই শব্দটি এমন

মধুরভাবে উচ্চারণ করিয়া আমাকে ডাকিলেন যে, আমার হৃদয়ের মর্মস্থান পর্যন্ত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। এমন প্রেমপূর্ণ মধুর আহ্বান, এমন আপনার করিয়া-লওয়া ডাক জীবনে আর কখনও শুনি নাই। শ্রীশ্রীমহারাজের হৃদয় যে কি অসীম প্রেমপূর্ণ ছিল তাহা ঐ একটি আহ্বানেই বুঝিতে পারিলাম। মহারাজ আমাকে ঐ প্রকার একবার ডাকিয়াই আবার নিজের ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ একটি ডাক আমার প্রাণে আজ পর্যন্ত বাজিতেছে। ঐ একটি ডাকেই চিরপ্রেম-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে!

(উদ্বোধন ঃ ৬২ বর্ষ, ১ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীমহারাজের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীনরেন্দ্রভূষণ পর্বত

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রথম দর্শন লাভ হয় আমার ১৯১৬ খ্রীঃ ময়মনসিংহ (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) শহরে শ্রীজিতেন দত্ত মহাশয়ের বাসাবাটীতে। শ্রীশ্রীমহারাজ আগমন করিতেছেন শুনিয়া স্কুলের ছাত্রবৃন্দ দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল, আমিও সঙ্গে চলিলাম। রাস্তা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জনাকীর্ণ হইয়া গেল। এমন ভিড় আর কখনও দেখি নাই! দূর হইতে সেই ভিড়ের মধ্যে শ্রীশ্রীমহারাজের সৌম্যমূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হইলাম এবং পিছন পিছন ছুটিলাম। এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়াতেও সেই নয়নমুগ্ধকর স্মৃতি ম্লান হয় নাই।

সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজ, শ্রীবাবুরাম মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে বেড়াইতে গেলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমারও যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ যখন দাঁড়াইলেন, শত শত লোক তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, "তোমরা জোড়হাত করে দূর হতে প্রণাম কর, এই আমি গ্রহণ করছি।" তিনি যষ্ঠি-হস্তে নিজে হাত জোড় করিলেন, কিন্তু কে শোনে সে কথা! তাহাতে আবার শ্রীবাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "করুক না প্রণাম।" তখন তিনি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অবস্থায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুটা রাত্রি হইল। পরে সকলে তাঁহার পিছন পিছন প্রত্যাবর্তন করিল।

শ্রীশ্রীমহারাজ ময়মনসিংহ শহরে দুইদিন অবস্থান করিয়া ঢাকা অভিমুখে রওনা হন। তাঁহার অভ্যর্থনায় যে লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, ঐ শহরে আমার অন্তত দশ বৎসরাধিককাল বাসের মধ্যে তাহার তুলনা দেখি নাই। আর লোকের কি আনন্দ-উচ্ছ্বাস! মনে হইত—যেন কত কালের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শুভাগমন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর বিরাট দেহ, মন ও প্রাণ লইয়া দেখা দিয়াছিলেন। এতবড় কায় যে কমনীয়তার ভাব দেখিয়াছিলাম, আজ পর্যন্ত তেমনটি আর দৃষ্টিগোচর

হইল না! দর্শনমাত্র যেন মন আকর্ষণ করিয়া নিলেন। ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ কিছুই রহিল না। গেরুয়াবস্ত্র-পরিহিত মাথায় গেরুয়া টুপি ও হাতে একগাছা লাঠি। সে রূপ বর্ণনাতীত! জিতেনবাবুর গৃহাভ্যন্তরের প্রবেশ-পথে একটি ছোট বালক 'বল'-হস্তে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সেই বলটা লইয়া হাতের লাঠি দিয়া একটু খেলিলেন আর বলিলেন, "বিকেলে এসো, তোমাদের সঙ্গে খেলা করব।" সেই যে বালকসুলভ ভাব ও খেলার দৃশ্যের স্মৃতি এখনও আমার মনকে অভিভূত করে।

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৯১৮ খ্রীঃ একদিন সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে মঠ বাড়ির সম্মুখের বাঁধানো ঘাটে নৌকাযোগে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হয়। অগ্রসর হইতে হইতে দেখিতে পাই—মঠবাড়ির পূর্ব দিকের নিম্নতলের বারান্দায় বড় বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট কয়েকজন মহারাজের দক্ষিণে শ্রীশ্রীমহারাজ পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বারান্দায় উঠিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজের চরণে প্রথম প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট আর এক মহারাজকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে মহাপুরুষ মহারাজ, প্রণাম কর।" তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হতে এলে?" বলিলাম—"কলকাতা বৌবাজার থেকে মহারাজ, আপনাকে ময়মনসিংহে দেখেছি।" বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন কত কালের পরিচিত জন পাইয়া গিয়াছেন, এমন ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এমন ভাব যা শুধু অনুভব করা যায়, ব্যক্ত করা যায় না। অনেক কথাই হইল। মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ যখন আসবো, আপনাকে যেন একা পাই।" উত্তরে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, তাই হবে।" আশ্বাস-বাণী যে আমার জীবনে কিরূপ সফল হইয়াছিল, তাহার সামান্য একটু বিবরণ দিলেই বুঝা যাইবে। তাঁহার কথা কত সত্য! জীবনে একটুও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। যখনই তাঁহার দর্শন-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহাকে একলাটিই পাইয়াছি। বলরাম মন্দিরেই অধিকাংশ সময় সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে। দুপুরের পরে হলঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের কাছে বসিয়া আছি—মাঝে ব্যবধান মাত্র দুই কি দেড় হাত। বসিয়া আছি তো, বসিয়াই আছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে নির্বাক। মুখে কোন কথা নাই। কখনো শ্রীশ্রীমহারাজের ভাবগম্ভীর বদনমণ্ডল, কখনো স্মিত হাস্য মুখমণ্ডল, আবার কখনো বা নিজ ভাবে যেন বিড়বিড় করিতেন, ঠোঁট নাড়িতেন। মনে হইত—আপন মনে কথা বলিতেছেন। এমনকি বদনমণ্ডল কখনো উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিত।

শ্রীশ্রীমহারাজের কথার কোন রকম ব্যতিক্রম যে আমার জীবনে কখনও ঘটে নাই, একটি ঘটনা হইতে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। শ্রীশ্রীমহারাজ মঠবাড়ির দোতলায় পশ্চিম বারান্দায় ছোট ঘরটিতে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা একে একে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া সারিবদ্ধভাবে বারান্দা দিয়া সেই ঘরে ঢুকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া উত্তর দিকের ছাদ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের দোতলার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছেন। আমি ঘরে ঢুকিলাম এবং শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ খেয়াল হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখি—সামনের লোক ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং পিছনের দিক দিয়া ঘরে কেউ ঢুকিতেছে না। আমার কেমন লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইল একি আজ উৎসবের দিনে আমি এভাবে বসিয়া! অমনি প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি ছাদ পার হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দিরের সিঁড়ি ধরিয়া নামিয়া চলিয়া আসিলাম। বাক্‌সিদ্ধ শুদ্ধাত্মা মহারাজের কথার যে ব্যত্যয় হইবে না! তিনি যে আমায় বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে একাকী পাইব, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের দিনেও একাকী দর্শন দান করিয়া নিজের কথার মর্যাদা রাখিয়াছিলেন এবং আমাকে ধন্য করিয়াছিলেন।

তখন আমি বৌবাজারে বাস করি। বাগবাজারে প্রায়ই হাঁটিয়া যাতায়াত করিতাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে কত প্রশ্নই না মনে উঠিত। কিন্তু মহারাজের সম্মুখে গেলেই যেন আর কোন প্রশ্ন মনে উঁকিও দিত না। নির্বাক হইয়া থাকিতাম।

১৯১৮ খ্রীঃ একদিন মঠে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "প্রথমে বলরাম মন্দিরে আসবে, সেখানে না পেলে উদ্বোধনে এবং সেখানে না পেলে মঠে চলে আসবে। " এই নির্দেশ অনুসারে প্রতি শনিবার বিকালে যাইতাম। যেদিন মঠে যাইতাম, সেদিন রাত্রে মঠে থাকিতাম এবং পরের দিন সকালে ফিরিয়া আসিতাম।

একদিন বলরাম মন্দিরে মহারাজকে না পাইয়া উদ্বোধনে যাই। সন্ধ্যা অতীত হইয়া একটু রাত্রিও হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই বলিলেন, "যাও মাকে দর্শন করে এসো।" সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে গিয়া দেখি—শ্রীশ্রীমা পা-দুখানি ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। ডান দিকের বেদির উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের পট। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। অপেক্ষা না করিয়া আবার নিচে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আসিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের "যাও মাকে দর্শন করে এসো"—এই আদেশ ভিন্ন আমার ভাগ্যে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ হইত না। এই স্মৃতিটুকুই আছে এবং থাকিবে। মায়ের বাড়ি গেলে এই স্মৃতিই উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। এখন মনে হয়—শ্রীশ্রীমহারাজ বলরাম মন্দিরে হলঘরে বসিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "তিনি দয়া করে না বুঝালে কেউ বুঝতে পারে না, না জানালে জানতে পারে না। সময় হলে সব হবে।" কথা না বলার ফাঁকে ফাঁকে শ্রীশ্রীমহারাজ যে ছোট ছোট দুটি-একটি এমন কথা বলিতেন, জীবনে এখন তাহার একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। অবাক হইয়া তাঁহার সেই সব কথার স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে উঠে এবং এক অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করি।

১৯১৮ খ্রীঃ বৌবাজার অঞ্চলে ছোট একটি মেসে থাকি। এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীমহারাজের পদপ্রান্তে গিয়া বসিয়া আছি। তিনি বলিলেন, "একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে নিরামিষ খাবে।" আমি নিবেদন করিলাম, "মহারাজ, মেসে অন্যদের সঙ্গে থাকতে হয়, আমার জন্য আলাদা করে কে নিরামিষ তৈরি করে দেবে?" প্রত্যুত্তরে নির্দেশ দিলেন, "মাছটা না খেলেই তো নিরামিষ হলো।" আমি বলিলাম, "মাছের পাকেই তো খেতে হবে?" তিনি বলিলেন, "তাতে দোষ কি? তুমি তো আমিষ খেলে না।" কি সুন্দর ব্যাখ্যা!

যখনই শ্রীশ্রীমহারাজের সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহার দক্ষিণ শ্রীচরণ কপালে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিতেন, "এসো, বাবা।" এই দুইটি কথা যতবার যাতায়াত করিয়াছি, ততবারই শুনিয়াছি। এখনও কথা-দুইটি কানে বাজিতেছে!

১৯১৮ খ্রীঃ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। তখনকার মঠ-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁশবনের নিকটবর্তী স্থানে ভোগরান্নার ঘর ছিল এবং সেখানে প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠান হইত। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমহারাজ সাজগোজ করিয়া প্রসাদ-বিতরণ পরিদর্শনে বাহির হইতেন। যেন শ্রীশ্রীরাজামহারাজ আজ 'মহারাজ-চক্রবর্তী' হইয়া আসিয়াছেন। মঠবাড়ির পশ্চিমাঞ্চলে ফল ও ফুলের বাগানের মধ্য দিয়া যে রাস্তা ছিল, সেই বরাবর শ্রীশ্রীমহারাজ ধীর পদক্ষেপে আসিয়া প্রসাদ-বিতরণ দেখিতেছেন। সঙ্গে একজন সেবক-ভক্ত মাথার উপরে ছাতা ধরিয়া চলিয়াছেন। সেই বিরাটকায় মহাপুরুষের সদানন্দ মুখোজ্জ্বল দিব্যকান্তি যিনি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সে দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

১৯১৮-১৯ খ্রীঃ যখন প্রায়ই বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীমহারাজের সান্নিধ্যে চরণতলে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, অনেক দিন ভুবনেশ্বর-মন্দিরের নির্মাণ সম্বন্ধে কত সুন্দর নির্দেশ দিতে শুনিয়াছি। তখনও নির্মাণ-কার্য চলিতেছিল। কোন গাছটি কোন স্থানে লাগাইলে ভাল হয়, কোন ফুল-গাছটি কোথায় রোপণ করিলে শোভা পাইবে, সেই ভাবে লিখিয়া পাঠাইবার নির্দেশ দিতেছেন। মনে হইত—যেন তিনি তখন সেই মঠ-উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর মালিকে নির্দেশ দিতেছেন।

১৯১৯ খ্রীঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব। আমরা কয়েকজন বন্ধু এক সঙ্গে বেলুড়ে গিয়াছি। স্বেচ্ছাসেবক হইয়া কাজ করিলাম। সন্ধ্যার সময় কলকাতা ফিরিব। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে মঠবাড়ির পূর্ব বারান্দায় নিচের তলায় গিয়া হাজির হইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরী-মা তখন কয়েকটি মেয়ে ভক্ত লইয়া সেখানে উপস্থিত। প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি, তখন শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের বলিলেন, "এদের নিয়ে এক সঙ্গে যাও, আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যেও।" নৌকাযোগে বাগবাজার ঘাটে পৌঁছিলাম। নৌকায় বসিয়া গৌরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। আমরা সবাইকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

১৯২২ খ্রীঃ, চৈত্রমাস। শরীর অসুস্থ। দেশের বাড়িতে আছি। একদিন অপরাহ্নে আনন্দবাজার পত্রিকা খুলিয়া ধরিতেই চোখে পড়িল সেই বিরাট পুরুষ শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতিকৃতি। ছবিটি হঠাৎ চোখের সামনে পড়িতে খুব আনন্দ হইল। পর মুহূর্তেই বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমহারাজের দেহরক্ষার সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে কাগজখানা। কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হইয়া থাকিলাম। যেন কতকালের আপনজন হারাইয়াছি!

১৯২৩ খ্রীঃ, একদিন সন্ধ্যার পর কলেজ স্ট্রীটে এসপ্ল্যানেডগামী ট্রামে উঠিয়াছি—সামনে কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) উঠিয়াছেন। মুখামুখি দাঁড়াইতেই প্রণাম করিলাম। বলিলাম, "মহারাজ, শ্রীশ্রীমহারাজ তো চলে গেলেন, এখন আমি কি করি?" এইটুকু বলিতেই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কৃষ্ণলাল মহারাজ বলরাম মন্দিরে বহুবার আমাকে দেখিয়াছেন, তাই পরিচিত আত্মীয়ের মতো বলিলেন, "তুমি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করো।" এ যেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ইঙ্গিত! কয়েক দিনের মধ্যেই বেলুড় মঠে গিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের চরণপ্রান্তে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ,

শ্রীশ্রীমহারাজ তো চলে গেলেন, এখন আমি কি করি?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "এসো, হবে এখন।" ভরসা পাইয়া বলিলাম, "কবে আসবো?" তিন-চারি দিনের মধ্যেই একটি দিনের কথা বলিয়া মঠে যাইতে নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী হাজির হইতেই তিনি আমায় অনুগ্রহ করিলেন। তখন বুঝি নাই এখন অনুভব করি—কেন শ্রীশ্রীমহারাজ বেলুড়ে প্রথম দর্শনেই বলিয়াছিলেন, "এই যে মহাপুরুষ মহারাজ, প্রণাম করো।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে মহাপুরুষ মহারাজ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অনুগ্রহ করিবেন, কল্পনাও করি নাই। তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন অধমকে চরণে স্থান দিবেন বলিয়া। সেদিন যে আমার কি আনন্দ, ভাষা নাই তাহা ব্যক্ত করিবার। এমন অহেতুক করুণা দয়াময় দীনবন্ধু ভিন্ন কে করিতে পারে? শুধু সেই অনুভূতিই আমার জীবন-যাত্রার একমাত্র পাথেয়!

(উদ্বোধন ঃ ৬৫ বর্ষ, ৯ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজের স্মৃতিকথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

স্থান—ময়মনসিংহ; শনিবার, বৈকাল ৪টা; ২২-০১-১৯১৬

যথাসময়ে অফিসে আসিয়া শুনিলাম, পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনমানসে অফিস হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। ব্যাকুল হৃদয়ে জিতেনবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, পরে শুনিলাম মহারাজ ভিতরে আছেন; অগত্যা ভিতরে গিয়াই মহারাজের দর্শনলাভ করিলাম।

পরম পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ হলঘরে বসিয়া ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন ঃ যথা—স্বামীজীর সেবাধর্মের কথা, নীচ জাতিকে ঘৃণা করা উচিত নহে ইত্যাদি। উপদেশচ্ছলে 'হাতি ও পিঁপড়ের' গল্প* বলিলেন। এমন সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন। বাবুরাম মহারাজও সঙ্গে চলিলেন এবং কয়েকজন ভক্ত অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনৈক ভক্ত (শ্রীশ্রীমহারাজের অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া) বাধা দিলে বাবুরাম মহারাজ একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ওরা সাধু সঙ্গ করবে না? কেন বাধা দিচ্ছ? জীবনের এই তো মহৎ কাজ। কার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ হয়? সাধুসঙ্গ বড় দরকার। তোমরা ভক্তদের বাধা দিও না।" শ্রীশ্রীমহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ নদীর ধারে কোর্টের (কাছারীর) নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ—বাবুরামদা, দেখছ কি সুন্দর মাঠ, কি সুন্দর মাঠ, কি সুন্দর নদী! বেশ জায়গা। হু হু করে বাতাস বইছে। এ সব দেখে আমার উদ্দীপন হচ্ছে।

---

* একবার এক অরণ্যে আগুন লাগে। পিঁপড়েরা হাতিকে বলে যে এই গাছের ডাল ভেঙে শুঁড় দিয়ে অরণ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচাও। হাতি তাই করে। তারপর একদিন হাতির নাকে এক পোকা ঢুকে হাতিকে মারবার চেষ্টা করে। হাতি মাটিতে পড়ে যায়। তখন পিঁপড়েরা তা দেখে দল বেঁধে হাতির নাকে ঢুকে পোকাকে মেরে ফেলে এবং বন্ধু হাতির প্রাণ বাঁচায়।

বাবুরাম মহারাজ—হবে বইকি। বেশ জায়গা। ঠাকুর বলতেন, হৃদয়ের বাড়িতে মাঠ আছে, তাই সেখানে থাকতে ভালবাসি। মাঠ দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে।

মহারাজ (মুক্তকণ্ঠে)—জয় গুরু, শ্রীগুরু।

বাবুরাম মহারাজ—হরিবোল, হরিবোল।

মহারাজ—বিশ্ব (হরিহরানন্দ), একটা ভগবানের নাম কর না। (অন্য একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন) তুই বল না।

তখন ব্রহ্মচারীটি একটি স্তব পাঠ কারিলেন।

মহারাজ—এটা কোন দিক?

সকলে বলিলেন, "উত্তর-পূর্ব কোণ।" মহারাজ ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তারপর আর একজন ব্রহ্মচারী স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বলিলেন, "এ সব জায়গায় সন্ধ্যা ও সকাল ধ্যান করা ভাল। মন পবিত্র হয়। ভগবানের নামই সত্য, আর যা দেখছ, সবই মিথ্যা। তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস, তাঁর গুণগান—এই জীবনের ধর্ম।" এই কথাগুলি তিনি খুব ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলে মহারাজ বারণ করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ বিনীতভাবে বলিলেন, "মহারাজ, তোমার এখন এই অবস্থা। ওরা একটু প্রণাম করে নিক। (ভক্তদের দিকে চাহিয়া) এই সময় তোরা একটু প্রণাম করে নে। মহারাজ, তুমি একটু দাঁড়াও।" সকলে প্রণাম করিলে মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, "কালে দেখছি এই সব ছেলেরা দেবতা হয়ে যাবে।" আবার সকলে নদীর ধারে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ আবেগপূর্ণ ভাষায় স্বামীজীর কথা, মহাবীর হনুমানের মতো স্বামীজীর ভক্তি প্রভৃতি অনেক কথাই সেদিন বলিয়াছিলেন।

২৩-১-১৯১৬ রবিবার। সকাল সাড়ে সাতটায় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র দত্তের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম রাজা মহারাজ ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তগণমধ্যে উপবিষ্ট রাজা-উপাধিধারী সুসঙ্গের জমিদারকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিলেন, "দেখুন, আপনি সঙ্গীত সাধনা করেন, খুব ভাল কথা। এর মধ্য দিয়েও ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। এই সুরই নাদ-ব্রহ্ম। তপস্যা করলে এই সব অনুভূতি হবে।" মহারাজ এই কথাগুলি এমন জোরের সহিত বলিলেন যে, উপস্থিত সকলের মর্ম স্পর্শ করিল।

আমি বলিলাম, "মহারাজ, মন বড় চঞ্চল। ধ্যান, জপ হয় না, কি করলে এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়।"

মহারাজ বলিলেন, "খুব সকালে ঘুম হতে উঠবি এবং হাত-মুখ ধুয়ে আসনে বসবি। মনকে শাসন করে বলবি—মন, স্থির হয়ে থাক্; বাজে চিন্তা এখন করতে পাবে না। এইরূপ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে বশে আনবি। দেখবি শীঘ্রই মন স্থির হয়ে যাবে। আর বাজে চিন্তা আসবে না। মত্ত হাতিকেও বশে আনা যায়; আর তুই মানুষ হয়ে নিজের মনকে বশে আনতে পারবিনি? আমি কাউকে বেশি উপদেশ দিই না। এখন এই সব কথা নিয়ে জাবর কাট। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, জাবর কাটতে হয়।"

গানের আয়োজন হইতেছে, সকলেই প্রণাম করিয়া বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হইলেন। পাশের ঘরে বাবুরাম মহারাজ একান্তে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি মহারাজের কণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে বাহিরে আসিয়া বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন, মহারাজ কাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন?" বীরেনবাবু আমাকে দেখাইয়া দিলেন। বাবুরাম মহারাজ তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যা বাঙ্গাল, এবার তোর হয়ে গেল। মহারাজ বিশেষ কাকেও উপদেশ দেন না, পরে বুঝবি।" আমি বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিলাম; তিনিও খুব আশীর্বাদ করিলেন।

বৈকালে বহু ভক্তের সহিত মহারাজের অপরাহ্ন-ভ্রমণের সঙ্গী হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আজ একটি বিশেষ দিন—ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-দিবস। পূজ্যপাদ মহারাজই আশ্রমের উদ্বোধন করিবেন, তাই বহু লোকের সমাগম। রাত্রি তখন ৭টা হইবে। মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে সঙ্গে লইয়া তুমুল আনন্দ-কলরব আর জয়ধ্বনির মধ্যে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ নিজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক করিলেন। তিনি আরাত্রিক করায় সকলেই প্রাণে প্রাণে এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিল। অতঃপর রাজা মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "মহারাজ, তুমি থাকতে আমি বলব?" রাখাল মহারাজ—"বাবুরামদা, তুমিই বলো।" বাবুরাম মহারাজ—"মহারাজ, দেখ দোষ নিও না।" এইভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনি মহারাজের আদেশ গ্রহণ করলেন। অতঃপর প্রেমানন্দ মহারাজ হৃদয়গ্রাহী একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর সেবাধর্ম সম্বন্ধে।

ক্রমে ময়মনসিংহের আনন্দের হাট ভাঙিবার দিন সমাগত। মহারাজ দুই-

তিন দিনের মধ্যে ঢাকা যাইবেন, দিন স্থির হইল। রাত্রি ৮টার ট্রেনে রওনা হইবেন। আমি যথারীতি বৈকালে জিতেনবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। আজ সকলের প্রাণে এক বিষাদের ছায়া। জিতেনবাবুর তো কথাই নাই। সমবেত ভক্তগণ প্রণাম করিলে মহারাজ সকলকেই উদারভাবে আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর মহারাজ ফিটনে উঠিলেন, সঙ্গে বাবুরাম মহারাজ ও অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ)। পূজ্যপাদ মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজী) আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "চলে আয় আমার সাথে।" আমি বিনীতভাবে উত্তর দিলাম, "হাঁ, স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যাব।" মহারাজ বলিলেন, "না, না, আমার সঙ্গে গাড়িতে আয়।" আমি সঙ্কোচ প্রকাশ করিলাম, ভাবিলাম মহারাজের সঙ্গে একাসনে কি করিয়া যাই! বাবুরাম মহারাজ তখন বলিলেন, "মহারাজ ডাকছেন, তাঁর কথা মান্য করতে হয়। তোর কোন সঙ্কোচ করতে হবে না।" অতঃপর ফিটনে অমূল্য মহারাজের পাশে বসিলাম। মনে সঙ্কোচ, পাছে পা কোন প্রকারে মহারাজের গায়ে লাগে। আবার নিজেকে ধন্য মনে করিতেছিলাম। এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, মহারাজের এত সহজ সান্নিধ্য লাভ করিলাম! তপস্যা আর কিছুই নহে—মহারাজের অহেতুকী কৃপা।

যথাসময়ে রেলস্টেশনে পৌঁছানো গেল। গাড়ি আসিবার সময় হইল। আমার দিদিও স্টেশনে গিয়াছিলেন। দিদি মহারাজকে প্রণাম করিলে মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "মা গাড়ি এসে গেল, সময় আর নেই। তোমাকে যাবার কালে এক কথায় জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছি—রোজ 'কথামৃত' পড়ো, তবেই হবে। কথামৃতের মধ্যেই সমস্ত ধর্ম আছে।" গতি মন্থর করিয়া গাড়ি আসিয়া পড়িল। মহারাজ গাড়ির কামরায় উঠিলেন, আমরাও একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। "তোমাদের সকলের জ্ঞান-ভক্তি হউক"—এই বলিয়া মহারাজ আশীর্বাদ করিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বিষণ্ণ হৃদয়ে আমরা গৃহে ফিরিলাম।

আমি তখন একটা অফিসে কাজ করি। নূতন কাজ অথচ কাজে উৎসাহ পাইতেছি না। মহারাজের দিব্য সঙ্গে এই কয়টা দিন কী একটা অনাবিল আনন্দে কাটিয়াছিল! তাঁহার অভাবে মনের সেই প্রসন্নতা নাই, তাই কাজে আঁট পাইতেছি না। অনুক্ষণ মনে হইতেছে আবার কবে তাঁহার পূত সঙ্গ লাভ করিব। এইরূপ অবস্থা-সঙ্কটে একদিন সত্যসত্যই কাজে ইস্তফা দিয়া কয়েকটি বন্ধুর সহিত ঢাকায় মহারাজের পদতলে উপস্থিত হইলাম। পূজ্যপাদ মহারাজ তখন ঢাকা আশ্রমে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোরা যে একে একে সকলেই ময়মনসিংহ হতে চলে এলি, সেখানকার সরস্বতীপুজো কি করে হবে?"

সেদিন প্রাতে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ঢাকার নবাববাড়ি গিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনের বিলম্ব হওয়াতে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মহারাজ সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমরা ভেবো না, বাবুরামদা এলো বলে।" বাস্তবিক কয়েক মিনিট পরে বাবুরাম মহারাজ আসিয়া উপস্থিত। তখন সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুরামদা, নবাবের সঙ্গে তোমার কি কথা হলো?" বাবুরাম মহারাজ—"নবাব জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যেতে পারে। আমি তাঁর উত্তরে বললুম—আপনারা যদি cow-killing (গো-হত্যা) বন্ধ করেন, তবেই হতে পারে। অন্য প্রসঙ্গও কিছু হয়েছিল।"

পূজ্যপাদ মহারাজের এমনই একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি যাহাদের কৃপা করিতেন, তাহাদের একেবারে আপনার করিয়া লইতেন। এই আকর্ষণকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা—যে আখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, অনেকেই কিন্তু প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিত। আমাদের জনৈক বন্ধু (কেদারবাবু), পূজ্যপাদ মহারাজের কৃপা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা, যাহা তিনি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বিবৃত করিতেছি।

কেদারবাবু—মহাপুরুষজী, আমরা মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজী) ও বাবুরাম মহারাজের নিকট কত ভালবাসাই পেয়েছি!

মহাপুরুষজী—হাঁ, মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ তোমাদের খুবই ভালবাসতেন, আমরা জানি।

কেদারবাবু—সে কথা আর কি বলব! মনে হতো মহারাজই আমাদের সব। এমনও হয়েছে—রাত্রিতে বাড়িতে শুয়ে আছি, প্রাণ ছটফট করত মহারাজকে দেখবার জন্য। একদিনের কথা বলি, সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি ১১টা, এমন সময় মন ব্যাকুল হলো মহারাজকে দেখবার জন্য। তখনই বাসা হতে রওনা হলাম। কুমারটুলি ঘাটে এসে দেখি ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি আরও দুই-তিন জন ভক্ত ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন?" তাঁরা উত্তর দিলেন, "মশাই, মহারাজকে দেখবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।" আমি শুনেই বুঝে নিলুম, এদের মনের অবস্থা আমারই মতো। তখন একত্র একখানা নৌকা করে বেলুড় মঠে এলুম। মঠে এসে মহারাজকে দর্শন করতে চললুম মহারাজের ঘরে। তখন অনেক রাত্রি, মঠে সব সাধুরা

ঘুমিয়েছেন। আমরা আস্তে আস্তে মহারাজের ঘরে গেলুম। গিয়ে দেখি, মহারাজ যেন কার জন্য বসে অপেক্ষা করছেন। আমরা গিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি আমাদের দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এত রাত্রে কি করে এলে, কোন কষ্ট হয়নি তো?" মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে ডাকলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, "এদের কিছু প্রসাদ দিতে পারো, বাবুরামদা?" বাবুরাম মহারাজ বললেন, "চার-পাঁচজনের জন্য প্রসাদ তৈরিই আছে।" আমরা প্রসাদ পেলুম, মহারাজকে প্রণাম করে অনেক রাত্রিতে রওনা হলুম।

মহাপুরুষজী—অপর লোক মহারাজের ভালবাসার কথা বুঝতে পারবে না সত্যই। মহারাজের এমনি টান ছিল ভক্তদের উপর।

কেদারবাবু—'মহারাজ'ই আমাদের সব। এমনকি জপ-ধ্যানও বেশি করতে পারি না। কেবল তাঁর অহেতুক কৃপার কথাই সর্বদা স্মরণ করে চোখের জলে ভাসি। এমন ভালবাসা আর পাব না।

মহাপুরুষজী—তোমাদের জপ-ধ্যানের আর দরকার কি? তোমরা তাঁর স্মরণ-মনন করছ, তাঁর অহেতুক কৃপার কথা ভাবছ। আবার কি? তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। তিনি তোমাদের ভার নিয়েছেন, তিনিই তোমাদের সব দেখবেন। তোমরা সব আনন্দে থাকো।

স্থান—বেলুড় মঠ ও বলরাম মন্দির, বাগবাজার, ১৯২১ খ্রীঃ।

জানুয়ারি মাসে 'শ্রীশ্রীমহারাজ'কে দর্শন করিবার জন্যই কলকাতা আসিয়াছি। ময়মনসিংহ হইতে মহারাজের জন্য খুব বড় দুইটি বেগুন নিয়া আসিয়াছিলাম—মহারাজ বেগুন খুব ভালবাসিতেন। কলকাতা পৌঁছিয়াই বাগবাজার বলরাম মন্দিরে যাইয়া শুনিলাম মহারাজ রামকৃষ্ণপুর (হাওড়ায়) আছেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে তথায় যাইতে বলিলেন এবং যাইবার রাস্তাও বলিয়া দিলেন। তদনুসারে বেলা চারটার সময় রামকৃষ্ণপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিভক্ত নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে মহারাজের দর্শন পাইলাম। মহারাজও বেগুন দুইটি দেখিয়া খুব খুশি হইয়া রামলালদাদাকে বলিলেন, "রামলালদা, আজ একাদশী, দেখ কেমন সুন্দর বেগুন এসেছে! বেশ করে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া যাবে।" মহারাজ বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন; আমরাও প্রণামান্তে গৃহে ফিরিলাম।

আমরা প্রায়ই বলরাম মন্দিরে যাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শনাদি করিতাম।

একদিন দেখি বলরামবাবুর বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে মহারাজ খুব হাসি-ঠাট্টা করিতেছেন। এমন সময়ে আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুই ঐ রামলালদাকে বলবি—মহাশয়ের সর্বাঙ্গীণ কুশল তো?" আমি যাইয়া রামলালদাকে ঠিক এই কথা বলিতেই তুমুল হাসির রোল উঠিল। মহারাজও খুব হাসিতে লাগিলেন। মহারাজের মন একটু নিচে নামিলে তিনি এইরূপই হাসি-ঠাট্টা করিতেন। একদিন একজন ভক্ত অনুযোগ করিয়া বলিয়াই ফেলিলেন, "মহারাজ, সকলে আপনার নিকট ধর্মকথা শুনতে আসে, আপনি কেবল বাজে হাসি-তামাসা করে তাদের ভুলিয়ে রাখেন।" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "দেখ, সংসারী লোকেরা ত্রিতাপে জ্বলেই আছে, তাই তাদের ক্ষণিক আনন্দ দিই। যথার্থ ধর্ম করার মতো লোক সংসারে বিরল। বাস্তবিক যারা জিজ্ঞাসু, তারা এলে আমি তাদের নিকট ধর্মকথাই বলে থাকি এবং বুঝতে পারি এদের নিকট ধর্মকথা বললে এরা শুনবে ও কাজ করবে। তাই আমি সকলের নিকট ধর্মকথা বলি না। ধর্ম করা সহজ নয়—পূর্বজন্মের সংস্কার চাই।"

আর একদিনের কথা—সেদিন আমার সঙ্গে আমার গর্ভধারিণী মা ছিলেন। বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আমরা মহারাজকে প্রণাম করিলাম। মহারাজ মায়ের পরিচয় লইয়া তাঁহাকে বলিলেন, " দেখ মা, হরিনাম করবে, কলিতে আর কোন তপস্যার প্রয়োজন নাই। ঠাকুরও আমাদের সকালে বিকালে হরিনাম করিয়ে নিতেন। কি আর তোমাকে উপদেশ দিব—তাঁর নাম কর, তাতেই তোমার সব মঙ্গল হবে। সংসার তো দেখছো—এই আছে, এই নাই। তবে কেন বৃথা মায়া-মোহে পড়ে থাকবে? বয়স হলে কাশীতে গিয়ে থাকা ভাল। তোমাদের পূর্ববঙ্গের অনেকে শেষ বয়সে কাশীবাস করেন। আমি এই সব বড়ই পছন্দ করি। কাশী শিবের স্থান, এর মতো উত্তম স্থান এ জগতে আর নেই। মা, তবে এসো, ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন।" আমরা প্রণাম করিয়া বিমল আনন্দে বাসায় ফিরিলাম। বিশ্বনাথের কৃপায় ও পূজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদে আমার মায়ের দীর্ঘকাল কাশীবাস হয় এবং কাশীধামেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল।

পরবর্তী শেষ দর্শন হয় ১৯২২ খ্রীঃ মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের শনিবার বেলুড় মঠে। মহারাজ মঠের পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমরা প্রণাম করিলে তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উপস্থিত জনৈক ভক্তের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন।

ভক্ত—মহারাজ, চলুন আমাদের দেওঘরের বাড়িতে।

মহারাজ (সহাস্যে)—বেশ তো, চলুন বেড়িয়ে আসি, তা বেশ হবে। হরিভাই কাশীতে অসুস্থ, তাঁকেও দেখে আসবো।

এইরূপ কথাবার্তার পর ভক্তটি মহারাজের সেবকদের সহিত আলোচনা করিতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজের কবে দেওঘর যাওয়া সম্ভব হইবে। সেবক কিন্তু তাঁহাকে আশার কথা শুনাইতে পারিলেন না, বরং বলিলেন, "মহারাজের বালকস্বভাব। তিনি কাকেও অসুখী করেন না, তাই অমন বলে থাকেন। এখন কোথাও যাওয়া হবে না।" ভক্তটি চলিয়া গেলেন। জানি না তিনি মনে আঘাত পাইলেন কিনা।

প্রায় ৫:৩০ মিঃ সময়ে মহারাজ বেড়াইতে বাহির হইলেন। তিনি মঠের দক্ষিণদিকের মাঠে একাকী বেড়াইতেছেন, যেন একটু ভাবস্থ। এই সুযোগে আমি তাঁর সঙ্গ লইলাম। এখন যেখানে মহারাজের মন্দির, তাহারই নিকটে আমগাছতলায় আমাকে দেখিতে পাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তুই আমাকে দেখেছিস?"

আমি তো শুনিয়া অবাক। আজ কেন তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন? আমি তো তাঁহার পরিচিত। যাহা হউক আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ মহারাজ, আপনাকে দেখেছি।"

মহারাজ—কোথায় দেখেছিস?

আমি—কাশী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও এই মঠেই দেখেছি।

মহারাজ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "একবার দেখলে কি না হয়?"

স্থূলশরীরে মহারাজের সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ।

এই ঘটনার পরদিনই মহারাজ বলরাম মন্দিরে গেলেন। সেখানে কয়েকদিন পরেই ১০ এপ্রিল রাত্রি ৮:৩০ মিঃ মহারাজের দেহাবসান হয়। সেদিন ভক্তদের বড়ই শোক ও দুঃখের দিন।

একবার দেখলে কি না হয়?—এই কথার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। এখন মনে হইতেছে শ্রীশ্রীঠাকুর যে বলিতেন, "রাখাল যখন তাঁহার নিজের স্বরূপ বুঝতে পারবে যে, সে ব্রজের রাখাল, তখন আর তাঁর শরীর থাকবে না।" তবে কি মহারাজ তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়াই আমাকে বলিলেন, "একবার

দেখলে কি না হয়?” ঘটনাও কিন্তু এমনই হইল যে, এই কথার কয়েকদিন পরেই তাঁহার স্থূল শরীরের অবসান হইল। পূজ্যপাদ মহারাজের অহেতুকী কৃপার কথা যখনই হৃদয়ে জাগে, তখনই অভিভূত হইয়া পড়ি। মনে আছে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে বসিয়া রাত্রিতে যখন এই নিদারুণ সংবাদ পাই, তখনই মহারাজকে শেষ প্রণাম করিবার জন্য বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হই। সেই শান্ত সমাহিত, ধ্যানস্থ মূর্তি! কে বলিবে তিনি নাই? তিনি সত্যসত্যই আছেন এবং ভক্তের হৃদয়ে চিরকাল থাকিবেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের স্মৃতিকথা—শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত)

ব্রহ্মানন্দ-প্রেমানন্দ স্মৃতি

শ্রীবাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

প্রথম দর্শন ঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় বিদগাঁ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট জন্মোৎসব। ঐ গ্রামের কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এবং কলমা গ্রামের ভক্ত শ্রীভূপতি দাশগুপ্তের উদ্যোগে বিদগাঁর নীলখোলার মাঠে উক্ত উৎসব ১৩২০ সনের ৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ১৯১৩) মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাই যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শুভাগমন করিয়া উৎসবের আনন্দ সহস্রগুণে বর্ধিত করিয়াছেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যের বিক্রমপুরে প্রথম শুভ পদার্পণ।

উৎসব-ক্ষেত্রটি নানাভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে কীর্তনমণ্ডপে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ যথাস্থানে সমাসীন। কীর্তন শেষ হইলে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন। ভক্তমণ্ডলী সব কিছু দেখিয়া ও শুনিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক হইয়া রহিলেন। সেই অতুলনীয় পুণ্যকথা উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মন অন্তত কিছুকালের জন্য ধর্মের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মনে গভীর রেখাপাত করিয়া অনেককে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দ্বিতীয় দর্শন ঃ মার্চ, ১৯১৪—বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব। যথাসময়ে কলেজ হোস্টেল হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া কলকাতায় আসিলাম এবং উৎসবের পূর্বদিনই বেলুড় মঠে পৌঁছিয়া দেখিতে

পাই বিরাট উৎসবের আয়োজন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নানা দিক হইতে ভক্ত ও কর্মিগণ আসিয়া জুটিতেছে এবং বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। আমি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া অন্য দিকে মন না দিয়া উৎসবের কাজে ব্যাপৃত হইলাম। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন যে কি ব্যাপার—তাহা যাঁহারা একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদকে সেদিন দর্শন করিতে না পারিলেও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিলাম, তিনি তত্ত্বাবধানের কার্যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সারা মঠপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি উপদেশ দ্বারা কর্মিগণকে খুব উৎসাহ দিতেছিলেন। উৎসবের কাজ ও রাত্রি-জাগরণ আমাদিগকে মোটেই ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই এবং স্বামী প্রেমানন্দের বার বার উপস্থিতি, সান্নিধ্য ও প্রেমবাক্য আমাদিগকে অসীম আনন্দ সাগরে ভাসাইতেছিল।

উৎসবের দিন সকাল হইতে ভক্ত-সমাগমে মঠ আনন্দমুখর হইল। প্রাতঃকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত সংখ্যাতীত ভক্ত মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শন পাইয়া ধন্য হইল। আমিও শ্রীশ্রীরাজা মহারাজকে এই প্রথম দর্শন করিলাম। অপরাহ্ণে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাও মঠে শুভাগমন করিলেন। মা শকটারোহণে মঠের দক্ষিণ প্রান্তের ফটক দিয়া মঠে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সম্মানার্থে তোপধ্বনি করা হইল, আমরা শ্রীশ্রীমার পুণ্য শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

তৃতীয় দর্শন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়েকদিন অবকাশের মধ্যে বেলুড় মঠ দর্শনমানসে খুব আগ্রহান্বিত হইলাম। আমার এক বাল্যবন্ধু তখন মঠে আছেন জানিয়া আগ্রহ আরও বাড়িল। ফলে বেলুড় মঠে যাইয়া (ইং ১৯১৫) দর্শনাদি ও প্রসাদগ্রহণের পর বন্ধু ২/১ দিন মঠে থাকিয়া যাইতে বলায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে শুনিলাম, আজ ১ বৈশাখ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন; ১০/১৫ জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। কি করিয়া এই সুবর্ণসুযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র ও অন্য একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের সান্নিধ্যে থাকা যায় এবং তাঁহাদেরই

সঙ্গে তপঃক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য করা যায়—সে চিন্তায় মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সে সময় মঠের নিজস্ব ২/১খানা নৌকা ছিল। ঐ নৌকাযোগেই মহারাজদের যাওয়া হইবে এবং সেবকগণই নৌকা বাহিবেন, জানিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ পূর্ববঙ্গের ছেলে বলিয়া আমার নৌকাচালনার অভ্যাস ও দক্ষতার একটু গর্ব ছিল। অবশ্যই বন্ধুবরের উৎসাহ ব্যতীত উক্ত নৌকায় আরোহণ করিবার সাহস আমার কখনও হইত না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণ নৌকারোহণ করিলে আমিও দাঁড় বাহিবার জায়গায় একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

আমরা গঙ্গার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলাম। একটু পরেই বেলুড় মঠের নিকটবর্তী গঙ্গার উপকূলে এক শিবমন্দিরের ঘাটে নৌকা লাগানো হইল। আমরা সকলেই নৌকা হইতে নামিয়া রাজা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম। তাঁহারা ৺শিবের মস্তকে পুষ্প-বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া, শিবকে ডাব-চিনি নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আমরাও সকলে দর্শন-প্রণামাদি করিয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলাম। পরে শুনিলাম এই শিবই '৺কল্যাণেশ্বর শিব' নামে সুপরিচিত।

নৌকা উত্তরাভিমুখে চলিয়া কিছুকালের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিল। ঘাটে অবতরণ করিয়া সকলে মন্দিরাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসগৃহ, পঞ্চবটীমূল, বিল্ববৃক্ষতল, শ্রীশ্রীমার বাসস্থান-নহবৎখানা প্রভৃতি দর্শন করা হইল। অবশেষে কালীবাড়ির অনতিদূরে লক্ষ্মীদিদির বাড়ি গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া জলযোগের পর সকলে নৌকায় উঠিলাম।

বেলুড় মঠে ফিরিয়া রাখাল মহারাজ ঠাকুরঘরের নিচে দক্ষিণে রোয়াকে বৃক্ষচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। আমরাও তাঁহার খুব নিকটেই বসিয়া পড়িলাম। বৈশাখের মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখরতায় মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষ হইতে শীতল বাতাস ক্লান্ত দেহ স্পর্শ করিতেছিল। ইহাতে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "দেখছিস, ভগবানের কি দয়া! সকলই পরমকারুণিক ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে।" পরে নিচের হল-ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের সেবার আয়োজন হইল। স্বামী প্রেমানন্দ স্বয়ং তাঁহার সেবার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং একখানা বড় পাখা হাতে লইয়া মহারাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দর্শনীয়। যাঁহারা স্বচক্ষে

দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই সেই অপার্থিব প্রেম কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন। মহারাজের সেবার পর আমরাও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

চতুর্থ দর্শন ঃ খ্রীঃ ১৯১৬ মার্চ-এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদ্বয় অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে লইয়া ঢাকার নিকটবর্তী কাশীমপুরের জমিদার-বাড়িতে কিছুদিন এবং নারায়ণগঞ্জের ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে অনেকবার তাঁহাদের পুণ্যদর্শন ও সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন ভক্ত যতীন্দ্র গুহের আগ্রহাতিশয্যে নারায়ণগঞ্জের শীতললক্ষ্যা পল্লীতে মহারাজদ্বয়ের সম্মানার্থে একটি অভ্যর্থনা-সভা আহূত হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কিছু ধর্ম উপদেশ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী মাধবানন্দকে কিছু বলিবার জন্য আদেশ করিলে তিনি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ বুঝাইয়া দিলেন।

এই সময়ে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গৃহিভক্ত সাধু নাগমহাশয়ের জন্মস্থান দর্শন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সহ দ্বিপ্রহরের পর নারায়ণগঞ্জের অতি নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে যাত্রা করিলেন। শকট হইতে নামিয়া তাঁহারা প্রায় এক মাইল গ্রাম্য পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নাগমহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে নাগমহাশয়ের বাড়িতে কয়েক শত ভক্তের সমাগম হইল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর তীরে মহারাজগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদ্বয় মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন, "আহা! কি চৈতন্যময় স্থান! কি চৈতন্যময় স্থান!" ইতোমধ্যে বাড়ির প্রাঙ্গণে উচ্চ কীর্তন শুরু হইল। বাবুরাম মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লইয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে কীর্তন বেশ জমিয়া উঠিল। রাখাল মহারাজ নৃত্য করিতে করিতে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। ইহাতে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই হরিনামের দিব্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইলেন।

পঞ্চম দর্শন ঃ কিছুদিন কলকাতায় আছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাগবাজারে ভক্ত

বলরাম বসুর গৃহে (বলরাম মন্দিরে) অবস্থান করিতেছেন জানিয়া তাঁহার দর্শন-মানসে ১৯১৮ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে উপস্থিত হই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ হরি মহারাজ তখন অসুস্থ হইয়া তথায় আছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল। রাখাল মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উপরে গিয়া দেখিলাম তিনি দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন এবং কয়েকজন ভক্ত দর্শনের জন্য হল-ঘরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংলগ্ন পশ্চিমের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী একে একে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ইতোমধ্যে মঠের একজন সাধু রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমার বন্যাক্লিষ্টদের সেবার জন্য মিশন হইতে কর্মী প্রেরণের কথা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন। মহারাজ সেবাকার্যে খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া আমিও মাসাধিক কাল নওগাঁ সেবাকেন্দ্রে স্বামী গঙ্গেশানন্দের তত্ত্বাবধানে সেবার কাজে যোগদান করিলাম।

ষষ্ঠ দর্শন ঃ প্রায় এক বৎসর পরে বলরাম মন্দিরে কয়েক দিন রাজা মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার পর তথায় যাইয়া দেখি, মহারাজ তাঁহার নির্দিষ্ট ঘরে আছেন এবং ভক্ত-সমাগমও একটু বেশি। ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র হস্তস্থিত একটি বড় শিশি হইতে তিনি একটু জল দিলেন। তাঁহাকে ভাবে গরগর মাতোয়ারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি মাতালের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন এবং ঐ বোতল হইতে একটু একটু পবিত্র জল প্রত্যেক ভক্তকে দিতেছেন এবং বলিতেছেন, "তোমাদিগকে baptise (পবিত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত বা দীক্ষিত) করে দিচ্ছি।" পরে জানিলাম, সেদিন স্নানযাত্রার তিথি। ভারতের পুণ্য নদনদীর—গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতির পূত বারি সংগ্রহ করিয়া তিনি উক্ত বোতলে রাখিয়াছেন এবং যে আসিতেছে তাহাকেই একটু দিতেছেন। সেদিন তাঁহার আনন্দময় ভাবমূর্তি দর্শনে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। এবারে পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যার (cyclone) হৃদয়বিদারক সংবাদ মহারাজকে জানাইয়া সেবাকার্যে মিশনের কর্মী পাঠানো হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমিও রাজা মহারাজের আশীর্বাদ লইয়া স্বামী অরূপানন্দের তত্ত্বাবধানে বিক্রমপুরের এক পল্লীকেন্দ্রে সেবাকার্যে যোগ দিতে যাত্রা করিলাম। এই আমার শ্রীশ্রীমহারাজকে শেষ দর্শন।

বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কলকাতায় বাগবাজার বলরাম-মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন একঘেয়ে ছিলেন না, তেমনি তাঁহার পার্ষদগণ।

স্বামী প্রেমানন্দ সত্যসত্যই প্রেমমূর্তি ছিলেন। কি বেলুড় মঠে, কি অন্য স্থানে ভক্তেরা তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ও মধুর ব্যবহারে সর্বদাই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতেন। তিনি ভক্তদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার অমায়িক আচরণে এবং প্রেমমূর্তি দর্শনে বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আগন্তুক ভক্তদিগকে তিনিই প্রথম আপ্যায়িত করিতেন। অনেক সময় জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দু-একটি সরল উপদেশের উপর ভিত্তি করিয়া সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্মের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেন এবং ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে নিজেই বিভোর হইয়া পড়িতেন। সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত থাকিলে অবসরমতো ও অতি সাবধানে তাঁহার দর্শন করাইয়া দিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রায় দীর্ঘ বিশ বৎসর বেলুড় মঠের যাবতীয় কর্মের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। মঠে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভক্তেরা, এমনকি সাধু-ব্রহ্মচারীরাও একটা বিশেষ অভাব বোধ করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি—সব আমার বাবুরাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।"

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বল্পভাষী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া মানবজীবন ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দিব্যমূর্তি অপলক নেত্রে দর্শন করিয়াই পরিপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তথায় বাক্যালাপ বা ধর্মালোচনার বিশেষ অবকাশ থাকিত না। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেন না, হয়তো উহার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না। রাজা মহারাজ সর্বদাই এক উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন এবং নিজের ভাবে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিতি এবং সান্নিধ্যমাত্রই ভক্তহৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতে যথেষ্ট ছিল। তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেন, সে স্থান আনন্দোৎসবে ও ভক্ত-সমাগমে পূর্ণ হইত। মহারাজের অলৌকিক আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে

অচিরাৎ বিস্ময়ান্বিত করিত। অপর দিকে তিনি সদানন্দ, বালক-স্বভাব, অসীম ক্ষমাশীল ও প্রেমময় পুরুষ ছিলেন। একদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্বাক নিস্পন্দ গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার, অপরদিকে স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও উপদেশের সরল অথচ উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরূঢ় করাইতে সমর্থ হইত। এই মহাপুরুষদ্বয়ের সংযুক্ত সফর পূর্ববঙ্গকে ধন্য করিয়াছিল এবং যুবকদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্থূল শরীরে দর্শন করিবার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ ও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দর্শন করিয়াছি। যতই দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ে এই কথাটি বারংবার বাজিতেছে ঃ I have not seen the Father but I have seen the Son.—অর্থাৎ আমি পিতাকে দেখি নাই, কিন্তু পুত্রকে দেখিয়াছি।

(উদ্বোধন ঃ ৬১ বর্ষ, ১ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, ব্রহ্মানন্দের জীবনমূর্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণোপান্তে বসিবার পরম সৌভাগ্য জীবনের অল্প কয়টি দিন লাভ হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ-প্রবরের দুর্লভ সঙ্গের সেই পূত স্মৃতি গ্লানি-মলিন কলুষ-জর্জর জীবনের অক্ষয় সম্পদ, অমৃতের অফুরন্ত উৎস হইয়া আছে।

মহারাজের পার্থিব জীবনের শেষভাগে তাঁহার দর্শন ও দিব্যসঙ্গলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তখন কলেজে পড়ি এবং নিয়মিতভাবে বেলুড় মঠে ও মধ্যে মধ্যে বলরাম মন্দিরে যাতায়াত করি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের দর্শনলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন প্রথম যাই, তখন মহারাজ কিছু দিনের জন্য বাংলার বাহিরে ছিলেন। একদিন সকালে মঠে গিয়া শুনিলাম তিনি মঠে প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং কিছুক্ষণ পূর্বে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছেন। শীঘ্রই ফিরিবেন। গঙ্গার ধারে, মঠের ঘাটের বাঁধান সিঁড়ির উপর বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আরও কয়েকজন গৃহিভক্ত একই উদ্দেশ্যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। একটু পরেই একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। দুই তিনজন সাধু-ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মহারাজ নামিয়া আসিলেন এবং ঘাটসংলগ্ন ছোট মাঠটির উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই প্রশান্ত, সৌম্য মূর্তির দিকে মুগ্ধনয়নে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে দেখিলাম কয়েকজন তাঁর বিশেষ পরিচিত। মহারাজ সকলের দিকে চাহিয়া কয়েকজনকে সাধারণ কুশল প্রশ্নাদি করিলেন। এই সময়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখন কেমন আছেন?" মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "দেখুন, আমরা সাধু মানুষ, আমাদের আর কেমন থাকা না থাকা কী? যে দিনটা তাঁর নাম গুণগানে কাটে, সেই দিনটাই আমাদের ভাল গেল মনে করি।" শারীরিক কুশল-সম্বন্ধে প্রশ্নের যে উত্তর মহারাজ দিলেন তাহা আমার হৃদয়কে সেদিন

বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল—দেহের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের যোগ্য উত্তর। ইহার পর তিনি গঙ্গার দিকের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। তখন উপস্থিত গৃহিভক্তগণ নানা ধরনের প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। মহারাজ মৃদু হাস্যের সহিত সাধারণভাবে 'হাঁ' 'না' বলিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। সেদিন আর কোন সৎপ্রসঙ্গ হইল না। মনে পড়ে, সেদিন একটু অতৃপ্তি ও ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়াছিলাম। কারণ আরও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনিবার আশা অন্তরে ছিল।

ইহার পর একদিন একাদশী তিথিতে মঠে গিয়াছি। মহারাজের দর্শনলাভ এবং রামনাম গান শোনা দুই-ই উদ্দেশ্য ছিল। মঠে পৌঁছিয়া প্রথমে ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া পরে মহারাজকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি তখন একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন। প্রণাম করিতেই আশীর্বাদ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় থাকি, কি নাম, কি করি—ইত্যাদি। আমি তখন কলকাতায় হেদুয়ার নিকট একটি পল্লীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতাম। আর্থিক অসুবিধার জন্য সেদিন আমার আবাস-স্থান হইতে হাঁটিয়া আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হই এবং সেখান হইতে হাঁটিয়া মঠে যাই। মহারাজকে ধীরে ধীরে সমস্ত পরিচয় দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করিলাম যে, সেদিন তাঁহার চরণ দর্শন এবং বিশেষভাবে 'রামনাম' শুনিবার উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়াই মহারাজ আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! তুমি রামনাম শোনবার জন্য অতদূর থেকে অত কষ্ট করে হেঁটে মঠে এসেছ! বেশ, বেশ! তোমার কল্যাণ হোক। যাও, রামনাম শোন গিয়ে। ভগবানের নামগান, মহা পবিত্র জিনিস। সব পাপ-তাপ, কলুষ ওতে ধুয়ে যায়। আর দেখ, রামনাম গানের সময় সবাইয়ের সঙ্গে নিজেও গাইবে।" আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম, কারণ সে সময় আমি গান করা বা স্তবস্তোত্র সুর করিয়া পাঠ করা, এ সব বিশেষ পারিতাম না। একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "গান আমি মোটেই গাইতে পারি না, সুর হয় না।" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "তা হোক। যেমন পার, আস্তে গাইবে। দেখ, যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয় সেখানে উপস্থিত থাকলে তাতে যোগ দিতে হয়, গাইতে হয়। ঠাকুর নিজে একথা বলতেন। যাও, এক্ষুনি রামনাম আরম্ভ হবে।" এমন মধুর, স্নেহপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, আমার সমস্ত মন-প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল। মনে হইল, একজন সামান্য দীন দরিদ্র ছাত্রের কল্যাণের জন্য এই মহাপুরুষের কী স্নেহগভীর আকুলতা! পরম আনন্দে রামনামের ঘরে গেলাম। একটু পরেই

রামনাম আরম্ভ হইল। সেদিন পরমপূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ রামনামে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার খুব নিকটে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিলাম। সেদিন রামনাম-গানের সময় মহাপুরুষজীর যে আনন্দোচ্ছল ভাবোদ্বেল মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও মনে পড়ে। রামনামের পর পুনরায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

ইহার তিন-চারি দিন পরে একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে মঠে যাই। পৌঁছিয়াই দেখিলাম ভিতরের দিকে প্রাঙ্গণে, ঠাকুরঘরের সিঁড়ির কিছু দূরে, মহারাজ দাঁড়াইয়া আছেন এবং জনৈক সেবককে কিছু বলিতেছেন। আমি প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই জিজ্ঞাসে করিলেন, "ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসেছ?" আমি একটু লজ্জিতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে না, এইবার যাব।" মহারাজ বলিলেন, "না, আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এস। মঠে এসে সকলের আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসে তার পরে অন্য কিছু করবে। যাও!" আমি অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়া প্রণাম করিলাম এবং তাহার পর নিচে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলাম। এই সময় মঠে পালিত একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গাভী সেখানে আসিয়া মহারাজের একেবারে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ একজন সেবককে কিছু তরকারির খোসা আনিতে বলিলেন। সেবকটি একটি চুপড়িতে করিয়া উহা আনিলে মহারাজ নিজের হাতে সেই তরকারির খোসাগুলি পরম স্নেহে গরুটিকে খাওয়াইতে লাগিলেন এবং আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, এই গরুটার এখানে আসার একটা history (ইতিহাস) আছে। এটি যখন বাছুর, তখন একজন কসাই এটিকে মঠের ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবুরামদা (স্বামী প্রেমানন্দজী) একে দেখে সেই কশাইয়ের কাছ থেকে পাঁচটাকা দিয়ে একে কিনে নিয়ে আসেন। আমি অনেক সময় একে নিজ হাতে খাওয়াতুম, যত্ন করতুম। এও আমার এমন বাধ্য হয়ে পড়েছে যে, আমাকে দেখলেই কাছে ছুটে আসতে চায়। দেখ, পশুদের ভেতরও কত স্নেহ-মমতা ও কৃতজ্ঞতা বোধ রয়েছে।" গরুটিকে খাওয়াইবার পর মহারাজ উঠিয়া মাঠের মধ্য দিয়া বেড়াইতে চলিলেন। গরুটি তখনও তাঁহার পিছু পিছু যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "যা, মা—যা, যা।" তখন গরুটি ফিরিয়া গেল এবং মহারাজ বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। আমি ও আমার সঙ্গী যুবকটি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার ধারে যাইয়া বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মহারাজ দোতলার বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে আসিয়া

বসিলেন। আমি নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িলাম। এই সময়ে একজন মাদ্রাজী ভক্তও সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। চারিদিকে শান্ত, নিস্তব্ধভাব। মহারাজ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মাদ্রাজী ভক্তটি মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই প্রসঙ্গ অনুসরণে আমি মহারাজকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, ভগবানের নিকট আমার যদি কোন আন্তরিক প্রার্থনা থাকে, তা কি নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়?" মহারাজ বলিলেন, "যদি ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে আন্তরিক প্রার্থনা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। শুধু প্রার্থনা নয়, বিশ্বাসী ভক্তের মনের আন্তরিক ইচ্ছাও তিনি পূর্ণ করেন। সব সময়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। (মাদ্রাজী ভক্তের দিকে ফিরিয়া) He is the fulfiller of all wishes. ঠাকুরের জীবনের সেই তুলসী বাগান ঘেরার ঘটনা জানতো? ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে থাকার গোড়ার দিকে তিনি নির্জনে সাধনার জন্য পঞ্চবটীতে একটা জায়গায় অনেকগুলি তুলসী গাছ পুঁতেছিলেন। ঐ তুলসী বাগানটি ঘেরার জন্যে তাঁর খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাগান ঘেরার জিনিসপত্র জোগাড় করা বা ঘেরার ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঠিক সেই সময় রাত্রিতে গঙ্গায় জোয়ারের স্রোতে বেড়া দেওয়ার উপযুক্ত কতকগুলি ছোট ছোট রলা কাঠ, বাখারি, খানিকটা দড়ি, মায় একখানা কাটারি পর্যন্ত একসঙ্গে বোঝা বাঁধা অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ঘাটে এসে লাগল। ভর্তাভারি নাম করে বাগানের এক মালী ঠাকুরকে খুব ভক্তি করত। সে ঐ বোঝাটা তুলে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এল। সেইগুলি দিয়ে তখন তুলসী-বাগানের বেড়া দেওয়া হলো। দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার! সত্যিই ভগবান বাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করেন—এতে কখনও সন্দেহ করো না।"

খুব আবেগপূর্ণ স্বরে শেষের কথা কয়টি বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। ইহার পর বলিলেন, "দেখ, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন সত্য; কিন্তু তা বলে প্রকৃত ভক্ত তাঁর কাছে যা তা চায় না। ভগবানের কাছে বিষয় চাইতে নেই; তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য, এইসব চাইতে হয়।" এই বলিয়া মহারাজ চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথা বলিতেছেন না দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় মঠে গিয়াছি। জনৈক পরিচিত ব্রহ্মচারীজীর নিকট শুনিলাম, মহারাজ উপরে আছেন। খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম দোতলায়, গঙ্গার দিকের বারান্দায়, মহারাজ একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া আছেন। সামনে পায়ের চটি জুতা দুখানি খোলা, তাহার উপর পাদুখানি রহিয়াছে। বারান্দায়, কোণের দিকে তিন চারিজন সাধু-ব্রহ্মচারী জপ-ধ্যান করিতেছেন। কোন শব্দ বা কথাবার্তা নাই। মহারাজ গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, বদ্ধাঞ্জলি—স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। আমি অতি সন্তর্পণে যাইয়া—তাঁহার ইজিচেয়ারের পার্শ্বে তাঁহার পায়ের নিকট নিঃশব্দে বসিয়া একটু জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর মহারাজ যেন কতকটা আপনমনে, মৃদুস্বরে বলিলেন, "পা টা কেমন যেন টস্ টস্ করছে।" আমি উহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা জানাইলাম, "আমি পা টা একটু টিপে দেব মহারাজ?" তিনি বলিলেন, "দাও।" আনন্দে আমার চোখে জল আসিল; একটা উন্মাদনায় দেহ যেন কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের আরও নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে পায়ের পাতা দুইখানি টিপিয়া দিতে লাগিলাম। মহারাজের পদসেবা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কত দিন ধরিয়া ছিল। কিন্তু কোনও দিন সুযোগ পাই নাই। অবশেষে ঠাকুর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার কৃপায় সেদিন তাঁহার 'মানসপুত্রে'র পদসেবার অধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। নিস্তব্ধ, মৌন পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ অবস্থায় উপবিষ্ট মহারাজের পদসেবা করিতে করিতে মনে হইল তাঁহার পবিত্র পদস্পর্শে জীবনের সমস্ত কলুষ, সমস্ত গ্লানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে মহারাজ একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "আর এখন দিতে হবে না। থাক।" তখন তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।

আর একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে গিয়াছি। সঙ্গে আমার একটি আত্মীয় বালক ছিল। মহারাজ এক তলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিলেন। গুড়গুড়িতে তামাক সেবন করিতেছিলেন। নিকটে দুই-তিন জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও দু-একজন গৃহিভক্ত ছিলেন। আমি নিজে মহারাজকে প্রণাম করার পর সঙ্গের বালকটিকে প্রণাম করাইলাম। মহারাজ তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?" আমি পরিচয় দিতে তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—আর কোন কথা বলিলেন না। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আস্তে আস্তে তামাক খাইতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিলাম—মহারাজ যেন খুব বেশি অন্তর্মুখ। ক্রমে তাঁহার শরীর যেন স্থির হইয়া আসিতে

লাগিল। অর্ধ-নিমীলিত নয়নে গঙ্গার দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটি পড়িয়া গেল। একজন সেবক তৎক্ষণাৎ সেটি তুলিয়া লইয়া মহারাজের হাতে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহা তখনই আবার পড়িয়া গেল, হাতে রহিল না। মহারাজ গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, তেমনি অর্ধ নিমীলিত নয়ন, স্থির নিশ্চল দেহে বসিয়া রহিলেন! নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না বুঝা গেল না। প্রায় জড়বৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গেল—চারিদিকে আঁধার জমিয়া উঠিয়াছে। আমরা যে কয়জন সেখানে ছিলাম, নিস্পন্দভাবে মহারাজের এই অপূর্ব অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। অদূরে অন্ধকারে আবৃতা গঙ্গা; সম্মুখে ব্রহ্মানন্দের অতলস্পর্শী গভীরতায় নিমগ্ন স্বামী ব্রহ্মানন্দ! চারদিকে জমাট বাঁধা এক মৌন গাম্ভীর্য যেন থম থম করিতেছে। এই অনির্বচনীয় পরিবেশের মধ্যে নিজের মনের সমস্ত চঞ্চলতা, সমস্ত গতি কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আচ্ছন্নের মতো বসিয়া রহিলাম। এই ভাবে প্রায় দেড়ঘণ্টার অধিককাল কাটিয়া গেল। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, খানিকটা উদাস দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার চাহিলেন। কোন কথা বলার সাহস বা শক্তি হইল না। শুধু একবার প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সেই দিনটির স্মৃতি আমার জীবনে অমর হইয়া আছে। আজও যখন ঐ সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে, তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্মৃতি মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, চোখের সামনে সেই ব্রহ্মানন্দ-ঘন মূর্তি আবার যেন জীবন্ত হইয়া উঠে!

(উদ্বোধন ঃ ৫৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা)

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

ছেলেবেলায় যখন মামার বাড়িতে থাকিতাম তখন প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত দেখি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনি। দুপুরে প্রায়ই খাওয়া-দাওয়ার পর দিদিমা ও পাড়ার বৃদ্ধারা এক জায়গায় বসিয়া কথামৃত-পাঠ শুনিতেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সরল উপমাবহুল কথাগুলি শুনিতে ভালবাসিতাম। তাহার পর যখন নিজের বাড়িতে আসিয়া হাইস্কুলে ভরতি হইলাম তখন স্বদেশী যুগ চলিতেছে, সবার মুখে স্বামী বিবেকানন্দের নাম ও বাণী শুনিতে পাই। প্রবল আগ্রহ লইয়া স্বামীজীর জীবনী ও বাণী স্কুল-লাইব্রেরি হইতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু তখন বেলুড় মঠ বা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না। স্বামীজীর বই পড়িয়া গ্রামে আমাদের একটি ছোট দলের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সাধ্যমতো আমরা গরীব-দুঃখীর কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করিতাম, কখন-কখন রোগীর সেবাও করিতাম।

গ্রাম ছাড়িয়া কলকাতায় আসিলাম এবং ১৯১৭ সালে একজন পরিচিত লোকের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হইল। তখন অবশ্য তিনি বেলুড় মঠে যোগ দেন নাই, সাধু হইবার জন্য নিজে তৈরি হইতেছেন ও অপর কয়েকটি যুবককেও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

ইঁহার সঙ্গে আমি প্রথম বেলুড় মঠে যাই এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন সন্তানের, বিশেষ করিয়া মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত পরিচিত হই। তিনি যখন বাগবাজার বলরাম মন্দিরে থাকিতেন তাঁহার কাছে খুব যাইতাম। তাঁহার সঙ্গ এত ভাল লাগিত যে, কয়েকদিনের অদর্শনেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতাম। আমাদের সহিত কথা তিনি খুব কমই বলিতেন, বয়স্কদের সঙ্গেই নানাপ্রসঙ্গ চলিত, তবুও যতক্ষণ মহারাজের সামনে বসিয়া থাকিতাম কি আনন্দেই যে মন ভরিয়া থাকিত তাহা প্রকাশ করিবার নহে। মনে হইত যেন মহারাজের চারিধারে আনন্দ জমাট

বাঁধিয়া আছে। যখন সেখান হইতে চলিয়া আসিতাম তখন মহারাজের চিন্তায় মন ভরিয়া থাকিত এবং আবার কবে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইব সেই ভাবনায় অস্থির হইতাম।

মনে আছে—একদিন সকালে বলরাম মন্দিরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যে ডান পাশের ছোট ঘরটি পাওয়া যায় সেখানে শ্রীশ্রীমহারাজ খাটে বসিয়া আছেন এবং আমরা একদল ছেলে তাঁহার সামনে মেজেতে বসিয়া রহিয়াছি। কেহ কেহ তখন ধ্যান-জপ করিতেছিলেন। এমন সময় খবর আসিল যে পূজনীয় রামলাল দাদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়) মহারাজজীকে দেখিতে আসিতেছেন। মহারাজ আমাদিগকে বলিলেন যে, রামলালদাদা ঘরে ঢুকিলেই যেন আমরা 'রামলাল দাদাকী জয়' বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি। রামলালদাদা ঘরে ঢুকিবামাত্র আমরা সকলে ঐরূপ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলাম। তিনি যেন থতমত খাইয়া গেলেন এবং হাতজোড় করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ বেশ আমোদ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আছি আর কেমন? যেন বালকবৎ—রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে। এই হয়তো ভাল আছি আবার হয়তো পরক্ষণেই কেমন হয়ে গেলাম।" রামলালদাদার সঙ্গে কত রকম হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল। আমরা মহারাজের বালকভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের ভালবাসার কি কোন তুলনা ছিল? কত দিন মনে হইয়াছে—লোকে বলে মা-বাপের ভালবাসার তুলনা নাই কিন্তু মা-বাপের ভালবাসা যে মহারাজের ভালবাসার কাছে অতি তুচ্ছ! সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতেই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। আমরা ছেলেরা একটি দল বাঁধিয়া কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে উৎসব দেখিতে গিয়াছি। খুব ভক্ত-সমাগম হইয়াছে। কিছুক্ষণ আনন্দে কাটিবার পর যোগোদ্যানের একজন সাধু আমাদিগকে বলিলেন যে, শ্রীশ্রীমহারাজকে একটু প্রসাদ পাঠাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত এবং আমাদের মধ্যে কেহ যদি এ কাজটি করিত তবে সুখী হইতেন। আমি তখনই রাজি হইয়া গেলাম। মহারাজকে এই সুযোগে একবার দেখিতে পাইব ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম। পায়ের ভিজা জুতা বন্ধুর কাছে রাখিয়া খালি পায়ে একটি টিফিন ক্যারিয়ারে প্রসাদ লইয়া বাগবাজারে বলরাম মন্দিরের দিকে রওনা হইলাম। বৃষ্টি যাহাতে টিফিন ক্যারিয়ারের ভিতর না যায় সেজন্য টিফিন ক্যারিয়ারটি মাথার কাছে ছাতির নিচে ধরিয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিতে লাগিলাম;

মনে ভয় ছিল দেরি হইলে শ্রীশ্রীমহারাজের খাওয়া হইয়া যাইবে। যাহা হউক, আমি যাইয়া দেখি মহারাজ তখনও স্নান করেন নাই। মহারাজ প্রথমে বেশ আনন্দিত হইয়াছেন মনে হইল এবং উৎসবের বিষয় সব জানিয়া লইলেন। কোন্ সাধু ঠাকুরের প্রসাদ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখিলেন যে আমি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছি অমনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে শীঘ্রই বাড়িতে ফিরিয়া কাপড় বদলাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কথায় মনে হইল ভিজিয়া অসুখ করিলে আমার চেয়ে তিনিই বেশি কষ্ট পাইবেন!

একদিন আমরা ছেলের দল শ্রীশ্রীমহারাজের সামনে মাটিতে বসিয়া আছি এমন সময় কয়েকজন ভক্ত ভদ্রলোক মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাঁহারা বজবজে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব-উপলক্ষ্যে মহারাজকে বজবজে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ কিন্তু যাইতে রাজি হইলেন না। শরীরটা তেমন ভাল নাই, বলিলেন। ভক্তগণ নানাভাবে তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকায় মহারাজ আমাদিগকে দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা যদি এই ছেলেদের লইয়া মহারাজের মতো তাহাদিগকে আদরযত্ন করেন তবে মহারাজেরই সেবা করা হইবে। ভক্তগণ আর কোন উপায় না দেখিয়া নির্দিষ্ট দিনে আমাদিগকে বজবজে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে আছে, আমরা মঠের কয়েকজন সাধুর সহিত সকালে বজবজে যাইয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলাম এবং শ্রীশ্রীমহারাজের প্রাপ্য আদরযত্ন পাইয়া বিব্রত বোধ করিয়া সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ একবার দক্ষিণভারত-ভ্রমণে চলিয়া যান। আমরা প্রায় প্রতি রবিবার তখন মঠে যাইতাম। রাত্রি থাকিতে আমরা সকলে কোন জায়গায় একত্র হইতাম এবং বড়বাজারের ঘাট হইতে এক পয়সা দিয়া স্টীমারে হাওড়ার পারে যাইয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া হাঁটিয়া মঠে যাইতাম। মঠে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) এবং অন্যান্য মহারাজ আমাদের দলের ছেলেদের নানাভাবে ভবিষ্যৎ জীবন-গঠন সম্বন্ধে সাহায্য করিতেন। এ জীবন ভোগের জন্য নয় এবং লেখাপড়া শেষ করিয়া কিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে জীবন উৎসর্গ করা যায় তাহা বলিয়া উৎসাহ দিতেন। আমাদের দলের অনেকে বেলুড় মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া এখন নানাস্থানে দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য যোগ্যতার সহিত চালাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি মাস কাটিয়া গেল। একদিন শুনিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ দক্ষিণ ভারত হইতে কলকাতায় ফিরিতেছেন। নির্ধারিত দিনে স্টেশনে গিয়া দেখি প্লাটফরমে দাঁড়াইবার জায়গা নাই। স্টেশনে কর্মচারীরা বলিতে লাগিলেন, "কই, তাঁহারা তো জানেন না যে ঐ গাড়িতে কোন নামকরা লোক আসিতেছেন, তবে এত ভিড় কেন?" ট্রেন সময়মতো আসিয়া দাঁড়াইতেই বয়স্ক কয়েকজন ট্রেনের কামরায় ঢুকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে মাল্যভূষিত করিলেন। মহারাজ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিরে সবার দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হাস্যরঞ্জিত মুখশ্রী আমাদের হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেল করিল। আবার তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া যেন আত্মহারা হইলাম।

১৯১৯ সালে কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইবে ঠিক হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ ঐ পূজা-উপলক্ষ্যে কাশী যাইবেন শুনিয়া জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাদের সহিত আমাকেও পূজার ছুটিতে কাশীতে যাইতে বলিলেন। আমি সানন্দে রাজি হইলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত একই আশ্রমে দিনের পর দিন থাকিবার সৌভাগ্য হইবে জানিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। যাইবার জন্য দিন গণিতে লাগিলাম। কিন্তু হঠাৎ শুনিলাম যে শ্রীশ্রীমহারাজ দুর্গাপূজায় কাশীতে যাইতে পারিবেন না। এ সংবাদে মন বিষাদে ভরিয়া গেল। শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং তিনি যাহাতে পূজায় কাশীতে যান ছোট ছেলের মতো আবদার করিতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ দুঃখের সহিত জানাইলেন যে তাঁহার যাওয়া হইবে না বটে কিন্তু আমরা কাশীতে যাইয়া খুবই আনন্দ পাইব এবং আমাদিগকে কাশী যাইতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার সেই স্নেহমাখা অনুমতি আমরা শিরোধার্য করিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ কাশীধামের মাহাত্ম্য ও বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাদেবীর কতই না গুণগান করিলেন। আমাদের বলিলেন, আমরা যেন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, স্বয়ং বিশ্বনাথ কাশীতে সত্যসত্যই বিরাজ করিতেছেন এবং কাশীর পথের প্রতি ধূলিকণাটিও পবিত্র! কত সাধু-সন্ত কত কত যুগ কাশীতে তপস্যা করিয়া ওখানকার বায়ুও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। কাশীর কি কোন তুলনা আছে ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমহারাজের কথায় আমাদের মনের দুঃখ কোথায় ভাসিয়া গেল! তাঁহার উৎসাহে মন আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। নির্ধারিত দিনে শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া কাশী রওনা হইলাম।

কাশীতে পৌঁছিয়া যখন সেবাশ্রমে প্রথম ঢুকিলাম, মনে হইল—আমরা ভুল

করিয়া কি কোন সাহেবদের বাগানে ঢুকিয়াছি? এমনই পরিপাটি ও ফিটফাট সব কিছু। রাস্তা লাল সুরকি দিয়া ঢাকা, কোথায়ও একটু ময়লা বা ছেঁড়া কাগজ বা শুকনা গাছের পাতা নাই। বাড়িগুলি সুন্দর রং করা। আশ্রমে ঢুকিলেই যেন মন পবিত্রতায় ভরিয়া উঠে! কোথায়ও কোন গোলমাল নাই, আর সব কিছুই— বৃক্ষলতা পর্যন্ত যেন আনন্দে ধ্যানমগ্ন। কাশীতে যে কয়দিন ছিলাম পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিলাম।

মঠের জনৈক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমরা নানা দর্শনীয় স্থান ও নানা মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। বেশ মনে আছে একটি বাগানে নির্জন স্থানে একজন প্রাচীন সাধুর দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি গাছে ঝুলান একখানা তক্তার উপর বসিয়া থাকিতেন এবং মৌনী ছিলেন। আমরা গেলে হাত দিয়া নিচে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্তি এখনও বেশ মনে আছে। পরে জানিয়াছিলাম এঁর নাম শ্রীচামেলী পুরী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরু শ্রীতোতাপুরীর গুরুভাই। শ্রীশ্রীমা যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন চামেলী পুরীকে দর্শন করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। সত্যই সাধুমহারাজগণ তপস্যা দ্বারা কাশীর বায়ু পর্যন্ত পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে দুর্গাপূজার ছুটি কাটিয়া গেল, আবার আমরা কলকাতায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া কাশীর সকল গল্প বলিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মানব জীবন ধন্য করিবার জন্য অনেকেই তখন শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট যাতায়াত করিতেন। দেখিতাম কেহ বহুদিন কার্য-সিদ্ধির জন্য যাতায়াত করিতেন, আবার কেহ বা ২/৪ দিন যাতায়াত করিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইতেন। আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ সহজেই কৃপালাভ করিতেছে দেখিয়া আমারও মনে দীক্ষা লইবার বাসনা জাগিল। কিন্তু শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শন কিংবা তাঁহার শ্রীমুখের দু-একটি কথা শ্রবণেই মন আনন্দে এত ভরিয়া থাকিত যে দীক্ষা লইবার কথা অনেক সময় মনেই পড়িত না। আবার এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইলে পরে মনে কষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া কখন-কখন মন বেশ চঞ্চল হইত।

এমনি ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে তাঁহাকে সবাই একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখনও এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে তাঁহার কাছে ডাকিলেন এবং আমার গায়ের জামা খুলিয়া শরীর দেখাইতে বলিলেন। জামা খুলিবার পর

আমার শরীরের চারিদিক তিনি দেখিলেন এবং তাঁহার সামনেই মাটিতে বসিতে বলিলেন এবং আমাকে সকালে ও সন্ধ্যায় শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীভগবানের একটি বিশেষ রূপ চিন্তা করিতে ও নাম মনে মনে জপ করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে আমি মা-বাপের প্রথম সন্তান হওয়ায় তাঁহারা আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করিবেন এবং আমি যদি তাঁহাদের আশা পূর্ণ করি তাহাতেই ধর্ম হইবে—সংসার-ত্যাগ করিলেই যে ধর্ম হইবে এমন কোন কথা নাই। আমি তখন বলিতে গেলে ছেলেমানুষ। ভাবিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দিলেন না তখন আমি নিশ্চয়ই উপযুক্ত আধার নই। এই চিন্তা আমাকে অভিভূত করিল।

কিন্তু বলরাম মন্দিরের দোতলা হইতে নিচে নামিবার সময় বোধ হইতে লাগিল আমার সমস্ত শরীর পালকের মতো হাল্কা এবং আমি যেন শূন্যে চলিতেছি। অল্প সময়ের মধ্যেই সদর রাস্তায় নামিলাম কিন্তু তখনও আমার সেই অবস্থা। শ্রীশ্রীমহারাজের বর্ণিত শ্রীভগবানের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি যেন আমার সামনে দেখিতে লাগিলাম। এইভাবে সেদিন তো গেলই, পরে আরও কিছুদিন চলিল। মন সর্বদাই কোন এক রাজ্যে যেন উঠিয়া থাকিত। দৈনন্দিন কাজ করিতে কষ্ট হইত। আবার ইহাও ভাবিতাম যে, শ্রীশ্রীমহারাজ যখন কৃপা করিলেন না তখন আমি যে অযোগ্য আধার সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আবার মনে হইত শ্রীশ্রীমহারাজ যে বলিতেন, সবাই সব সময়ে কৃপা প্রার্থনা করে কিন্তু কৃপা করিলে কি তাহা ধারণ করিতে পারে! গোষ্পদে সমুদ্র ধারণ করা কি সম্ভব? এই দ্বন্দ্বময় চিন্তা আমায় এমন পাইয়া বসিল যে আমার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি যেন একেবারেই লোপ পাইল।

বহুদিন পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় দীক্ষিত হইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল এবং কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আর এক সন্তানের শ্রীচরণে বসিয়া অন্তরের আবেদন জানাইলাম, কারণ শ্রীশ্রীমহারাজ তখন ইহজগতের লীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমহারাজের যে কৃপালাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিবার কথা মনে আসিল না। শুভদিনে যখন কৃপালাভ করিলাম, দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম যে শ্রীশ্রীমহারাজ যে নাম ও রূপের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন এখন তাহাই পুনরায় পাইয়াছি।

(উদ্বোধন ঃ ৫৭ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিচারণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমি বিয়ে করছি না কিছুতেই। দাদামহাশয় (ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার) মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। এ বিংশ শতাব্দী, তার উপর বেঁকেবসা-ছেলে তাঁর পুত্র নয়, দৌহিত্র মাত্র—যার উপর জোর চলে না—আরো এইজন্যে যে দৌহিত্র সাবালক তথা অত্যাধুনিক। ভেবেচিন্তে শেষে একদিন বললেন ঃ "তাহলে এক কাজ কর—চল এক মস্ত সাধুর কাছে—রাখাল মহারাজ। জানিস না তো—কী পেল্লায় সাধু—ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য! সাধুর আশীর্বাদই তোর রক্ষাকবচ হোক—যখন বিবাহ করবি নে গোঁ ধরেছিস, তোকে তো আর এ যুগে জোর করে ধরে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। তবু এখনো ফের বলছি রে—বিয়ে করে (ইংলণ্ডে) রওনা হলেই ভালো করতিস—জানিস না তো ওদেশের রঙ্গিণীদের। মেমসাহেবরা সে কত ছলাকলাই যে জানেন"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার দাদামহাশয় আদৌ জানতেন না যে আমি আবাল্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তাই এমন সন্দেহ তাঁর মনে একবারও উদয় হয়নি যে আমার বিবাহ-বিমুখতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার বন্ধুদের মধ্যে এক সুভাষকে (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু) বলেছিলাম যে পরমহংসদেবের ছবির সামনে আমি অঙ্গীকার করেছি যে—কৃষ্ণৈকান্ত ব্রহ্মচারী হয়ে চিরকুমার ব্রত নিয়ে আমি তাঁর নির্দেশ মেনে চলব ভগবানের তীর্থযাত্রায়।

সুভাষ আমার এ সংকল্পে সায় দিলেও সে এই সময় থেকেই ভগবৎব্রত ছেড়ে দেশব্রতকেই সর্বান্তঃকরণে বরণ করেছিল। তাই চিরকুমারব্রতে তার মনের পুরোপুরি সায় থাকলেও সে নিরন্তরই আমাকে বলত বিবেকানন্দের কথা ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আমার সঙ্গে কেবল এই ক্ষেত্রেই তার একটা অমিলের ব্যবধান ছিল যার উপর দিয়ে কোনো রকম রফার সেতু বাঁধাও মুশকিল। কারণ বলেছি, আমার

মনের সদাটলমানতা সত্ত্বেও এইখানে আমি আমার শৈশবেই এমন একটা খুঁটি পেয়ে গিয়েছিলাম যে আমার পক্ষে ভগবৎব্রত ছেড়ে বিশ্বমানবী দেশব্রতকে বরণ করা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি হয়ে উঠেছিল। সুভাষের কথায় আমি তখনকার মতো তার দেশভক্তিতে উজিয়ে উঠলেও তার কাছ থেকে চলে আসতে না আসতে সত্যিই পরিষ্কার দেখতে পেতাম যে সুভাষের স্বধর্ম আমার কাছে পরধর্ম। এতে মনে ব্যথা বাজত বৈ কি, কিন্তু এটুকু মনস্তত্ত্ব আমি জানতাম যার আলোয় দেখতে পেতাম আমার জীবনবিধাতা আমাকে কোন্ পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। সে পথ—না বিবেকানন্দ স্বামীর মতন অলোকসামান্য কর্মব্রতীর, না সুভাষের মতন অনন্যতন্ত্র দেশব্রতীর। সে পথ হলো ভক্তির সেই চিরন্তন পথ যে পথ দিয়ে ভক্ত যুগে যুগে চেয়েছে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে কৃতার্থ হতে। তাই সুভাষের কাছ থেকে ফিরে যখন ফের চারদিকে সুন্দরী বধূবরণের চক্রান্তে পড়ে যেতাম তখন সত্যিই কাতর হয়ে পরমহংসদেবের ছবির সামনে চোখের জলে ডাকতাম—একটুও বাড়িয়ে বলছি না ঃ " দেখো ঠাকুর, পথ দেখিয়ে পথ ভুলিয়ে দিও না, গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিও না—মন হাজার দুর্বল হলেও তোমার ডাক ছাড়া আর কোন ডাকে যেন আমি তোমাকে ভুলে না যাই, এমনকি যদি তোমাকে নাও পাই তাহলেও আমাকে বিবাহ করে সংসারী হতে দিও না কিছুতেই..." ইত্যাদি।

এ হেন আমি যে রাখাল মহারাজের দর্শনের প্রস্তাবে উজিয়ে উঠব, সে কি আর বলতে হবে? স্বয়ং রাখাল মহারাজ—ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র—যাকে ঠাকুর বলতেন নিত্যসিদ্ধের থাক—যার সম্বন্ধে উপমা দিতেন, হোমা পাখির—যে আকাশেই ডিম পাড়ে ও সে ডিম পড়তে পড়তে ফুটবামাত্র সদ্যোজাত পাখায় ফিরে উধাও হয় আকাশের দিকে, নিত্যসিদ্ধরাও ঠিক তেমনি সংসারে বদ্ধ হবার আগেই ভগবানের দিকে চম্পট দেয়—বলতেন ঠাকুর। কতবারই পড়েছি রাখাল মহারাজের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা, শুনেছি শ্রীম-র তথা স্বামী সারদানন্দের মুখে তাঁর আশ্চর্য বৈরাগ্য, প্রেম ও সমাধিভূমিতে অবস্থান করার কাহিনী। লোকে বলত তাঁকে রাজা মহারাজ। কারণ পরমহংদেব বলতেন ঃ "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট, স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই, বৈরাগ্যের জ্বলন্ত বিগ্রহ, পঙ্কে থেকেও যিনি ছিলেন পঙ্কজের মতন নির্মল, বিবাহ করেও যিনি ছিলেন সহবাস-বিমুখ—আজ তাঁকে স্বচক্ষে দেখব?—মন আমার গান গেয়ে উঠল বৈ কি!

এখানে বলে রাখি ঃ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার ও বিহারী ভাদুড়ির সঙ্গে দাদামহাশয় পরমহংসদেবের গলক্ষতের চিকিৎসা করতে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন মাঝে মাঝে—"কথামৃতে" তাঁর নাম আছে দু-তিন জায়গায়। দাদামহাশয় থিয়েটার রোডে প্রায়ই রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করতেন রসিয়ে—ঠাকুরকে কি চোখে দেখেছিলেন। মনে পড়ে তাঁর মুখে শোনা কাহিনী যে—সমাধিতে সময়ে সময়ে ঠাকুরের হৃৎস্পন্দন থমকে যেত, আদৌ নাড়ী পাওয়া যেত না। দাদামহাশয় বলতেন ঠাকুরের হাসির কথা, নাচতে নাচতে দিগম্বর হয়ে পড়ার কথা—সর্বোপরি তাঁর মধুর ভাবসঙ্গীতের কথা। উঠতে বসতে খোঁটা দিতেন ঃ "ধেৎ! কী তা না না না করে ওস্তাদি করিস তুই? তাঁর মতন গাইতে গাইতে যদি বিশ্ব ভুলে যেতে পারতিস তবে না বুঝতাম!" (এ রকম খোঁটা যখন তিনি দিতেন সময়ে সময়ে বেজায় লোভ হতো তাঁকে টুকি—আমার জন্যে একটি রাঙা বৌয়ের ব্যবস্থা করে ভগবানের নামে বিশ্ব ভুলে যাওয়ার সাধনার মুখেই তিনি আমাকে চালাতে চাইছিলেন কিনা।) আর একটা কথা মনে পড়ছে— দাদামহাশয় বলতেন—ঠাকুর প্রায়ই ভাবোন্মত্ত হয়ে গাইতেন একটি গান ঃ "রামকো জো না জানা সো ক্যা জানা হয় রে।" কিন্তু এ-গানটির কোনো উল্লেখই পাই নি পাঁচখণ্ড কথামৃতে।* যাক্, যা বলছিলাম।

রাখাল মহারাজ, ওরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সে সময়ে কলকাতায় এলে প্রায়ই থাকতেন বাগবাজারে বলরাম বসুর দ্বিতল ভবনে। দাদামহাশয়ের মোটর থামল এই তীর্থোপম পুণ্যনিলয়ের সামনে—যেখানে ঠাকুর কতবারই উদ্দণ্ড নৃত্য করে সবাইকে মাতাতেন—মা-র নামে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতে ধূপের গন্ধ ভেসে এল। গায়ে আমার কাঁটা দিল ফের—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগীর দর্শন পাব আজ।

দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কী সৌম্য পবিত্র মূর্তি! গেরুয়া রঙে যেন আরো নির্মল, আরো উজ্জ্বল রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। গম্ভীর আনন অথচ এতটুকু কাঠিন্য নেই। আনন্দময় মহাপুরুষ দাদামহাশয়কে দেখে বালকের মতনই সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ঃ "এ কী ! প্রতাপবাবু! আসুন আসুন! কতদিন বাদে..."

তারপর এ কথা সে কথা ... কত গল্প হাসি ঠাট্টা—ঠাকুরের স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন... যেমন দুই বন্ধুর মধ্যে অনেক দিন বাদে হঠাৎ দেখা হলে হয়ে থাকে।

---

* গানটি শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে।

আমি মুগ্ধ হয়ে শুধু শুনি তাঁর মুখে ঠাকুরের কথা আর থেকে থেকে চোখে জল ভরে আসে—বহু কষ্টে সামলাতে হয়।

হঠাৎ চমক ভাঙল—আমার নিজের নাম শুনে।

দাদামহাশয় অনর্গল আমার কাহিনী পেশ করে শেষে বললেন ঃ ছেলে ভালোই বলব—পড়াশুনোয় কিছু গাফিলি করে না—গত বৎসর বি. এস-সি অনার্স গণিতে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে। কিন্তু আমি মহাভাবনায় পড়ে গেছি মহারাজ! হয়েছে কি—ওর বাবা (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) অনেক টাকা রেখে গেছেন। তার ওপর ও এখন সাবালক—কাজেই বেপরোয়া, জানেন তো আজকালকার ছেলেদের কাণ্ড! তার উপর দেখতেই পাচ্ছেন, দেখতে শুনতেও (হেসে) নিতান্ত অখাদ্য নয়। কিন্তু হলে হবে কি— দুর্দান্ত একগুঁয়ে, তার উপর ঝোঁকালো আর রোখালো। বলে বিয়ে করবে না—ভাবুন তো! এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে সুন্দরী পয়মন্ত পাত্রী হাজির—দু-একজন টাকাওয়ালা বাপের মেয়েও আছে—অতি চমৎকার ঘর—কিন্তু ও কি সোজা দুরন্ত ঠাউরেছেন?—একবার গোঁ ধরলে ছাড়ায় কার সাধ্য? কাজেই ওকে বিয়ে করাবে কে বলুন তো?”

রাখাল মহারাজ (ফিক করে হেসে) ঃ বটে! বেশ বেশ। (একটু আমার দিকে চেয়ে থেকেই দাদামহাশয়ের দিকে ফিরে) আমি আপনার ভাবখানা বেশ বুঝছি প্রতাপবাবু। শুধু আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি সেটাই ভেবে পাচ্ছি নে। আমি নিজে সন্নিসি ঠাকুর হয়ে কোন্ মুখে ওকে তুতিয়ে পাতিয়ে বিয়ে থা করে থিতু হতে বলি বলুন তো?—তাই বলি শুনুন—ওর উপরেই কেন ছেড়ে দিন না—যে বিয়ে করবে?

দাদামহাশয় ঃ ওর উপরে ছেড়ে দিতে তো আমরা গররাজি নই মহারাজ, কিন্তু মুশকিল বেধেছে এই জন্যে যে, ও ধরেছে বিয়ে না করেই বিলেত যাবে—এই বৎসরেই। কাজেই আমরা ভয় পেয়েছি বই কি, বুঝলেন না? ও যে রকম ঝোঁকালো ছেলে—ওদেশে মেমরাও যে কী বস্তু জানেন না তো—কী সাজসজ্জা রং ঢং তাদের! ও পড়বেই পড়বে কোনো না কোনো রঙ্গিণীর ফাঁদে আর করবে তাকে ঘরণী। তখন?—(একটু থেমে) তাই তো ভেবে চিন্তে আপনার আশীর্বাদ নিতে ওকে ধরে নিয়ে এলাম মহারাজ!—সাধুদের আশীর্বাদের মতন রক্ষাকবচ সংসারে আর কী আছে বলুন? (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) তাছাড়া এখন আর উপায়ই বা কী বলুন?—হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি—তার উপর ও আবার কী বিষম গান-পাগলা জানেন না তো। আর মেয়েরা গান শুনলে—বুঝলেন কি না...

রাখাল মহারাজ (টুপ করে) ঃ তুমি গান গাইতে পারো বাবা? বেশ বেশ। শোনাও না একটি—মার নাম। জানো?

আমি "জানি" বলে আনন্দে অধীর হয়ে ধরে দিলাম কথামৃতের একটি বিখ্যাত গান, কমলাকান্তের রচনা ঃ

মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
বিষয় মধু তুচ্ছ হোলো কামনা কুসুম সকলে,
কমলাকান্তের মনে আশা পূরণ এত দিনে।
সুখ দুঃখ সমান হলো—আনন্দ সাগর উথলে।

গান শুনতে শুনতে রাখাল মহারাজের মুখের চেহারা বদলে গেল—যেন একটা অলক্ষ্য আভা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। ...আমার হৃদয়ে জেগে উঠল ভক্তি, চোখে অশ্রু। তারপর ... কী যে হলো বলে বোঝাতে পারব না, শুধু এইটুকু বলি যে স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার মাথার উপরে মহাযোগীর সব-তাপ-জুড়িয়ে-দেওয়া আশীর্বাদ!...

গান শেষ হলে দেখি—কী আশ্চর্য! —দাদামহাশয়ের চোখে জল! হয়ত এই প্রথম তাঁর মনে হয়ে থাকবে যে, গান শুধু বিপদে ফেলতেই মুখিয়ে নেই—বিপদ কাটাতেও পারে বা।

ওদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি—মহারাজ সমাধিস্থ। কী সুন্দর!... কী পবিত্র!

অনেকক্ষণ বাদে তিনি চোখ খুললেন। তারপর ভাবনেত্রে আমার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি চোখ নিচু করলাম। বুকের মধ্যে আমার ডমরু উঠেছে বেজে...

হঠাৎ তিনি দাদামহাশয়ের দিকে ফিরে ধরা গলায় বললেন ঃ "প্রতাপবাবু! ভয় নেই আপনার। এ ছেলের কোনো বিপদ হবে না বিদেশে বিভুঁয়ে।"

দাদামহাশয় সপ্রশ্ন নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকটা বিহ্বল ভাবেই বলব। তিনি বললেন ঃ "জানেন—ও যখন গাইছিল—আমি কি দেখলাম? দেখলাম ওর চারদিকে ঠাকুরের কৃপায় একটি—aureole—মণ্ডল। এ-কৃপা হলো একটি বর্ম—বুঝলেন প্রতাপবাবু? হ্যাঁ সত্যিই বর্ম—আর আমি জানি তার মর্ম। ও দু একবার হয়ত হোঁচট খেতে পারে, কিন্তু পদস্খলন ওর হবে না—আপনাকে বলছি, বিশ্বাস করুন।" বলে আমার দিকে ফিরে ঃ "এসো তো বাবা—একটু কাছে।"

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, তাঁর পায়ে আমার মাথা রেখে ভেঙে পড়লাম... কেবল কান্না আর কান্না।

রাখাল মহারাজ আমার মাথায় ঘাড়ে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শান্তির প্রবাহ বইতে শুরু করে—মাথা থেকে নাভি পর্যন্ত। ...

যখন আমি ফের মাথা তুললাম দেখি তিনি গভীর স্নেহে আমার দিকে চেয়ে!

আমি (ধরা গলায়) ঃ আমাকে ... আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

রাখাল মহারাজ (একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে) ঃ কেবল একটি কথা ... (তাঁর সুর মৃদুল হয়ে এলো) মনে রেখো বাবা সদাসর্বদা।

আমি (বিহ্বলভাবে) ঃ মনে রাখব?

রাখাল মহারাজ ঃ হাঁ বাবা। ঠাকুর আমাদের বলতেন কেবলই এই একটি কথা ঃ স্মরণ-মনন থাকলেই হলো—নিরন্তর মনে মনে তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা—এরই নাম হলো যোগ—যোগের যোগ। মনে রাখতে হবে ঠাকুরের কৃপা, বলতে হবে নিজেকে সর্বদাই ঃ "আমি তাঁর কৃপা পেয়েছি—এ কৃপার যোগ্য হতে হবে। ব্যস—আর কিছু নয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

এ-পরম দর্শনের অঘটন নাম দিয়েছি। কারণ যা দেখলাম তার বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা আমার জানা নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি চরণ মনে আসে ঃ যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

সুভাষকে গিয়ে একথা বলতেই ওর চোখ অশ্রু-আভাসে সজল হয়ে উঠল। আমার দুহাত চেপে ধরে বলল ঃ "আমিও এই কথাই বলি ভাই—'মনে রেখো' তুমি।—হ্যাঁ শুধু মনে রেখো যে, কৃপা যে পায় তার জীবন বদলে যায়ই যায়। ... আর" বলে একটু থেমে "আমিও পেয়েছি এ-কৃপার আভাস। তাই তো চাই দেশের কাজে জীবন ঢেলে সার্থক হতে।" এও তোমাকে বলেছি যে ঐ রাখাল মহারাজই আমাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে পাঠান, বলেন, "আমাকে দেশের কাজ করতে হবে।"

আমি ঃ জানি সুভাষ। আর এ তুমিই পারবে।

(স্মৃতিচারণ, শ্রীদিলীপ কুমার রায় ঃ প্রকাশক-সুরকাব্য সংসদ)

তৃতীয় পর্ব

মহাসমাধি

পরমহংসাচার্য—ব্রহ্মানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র—রাখাল, স্বামী বিবেকানন্দের আদরের ভাই—রাজা, শিষ্যের প্রিয়তম—মহারাজ, বিপুল শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের অধ্যক্ষ ইহধামে আর নাই। শ্রীভগবানের নবযুগলীলার পুষ্টির নিমিত্ত জগদ্ধিতায় যে চিন্ময়ধাম হইতে এই ত্রিতাপ-তাপিত ধরায় তাঁর আগমন হয়, গত ২৭ চৈত্র, সোমবার মদন ত্রয়োদশীর দিন এবং চতুর্দশীর প্রারম্ভে রাত্রি ৮ টা ৪৫ মিনিটের সময়, তিনি সেই নিত্যধামে পুনরায় প্রভুর পার্ষদত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত ১০ চৈত্র শুক্রবার একাদশীর দিন, বাগবাজার পল্লীস্থ, বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হন। ঐ রোগ উপশমিত হইতে না হইতেই গত রামনবমীর দিন আবার তাঁহার জ্বর ও পূর্বের বহুমূত্র রোগ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র, শ্যামাদাস, চন্দ্রকালী, নীলরতন, কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাই ঐ দিন হইতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হন।

শনিবার মধ্যরাত্রে হঠাৎ তিনি তাঁহার সকল সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে নিকটে বসিতে বলেন এবং কি এক অদ্ভুত প্রেমাবশে মাতোয়ারা হইয়া জড়িতকণ্ঠে সকলকে অভয় ও ভরসার বাণী শুনাইতে থাকেন। তাহার পর স্বামী সারদানন্দজীকে ডাকিয়া পাঠান। ইতোমধ্যে বলিয়াছিলেন, "আমার বিবেক, বিবেক, বিবেকানন্দ দাদা!" "বাবুরামকে চিনি, শ্রীরামকৃষ্ণচরণ জানি।" অতঃপর সারদানন্দ স্বামী উপস্থিত হইলে বলিলেন, "ভাই শরৎ, এসেছিস—আমার যে ব্রহ্ম-বেদান্ত গোল হয়ে গেল। তুই তো ব্রহ্মবিদ্যা জানিস, কি বল দিকি।" শরৎ মহারাজ, "তোমার আবার গোল কি? ঠাকুর তোমার সব করে দিয়েছেন।" তখন বলিয়া উঠিলেন, "আমি প্রায় গিইছি, কেবল একটু পাচ্ছিনি। ব্রহ্ম-তিমির!" পরে বিদ্রূপের সহিত, "আচ্ছা, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম করচি, আবার লেমনেড লেমনেড করচিস কেন?" কথা শুনিয়া সকলেই মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। "Father in Heaven দেখ, দেখ, এও খুব সুন্দর, এও ভগবানের এক ভাব। চল্, চল্।" শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি লেমনেড খেয়ে

ঘুমোও।" তখন বলিলেন, "মন যে ঐ ব্রহ্মলোকে—নামতে চায় না—দে ব্রহ্মে ঢেলে।" কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "আহাহা! ব্রহ্ম-সমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ! ওঁ পরমাত্মনে নমঃ! একটি বিশ্বাসের পত্রে ভেসে চলছি। আহাহা!" যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন যেন সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের শান্ত শীতল স্পর্শ, সমবেত সন্ন্যাসিমণ্ডলীর হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে আরও যে সকল গুহ্য কথা অপরের নিকট বলিয়াছিলেন, যাহা তিনি জানিতেন না, তাহাও তিনি তখন প্রকাশ করেন—"দেখ্ দেখ্ কৃষ্ণ এসেছে। আমায় মল পরিয়ে দে, আমি তার হাত ধরে নাচব—ঝুম্ ঝুম্ করে। আমি যে ব্রজের রাখাল। একটি ছোট ছেলে তার কচি হাত আমার পিঠে বুলুচ্চে, আর বলচে চলে আয়, চলে আয়। তোরা সর, আমি যাই। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।" মহাপুরুষজীকে দেখিয়া বলেন, "শিবানন্দ দাদা এসেছ।" মহাপুরুষজী, "মহারাজ, তুমি চলে গেলে আমরা কি করে থাকব। তুমি ইচ্ছে করলেই সেরে যাবে।" অভেদানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "কালী ভাই এসেছিস, আমি যাচ্ছি।" তিনি বলিলেন, "ভাই, তুমি থাক। তুমি ইচ্ছা কর, তা হলেই সেরে যাবে।" প্রভাতে শ্রীযুক্ত বিপিন ডাক্তার দেখিতে আসিলে বলিলেন, "বিপিন দাদা, ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা।" শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় দেখিতে আসিলে বলিলেন, "শিবই সত্য—ঔষধ মিথ্যা।" তাহার পর সকলকে বলিতে লাগিলেন, "রামকৃষ্ণঃ! রামকৃষ্ণঃ! রামকৃষ্ণঃ! ভয় কি তোদের, তোরা ভগবানের নাম কর। তোরা সব তাঁর।" তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, কেবল তাঁহার তপোপূত পবিত্র, মধুর, প্রেমময় জীবন। আকাশের চাঁদ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিকমিক করে। মাছেরা তাহার সহিত খেলা করে, ভাবে এ বুঝি আমাদেরই একজন। তারা কি তখন বুঝিতে পারে এ চাঁদ চলিয়া যাইবে! এ চাঁদ আকাশের! জলের নয়!

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

শ্রীধ্রুব

মহারাজ ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু মনে তো হয় না তিনি আর আমাদের সহিত নাই—মনে হয় বুঝি তিনি পূর্ববৎই তাঁহার এই পার্থিব লীলারঙ্গমঞ্চের কোন এক দেশে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু চক্ষু যে বলে, কই সে দেবতনু তো দেখিতেছি না। কর্ণ বলে, কই সে করুণাময়ী বাণী তো আর শুনিতেছি না! আবার মন বলে, আছে। আমারই গভীরতম প্রদেশে অতীতের পুণ্য স্মৃতির মন্দিরে, সে গোপন দেবতা সকলের আড়ালে হাস্যকৌতুক রসের মধ্য দিয়া এক মধুর ধর্মরাজ্য বিস্তার করিয়া স্বীয় দেবতার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তাই আমাদের বিচ্ছেদের দীর্ঘ নিশ্বাস সেই মানস মন্দির দ্বারে আঘাত দিয়া অহরহঃ তাঁহার করুণার সাড়াই আনিয়া দিতেছে। তাঁহার সেই তপোপূত করুণাঘন মূর্তি আজ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাহ্য গতি রুদ্ধ করিয়া অন্তর রাজ্যেই টানিয়া আনিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শুক বলিয়াছিলেন—

স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥
আচ্ছিদ্য কীর্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসানুকৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥ (ভাগবত, ১১/১/৬-৭)

আমরা বলি, মহারাজ নিজ করুণাঘন মূর্তির দ্বারা সকল লোক-লাবণ্য হরণ করিয়া গিয়াছেন, ভরসাময়ী বাণীর দ্বারা অতি বড় দুর্বলকেও আশান্বিত করিয়া গিয়াছেন, পবিত্র কীর্তির দ্বারা মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

গুরুশিষ্যের মধ্যে যে একটা গম্ভীর সম্বন্ধ থাকে—যাহা ভীতি মিশ্রিত—সে সম্বন্ধ তাঁহার শিষ্য-সন্তানের মধ্যে ছিল না। তাঁহার ও আমাদের মধ্যে ছিল প্রেমের সম্বন্ধ—যাহা সকল ব্যবধান দূর করিয়া তাঁহাকে আমাদের অতি নিকটতম প্রিয়তম হিতকারী বন্ধুরূপে প্রতীয়মান করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যখন তাঁহার অন্তিমের মহাসমাধি দর্শন করিলাম—তাঁহার অজ্ঞাত, শ্রীশ্রীঠাকুরের

তাঁহার সম্বন্ধে অনুভূতি সকল যখন তিনি স্বীয় মুখে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অর্জুনের ভগবৎ সম্বন্ধীয় উক্তি মনে পড়িতে লাগিল—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ (গীতা, ১১/৪১)

আমরা বলি হে "কমল-কৃষ্ণ-সখা"! অনুভূতিহীন আমরা, তোমার মহত্ত্ব কি করিয়া বুঝিব। তুমি যে নানা হাস্য-রস-কৌতুকের মধ্য দিয়া আমাদের হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবল হাস্যরসেই আমরা মগ্ন হইয়াছি—নানা আধ্যাত্মিকতার ভাবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়াছি।

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥ (ভাগবত, ১০/৩৩/৩০)

—প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য জানা সত্ত্বেও—তুমি যে হীন, দীন, নিচ দুর্বলের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইয়া বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিয়াছ—তোমার এই দুর্নির্ণেয় গতি বুঝিতে অসমর্থ আমরা যে সাধারণ সিদ্ধ পুরুষের মাপ কাটিতে তোমাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি তজ্জন্য, হে শ্রীরামকৃষ্ণ মানস-পুত্র, আমাদিগকে ক্ষমা কর। কেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবী তোমাকে অতি শুদ্ধসত্ত্ব প্রিয়তম পুত্র বলিতেন, কেন স্বামীজী বলিতেন, "আধ্যাত্মিকতা হিসাবে রাখাল আমাদের চাইতে ঢের বড়", কেন শিবানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষেরা তদ্গত চিত্তে তোমার নিকট উপস্থিত হইতেন, কেন আজ তোমার বিরহে এই বিরাট জন-সমুদ্র উদ্বেলিত—তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিব? মহৎরাই মহৎকে বুঝেন—আমরা যে হীন, প্রেমিকেরাই প্রেমময়কে বুঝেন—আমরা যে পাষণ্ড, ক্ষমাশীলেরাই তোমার করুণা উপলব্ধি করিয়াছেন—আমাদের যে তিতিক্ষা নাই, বীতরাগেরাই তোমার ত্যাগ বুঝিয়াছেন—স্বার্থপর আমরা কি করিয়া তোমাকে বুঝিব, জানিব। তাই আজ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহী উদ্ধবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

দুর্ভগো বত লোকঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোডুপম্॥ (ভাগবত, ৩/২/৮)

দুর্ভাগা আমরা ঈশ্বর পার্ষদের পার্শ্বচর হইয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, নিজেদের সর্বস্ব তাঁহার চরণে বিকাইতে পারি নাই। আকাশের চাঁদ জলে

প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, মৎস্যকুল তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ভাবিয়াছিল এ বুঝি আমাদেরই মতন একজন, তাহারা ভাবে নাই, বুঝে নাই যে, এ চাঁদ তাহাদের সলিল-ভবন অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইবে, এ চাঁদ আকাশের—জলের নয়।

* * *

রুদ্রানুচর বিবেকানন্দ আসিলেন ত্যাগের ভৈরববিষাণ নিনাদে নিদ্রিত জগৎবাসীকে উঠাইতে, জাগ্রত করিতে; ত্রয়ীর ত্রিশূলে জগতের সকল পাষণ্ড, নাস্তিক, জড়বাদীর দুর্গ ধ্বংস করিয়া ব্যবধানহীন সমন্বয় রাজ্য প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিতে। পাপপ্রাসাদের ভিত্তি ধ্বংস হইল, ধীরে ধীরে সে প্রাসাদও জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু গঠন করিবে কে? তাই শ্রীভগবান তাঁহার নবযুগধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য আনিয়াছিলেন বিষ্ণু-সখা রাখালকে। রুদ্রতেজে বিশ্বের সকল পাপতাপ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হয়—কিন্তু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গঠনের জন্য প্রয়োজন—শান্ত-মধুর, শুদ্ধ-সত্ত্ব শক্তি—যে শক্তি নিজকে প্রকাশ করিয়াছিল শ্রীশ্রীমহারাজের মধ্য দিয়া। এই জীবন্ত শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যে ক্ষুদ্র-চক্র বরাহনগরে ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিল—ধীরে ধীরে সেই লীলায়িত শক্তিকেন্দ্র হইতে ঘন ঘন ভাবোচ্ছ্বাস বিপুল বেগে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পরিধির সৃষ্টি করিয়া আজ জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে চাহিতেছে। মনে হয়, সেই শান্ত মধুর সত্ত্বঘন স্থূলমূর্তি লোক চক্ষু হইতে নিজেকে তিরোধান করিয়াছে বলিয়া যে বোধ হইতেছে সে কেবল তজ্জাত সম্মুখস্থ বিরাট তরঙ্গের ব্যবধান হেতু। কিন্তু এখনও সেই গঠন-শক্তি "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সাঙ্ঘাঙ্গ মধ্যে সূক্ষ্মাকারে ব্যাপ্ত থাকিয়া আরও অধিক নিজেকে প্রকট করিবে। কি করিয়া তিনি এই রামকৃষ্ণসঙ্ঘকে ধীরে ধীরে এত বড় বিরাট আকার ধারণ করাইলেন এবং কি করিয়াই বা সকল মঠ, সেবাশ্রম, বিদ্যালয়গুলিকে বেলুড় মঠে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন—ভাবিতে গেলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ উপস্থিত হয়।

স্বামীজী অতি দুঃখে বলিয়াছিলেন, "এই যে কয়েকটি বাঙ্গালী আমরা একত্রে বসবাস করিতেছি, আর কিছু না হউক, ইহাই একটি জগতের অদ্ভুত ঘটনা।" এত বড় পরশ্রীকাতর দাসবৃত্তি জাতির সন্তানেরা, এই বৃহৎ সঙ্ঘের মধ্যে একতাসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে—ইহা কি বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয় নয়? পরন্তু এই একতা জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভরসা ও আনন্দ আনিয়া দেয় না?

কিন্তু কোন্ চরিত্রবলে তিনি এই একতার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিলেন তাহা এই দাস জাতির যথেষ্ট ভাবিবার বিষয়। তিনি কখনও কোন সঙ্ঘ-সভ্যের ব্যক্তিগত ছোটখাট ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না পরন্তু কেহ দোষ করিয়া থাকিলে তাহা বন্ধুর ন্যায় অতি গোপনে সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি কর্মীর কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতেন, নিজের মত তাহার ঘাড়ে বলপূর্বক চাপাইয়া, তাহার উপায় ও উদ্দেশ্যে গোল বাধাইয়া দিতেন না, পরন্তু প্রয়োজন হইলে কেবল সাহায্যই করিতেন।

তমোগুণ মানুষকে জড় করিয়া দেয়। রজোগুণের দাপটে বিশ্ব কম্পিত হয়, সে বলপূর্বক অপরকে নিজের মতে আনে, পেশীশক্তির দ্বারা নিজ কার্য সিদ্ধ করিয়া লয়। সত্ত্বগুণ পবিত্র ও মধুর। করুণা ও প্রীতি তাহার সিদ্ধির উপায়। তাহার গতি নীরব, ধীর ও অপ্রতিহত। শিশির বিন্দু যেমন ধীরে গোলাপ কোরকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তাহাকে প্রস্ফুটিত করে—সলিল যেমন সকল বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া ধীর অথচ অপ্রতিহত গতিতে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে—সত্ত্বগুণের গতি ঠিক সেইরূপ। সত্ত্বগুণ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না কিন্তু যুদ্ধের পরিচালনকারী ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বিচারে পরাস্ত করে না, কিন্তু হৃদয়কে অধিকার করে, দুরন্তকে নাশ করে না—শান্ত করিয়া লয়, গড়াই তাহার কার্য—ভাঙ্গা নয়। যেখানে এই শক্তির বিকাশ—তাঁহারই দ্বারা পুরাতনের জীর্ণ অপসারণ করিয়া নূতনের গঠন সম্ভব। মহারাজ ছিলেন এই শক্তির আধার। তিনি সত্ত্বগুণাবলম্বীকে ধ্যানের দ্বারা রজোগুণাবলম্বীকে কর্মের দ্বারা, তমোগুণাবলম্বীকে ভোগের দ্বারা উত্তরোত্তর প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন—কাহাকেও কদাপি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। বদ্ধের নিকট তিনি অতি বড় বদ্ধের ন্যায় মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন—মুমুক্ষুর সহিত নির্মমভাবে "নেতি" মার্গ অবলম্বন করিতেন—বিলাসীর নিকট তিনি ছিলেন মহাহাস্যামোদী।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ (গীতা, ৩/২৬)

—তিনি দৃষ্টিমাত্রেই অধিকারী বুঝিতে পারিতেন—তাই কখনও তিনি বড় বড় কথার দ্বারা কাহারও বুদ্ধির ভেদ উপস্থিত করিতেন না। তিনি আত্মযুক্ত হইয়া সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। শাস্ত্রেও জ্ঞানীর এরূপ ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে—

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ।। (ভাগবত, ১১/১৮/২৯)

—ব্রহ্মজ্ঞেরা লোক সংগ্রহের জন্য প্রাজ্ঞ হইয়াও বালকবৎ ক্রীড়া করেন। কর্মকুশল হইয়াও জড়বৎ বিচরণ করেন, বিদ্বান হইয়াও উন্মত্তবৎ প্রলাপ বকেন, বেদবিৎ হইয়াও গোচর্যা করিয়া থাকেন।

—মৃত্যু কিন্তু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকট করিয়া দেয়। জুয়াচোরের জুয়াচুরি ধরা পড়ে এই সন্ধিক্ষণে। টিয়াপাখি সারাজীবন রাধাকৃষ্ণ বলিয়া আসে কিন্তু যখন বিড়ালে ধরে, তখন টাঁ টাঁ করে। তাই মহারাজের আজীবন ভাগবতানুধ্যানের পরিচয় পাই ইহলীলা অবসানের অন্তিম সময়ে। যখন ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ঘোষ মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে জিজ্ঞাসা করেন, “মহারাজ, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?” তিনি উত্তরে বলেন,

সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।। (বিবেকচূড়ামণি,২৪)

“আমার অবস্থা এখন এইরূপ, তোমরা এইটির ধারণা কর।” তিন দিন ধরিয়া তিনি অলৌকিক ভাগবতী মূর্তি উপলব্ধি সম্বন্ধীয় বাক্য ছাড়া অপর কিছুই বলেন নাই। এবং সেই সকল প্রসঙ্গে সকলকে আশা ও ভরসার বাণী তথা—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরপ্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমঃ বিঘ্নবিনাশনায়।।

—ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ! ওঁ পরমাত্মনে নমঃ! রামকৃষ্ণঃ, রামকৃষ্ণঃ, রামকৃষ্ণঃ প্রভৃতি ভগবান্নামানুকীর্তন ছাড়া অপর শব্দের ব্যবহার মাত্র করেন নাই।

* * *

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।

(গীতা, ৮/৫, ৬, ১০)

—এই ভগবতাঙ্গীকার আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবুদ্ধ করুক।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীকণ্ঠ

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

*　　*　　*

মনোজ্ঞং সুজ্ঞানং মুনিজন-নিধানং ধ্রুবপদং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে॥
ধিয়া ধীরৈর্ধ্যেয়ং শ্রবণপুটপেয়ং যতিবরৈ-
র্মহাবাক্যৈর্জ্ঞেয়ং ত্রিভুবন-বিধেয়ং বিধিপরম্।
মনোমানামেয়ং সপদি হৃদি নেয়ং নবতনুং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে॥

*　　*　　*

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

চৈত্রপূর্ণিমার উদ্দীপ্ত মধ্যাহ্নে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে নবযুগের ভাবশ্রীক্ষেত্র বেলুড়মঠের পুণ্যাঙ্গনে সাশ্রুনেত্রে, দগ্ধহৃদয়ে গুরু-ভ্রাতৃবৃন্দ ও ভক্তশিষ্যমণ্ডলী তাঁহাদের বড় আদরের হৃদয়ের রাজা, জীবনের জীবন, অমূল্য রতন, পরমারাধ্য শ্রীমন্মহারাজের শিব-শরীর স্রক্-চন্দন-চর্চিত, ক্ষৌমবস্ত্র-বিভূষিত করিয়া পবিত্র চিতাগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন। তটিনীতটে পার্শ্বস্থ তরুতলে নির্বাক-নিস্পন্দভাবে ভাঙ্গাবুক লইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, আর নির্নিমেষনয়নে দেখিতেছিলাম—আমাদের সবাকার রুদ্ধক্রন্দন ও বদ্ধব্যথা স্বয়ং প্রকৃতি আপনার সর্বাঙ্গে প্রকট করিয়া রহিয়াছেন। সে শোকদৃশ্য দেখিয়া তপন তাঁহার প্রখররশ্মি হারাইয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন, পবন তাঁহার অবিরাম ক্রন্দনরোলে আমাদের সকলের অন্তরের শূন্যতা ক্রমশ বাড়াইয়া তুলিলেন, জননী-জাহ্নবী অশ্রুজলকল্লোলে, উচ্চগ্রামে মাতৃ-হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা জানাইয়া উথলিয়া উঠিলেন—আর দূরবনাগত ঘুঘুর করুণ ক্রন্দন-রব মূকপ্রাণিকূলের

গভীর বেদনা ও সস্নেহ সহানুভূতি সূচিত করিল। বোধ হইল—যেন সকলই নিরর্থক, নিরানন্দ ও নৈরাশ্যময়! আচার্য ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আর কে অমিয়মাখা সান্ত্বনা বাক্যে, প্রেমের অভয়বাণী শুনাইয়া বিপদে প্রফুল্লতা, কর্তব্যে একাগ্রতা, দৈন্যে আত্মবিশ্বাস, স্খলনে ক্ষমা, চাঞ্চল্যে শান্তি দিবেন?

দ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধগগনবক্ষ চিরিয়া মাঝে মাঝে "রামকৃষ্ণায় স্বাহা! রামকৃষ্ণায় স্বাহা! রামকৃষ্ণায় স্বাহা!" রব ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতভাগ্য আমরা—চোখের সম্মুখে পলকে পলকে আচার্যের স্থূলদেহের ভস্ম-পরিণতি দেখিতে লাগিলাম।

শ্রীগুরুসকাশে নিত্যধামে প্রয়াণের দুই দিবস পূর্বে কি এক অভূতপূর্ব-অপরূপ ভাবমুহূর্তে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিদায়-বেলায় নিজ জীবনের—গুহ্য মর্মকথা জ্ঞাপন করিয়া গেলেন—"রামকৃষ্ণের 'কৃষ্ণ'টি চাই! ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, কৃষ্ণ এসেছ? আমাদের এ কৃষ্ণ আলাদা—এ গোপের কৃষ্ণ, কমলে-কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়।"

কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথিই যে নববেশে নবযুগে দক্ষিণেশ্বরের প্রেমিক পূজারী ব্রাহ্মণের বেশে যুগাবতাররূপে মানবমণ্ডলীকে মুক্তি ও ত্রাণের পথ দেখাইতে নূতন লীলার জন্য আবির্ভূত! সর্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এক-দিবসের ভাবাবেশে এক দিব্যদর্শনের অপ্রকাশিত কথা আজ প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। শ্রীশ্রীরাখালের প্রথম মিলনের অব্যবহিত পূর্বে তিনি গঙ্গাবক্ষে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের ভিতর বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যরত সখা রাখালকে দেখিয়াছিলেন। ইহাই "আমার কমলেকৃষ্ণ" উক্তির ভাষ্য!

অবতারের লীলার পুষ্টি ও সহায়তা ভিন্ন তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ, ঈশ্বরকোটি, নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের মানবদেহ ধারণ করিয়া অম্লানবদনে দেহীর সকল জ্বালাযন্ত্রণা বরণ করিয়া লইবার অন্য আর কি কারণ হইতে পারে? পরমহংসদেবই প্রাণের টানে তাঁহার পরমস্নেহের মানসপুত্রকে টানিয়া আনিয়াছিলেন।

আচার্যের জীবন-লীলার সকল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিবার সামর্থ্য-আয়োজন এখানে নাই। কিন্তু আজিকার এই আকস্মিক বজ্রপাতের সন্ধিক্ষণে তদীয় জীবনের প্রকৃত দ্যোতনা, মূল মর্মকথা সর্বজনসকাশে জানাইয়া আশ্বস্ত হইতে চাই।

দক্ষিণেশ্বরের মুক্তিদাতা পরমহংসের পূতসংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই সাধারণ মানবের পথাবলম্বন করিয়া শ্রীরাখাল বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের" নূতন বাণীর নবীন আলোকে সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল—সে তীব্র তরঙ্গের আবর্তে পৌঁছিয়া তিনি প্রেমাস্পদ প্রেয়সীর যৌবন-জীবন নৈরাশ্যসাগরে ভাসাইয়া, শিশু সন্তানের পিছনের অস্ফুট ডাক ও তাহার মায়াস্পর্শ নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করিয়া, এক অপূর্ব প্রেরণার প্রভাবে সংসারের সকল বন্ধন, সর্ব প্রলোভন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, অর্থ-ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলিয়া শ্রীগুরুর ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুক্তির মহানন্দ অনুভব করিলেন। তৎপরে তাঁর দীর্ঘকাল তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন, সমাধি-অনুভূতি-দর্শন সকলই অদ্ভুত—লোকোত্তর। উচ্চদরের সাধক ভিন্ন সে কথা কহিবার আর কাহার অধিকার?

পরমহংসদেব তাঁহার বড় আদরের এই মানসপুত্রের ভিতর ইদানীং আপনাকে মূর্ত ও প্রকট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ঠাকুরই নরদেহে বিরাজিত ছিলেন। তাই সত্যসত্যই একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সমসাময়িক জনৈকা স্ত্রীভক্ত শ্রীমহারাজের নিকট কিয়ৎকাল স্থিরচিত্তে বসিয়া ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তৎপরিবর্তে স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরকে সশরীরে আবির্ভূত দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিয়াছিলেন! উহা শুনিয়া শ্রীঈশার-বাণী মনে পড়িল—"I and my Father are One."

এই দুর্লভ-দেবশিশুর সদাহাস্যময় নির্মল মুখজ্যোতি দেখিয়া পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইত। তাঁহার কথা বলিতে গিয়া প্রথমে ইহাই মনে পড়ে—তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত—জগতের সকল শিশুর সরলতা একত্র সঞ্চিত ও আহৃত দেখিয়া তুষ্টিলাভের জন্যই বুঝি, ভগবান এই বাল-রাখালকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন! "Except ye become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of Heaven."

সংসারের ত্রিতাপতাপিত জীব, দুঃখ-দারিদ্র্যের গুরুভারাবনত মানব, পথভ্রষ্ট-কলুষ-পাপপঙ্কিল হতাশ নরনারী কিয়ৎকাল তাঁহার শান্ত-স্নিগ্ধ চরণতলে বসিয়া সেই পূত-সংস্পর্শে আসিলে লুপ্ত উদ্যম, হারানো জীবন, বিগত বিশ্বাস, নষ্ট চেতনা ফিরিয়া পাইয়া পরমা শান্তির স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া ধন্য হইত—সে সুশীতল কল্পতরুর ছায়া—সবাকার জুড়াইবার স্থান, চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত।

মহানন্দময়—সেই মহাপুরুষের প্রতি পদবিক্ষেপে আনন্দের শুভ্র-সমুজ্জ্বল

কোটি শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিত! বেলুড় মঠে যখন তিনি থাকিতেন তখন মনে হইত, বিশাল মঠভূমির প্রত্যেক ধূলিকণা, তৃণশষ্প, বৃক্ষলতাগুল্ম, পশু-পক্ষি-মানব—সর্বোপরি তানতরঙ্গিণী ভাগীরথী—সকলই ব্রহ্মানন্দের এক অফুরন্ত ফোয়ারার সুখ-হিল্লোলে ভাসমান—মনে হইত, চির-আনন্দের লীলানিকেতন অমরায় বিরাজ করিতেছি। শিবক্ষেত্র বারাণসীখণ্ডে গুরুভ্রাতা, ভক্তশিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দরাজ, মধুরমূরতি শ্রীমহারাজকে তাঁহার পরমপ্রিয় রামনাম-সঙ্কীর্তন বা কালভয়বারিণী কালীকীর্তনের আসর জমাইয়া বিরাজ করিতে যাঁহাদের দেখিবার ভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা চিরজীবনের তরে সে সুখস্মৃতি হৃদয়ের গোপন মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখিয়াছেন—সে চিত্তবিমোহনকারী হ্লাদময়ী দৃশ্যনিচয় নয়ন-মন ভরিয়া উপভোগ করিয়াও তাঁহাদের আশা মিটে নাই—মনে হইয়াছিল—স্বয়ং শিব নরদেহ ধরিয়া ভাব-ভক্তি-প্রীতির ত্রিধারা ধরায় বহিয়া আনিয়াছেন! কিন্তু তখন কে জানিত কাশীতে এই তাঁহার শেষ আগমন? আবার এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন বলিয়াই বোধ হয়, সর্বশেষে দক্ষিণদেশে মাদ্রাজ অঞ্চলে সর্বপ্রথম মহাসমারোহে বিপুল আয়োজনে দেবী দশভূজার পূজার বিরাট অনুষ্ঠান, বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন প্রভৃতি করিয়া শেষবার ভক্তবৃন্দকে এক অপূর্ব আনন্দস্রোতে ভাসাইয়া প্রাণমন মাতাইয়া ছিলেন। সর্বোপরি—তাঁহার বড়সাধের আদরের অনুষ্ঠান—ভুবনেশ্বরের নবনির্মিত বিরাটমঠে শিষ্যসমাবৃত হইয়া এক বিরাম-বিহীন ভাবস্রোতে সকলের মনোরঞ্জন করিলেন।

অনন্ত শক্তির আধার হইয়াও তিনি সর্বক্ষণ এক অদ্ভুত উপায়ে আত্মগোপন করিয়া আপনার প্রকৃতস্বরূপ লোক-লোচন হইতে ঢাকিয়া রাখিতেন। 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া' তিনি জগতের অনেক তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে সাধারণ মানবের ন্যায় মনঃসংযোগ করিতেন—সামান্য দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে ছেলেখেলা করিতে দেখা যাইত। সর্বসময়েই তাঁহাতে একটা সহজ, সরলভাব বিদ্যমান ছিল—কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টভাবের তিলমাত্র সেখানে স্থান পাইত না। সহাস্যবদনে কত সময় বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে হাসি-ঠাট্টা-তামাসা করিতে দেখিয়া মূঢ় আমরা, পরস্পরের বিরাট ব্যবধান ভুলিয়া তাঁহাকে আমাদেরই মতো একজন ভাবিতাম! কিন্তু উহারই ভিতর মাঝে মাঝে দুই একটি কথার ভাবে ইহাও বেশ বুঝা যাইত—যে আমরা যাঁহার সহিত কথা বলিতেছি, তিনি এ পৃথিবীর নহেন—তিনি স্বর্গলোকের এক দেবতা! "I am from above, I am not of this world."

নিপুণ মাঝির ন্যায় সুবিশাল সঙ্ঘতরণীর হাল ধরিয়া শত ঘূর্ণি, অসংখ্য ঝঞ্ঝা হইতে তিনি উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাই আজ পথহারা হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মরমের রব উঠিয়াছে—"কাণ্ডারি কোথা?"

সাধারণ নেতার বাহ্যাড়ম্বর, আত্মাভিমান, আত্মম্ভরিতা তাঁহাতে কোন দিন স্পর্শ করে নাই। সে ঐশী শক্তির সম্মুখে সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইত। সে অসীম নিস্তব্ধ নীরবতার মধ্য হইতে কর্মীর দল অনন্ত বীর্য, অদ্ভুত প্রেরণা পাইত এবং আপনাদিকে তাঁহারই যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া প্রবল উৎসাহে কর্মরত হইত।

দুরন্ত-চঞ্চল শিশু মনের টানে বিনাবিলম্বে কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া অকস্মাৎ প্রেমাস্পদের সহিত মিলিবার জন্য ছুটিয়া থাকে। আমাদের এই বাল-ব্রহ্মানন্দও তেমনি আজ আচম্বিতে শিশুসুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত ভক্তজনহৃদয়ে শেল হানিয়া বিদ্যুদ্বেগে, ইচ্ছামাত্র শ্রীগুরুর পুণ্যলোকে, চকিতে চলিয়া গেলেন!

হে গুরো! তুমি নিত্য-তুমি শাশ্বত—তুমি অবিনাশী—তোমার মৃত্যু নাই—পরমগুরুর সহিত তোমার এই দিব্যমিলনে শোক-ক্রন্দন অশাস্ত্রীয়—এ সকল জ্ঞানবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য—কিন্তু "মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না।" ক্ষুদ্র আমরা—মূঢ়-অজ্ঞান, অবুঝ আমরা—আমরা স্থূল চাই, নামরূপের কাঙ্গাল আমরা! তোমার শেষ আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাই আমাদের এই সঙ্কটময় দুর্গম জীবন-গহনপথের একমাত্র দীপবর্তিকা, শোকে একমাত্র সান্ত্বনা। হে আচার্য! তুমি আজ অশরীরী হইয়া ভারতের গগন-পবন-প্রান্তরে—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাক। আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনসমস্যার সমাধান তোমাকেই করিতে হইবে। জাতির আজ বড় দুর্দিন—তোমাকে তো আমরা ছাড়িতে পারি নাই, পারিবও না। আমাদের নেতা, আমাদের বন্ধু, আমাদের চালক হইয়া হে শিব! কল্যাণের পথে তুমি আমাদিগকে চালিত করিয়া মুক্তি দাও! তোমার 'অভীঃ'মন্ত্র সর্বদা আমাদিগের অন্তরে জাগরূক রহিবে। জগতের তুচ্ছ প্রলোভন আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর—কিন্তু হে করুণাময়! কৃপাসিন্ধো! আত্মবিস্মৃতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর—তুমি বারবার বলিয়াছ—"ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।" "Ye shall know the truth and the truth shall make ye free"—এই সত্যবাণী উপলব্ধি করিলেই মুক্তি মিলিবে।

তোমার সাধনার তপোপূত জীবন, লোককল্যাণের জন্য তোমার

আত্মবিসর্জন—পথের ইঙ্গিত দিয়াছে—আজ তুমি যেন ভৈরবকণ্ঠে ইহাই ঘোষিত করিলে—"I am the light of the world : he that followeth me, shall not walk in darkness, but shall have the Light of Life."

হে প্রভো! কোটিকণ্ঠে গললগ্নীকৃতবাসে আজ আমরা তোমার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছি—তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের অচলা ভক্তি দাও। আমাদের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নহে, কেবল—

হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে
চিত্তের চিরবসতি॥
* * *
বচন মনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী॥

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীগোকুল

যার কিছু দিন পূর্বে কল্পনা করিতে পারি নাই আজ, রঙ্গভূমে সহসা প্রেতের বীভৎস আবির্ভাবের মতো অদৃষ্ট চক্রের উপর কঠোর বিধাতার দারুণ নির্মম-হস্তের রেখাপাতের পরিচয় দিয়া, ভক্তদের সেই দুর্দিন সমাগত। যবনিকা পতনের গতি ও কাল নির্দিষ্ট আছে—কিন্তু যে মহাজীবনের লীলাভিনয় প্রেমসমুদ্রতরঙ্গের উদ্দাম গতিতে কত জলহীনা শুষ্ক হৃদয়-তটিনীকে জলপূর্ণা করিয়া বন্যা ডাকাইয়াছিল তাহা যে এত শীঘ্র সমাপ্ত হইবে ইহা সেই আদি কবি বিশ্বনাট্যকারের রচনাতেই সম্ভব, ক্ষুদ্র মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠতম নাট্যরথীরও দৃষ্টির বহুদূরে বিধাতার কলমের উপর কে হস্তক্ষেপ করিবে? তাহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায় কি? সে সনাতন প্রথানুযায়ী তস্করের মতো চুপে চুপে আসিয়া ভক্তদের আরাধ্য দেবতা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি এবং হৃদয় রাজ্যের মহামহিম মহারাজাধিরাজকে অপহৃত করিয়াছে। তাহার দ্বারে আজ নিঃসম্বল হইয়া হতভাগ্য আমরা, হাহাকার না করিয়া আর করিব কি? অকূল সংসার সমুদ্রের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রহৃত হইয়া ক্ষুদ্র জীবনতরী যে বিশাল আলোক-স্তম্ভের কিরণ ধারায় নিরাপদে বাহিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, আজ তাহা কালের কঠোর করস্পর্শে আমাদের নয়নপথ হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া সেই জীবন-তরীকে অভাবনীয়রূপে বিপন্ন করিয়াছে।

এই বিপদের দিনে, এই আকুল ক্রন্দনের ব্যর্থতার মাঝখানে, বিধাতার কঠিন নির্যাতনে আমাদের মরুভূমিতে কিঞ্চিৎ বারিপতনের মতো একটু আশ্বাসের উপায় আছে, তাহা সেই মহাকারুণিক ভগবান শ্রীমন্মহারাজের অপার করুণার কিঞ্চিৎ স্মরণ-মনন ও ধ্যান-ধারণা করিয়া। আমরা সেই প্রেম সমুদ্রের কতটুকুই বা আয়ত্ত করিয়াছি বা পারিয়াছি! কিন্তু "পিপীলিকার একটি দানাতেই তৃপ্ত" হইবার মতো আমাদের সেই সামান্যটুকুই যোগ্যলাভ জ্ঞান করিয়া তাহাই জীবনে কার্যে পরিণত করিতে সাধ্যমতো চেষ্টা করিতে হইবে, কেন না আর পাইবার আশা নাই। এবং ইহার ফলে বাকি জীবনে কথঞ্চিৎ আশ্বাস ও শান্তিলাভ করিয়া

অন্তে যে পিতার পবিত্র আবাসে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মহাসিংহাসনোপরি আমাদের হৃদয়রাজ্যের মহারাজ উপবিষ্ট তাঁহারি অপার করুণায় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইব, ইহা নিশ্চয় মনে হয়।

এক একবার ভাবি, মহারাজ তাঁহার আনন্দের নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? বরঞ্চ সেই আনন্দের মূর্তি এবং করুণার নির্ঝর এতদিন কি করিয়া এই শঠতা-প্রবঞ্চনাপূর্ণ শয়তানী সংসারে আমাদের মতো ব্যক্তির উপর করুণায় ছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বরফের কণা গ্রীষ্মকালে কতক্ষণ সাকার থাকে?

ইদানীং মহারাজকে দেখিয়া মনে হইত তিনি সর্বদাই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহটি পর্যন্ত ভাবময় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার আহার বিহার সেই ভাবানুযায়ী হইলেই তাঁহার দেহ ভাল থাকিত এবং একটু ব্যতিক্রম হইলেই তিনি অসুখে পড়িতেন। তাঁহার ভাবের কিঞ্চিৎমাত্র বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইলে দেখিতাম, তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি আনয়ন করিয়া উহা তাঁহার যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। অবশ্য তিনি তাহা, তাঁহার চিরহাস্যরঞ্জিত অধরে বেশ সংবরণ করিয়া থাকিতেন, তবে আমরা উহা কল্পনা করিয়া লইতাম মাত্র। এই জন্য বোধ হয় তিনি পরিচিত ও তাঁহার ভাবরাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সামান্যক্ষণ কথাবার্তা কহিতে পারিতেন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে কোনমতে শতচেষ্টাতেও থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের কিছুদিন পূর্ব হইতে যখন দেখিলাম তাঁহার আর নিজস্ব-ভাব সংরক্ষণ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সকল রকম ব্যক্তিদের সহিতই অবাধে মেলামেশা করিতেছেন—তখনই আমাদের যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জর রক্ষা করিবার বহুপূর্ব হইতেই তাঁহার দেহগত ব্যষ্টিকৃত অমৃতোপম ভাবরাশিকে ক্ষিপ্রগতিতে ছড়াইয়া বিরাট সত্ত্বায় লীন করিতেছিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহার দেহের তিরোধান।

মহারাজ, আজ তোমাকে হারাইয়া দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আমরা বেড়াইতেছি, ইচ্ছা হয় চিৎকার করিয়া কাঁদি, কিন্তু বোধ হয় তোমার নিবিড় স্নেহজাল—সেই অপার ভালবাসার স্পর্শ এখনও আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাই পারিতেছি না। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন আমরা, তোমায় দেখিতে পাইব না, সাধন-ভজনহীন হতভাগ্যদের সে জ্ঞানদৃষ্টি নাই যাহাতে তোমার নিত্যলীলাবিগ্রহ মানসচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হয়। এখন আছে খালি, ভাবিবার—যাহা স্থূলভাবে

তুমি তাহাদের জন্য করিয়াছ। তাহাও অপার অগম্য সমুদ্রবৎ—কতটুকুই বা ভাবিয়া ইয়ত্তা করিবে? আর সূক্ষ্মভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যাহা সাধন করিয়াছ, যাহার জন্য তোমার মধুময় দেহপদ্ম মহাকালীর চরণতলে অর্ঘ্য প্রদান করিলে তাহা তাহাদের নয়নের চির অন্তরালে রহিয়া গেল।

মহারাজের চরিত্রের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। হিমাদ্রির অনন্ত অম্বরস্পর্শী শিখরের ন্যায় সে চির-জ্যোতিষ্মান, চির-অভেদ্য থাকিবেই।

ব্রহ্মানন্দ যেমন মুখে ব্যক্ত করা যায় না, বলিলেই তাহার হীন অবস্থা ঘটে তেমনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিষয় কিছু বলিতে যাইলেই তাঁহাকে অতিশয় নিম্ন করিতে হয়। তিনি কি, বা কেমন ছিলেন, কি করিয়া বলিব? ব্রহ্মানন্দের উপমা ব্রহ্মানন্দ। তবে আমাদের নিকট যে যে ভাবে তিনি পরিদৃষ্ট হইতেন তাহাই কিছুমাত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব, যদিও সে চেষ্টা সফল হইবার কোনরূপ আশা নাই।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন ঃ

"পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

মহারাজকে না দেখিলে এক আধারে এই বিভিন্ন ভাবগুলির সমাবেশ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর, তাহা বুঝিতে পারিতাম না।

যিনি প্রভুর ন্যায় কর্তব্যপালনে শিষ্যকে কঠোর আজ্ঞা দিতেছেন, তিনি আবার কেমন করিয়া তাহারি সহিত বালকের মতো সামান্য কারণে ফষ্টিনষ্টি করিয়া আনন্দ করিতেছেন, তাহা বুঝা সুকঠিন। যিনি গম্ভীর ভাবে 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা' উপলব্ধি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর উপর বীতরাগ হইয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া শাক, কচু, মুলা বেগুন প্রভৃতি তরকারির কথা কহিয়া তাহাদের উপকারিতা বুঝাইতেছেন তাহা ধারণা করা বড় সহজ নয়। যিনি অর্থং অনর্থং জানিয়া কাম-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন তিনি কেমন করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে বুঝাইয়া তাহার ধর্মত সংগ্রহের পন্থা নির্দেশ করিয়া দিতেছেন—ইহা বাহির হইতে অসামঞ্জস্যকর বলিয়াই তো মনে হয়। এই মাত্র যাঁহাকে অতি ধীর গম্ভীর ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিতে দেখিলাম, পরমুহূর্তে তাঁহাকেই প্রগল্ভ বালকের মতো ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বিস্ময় মানিতে হয়।

তাহাদের কষ্টে দুঃখে ভক্তদের জন্য জননীর মতো তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, তাই তখন সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দিয়া তিনি সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জ্ঞানদৃষ্টি সহায়ে বলিয়া দিতেন। স্বাস্থ্যভঙ্গে বা রোগে তিনি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসককেও পরাজিত করিয়া ভক্তদের আহার বিহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাহাদের নিজ নিজ বাড়িতে কোন কার্যাদি হইলে তিনি আপনাকেই যেন তাহার তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করিয়া সে কার্যে যাহাতে বিন্দুমাত্র অনুষ্ঠানেরও ব্যতিক্রম না হয় তাহার জন্য যত্নবান থাকিতেন। আবার নিয়মিত কর্তব্যের অবহেলায় বা কোন কারণে মনের হীনতা দেখিলে তাহা সংশোধনার্থ তাঁহার মতো তীব্র তিরস্কার কাহারও নিকট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেশি বলিতেন না—অল্প দু-একটি কথা যাহা বলিতেন, তাহা ব্যক্তিগতভাবেই বলিতেন এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইত। আমরাও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বেশি কথা বলাইবার চেষ্টা করিতাম না, কারণ দেখা যাইত ঈশ্বরীয় কথা কহিবার পরই তিনি কেমন গম্ভীর হইয়া এক কালে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে থাকিতেন। আমরা তখনকার মতো তাঁহার অপূর্ব প্রাণমনমত্তকারী সাহচর্য হারাইতাম। “জীবের কর্তব্য কি” প্রসঙ্গে বহু পূর্বে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, “সাধন-ভজন মন কর তাঁর নিরন্তর।” সেইরূপ মিষ্টসুরে, বালকের ব্যাকুলতায় ভগবানের স্তব আমি আর কোথাও শুনি নাই। উহা শ্রবণমাত্রে অতি অভক্তেরও প্রাণমন আকৃষ্ট হইয়া ক্ষণেকের জন্যও বোধ হয় শ্রীভগবানের চরণে ন্যস্ত হইত।

নাটক রচনার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটি সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়া আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম মহারাজ এ বিষয়ও কেমন করিয়া আয়ত্ত করিলেন! বড় বড় নাট্যরথীর নিকট বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু এত অল্প কথায় উহার সুগভীর তত্ত্ব কেহ আমায় কখন বলেন নাই—আমার বিশ্বাস সে তত্ত্ব তাঁহারাও জানেন না। কোন সময়ে বিবাহের ঘটককে তাহার নিজ কর্মের অনুকূলজনক কথাবার্তা মহারাজকে শিখাইয়া দিতে শুনিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। হাস্যরসের সৃজন করিতে তাঁহার মতো আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি আনন্দময় জগতের রাজরাজেশ্বর ছিলেন সুতরাং মর্তবাসীর নিকট সেই মহামূল্য স্থানের কিঞ্চিৎ কণা ছড়াইয়া দেওয়া আর তাঁহার পক্ষে বিচিত্র কি! অতি বিচক্ষণ দক্ষ মালির মতো বৃক্ষাদির রোপণ ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে মহারাজের কি অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তিরই পরিচয় পাইয়াছি!

শুধু বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কেন, জীবজন্তু প্রভৃতিরও বিষয়ে ঐরূপ। পশু-পক্ষী লইয়া তাঁহার খেলা যিনি চক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন তাহাদের উপরও সেই রাখালরাজের কি গভীর সহানুভূতি ও স্নেহ ছিল। বুঝি ইহাদেরও আহার বিহারের জন্য তিনি সচেষ্ট ও চিন্তিত থাকিতেন!

গৃহাদি নির্মাণ সম্বন্ধেও মহারাজের জ্ঞান বড় অল্প ছিল না, তাহার ন্যায় সুদর্শন মনোহর, বাটীর নক্সা প্রস্তুত করাইতে আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিব না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যিনি অদ্বিতীয় সত্য, নিত্যবিরাজিত শিবসুন্দরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার প্রত্যেক কর্মেই যে চরম দক্ষতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি! আমরা তাঁহার কটা দিকই বা দেখিয়াছি বা দেখিলেও তাহা যথাযথ বলিতে পারি!—এইরূপ সাংসারিক এবং পারমার্থিক প্রত্যেক ব্যাপারে মহারাজের বিরাট শক্তি লোকহিতৈষণায় শতধা বিভক্ত হইয়া প্রতিদিনই অবিরাম ধারে ছুটিত—সে ধারা নির্মল, মধুময়, ছন্দের গতিতে নৃত্য করিয়া চলিত; তাহাতে ছিল, কেবল ঝঙ্কার ভগবদ্ভক্তি, ভালবাসা এবং অহেতুকী কৃপা।

তাঁহার শ্রীমুখে বার বার শুনিয়াছি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—যাহা কিছু সমুদয়ই সেই ব্রহ্ম, তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি স্বয়ং সেই ব্রহ্মানন্দের ঘনীভূত মূর্তি ছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয় জগতের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বকথা তাঁহার অগোচর ছিল না, তিনিও তাহা অকাতরে আপামর সাধারণকে বিলাইয়াছেন।

তাঁহার শ্রীমুখে আমি শেষবাণী শুনিয়াছি, "তোরা ভগবানকে ভুলিস না।" আর কেহ কিভাবে ইহা লইবেন জানি না, তবে আমার মনে হয় তিনি যেন এই বাক্যে ভগবান যে আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় এই অর্থটিই পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন পরমাত্মীয় তাঁহার আত্মীয়ের উপাসনা বা আরাধনা ব্যতীতও কল্যাণ কামনায় সচেষ্ট থাকেন এবং প্রার্থনা করেন—মাত্র তাহার স্মরণ-মননটুকু—সেইরূপ ভগবান বুঝি আমাদের তৎসম্বন্ধে বিস্মৃতি না ঘটিলেই পরম সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন। ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে তাঁহার বহুদিন পূর্বের প্রথম বাণী "সর্বদাই সাধন-ভজন করিবে" এবং শেষ বাণী "ভগবানকে ভুলিস না।" (অবশ্য যাহা আমি শুনিয়াছি)। শেষ কথাটি বলিবার সময় তাঁহার কথা কহিবার শক্তি লোপ হইয়া আসিতেছিল এবং অতি কষ্টে তিনি উহা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা কদাচ যেন সেই চিরকিশোর রাজা মহারাজের এই বহু

কষ্টে উচ্চারিত শেষ কথাটি না উপেক্ষা করি। ইহা দুর্দান্ত ও ভ্রান্ত জীবের প্রতি তাঁহার চরম ও পরম ছাড়পত্র। তাঁহার অপার ক্ষমাগুণ ও ভালবাসার পরিচয় দিতে যাইলে, চক্ষু আপনি অশ্রুপূর্ণ হয় এবং বাক্য রোধ হইয়া আসে।

যিনি মহারাজকে দেখিয়াছেন তাঁহারই ধারণা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বজ্ঞ। তিনি দেশ কাল পাত্রের অতীত অবস্থায় থাকায় ত্রিগুণরহিত হয়েন এবং তাঁহার স্বভাব পঞ্চবর্ষীয় বালকের মতো হয়। হে পরম পুরুষ, যতদিন এই পাপপূর্ণা মেদিনী পবিত্র করিয়াছিলে ততদিন তোমার কোন সেবা করিতে পারি নাই, তোমাকে হারাইয়া তোমার পাদপদ্মে আজ অশ্রুসিক্ত ভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

পতিতপাবন স্বামী ব্রহ্মানন্দ

তারাসুন্দরী দাসী

ছেলেবেলা থেকেই থিয়েটার করি। নটগুরু মহাকবি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের অধীনে অধিকাংশ সময়েই কাজ করিয়াছি। ছেলেবেলা থেকেই গিরিশবাবুর মুখে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কথা শুনিতাম। গিরিশবাবুর সংস্পর্শে যে থিয়েটারই আসিয়াছে, সেই থিয়েটারেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি করিয়া ছবি থাকিত। আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সকলেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইবার পূর্বে ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করিতাম এবং এখনও বোধ হয় বাঙ্গালীর সকল থিয়েটারে এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

এইরূপে বাল্যকাল হইতেই আমরা ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং বেলুড় মঠে উৎসবাদি দর্শনে সময় সময় বড়ই ইচ্ছা হইত। একবার গিরিশবাবুকে বলিয়াছিলাম, তিনি যদি অনুমতি করেন—উৎসব দেখিয়া আসি। বেশ মনে আছে, সে সময় গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, ‘‘এখন নয়—ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয়, পরে যেও।’’ এই জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও কখনো মঠে যাই নাই।

তারপর প্রথম মঠে গেলাম—সে বোধ হয় আজ ছয় বৎসর পূর্বে (১৯১৬ সাল)। মন বড় খারাপ, অশান্তি—অশান্তি, কিছু ভাল লাগে না, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। নানা তীর্থে দেবালয়ে যাই—সংসার ক্রমশ বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন মনের অবস্থা—একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বেলুড় মঠে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন, শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী—বাঙ্গলা নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। অতি শৈশবে যখন সাত বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইনিই আমায় নাট্যশালায় লইয়া যান—মঠেও ইনি আমার প্রথম সঙ্গিনী।

যখন মঠে গেলাম, তখন প্রায় দুপুর উত্তীর্ণ হইয়াছে—মহারাজ সেবা-অন্তে বিশ্রাম করিতে যাইবেন—আমরা উভয়ে প্রণাম করিলাম। মহারাজ দেখিয়াই বলিলেন, ‘‘এই যে বিনোদ, এই যে তারা—এসো এসো, এত বেলা করে

এলে—মঠের খাওয়া দাওয়া যে হয়ে গেছে—আগে একটু খবর দিতে হয়, তাইতো—বস বস।” দেখলেম আমাদের জন্য বড় ব্যস্ত। তাঁহার আদেশে তখনই প্রসাদ আসিল। লুচি ভাজাইবার ব্যবস্থা হইল। আমরা ঠাকুর প্রণাম করিয়া মঠে প্রসাদ পাইলাম। মহারাজের আর তখন বিশ্রাম গ্রহণ করা হইল না, একটি সাধুকে ডাকাইয়া বলিলেন, “এদের সব মঠের কোথায় কি আছে দেখিয়ে দাও।” পরে পরিচয় হইলে জানিলাম যে সাধু আমাদের মঠ পরিদর্শন করাইলেন, তাঁহার নাম স্বামী অমৃতানন্দ।

সাধু সন্ন্যাসীকে ছেলেবেলা থেকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ভয়টাও ছিল খুব বেশি। অপবিত্রা, পতিতা—কি জানি যদি কোন অপরাধ হয়, তাই প্রথমে আমি সঙ্কোচে, ভয়ে ভয়ে মহারাজের চরণ ধূলি লইয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজের কথায়, তাঁহার ব্যবহারে, আমাদের জন্য তাঁহার ব্যস্ততায়, তাঁহার যত্নে সে ভয় সঙ্কোচ কোথায় উড়িয়া গেল! মহারাজ বলিলেন, “এসো না কেন?” আমি বলিলাম, “ভয়ে মঠে আসতে পারি না।” অতি আগ্রহের সহিত মহারাজ বলিলেন, “ভয়—ঠাকুরের কাছে আসবে, তার আর ভয় কি? আমরা সকলেই তো ঠাকুরের ছেলে-মেয়ে—ভয় কি! যখন ইচ্ছা হবে এসো। মা, তিনি তো খোলটা দেখেন না—ভেতরটা দেখেন। তাঁর কাছে তো কোন সঙ্কোচ নাই।” স্বামী প্রেমানন্দ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “ঠাকুরের কাছে আসতে কারুর বাধা নাই।”

বৈকালে চা খাইয়া মঠ হইতে ফিরিলাম। আসিবার সময় মহারাজ বলিলেন, “মাঝে মাঝে এসো, আজ বড় কষ্ট হলো, একদিন ভাল করে প্রসাদ পেও।” এই আমার প্রথম দর্শন—এই আমার প্রথম বন্ধন।

ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ একদিন ‘রামানুজ’ দেখিতে যান। অভিনয় শেষ হইলে আমি মহারাজের পায়ের ধূলি লইলাম—মহারাজ আশীর্বাদ করিলেন; বলিলেন “বেশ বেশ, খুব ভক্তি বৃদ্ধি হোক!” কৃতার্থ হইলাম।

দিন যায়—আমিও কিন্তু পূর্বের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই—কিছুতে শান্তি পাই না। কি যে জ্বালা—আশ্রয় নাই, জুড়াইবার স্থান নাই—সব শূন্য—সব শূন্য! জগন্নাথের দর্শন লালসায় পুরী যাত্রা করিলাম। পথে ভুবনেশ্বর ধর্মশালায় আছি, শুনিলাম মহারাজ ভুবনেশ্বরের মঠে আছেন—দেখিতে গেলাম। মহারাজের সেই আদর, সেই যত্ন, সেই আগ্রহ—কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন! বলিলেন—“একি রোদ্দুরে যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে—

এসেছো শরীর সারাতে, রোদ্দুরে বেরুলে কেন? ... কোথায় খাও? কাল থেকে মঠ হতেই প্রসাদ যাবে। কি খেতে ভালবাস! আর মা, আমরা সাধু সন্ন্যাসী ফকির—কি বা এখানে পাওয়া যায়!" এমনি আরও কত কথা! আমি তো একেবারে অবাক—একি সাধু! পরম গৃহী, পরম মায়াজীবীও যে তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য এমন উতলা হন না! কে আমি?—সমাজের কোন্ স্তরে আমার স্থান—কত—কত নিম্নে—ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া জগতের কাছে যার প্রাপ্য আর কিছুই নেই—না বন্ধু, না পিতা, না আত্মীয়—এত বড় সংসারটা—এ যেন একটা পরের বাড়ি। স্বার্থ ভিন্ন কেউ কথা কয় না, ফিরেও চায় না—জগতে আপনার বলতে কেউ নাই। আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্বপূজ্য, সর্বমান্য মহারাজ কি আকুল আগ্রহে, কি অকৃত্রিম স্নেহে, কি অপ্রত্যাশিত যত্নে আমাকে আপনার করিয়া লইলেন! বাপকে কখনও দেখি নাই—শুনিয়াছি যখন আমি মাতৃগর্ভে তখন বাবা মারা যান। মনে হইল—এই কি বাপের স্নেহ, না এ তার চেয়েও বেশি আর কিছু? চোখের জল রাখিতে পারিলাম না—সারা জীবনের আক্ষেপ যেন অশ্রুধারার সঙ্গে সঙ্গে গলিয়া মাটিতে পড়িতে লাগল! মনে হইল, এই তো জুড়াবার স্থান, এই তো এমন একজন দরদী আছেন—যাঁর কাছে আমি পতিতা নই, অস্পৃশ্যা নই, ঘৃণিতা নই। মহারাজের মেয়ে আমি—যার কেউ নাই তার আপনার জন—ঐ আমার মহারাজ, ঐ আমার পিতা, আমার স্বর্গ, আমার শান্তি, আমার ভগবান। জ্বালা জুড়াইল, মহারাজ কত কথা বলিলেন—কত—সব মনে নাই। কিন্তু যা মনে আছে তাই এখন আমার জীবনের সম্বল। বলিলেন, "মা বুঝতেই তো পারছ, দেখছ তো সংসারে কত জ্বালা! আমাদেরও যে ও রকম হয়নি, তা মনে করো না। যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যাই, বয়স অল্প—জপতপ করি, কিন্তু সব সময় শান্তি পাই না—মনে কত কথা উঠে বুঝতেই তো পারছ—চারিদিকের আকর্ষণ—জ্বালা। সময় সময় ভাবি, কই আনন্দ তো কিছু পেলাম না! একদিন এই রকম বসে ভাবছি, মনে করছি, এখান থেকে পালাব আর ঠাকুরের সঙ্গে দেখাও করব না। দেখলেম সম্মুখে ঠাকুর বললেন—'কি ভাবছিস—বড় জ্বালা— নয়?' আমি নিরুত্তর। ঠাকুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। জ্বালা কোথায় গেল! কি আনন্দ! কি আনন্দ!" আমারও মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল, "বাবা, আমার তো বড় জ্বালা—বড় তাপ—সহ্য করতে পারছি না, ছুটে ছুটে বেড়াই, ঠাকুরের মতো আমারও জ্বালা জুড়িয়ে দিন।" স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুরকে ডাক মা, কোন ভয় নেই—

তিনি তো এই জন্যই এসেছিলেন—নাম কর—প্রথমটা দু-দিন, একটু কষ্ট হবে, তারপর ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন—কোন ভয় নেই মা, কোন ভয় নেই। দেখবে—বড় আনন্দ হবে, বড় মজা হবে।"

শুনিয়াছি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ ঠাকুর আমাদেরই মতো পতিতকে উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন—আজ প্রত্যক্ষ করিলাম—মহারাজের অহেতুকী কৃপা—ঘৃণা বিদ্বেষ-শূন্য কৃপা। আমার মতো পতিতার জন্যই যেন আসিয়াছিলেন—কোন ভয় নেই মা, ঠাকুরের ছেলে-মেয়ে ভয় কি! কি আশ্বাস বাণী, কি সান্ত্বনা—যেন পা বাড়াইয়া বলিতেছেন, "ওরে কে কোথায় পতিত আছিস, কে তাপিত আছিস আয়, আশ্রয় নে, ভয় কি—ঠাকুর আছেন।"

ঠাকুর করুন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ মহাবাক্য যেন না ভুলি!

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণে

সরলাবালা দাসী

২৭ চৈত্র—সোমবার, শুক্লাত্রয়োদশী। ত্রয়োদশী শুভযাত্রায় সর্বসিদ্ধি যোগ, এই শুভযোগে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নিত্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। প্রিয়জনের অশ্রুজলে শীতল, চন্দনগন্ধে সুবাসিত, পুষ্পদলে আবৃত পথে রাখাল মহারাজ তাঁহার নিত্যলীলার সখাগণের প্রেমের আহ্বানে ও তাঁহার প্রাণ-প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত একান্ত মিলনের আগ্রহে ত্বরিত-গমনে চলিয়া গিয়াছেন—ব্রজের রাখালের সেই নিত্যছন্দে গতিলীলার নূপুরধ্বনি এখনও আমাদের হৃদয়ে বাজিতেছে। এখনও সে মধুরধ্বনি যেন আমাদের শুনাইতেছে, "ফুরায় নাই, ফুরায় না, ফুরাইবার নয়।"

ঠাকুরের তিনি আদরের দুলাল। তাঁহার কিশোর জীবনের প্রারম্ভ হইতে নিত্যধামে প্রয়াণের দিন পর্যন্ত সমগ্র জীবনটী নব বিকশিত পুষ্পের ন্যায় সমভাবেই নবীন ছিল। বর্ষচক্রের বহু আবর্তনে সে অম্লান-তারুণ্যে একটিও রেখাপাত করিতে পারে নাই। যেমন শিশুসুলভ সরল নিঃসঙ্কোচে তিনি তাঁহার গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন, "তামাক সাজতে আমি পারব না, মশাই," যেমন শিশুর মতো নিঃসঙ্কোচে তাঁহার কোলে উঠিয়া স্তন পান করিতেন—সেই সরলতা ও সরসতায় তাঁহার জীবন চিরদিন মধুর রসে ভরপুর ছিল। সন্ন্যাস জীবনের কঠোর সাধনা, পাণ্ডিত্য, কর্মপথের বাধার আঘাত ও লোকপ্রতিষ্ঠা—কোন কিছুই তাঁহার চিরসরস চিত্তে নিমেষের জন্য নীরসতা আনিতে পারে নাই—আদরের দুলাল হইয়া তিনি জগতে আসিয়াছিলেন এবং আদরের দুলাল হইয়াই তিনি চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন। এ আগমন ও গমন জন্মমৃত্যু নয়, এ কেবল নৃত্যকারী ব্রজবালকের প্রেমের খেলার লুকোচুরি মাত্র।

ত্যাগের পথ কঠিন, এ কথা চিরদিন সকলে জানিয়া ও মানিয়া আসিতেছে। কিন্তু আগে কি কেহ জানিত ত্যাগের পথে এত সরসতা, এত মধুরতা আছে? ভোগ লালসায় লোকে চিরদিন লুব্ধ হইয়াছে, কিন্তু ত্যাগের অতি মনোহর

লোভনীয় আদর্শ এমন ভাবে আগে কি জগতের চিত্র আকর্ষণ করিয়াছে? সন্ন্যাস মায়াবাদের কঠোরতায় নীরস—ইহাই সকলে জানিত। কে জানিত যে সন্ন্যাসই সেই পরম প্রেমের নির্মল উৎস, যে উৎস স্বার্থের, ব্যক্তিত্বের, অথবা পারিবারিক কোন বন্ধনেই রুদ্ধ সলিলের মতো কলুষিত হয় না। দীনে দয়া, দরিদ্রে ভিক্ষাদান এই কথাই লোক এতদিন জানিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দীনের সেবা ইষ্টপূজা, একথা কে জানিত? কে জানিত যে ভিক্ষাদান বলিয়া কোন কথা নাই, আছে কেবল ভাইয়ের ভাইকে হৃদয়ে ধারণ? এবম্বিধ মহাপ্রেমের অভিযানের যিনি অগ্রগামী সেনাপতি হইবেন তাঁহার হৃদয় যে উপাদানে সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন ঠাকুরের কি তাহা অজ্ঞাত ছিল? তাই তিনি ব্রজের রাখালকে জগতে আনিয়াছিলেন।

এই মহাপ্রয়াণ স্মরণে মন, যে ভাবে অভিভূত হয় ভাষা কি তাহা ব্যক্ত করিতে পারে? মানবচিত্ত সততই দুঃখ-শোকে জর্জরিত, দুঃখ-শোকের পরপার আনন্দের রাজ্য সে কেবল ক্ষণিকের স্বপ্ন।

যদি আজ আমাদের ন্যায় দীন চিত্তের এই মহাপ্রয়াণে জগৎ অন্ধকার মনে হয়, তাহা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। "একে একে নিবিছে দেউটি" ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই আনন্দের লীলা নিকেতন—সে যে নিত্যলীলার কেন্দ্র, শোকের আঘাতে এ কথা আমরা সততই ভুলিয়া যাই। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেমময় জীবন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী প্রেমানন্দ কাহার কথাই বা না আজ মনে জাগিতেছে।

এক আঘাত সকল আঘাতের বেদনা নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলে। তথাপি বার বার মনে হইতেছে আমরা ধন্য, আমরা কৃতার্থ, কাম-কাঞ্চনের ক্লেদমুক্ত এই অপূর্ব পবিত্র প্রেম সাধনা, সজীব বিগ্রহরূপে—ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করিবার ভাগ্যলাভ করিয়াছি।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ব্যক্তিত্ব

শ্রীঅনন্ত

"শান্তো মহান্তঃ নিবসন্তি সন্তঃ বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ॥"

(বিবেকচূড়ামণি, ৩৭)

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়তম মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বীয় অলৌকিক সাধনা ও পবিত্রতা সহায়ে তমোহীন আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে স্বয়ং অবগত হইয়া, অহেতুক কৃপা প্রদর্শনে মানবকে তাহার সন্ধানদানকরত অধুনা স্ব-স্বরূপে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ ধর্মবীর মহাপুরুষের স্থূল রূপ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল শক্তি অন্তর্হিত হয় না—সূক্ষ্মরূপে উহা মানব হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় চিরদিন উজ্জ্বল থাকিয়া তাহাকে সংসার-সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ করিতে সাহায্য করে। এই জড়বাদসর্বস্ব বর্তমান যুগে যখন মানব পার্থিব সুখকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তল্লাভের চেষ্টাতেই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছে, তৎকালে শ্রীশ্রীমহারাজের অপূর্ব আধ্যাত্মিকজীবন সেই পথহারা মানবগণের নিকট উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভস্বরূপ। তিনি একাধারে যেরূপ মহাকর্মী, সেইরূপ মহাভক্ত ও জ্ঞানী ছিলেন। এই তিনটি ভাব যে পরস্পর অবিরোধী এবং এই ত্রয়ী যে একই ক্ষেত্রে অবিরুদ্ধভাবে অবস্থানপূর্বক মানবজীবনকে পরিপূর্ণতর করিতে সক্ষম—ইহা আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীবনে দেখিয়াছি। আর দেখিয়াছি, কিরূপে মানব ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, ভগবদারাধনায় নিমগ্ন হইয়া কিরূপে সাধক জগৎ ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু দেহজ্ঞান পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যায়, মোহিনী মায়া ও অণিমালঘিমাদি ঐশী সম্পদও কিরূপে সিদ্ধজীবনকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না এবং কিরূপে সার্বজনীন প্রেম মানব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, অসংখ্য বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়কে অত্যদ্ভুত ভালবাসায় আকর্ষণপূর্বক তাহাদিগকে একই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করাইতে সক্ষম। তদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে

"ব্রজের রাখাল" বলিয়া নির্দেশ করিতেন, তাই তাঁহার কৌমার বয়সে অত্যদ্ভুত বালক ভাবের, যৌবনে সাধক ভাবের এবং উত্তর জীবনে গুরুভাবের অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও এই বালকের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেমসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল অন্য কোন শিষ্যের সহিত শ্রীগুরুর ঐরূপ গভীর প্রেমসম্বন্ধ ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শ্রীগুরুর দেহান্তে এই বালক স্থির, ধীর ও সংসার-বিরক্ত হইয়া সমস্ত পার্থিব সুখকে তুচ্ছজ্ঞানপূর্বক কোন অপার্থিব সুখের সন্ধানে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কখনও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ, কখনও বা আকাশবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অবস্থান, কিছু জুটিলে আহার—নচেৎ উপবাস। বৃন্দাবনধামে তপস্যাকালীন ব্রাহ্মমুহূর্তে কুটীর হইতে বহুদূরে কোন নির্জন স্থানে গমন করিয়া তথায় সমস্তদিন গভীর ধ্যানান্তে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষান্নে উদর পূরণ—অথবা তদভাবে আকণ্ঠ যমুনাবারি পান করিয়া তিনি ক্ষুন্নিবারণ করিতেন।

শুনিয়াছি—সাধক জীবনে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিবা রজনীর অধিকাংশ সময় শুদ্ধ ধ্যান-জপে অতিবাহিত হইত। বহুবর্ষব্যাপী এইরূপ কঠোর ও গভীর সাধনাদ্বারা তিনি অনুভূতির কোন উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা আমাদের সাধ্যাতীত। কারণ জহুরিই একমাত্র জহর চিনিতে সক্ষম। শ্রীশ্রীমহারাজের তুল্য আর একজন মহাপুরুষ বর্তমান থাকিলে তিনি বলিতে পারিতেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে।

স্বামী বিবেকানন্দ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"রাখাল spiritualityতে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার আচরণে সম্যক প্রকাশ পাইত। তিনি অন্যান্য গুরুভ্রাতা অপেক্ষা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন। বেলুড় মঠ পরিচালনার নিমিত্ত তৎকর্তৃক যে নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একমাত্র শ্রীশ্রীমহারাজ ব্যতীত অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণকে তাহার অতি সামান্য নিয়মটিও মান্য করিয়া চলিতে হইত। অতি লঘু কর্মও স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত তিনি কখনো অনুষ্ঠান করিতেন না। মঠের নির্মাণ কার্য শেষ হইবার পর, উহার সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"রাজা, আজ হতে এ সমস্ত তোর। আমি কেউ নই।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকেই উহার সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও আজীবন ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের উপর স্বামী বিবেকানন্দের যে কতদূর বিশ্বাস ছিল তাহা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের নিকট শুনিয়াছি। স্বামীজী বলিতেন—"সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিলেও, রাখাল ও হরিভাই আমাকে কখনো পরিত্যাগ করিবে না।" অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণও তাঁহাকে যে কি শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন তাহা যাঁহারা সচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বলিতে পারেন! স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশ তাঁহারা শ্রীগুরুর আদেশ তুল্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা বলেন—মহারাজের ভিতর আমরা যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইতাম—অনেক সময় তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়াই ভ্রম হইত। ঐরূপ ভাবই যে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তাঁহাদের এতদূর শ্রদ্ধাভক্তি করিবার একমাত্র কারণ, তাহা আর বলিতে হইবে না।

গুরুভ্রাতাগণের ন্যায় শিষ্যবর্গের হৃদয়ও তিনি এক অত্যদ্ভুত ভালবাসায় জয় করিয়াছিলেন। সে ভালবাসা কত গভীর, উহার বেগ কত প্রখর, তাহার আকর্ষণী শক্তি কত তীব্র তাহা যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন, জনক-জননীর স্নেহও সে ভালবাসার নিকট তুচ্ছ বোধ হইত। সে ভালবাসায় কত তৃপ্তি, কত শান্তি, কত আনন্দ তাহা অনুভবযোগ্য, ভাষায় বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার চক্ষের একটি চাহনি হৃদয়ে পুলক সঞ্চার, মুখের একটি বাণী কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ এবং অঙ্গের একটি স্পর্শ হৃদয়ে আনন্দের তুফান তুলিত। উত্তরকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীবনে গুরুভাবের বিকশিত শতদলপদ্মের পুণ্য সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া—কত মধুপ যে তাহার চতুর্দিকে আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন তখন সেই স্থানে নর নারী এবং বালক বৃদ্ধ ও যুবক ভক্তে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত।

তত্ত্বান্বেষিগণকে একই শিক্ষা-যন্ত্রে ফেলিয়া সমভাবে তিনি সকলকে গঠন করিতেন না; তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী বিভিন্নমার্গে একই লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করিতেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ধর্মজগতে এরূপ শিক্ষা পদ্ধতি একমাত্র ভারতেরই নিজস্ব। সাধারণত আমরা দেখিতে পাই—প্রত্যেকের মনোগত ভাব, চিত্তের ঐকান্তিকতা, বিষয়ভেদে মনের দক্ষতা অন্য হইতে বিভিন্ন। কাহারও সাহিত্যে বা ইতিহাসে, কাহারও গণিত শাস্ত্রে বা বাণিজ্যে এবং কাহারও হয়ত ব্যবহার শাস্ত্রে বা সমর নীতিতে অনুরাগ প্রবল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মনোগত ভাবানুযায়ী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইলে

সে অচিরেই তত্তৎ বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া সংসার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যদি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকে গণিত শাস্ত্র বা বাণিজ্যানুরাগীকে সমর নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে বিষয়ভেদে তাহার মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি লাভের পথ তো চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবেই, অধিকন্তু শিক্ষিতব্য বিষয়ে বিরাগজন্য সে তাহাতেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তদ্রূপ। গুরু শিষ্যের মনোগত ভাব না বুঝিয়া তাহাকে তাহার অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে শিষ্যের উন্নতি লাভের পথও চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য গুরু, যিনি শিষ্যের সমস্ত পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা ভারতেতর দেশ হইতে চিরকালই অধিক বলিয়া উহার আধ্যাত্মিক জীবন সমধিক সতেজ ও সরস। শ্রীশ্রীমহারাজ ভারতীয় ঋষিগণের চিরানুচারিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যবর্গকে তাহাদের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী—যাহার প্রবলকর্মানুরাগ তাহাকে লোকহিতকর নিষ্কাম কর্মে, যাহার শাস্ত্রানুরাগ তাহাকে শাস্ত্র পাঠে, যাহার ধ্যান-জপ বা পূজার্চনায় তাহাকে তাহাতেই উৎসাহ দান করিতেন। কিন্তু যাহাতে তাঁহার শিষ্যবর্গ সকলেই সাধনার গভীর সলিলে নিমজ্জিত হইয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক জীবন লাভে সক্ষম হয় ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ছিল।

আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"কিছু কর, কিছু কর, না খাটলে কি কিছু হয়? তোরা ভাবছিস, যে আগে অনুরাগ ভক্তি হোক তারপর ডাকবো, তা কি কখনও হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে। তাঁকে আনবার জন্যই তপস্যা; তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, তপঃ তপঃ তপঃ। দেখছিস নি, অবতার পুরুষদের পর্যন্ত কত খাটতে হয়েছে। কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য এদের কত তপস্যা করতে হয়েছিল। কি ত্যাগ, কি তপস্যা! এই তো বয়স, বুড়ো মেরে গেলে আর হবে না! লাগ দেখি, একবার জোর করে। দেখবি মনের সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগ, লাগ, জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয়—সবই সমান, একটা ধরে ডুবে যা।"

পূর্বেই বলিয়াছি স্বামী ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন উচ্চ মণিকোঠায় সর্বদা অবস্থান করিতেন তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। স্তিমিত পদ্মার প্রশান্ত

বক্ষ দেখিয়া কেহ যেরূপ কল্পনা করিতে পারে না উহা কত ভীষণ, উহার বেগ কত তীব্র; শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনের বাহ্যিক প্রকাশ দর্শনে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতির গভীরতা নির্ণয় করিতেও আমরা তদ্রূপ সম্পূর্ণ অপারগ। তাঁহার বালসুলভ ব্যঙ্গ কৌতুক, অদৃষ্টপূর্ব সরলতা, চপল হাস্য, অপূর্ব দীনতা দর্শনে কেহ ধারণাও করিতে পারিত না—ইনিই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম মানসপুত্র শ্রীযুক্ত রাখাল—স্বামী বিবেকানন্দের আদরের ধন—"রাজা" এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র কর্ণধার "স্বামী ব্রহ্মানন্দ"।

শ্রীশ্রীমহারাজ দয়া, করুণা ও ক্ষমার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। যে কোন পাপী তাপী একান্ত সরল মনে তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে তিনি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। এমনকি সেই মহাপুরুষ বারবণিতাগণকেও শ্রীচরণে স্থান দিয়া তাহাদিগকে ভবভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ বিচারশূন্য দয়া তাঁহার মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বরং সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছে। জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের জীবনেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভগবান বুদ্ধের বার-বিলাসিনী অম্বাপালীকে কৃপা প্রদর্শন, যিশুখ্রীস্টের পতিত চরিত্রদিগকে পদাশ্রয় দান এবং শ্রীচৈতন্যের জগাই মাধাইকে উদ্ধারকরণ ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জগতেই যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে। পার্থিব জগতেও তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। কেহ মামলা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইতে আসিয়াছে, তিনি তাহাকে একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞের ন্যায় পরামর্শ দান করিতেছেন; কাহাকেও বা গৃহনির্মাণ কার্যে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের মতো সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বলিতেছেন; আবার কাহারও পীড়া হইয়াছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগতের এরূপ সর্বজ্ঞান সম্পন্ন গুরুভাব তদীয় আচার্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্য কোন মানবে আমরা দেখিতে পাই না। একদিনের নিমিত্তও যে, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, বারেকের জন্যও যে তাঁহার সদানন্দময় রূপ দর্শন করিয়াছে সে কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তাঁহার অপার স্নেহে জননীর স্নেহ ভুলিয়াছিলাম, তাঁহার আশ্রয়ে জগতের ভীষণতা অন্তরে স্থান পাইত না। রাজাধিরাজ পিতার ক্ষমতা সন্তান যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীশ্রীমহারাজের নিবিড় ভালবাসা আমাদিগকে তাঁহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে দেয় নাই। আমরা জানিতাম না তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের কত বড় রাজা,

ভাবিতাম না শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যিনি সর্বময় কর্তা, শুধু জানিতাম তিনি আমাদের জনক জননী, ইহ-জগতের একমাত্র আশ্রয় স্থল।

হে পরমাশ্রয়, তোমাকে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত বিগ্রহ মনে করিয়া তোমার অপার স্নেহে মুগ্ধ থাকিতাম—"ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকং বিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি।"—তুমিই আমাদের পিতা, তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিতেছ।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীঅপরেশ চন্দ্র

প্রায় আটাশ বৎসর পূর্বেকার কথা, মঠের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কেন জানি না, কি কারণে মনে নাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়ভক্ত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সহিত মঠে যাই। তখন এই মঠ বরাহনগরের আলমবাজারে। যৌবনের প্রথম উন্মেষ। সবল সুস্থদেহ, ততোধিক সুস্থ ও সবল মন। সংসারের কোনো চিন্তা নাই, বিশেষ বন্ধন নাই। শতমুখ-প্রসারী কল্পনা, রঙীন ডানা মেলিয়া মুক্ত আকাশের দিকে ছুটিয়াছে। কত আশা, কত সুখ স্বপ্ন। মঠে গেলাম ভাগ্যবশে মহারাজেরা চরণ ধূলিও দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ আজ কোথায়? উৎসবে, পালে পার্বণে মঠে যাই, মহারাজদের তামাক সাজি, কত গল্প করি, ফাই ফরমাস খাটি, আর কি জানি কেন একটা বিপুল আনন্দে প্রাণ মাতিয়া উঠে। —কখন-কখন গিরিশবাবুর নাটক হইতে কোনো কোনো অংশের আবৃত্তি করি, মহারাজেরা হাসিয়া আকুল, আমি আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল! এমনি গতায়াত, এমনি মেলামেশা। কত রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়াছি, পঞ্চবটী তলায়, নহবৎ খানায়, গঙ্গার ধারে পোস্তার উপরে—ঠাকুরের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের কথা—তখন বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে জগৎ তোলপাড়। মাথার উপর মুক্ত আকাশ, সম্মুখে কলনাদিনী পূত প্রবাহিনী জ্যোৎস্নাস্নাতা ভাগীরথী, আর চারিদিকে ফোটা ফুলের আকুল করা গন্ধ। উচ্চে উচ্চে, কত উচ্চে মনকে ছাড়িয়া দিতাম, হায় সেদিন—আর আজ?

একটা কথা আছে, কল্পতরু মূলে যে যা চায়, সে তাই পায়। —কি চাহিয়াছিলাম? মনের অগোচরে তো পাপ নাই। যাহা চাহিয়া ছিলাম, ঠাকুর অকৃপণ করে তাহাই দিয়াছেন, যাহার কণ্টক বেষ্টনী আজ অসহ্য, যাহার দংশন জ্বালাময়, যাহার অস্তিত্ব সর্বসুখ হয়। থিয়েটারের দলে মিশিলাম। তাহার পর মঠ হইতে, দক্ষিণেশ্বর হইতে, মহারাজদের চরণ প্রান্ত হইতে ধাপে ধাপে

অকুতো-সাহসে, ধীর অবিচলিত পাদক্ষেপে, অন্ধকার সংসার গহ্বরের ক্রমনিম্নস্তরে নামিতে লাগিলাম। বিষম রোগ। মঠ— আর সেদিক মাড়াই না। চোরের মতো লুকাইয়া এক আধ বছর হয়তো বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখিয়া আস্তানায় ফিরি। দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে। অনুকূল বাতাসে ঘুড়ি তখন তর তর করিয়া আকাশে উঠিয়া বুঁদ হইয়া গিয়াছে। আমি তখন সর্ব বিষয়ে পুরা থিয়েটারওয়ালা।

বার চৌদ্দ বৎসর এইভাবে কাটিল। একদিন—সুহৃৎ কি দুশমন জানি না—মতিলাল (শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল) বলিল "হাঁ হে, তুমি আর মঠে যাও না কেন?" নিজের কাছে নিজেই চোর। বলিলাম, "এ প্রাণ নিয়ে মঠে যেতে আর ইচ্ছা হয় না।" মতিলাল ছাড়ে না, বলে, "প্রাণ কবেই বা কি ছিল, আর আজই বা কি হয়েছে।" মতিলাল ছাড়ে না, এক রকম জোর করিয়াই আমাকে "উদ্বোধনে" লইয়া গেল। বহুকাল পরে স্বামী সারদানন্দের পদধূলি লইলাম। তখন "রামানুজ" লিখিতেছি, মতিলালই শশীমহারাজের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর) রামানুজ চরিত আনিয়া দিয়াছে। আর তাহার নিত্য কাবুলিওয়ালার তাগাদা চলিতেছে, "কি হইল, কতদূর লেখা হলো?" অঙ্কের পর অঙ্ক লেখা হয় আর স্বামী সারদানন্দকে শুনাইয়া আসি, তিনি উৎসাহ দেন, আশীর্বাদ করেন। আমার ভাগ্যক্রমে এই সময় "মহারাজ" শুনিলেন, আমি "রামানুজ" লিখিতেছি। শুনিলাম রামানুজ লেখা হচ্ছে শুনে মহারাজ খুব খুশি হয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন "কে লিখছে, আমাদের সেই অপরেশ?" বন্ধুর মুখে শোনা কথা, তবু এখনো কর্ণে ঝঙ্কার তুলিতেছে "আমাদের সেই অপরেশ!" এমন করিয়া পরকে, পতিতকে, পাপীকে কে আপনার করিয়া লইতে পারে? কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যেন নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ে, ভয়ে সসঙ্কোচে রামানুজের পুঁথি বগলে করিয়া "বলরাম মন্দিরে" গেলাম মহারাজকে শুনাইতে—তাঁহার আশীর্বাদ আনিতে। চাহিবার পূর্বে যে আশীর্বাদ অকৃপণ করে ঢালিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন—তখন তো জানিনা। স্থানে স্থানে শুনিলেন—কি আনন্দ, কি উৎসাহ, নীরদ মহারাজকে টেলিগ্রাম করিলেন, তিনি তখন মুর্শিদাবাদে, মহারাজের ইচ্ছা তিনি গানের সুর করেন। মহারাজেরই আদেশে—রামনামের গানটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করি।

তাহার পর এই কয় বৎসরের স্মৃতি—কি বলিব, কি যে ভালবাসা, কি যে টান, কি যে অযাচিত করুণা, আর সর্বোপরি কি যে মোহকরী আকর্ষণ! আমার মতো হীন, শত কলুষেভরা জীবন, ভদ্র সমাজ অনেক কিছু বলিয়া নাসিকা

কুঞ্চন করেন, যাঁরা ধর্ম করেন—ভ্রষ্ট বলিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান, কিন্তু আমার মহারাজের হৃদয়ে এ-কি সঞ্চিত স্নেহ ধারা। কি তাঁহার আশ্বাস বাণী, আমার মতো হতভাগ্যের জন্য কি তাঁহার ব্যথা। মঠে আমি যাই আর নির্বাক হইয়া ভাবি, কি-এ আকর্ষণ! হেলায় ত্রিতাপ ভুলাইয়া দেয়, সংসারবিষের জ্বালা—নিমেষে জুড়াইয়া দেয়, কামনা—স্খলিত চরণে যেখানে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে—দেখি দলে দলে মহারাজের নিকট লোক যায়, আর পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া ফিরিয়া আসে। কি-এ আকর্ষণ, কি-এ মহাশক্তি! আড়ম্বর নাই, বাগ্মিতা নাই, বিদ্যার প্রচার নাই—এ সন্ন্যাসী তামা-কে সোনা করে না, খড়ম পায়ে গঙ্গাপার হয় না, বিভূতির কলাই নাই, অষ্ট সিদ্ধির বালাই নাই, কিন্তু তবুও কি এ আকর্ষণ! সংসার ত্যাগী যতি, মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মমাত্র উপজীবী আনন্দময় সত্ত্বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু ব্যথিতের কাছে, তাপিতের কাছে—মমতার সাগর, মায়ার অবতার, মাতৃ হৃদয়ের মতো কোমল হৃদয়, যেন জগতের জীবের পুঞ্জীকৃত ব্যথায় সদা কাতর!

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই! কিন্তু শুনিয়াছি তিনি একবার করুণ নেত্রে যাহার প্রতি চাইতেন, সে ভাগ্যবান আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না। কি-এ আকর্ষণ, ইহা আমরা জানি না, বুঝি না কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে তাঁহার নিকট আসিয়াছে, যে তাঁহার নিকট বসিয়া দুদণ্ড কথা কহিয়াছে, সেই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ঠাকুর বুঝি আপন আকর্ষণী শক্তি তাঁহার এই মানস পুত্রের নিকট সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রেমের অবতার। এ-প্রেমের ঘৃণা ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না, বিভাগ ছিল না, যত বড় পাপী হউক যেমন তাপিত হউক, ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ সাধু অসাধু তিনি সকলকে অকাতরে এই প্রেম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে গুরুভক্তির কথা পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে ইহা পৌরাণিক, ইহা অলৌকিক, জাগতিক নয়। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের—শিষ্যবর্গের মধ্যে ভাগ্যক্রমে যে গুরু ভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বুঝি পুরাণকেও অতিক্রম করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিদ্যা যখন অবিদ্যার নিশান উড়াইয়া, জগৎকে চকিত ত্রস্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, যখন পায়ের নিচের মুষ্টিমাত্র মৃত্তিকাও লোকে পরীক্ষা না করিয়া লইতে চাহে না, একটা মাটির হাঁড়ি তিন বার বাজাইয়া তবে কেনে—এই জড়বাদীর যুগে কি-এ গুরুভক্তি, কি-এ অনুরাগ! মহারাজ ইঙ্গিতে আদেশ করিতেছেন—হাসিমুখে, মিষ্ট-কথায়

আদর করিয়া;—আর সংসার ত্যাগী সাধু—তাঁহার শিষ্য, তাঁহার পুত্র—উঞ্ছ সংসারীর উটজ প্রাঙ্গণে সাগ্রহে ছুটিয়া গিয়া দীনের দীন হীনের হীন সঙ্গিহারা বন্ধুহারা, পীড়িতের মল-মূত্র চন্দন জ্ঞানে ধৌত করিয়া দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। অন্নপূর্ণার হৃদয় লইয়া নিরন্নের মুখে ভিক্ষার অন্ন তুলিয়া দিতেছেন, শোকার্তের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া সমবেদনার অমৃতধারায় তাহার শোকবহ্নি নির্বাপিত করিতেছেন। এই যে সেবা, এই যে পরার্থে আত্মদান যে মহাপুরুষের ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিত কর্মের ন্যায় অনাড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়, ভগবান যদি সত্য ব্যথাহারী হন তাহা হইলে এই ব্রজের রাখাল—রাখাল মহারাজ, যে তাঁহারই মানসপুত্র, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে?

ব্রহ্মানন্দ স্বামী নাই, চারিদিকেই এই রব! তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শিষ্য সন্ন্যাসী গৃহী সকলের হৃদয়েই সমান হাহাকার! কিন্তু সত্যই কি তিনি নাই? তাঁহার ভৌতিক দেহ লোক-লোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তবু কি তিনি নাই? তিনি আছেন, তিনি ছিলেন, তিনি থাকিবেন। তাই তো মা আনন্দময়ী ব্রজের শ্যামোন্মাদিনী কালিন্দীকূল হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ব্রজের রাখালকে এই শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গের কোমল অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালিকে টানিয়া তুলিবার জন্য—বাঙ্গলাকে ধন্য করিবার জন্য—সেই বাঙ্গলায়, যেখানে বুদ্ধ নির্বাণ মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আচণ্ডালে নাম-সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন, যেখানে আনন্দময় নিত্যানন্দ গললগ্নী কৃতবাসে দ্বারে দ্বারে বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন—''আমায় কিনিয়া লহ বল গৌরহরি'' সেই বাঙ্গলার নিজসম্পদ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, রাখালমহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার ভাববিগ্রহ লইয়া ঐ যে আমাদের সম্মুখে—কে বলে তিনি নাই!

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র

শ্রীশচন্দ্র মতিলাল

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলা দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অন্যতম নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বা স্বামী যোগানন্দের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশিবার সৌভাগ্য আমার ছিল না। ঠাকুর সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান তাহা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মুখে শ্রুত তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনোপলব্ধি ও অনুভূতির আংশিক উন্মেষ মাত্র। বর্তমান প্রবন্ধের সহিত সে সকলের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, যে মহাপুরুষের জীবনকথা আলোচনা করিতেছি তাহার সহিত আমার সে স্মৃতি পরোক্ষভাবে জড়িত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় গিরিশচন্দ্রের গৃহে। মঠে, দক্ষিণেশ্বরে ও বলরাম মন্দিরে ইতঃপূর্বে তাঁহার দর্শন পাইলেও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের তেমন সুবিধা হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের মুখে ঠাকুরের অহেতুকী কৃপা ও ভালবাসার কথা শুনিয়া মনে হইত যে, দিন বৃথাই কাটিয়াছে, নররূপী নারায়ণের দর্শন এত সুলভ হইলেও হেলায় সে সুযোগ খোয়াইয়াছি। গিরিশ সে কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন, দেখ, তোমরা আমাদের চেয়েও ভাগ্যবান, কেন জান, তোমরা ঠাকুরের নাম শুনিয়া এদ্বারে আসিয়াছ। ঈশা বলিয়াছেন, "Blessed be he that cometh in the name of the Lord."

গিরিশের কথায় তখনকার মতো শান্ত হইতাম সত্য, কিন্তু মনের ক্ষোভ মিটিত না।

যতদূর স্মরণ হয়, সে দিন বৈকালে মহারাজের সহিত গিরিশচন্দ্রের ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলিতেছিল। আমি এক চ্যাঙারি সন্দেশ লইয়া উপস্থিত হইলাম। গিরিশ বলিলেন, "দেখ, ভাগ্যিবানের বোঝা ভগবানে বয়, বেশ করেছ, ওঁর কাছে দাও।" আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া উহা মহারাজের সম্মুখে রাখিলাম। মহারাজ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশ আমার পরিচয় দিয়া ভৃত্যকে জল

আনিতে আদেশ করিলেন। জল আসিলে মহারাজ সন্দেশগুলি (চেঙ্গারি সমেত) ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সানন্দে দুই একটি মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বাঃ। উত্তম সন্দেশ—সকলকে দাও।" সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উহা বিতরণ করিলাম। গিরিশ বলিলেন, "তোমার খুব জোর বরাত।" তাহার পর আরও খানিকক্ষণ কথাবার্তা চলিল, সন্ধ্যা হইয়া গেল, মহারাজ বলরাম মন্দিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর আমি গিরিশচন্দ্রকে এ অযাচিত করুণার হেতু জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "দেখ, এর আর মানে নাই, যখন যার কাছে দরকার ঠাকুর ঠিক সেইখানে নিয়ে যাবে।" গিরিশ সহোদর অতুলচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বলিলেন, "পরমহংসের কথা—রাখাল তাঁর ছেলে। ছেলে যত বড়ই মূর্খ ও আবদেরে হোক, বাপের কিছু কিছু গুণ তাতে বর্তায়, রাখালে তাঁর অনেক গুণ বর্তেছে। তোমরা পরমহংসের দেখা পাওনি, তাঁর ছেলেদের দেখে কতকটা idea পাবে।" গিরিশ বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর বলিতেন, এইখানকে এলে গেলেই হবে। 'এইখানকে' মানে কি জান—তাঁর চিহ্নিত ভক্তদের কাছে।" সকল কথা বোধগম্য হোক বা না হোক, অপূর্ব শান্তি ও আনন্দ লইয়া সে রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে বেলুড় মঠে মহারাজের সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন রবিবার হইলেও মঠে বেশি ভিড় ছিল না। মহারাজ ও তাঁহার দুই-চারিটি অনুচর শিষ্য ভিন্ন, প্রায় সকলেই সে দিন সালিখার উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। আমরাও সেখানে গিয়াছিলাম; প্রসাদ ধারণের পর সুবিধা হওয়ায় ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি দুই-চারিজন ভক্তের সহিত নৌকাযোগে মঠে চলিয়া আসি। বেলা অপরাহ্ণ, মহারাজ চা-এর টেবিলের পূর্বধারে বেঞ্চিতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমাদের দেখিবামাত্র বলিলেন, "এই যে, এস, কেমন আছ?" আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর সামনের বেঞ্চিখানিতে বসিলাম। সালিখার উৎসবের কথা চলিতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন, "শরীরটে ভাল ছিল না বলে উৎসবে যেতে পারিনি।" তারপর পুলিন মিত্র, কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সহিত হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেখিলাম দুইজন মাদ্রাজী ভক্ত কতকগুলো ফুল লইয়া ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেল এবং পরক্ষণেই ফুলগুলিসমেত নিচে নামিয়া আসিল। ফুল ঠাকুর ঘরে না রাখিয়া, ফিরাইয়া আনিতে দেখিয়া মনে কেমন খটকা লাগিল; ভাবিলাম, কি আশ্চর্য! ঠাকুরের স্থান, এমন সুন্দর গোলাপ ঠাকুরকে না দিয়া অম্লানবদনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া মহারাজের দিকে

অগ্রসর হইতে লাগিল। আঁখির পলকে মহারাজ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইবার উপক্রম করিলেন এবং পরক্ষণেই সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুরের ছবির মূর্তির মতো, নিশ্চল নিস্পন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কেহই ইতঃপূর্বে মহারাজের এরূপ ভাবান্তর দেখে নাই। মহারাজ অসুস্থ হইয়াছেন মনে করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল নিকটেই বসিয়া ছিল, তাড়াতাড়ি নাড়ি টিপিল। বলাবাহুল্য, কিছুই অনুভব করিতে পারিল না—একজন জল আনিতে ছুটিল। মাদ্রাজী ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, ধীরে ধীরে মহারাজের অভয় চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিল। প্রায় ৩/৪ মিনিট পরে মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা মহারাজকে এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "ঠাকুর জানেন" ছাড়া আর কোন বিশেষ উত্তর পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ নাই। প্রসাদী ফুল লইয়া আমরা নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। সহযাত্রিগণের বিজ্ঞতা ও বক্তৃতার স্রোত ছুটিল, আমার কিন্তু সে সকল কিছুই ভাল লাগিল না, অজ্ঞমন কেবলই বলিতে লাগিল নররূপী নারায়ণ—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে ও তাঁহার মানসপুত্র সচল বিগ্রহ রাখালরাজে বিশেষ প্রভেদ নাই।

ভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী—গিরিশের সহিত কথা না কহায় গিরিশচন্দ্র দারুণ অভিমান ভরে মাকে বলিয়াছিলেন যে "তিনি হয়েছেন ছবি, আর তুমি হয়েছ বৌমা।" স্বামী ব্রহ্মানন্দকে না দেখিলে আমার মনে সে ভাব বদ্ধমূল হইয়া থাকিত। যে সকল মহামূল্য উপদেশ আমি তাঁহার কাছে পাইয়াছি তাহা সাধারণে প্রকাশ করিবার নয়—এবং তাঁহাকে বুঝিবার বা তাঁহার বিষয়ে লিখিবার শক্তি আমার নাই, কেবল একটিমাত্র কথা বলিতে পারি, তাঁহার কাছে যা কিছু পাইয়াছি তাহা তাঁহারই দয়ায়—আমার দাবি-দাওয়া তাহাতে কিছুই ছিল না।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণে

মুসাফির

বর্তমান যুগে আসুরিক ভাবযুক্ত, ইহকাল সর্বস্ব বুদ্ধিসম্পন্ন, আধিভৌতিক জ্ঞানানুশীলনে তৎপর পাশ্চাত্য জাতির সহিত, দৈবী ভাবাপন্ন, পরকালে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক সাধন তৎপর প্রাচ্য জাতির ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় জগতের মানবসমাজে এক মহা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিল, পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে পড়িয়া জীব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ, খ্রীস্ট, মুসলমান ইত্যাদি নানা ধর্ম মার্গে; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি বহু বিভিন্ন সাধন পন্থায়; অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত ইত্যাদি নানা বাদে মানব মন আলোড়িত হইতে থাকিল। কালের প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া কতকগুলি বাহ্যিক আচার ব্যবহারকেই ধর্ম বোধে উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া পরস্পর বিবাদ ও কলহে মত্ত হইয়া উঠিল, নিজ নিজ ধর্মমতই সত্য আর অন্য ধর্মমত মিথ্যা এই বুদ্ধিতে পরস্পর পরস্পরের ধর্মমত খণ্ডনে প্রযুক্ত হইল, ফলে ধর্ম জিনিসটিই লোপ পাইবার উপক্রম হইল, ধর্মের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লোকের দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। জগতের অবস্থা পুনরায় শোচনীয় ভাব ধারণ করিল।

অজ্ঞান-অন্ধ জীব অহং বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মায়াচক্রের ঘোর আবর্তনের মধ্যে পড়িয়া বাসনার পর বাসনার, কল্পনার পর কল্পনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া নৈরাশ্যে ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণীত হইতে লাগিল, আশার স্বপনে ভুলিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিয়া অবিরাম যুদ্ধে নিযুক্ত হইল, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখের তরঙ্গ তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, জীব কখনো আশা, কখনো নিরাশা কখনো সুখ কখনো দুঃখ, কখনো শান্তি কখনো অশান্তি এইরূপ এক অভিনব ভাব স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। পরম করুণাময়, জগতের ঈশ্বর শ্রীভগবানের আসন জীবের দুঃখে টলিয়া উঠিল। কুরুক্ষেত্রে পার্থ সারথিরূপে তিনি যে সত্য করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পালন করিবার সময় উপস্থিত হইল। মানব জগতে

শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপনের জন্য, রজোগুণের প্রবল প্রভাব সত্ত্বগুণের দ্বারা সংযত করিবার জন্য, দেহবুদ্ধি বিজড়িত অনিত্য সুখানুসন্ধানের প্রচেষ্টায় প্রমত্ত মানব মনকে নিত্য সুখের দিকে প্রধাবিত করিবার জন্য, বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মমত বিরোধ দূর করিবার জন্য, এ বিশ্ব-সংসারকে পরমানন্দ, পরম শান্তি প্রদান করিবার জন্য সেই ত্রিতাপ সংহর্তা জগৎপিতা তাঁহার চিরশান্তি নিকেতন বৈকুণ্ঠধাম ত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া "যত মত, তত পথ" এই মহান সত্য প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব ধর্ম সমন্বয় রূপ সাধনার দ্বারা এক নবযুগের সৃষ্টি করিলেন।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য এবং সেই দিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে শ্রীভগবান বার বার জগতে আসিয়া এক-একবারে এক-এক ভাবে তাঁহার অপূর্বলীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীভগবানের সে লীলা দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র, তাঁহার বড় স্নেহের, বড় আদরের রাখালরাজ, যাঁহাকে ভক্তগণ মহারাজ বলিত, যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত, তাঁহার সেই শান্তিময় চরণপ্রান্তে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য তিনিই কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন।

সে আজ অনেক দিনের কথা যে দিন প্রথম এই মহাপুরুষকে দর্শন করি, জানিনা কেন সেই একবার দর্শনমাত্রেই আপনা হইতেই হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার প্রতি একটা অদ্ভুত ভালবাসার ভাব জাগিয়া উঠিল, মনে হইল যেন তিনি আমার কত আপনার। তাহার পরই যখন তাঁহার শ্রীমুখের দুই একটি কথা শুনিলাম, সে কথাগুলি যদিও অতি সাধারণ কথা, সেরূপ কথা কত দিন কতবার কত লোকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু কোন দিন সে কথা মর্ম্মস্থানে যাইয়া এমনভাবে আঘাত করিতে পারে নাই—আজ পর্যন্তও যেন সেই স্নেহমাখা, সেই ভালবাসাময়, সেই প্রেমপূর্ণ কথাগুলি কানে বাজিতেছে। ইহার পর হইতেই সেই ভালবাসার আকর্ষণ যেন দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহার সে ভালবাসার স্রোতের প্রবল বেগ পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের স্নেহ ভাসাইয়া দিল। সেদিন জানিতাম না ইনিই শ্রীভগবানের মানসপুত্র, সেদিন শুনি নাই যে ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "রাখাল নিত্য সিদ্ধ", "ঈশ্বরকোটির লোক", "শ্রীকৃষ্ণের অংশ", "ব্রজের রাখাল রাজ"। তাঁহার অপূর্ব ভালবাসার কোন হেতু ছিল না, সে ভালবাসার পশ্চাতে কোনও কামনা, কোনও বাসনা, কোনও মায়িক সম্বন্ধও ছিল না তথায় ছিল

কেবলমাত্র করুণার একটি কটাক্ষ, অহেতুকী কৃপার একটি বারিবিন্দু, প্রেমময়ের প্রেমের একটু অভিব্যক্তি, শ্রীভগবানের দীনবন্ধু-দীনবৎসল নামের কথঞ্চিৎ সার্থকতা।

কত কথাই মনের মধ্যে উদয় হইতেছে। শ্রীসম্পন্ন ধনীর ঘরে জন্ম লইয়া, সুখের, ভোগের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বহির্বাস কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া নগ্নদেহে ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রাখাল রাজা; ব্রজধামের গ্রামে গ্রামে প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলে যেমন একদিন রাখালবালকগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত, সেইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণেই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মনে পড়িতেছে সেই আমাদের মহারাজ পরিব্রাজকরূপে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ভয়কে তুচ্ছ করিয়া নিবিড় অরণ্যপথে পদব্রজে কত গিরি, কত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটির লোক আমাদের ব্রহ্মানন্দ স্বামী নর্মদা নদীর তীরে একাসনে একাদিক্রমে ছয় দিন যাবৎ আহার বিহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

যেদিন দেখিলাম দোল পূর্ণিমার সুরধুনীতীরে বেলুড় মঠের আঙ্গিনায় ভক্তজন মাঝে প্রেমে ও ভাবে বিহ্বল হইয়া—"আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে" এই গীত গাহিতে গাহিতে বাহু তুলিয়া ভক্তগণের মন মাতাইয়া যেন সাক্ষাৎ নদীয়ার নিমাই আবার আসিয়া নৃত্য করিতেছেন। যেদিন দেখিলাম সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া "আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে—" এই গীত গাহিতে গাহিতে কালী-কীর্তনে ভক্তিগদগদ চিত্তে নৃত্য করিতেছেন এবং তাঁহার সেই অপূর্ব ভাবে সহস্র সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। যেদিন দেখিলাম কাশীধামে সন্ন্যাসিগণের সম্মুখে রুদ্রাক্ষমালা হস্তে শিবের প্রেমে মত্ত হইয়া "বেলপাতা নেয় মাথা পেতে" গীত গাহিতে গাহিতে যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার যখন করালবদনা, অসি মুণ্ডধরা, বরাভয়া মা জগদম্বার সম্মুখে যেন অষ্ট নায়িকার এক নায়িকা হইয়া চামর ঢুলাইতেছেন, আর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিতেছেন। বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে গভীর রাত্রে যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন ও দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে ধারা বহিয়া যাইতেছে; বৃন্দাবন ধামে পদার্পণ মাত্র সমাধিস্থ হইয়া যাইতেছেন; যিশুখ্রীস্টের জন্মদিন রাত্রে

একাগ্রভাবে Sermon on the mount শ্রবণ করিতেছেন ও যিশুখ্রীস্টের উপাসনা করিয়া ভোগ দিতেছেন; তখন মনে হইল সর্বধর্ম সমন্বয়ের যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র যেন সমন্বয়ের সাক্ষাৎ বিগ্রহ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে দ্বৈতবাদীর মূর্তি পূজা পর্যন্ত সকল প্রকার সাধনার ভাব তাঁহার জীবনে যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল "যত মত তত পথ" এই কথাটির সত্যতা যেন নিজ চরিত্রের দ্বারা তিনি দেখাইয়া দিয়া গেলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক প্রকাশিত মহা সমন্বয় ধর্মের বার্তা তাঁহার প্রিয় শিষ্য সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার স্বামী বিবেকানন্দ এক দিকে জগতের ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া আসিলেন। বেদান্ত কেশরীর সে মহান গর্জনে জগতের তম নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সুপ্তোত্থিত জগৎ চক্ষু মেলিয়া সে বিরাট পুরুষকে দেখিয়া চমকিত হইল, তাঁহার মুখ নিঃসৃত সাম্যবাণী শুনিয়া জগতের ভ্রম দূর হইল। সমস্ত জগৎ সমন্বয়ের ভাবে বিমুগ্ধ হইল। অপর দিকে ভগবন্নিষ্ঠ, সমন্বয় ভাবে ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখাৎ আশার বাণী পাইয়া আশ্রয়ের জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল এবং স্বামী বিবেকানন্দের পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিয়া করুণার অবতার, প্রেমের মূরতি, ভক্তবৎসল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বড় আদরের মানসপুত্র, আমাদের ব্রজের রাখাল রাজা সেই সকল ভক্তগণকে লইয়া নীরবে শান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপরিসীম ভালবাসায় অপূর্ব স্নেহে ও ঐশ্বরিক প্রেমের অঙ্ক মধ্যে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘরূপ শিশুটি শশিকলার ন্যায় দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় জীবন অর্পণ করা অপেক্ষা সাধন আর নাই", "sympathy sympathy সকলকে sympathy করিয়া যাও", "মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ" ইত্যাদি তাঁহার উপদেশ দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘটি সঞ্জীবিত হইতে থাকিল, সমাজের চক্ষে অতি নীচ শ্রেণীর লোক হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর লোক পর্যন্ত তাঁহার প্রেমালিঙ্গন লাভে বঞ্চিত হইল না।

জগতের যত লোক দুঃখের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, অশান্তির বহ্নিতে প্রদগ্ধ হইয়া, নৈরাশ্যের সাগরে ডুবিয়া বদ্ধ শ্বাস হইয়া, ষড়রিপুর প্রবল অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল সকলেই আনন্দে মোহিত হইয়া, হৃদয়ে অপার শান্তি লইয়া, আশার তরীতে উঠিয়া, ষড়রিপুর উপর আধিপত্য লাভ করিয়া ফিরিয়া গেল, জগৎ যেন অভয় পাইল। কিন্তু আজ

জগৎ সেই সাক্ষাৎ অভয়দাতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দেহত্যাগের পূর্বে তাঁহার প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে পরম জ্ঞানের উপদেশ করিয়া, নর শরীর ত্যাগ করিয়া সমস্ত ভারতকে কাঁদাইয়া পাণ্ডবকুলকে নিরাশ্রয় করিয়া, ব্রজবালিকার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ বহু শতাব্দী পরে আর একবার শ্রীকৃষ্ণ অংশসম্ভূত রাখালরাজ জগতে আসিয়া তাঁহার প্রেম ও ভক্তির লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া, শিষ্যগণকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া জগৎকে কাঁদাইয়া, আশ্রিত জনকে নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার সেই প্রেমের স্মৃতি, তাঁহার সেই "কোথায় আমার বাবারা কোথায়" এই স্নেহের আহ্বান, "ভয় কি, ভয় কি" বলিয়া তাঁহার সেই অমৃতময় অভয় বাণী রাখিয়া গিয়াছেন।

আজ কে যেন প্রাণের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে এস এস, হে আমার হৃদয় দেবতা, হে আমার স্নেহের পুতুলি, হে আমার প্রেমের আস্পদ এস ফিরে এস, একবার এসে দেখে যাও, দেখে যাও আজ তোমার বিরহে কত শত নরনারী শোক সাগরে ভাসিতেছে, দেখে যাও আজ তোমার অভাব তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন অনুভব করিতেছে, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত আজ তোমার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, আজ তাহারা তাহাদের একমাত্র অবলম্বন অগাধ সাগরে হারাইয়া সংসার তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আজ আর কোথায় যাইয়া তাহারা তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে? কোথায় যাইয়া তাহারা অপার শান্তি পাইবে? যাহাদের জন্য তুমি তোমার কৃষ্ণ-সখাকে ছাড়িয়া নর শরীর ধারণ করিয়া কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলে, আজ তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইও না, হতভাগ্য জগৎকে দেবলীলা হইতে বঞ্চিত করিও না, দুঃখিনী ভারতমাতা তোমার মুখপানে চাহিয়া কত আশা করিয়াছিল। আজ তাহার সে আশালতাকে ভগ্ন করিও না। ঐ ঐ শোনো আজ ভারতের কঙ্কাল মাত্র সার, অনশনে মৃত প্রায় সহস্র সহস্র সন্তান তোমার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ ভারতের সহস্র সহস্র নারী ছিন্ন বস্ত্রাবৃত হইয়া তোমার জন্য হা হুতাশ করিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ ভারতের সহস্র সহস্র নর নারী রোগ, মহামারীতে বিধ্বস্ত হইয়া শান্তির জন্য ব্যাকুল ভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ কোটি কোটি ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে তাহাদের জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ লক্ষ লক্ষ ভারতের অস্পৃশ্য জাতি সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাদের হৃদয় ব্যথা তোমাকে জ্ঞাপন

করিতেছে—আর অপর দিকে ভক্তগণ আজ তোমার সেই সদা প্রফুল্ল বদন, তোমার সেই স্নেহ পরিপ্লুত অপূর্ব দৃষ্টি, তোমার সেই হৃদয় বিগলিতকারী সুমধুর কথোপকথন তোমার সেই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ সাগরে ভাসিতেছে।

বার বার মনে হইতেছে যিনি আমাদের এত ভালবাসিতেন, যিনি আমাদের কল্যাণের জন্য এত চিন্তা করিতেন, যিনি শরীর ত্যাগের শেষ মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছেন সত্যই কি তিনি চিরদিনের জন্য আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, সত্যই কি আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, সত্যই কি আমরা আর তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব না। যখনি যখনি এই চিন্তা মনে উদয় হয় তখনি তখনি যেন হৃদয়ের কোন এক নিভৃত স্থল হইতে কে যেন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিতেছে, "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" ওরে আমি যে জন্মরহিত, আমি যে নিত্য, আমার যে শেষ নাই, আমিই সে পুরাণ পুরুষ।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)

প্রেমিক পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।"

অনেকেরই ধারণা ত্যাগিপ্রবর সন্ন্যাসী ও সাধক স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিশিদিন বুঝি ব্রহ্মানন্দেই লীন হইয়া থাকিতেন, ত্রিতাপদগ্ধ জগতের দিকে তাঁর করুণাকটাক্ষ ছিল না। তাঁহার ঐ গুরুগম্ভীর বাহ্যভাবের অন্তরালে যে কতখানি কোমল একটা হৃদয় বিরাজ করিত, তাহার খবর অনেকেই রাখেন না। যাহাদের ভাগ্যে তাঁহার সঙ্গলাভ ঘটিয়া উঠে নাই, তাহাদের পক্ষে উহা ধারণা করা তো একেবারেই অসম্ভব। কাল্পনিক ভালবাসার অহেতুকী কল্পনা যে খাঁটি সত্য হইতে কতটা দূরে পড়িয়া থাকে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। কাজেই কল্পনার সাহায্য লইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের গভীর ভালবাসা ও অপার করুণার পরিমাপ করিতে গেলে মাপকাঠির নিজের অস্তিত্বই সেখানে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

আধ্যাত্মিক জগতের বাহিরের জীব আমরা, তাঁর সাধনার গভীরতা জানিতাম না। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল কি না, সে প্রশ্নে কোনদিনও মাথা ঘামাই নাই—ঘামাইবার কোন প্রয়োজনও বোধ করি নাই। "ব্রহ্ম সাকার কি নিরাকার" "ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়" ইত্যাদি গুরুগম্ভীর ও দুর্বোধ্য প্রশ্নে কখনও

আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত হইতে দিই নাই। তবু কেন, আমরা তাঁহার পায়ে নিজেদের বিকাইয়া দিয়াছিলাম? ইহার উত্তরে আমাদের শুধু একটি কথা বলিবার আছে যে, তাঁহাকে আমাদের ভাল লাগিত। তিনি তাঁহার ধর্মজগতের উৎকর্ষতার ফলে আমাদের হৃদয় জয় করেন নাই—করিয়াছিলেন তাঁহার অপূর্ব, আপন-ভোলা প্রেমের সহায়ে। তিনি তাঁহার অতুল প্রেমের বলেই আজ বিশ্ববিজয়ী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একজন আদর্শ প্রেমিক ছিলেন। প্রেমসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি প্রেমের যে দৃষ্টান্ত জগৎ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাহার আংশিক অনুসরণেও মানুষ নিজের জীবনকে সার্থক ও কৃতার্থ করিতে পারিবে। স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনাপ্রসূত ছিন্নবিচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলিকে প্রেমের শৃঙ্খলে একত্রিত করিয়া, তিনি যে মহান এক সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জগতে তাঁহার কীর্তি যে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধ্বনিত হইবে তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। বাহ্যিক কোন পূজার্চনা বা মন্ত্রঃপূত হোমের সাহায্য না লইয়া হৃদয়ের তরঙ্গায়িত ভাবরাশির সহায়ে তাঁহার বিশ্ববিজয়ী প্রেমকে হোতার আসনে বসাইয়া তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি এই লোকহিতকর বিশাল সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জননীর মতো তাঁহার পরিপূর্ণ স্নেহসলিলে অবগাহন করিয়া এই বিরাট কল্যাণকর সঙ্ঘ পূত ও পবিত্র হইয়া দিন-দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্ঘের প্রাণ, সহায় ও সম্বল সবারই মূলে এই অপূর্ব প্রেমবীজ প্রোথিত আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই প্রেমকেই তাঁহার হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একসময় আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"মঠে আজকাল কতরকমের লোক আসছে; সকলের মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য করা একেবারে অসম্ভব; আমার মনে হয়, আমার দিক থেকে একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, এদের সকলকে শান্তি দেওয়া—সকলে যাতে সুখী হয়—সেই চেষ্টা করা।" তাহাই হইয়াছিল—সকলের সুখের জন্যই তিনি আপনাকে প্রেমের অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া—নিজের বিশেষত্বটাকে বাদ দিয়া—সকলকে সমানভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। এই স্বেচ্ছাবিসর্জন ছিল বলিয়াই আজ তাঁহার নামে চক্ষু ছলছল করিয়া উঠে।

বাহিরের জগতের যত পাপী, তাপী, সকলেই তাঁহার কাছে সমান আদর পাইত। সমাজে যাহার এতটুকু স্থান নাই, তাহাকেও দেখিতাম তাঁহার হৃদয়ে

এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। "নীচ জাতি, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই"—এ বাণী আমরা তাঁহার মহিমায় জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখিয়াছিলাম। একবার যে আসিত, সে পুনর্বার তাঁহার কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিত না, সকলেরই যে সেখানে সমান আদর—বড় ছোট ভেদাভেদ নাই। সে আনন্দময় রাজ্যে বাস করিবার সময় প্রায়ই কল্পনাকাশে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর শ্যামচ্ছায়ের পরিপূর্ণ ছবি ভাসিয়া উঠিত—যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অপার করুণা সহায়ে সকলকে সমভাবে প্রেম বিলাইয়াছিলেন। তাঁহারই তো মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ; আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম ভিন্নরকম হইলেও, পুত্র যে অনেকাংশে পিতার গুণের অধিকারী হয়, এ নিয়মের ব্যতিক্রম বোধ হয় সেখানেও হয় না। কাজেই শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রেম যে অসীম ও অতলস্পর্শ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

আর সেই প্রেম—তাপিত, পীড়িত ও ক্লিষ্টদের পানেই তীরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার উল্লাসে গীতশূন্য অবসাদপুর ধ্বনিয়া উঠিয়া যেন মূর্ত হইয়া প্রকাশ পাইত—সে মৃতুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে কর্মহীন জীবনের সমস্ত প্রান্ত তরঙ্গিয়া উঠিত। তাঁহার সহানুভূতিসূচক মৃদু মধুর কণ্ঠস্বরে দুঃখ তাহার ভাষা ও ভাব লাভ করিত—তাহার অন্তরের গভীর পিপাসা স্বর্গের অমৃতের জন্য লালায়িত হইয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিত; তাঁহার কোমল করপরশনে কতশত অসন্তোষ মহানির্বাণ লাভ করিত—তাঁহার প্রেমের যজ্ঞের ফোঁটা ধারণ করিয়া পতিতা সিদ্ধিলাভ করিত। নীরবে করুণ নেত্রে অন্তরে নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমা বহন করিয়া তিনি তাহাদের শত অপরাধ ক্ষমা করিতেন। তিনি বলিতেন, "সমাজে কোথায়ও এদের স্থান নেই—অশান্তিময় জীবন নিয়ে এরা নিশিদিন কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, আমরা যদি এদের স্থান না দিই, আমরা যদি এদের হাত বাড়িয়ে টেনে না তুলি, তবে আর এদের আশা ভরসা কোথায় বল।" তাহাই দেখিয়াছিলাম—কতশত পাপীর নিদারুণ পাপরাশি তিনি তাঁহার কোমল হস্তের অপূর্ব পেলবে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, কতশত ঘৃণ্য নরনারী তাঁহার রক্তিম চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া তাহাদের আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে তাহা ধৌত করিয়া দিয়াছে। শুধু তাঁহারই পবিত্র "প্রেমে মিটিয়াছে সকলের সর্বপ্রেম তৃষ্ণা।"

আমাদের এই তরঙ্গায়িত জীবনসমুদ্রের ভিতর আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমের অপূর্ব সামঞ্জস্যময় তাঁহার পরিপূর্ণ জীবন বিচিত্র মাধুরীমণ্ডিত হইয়া এমন একটি দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছিল যেখানে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ কতশত নরনারী আসিয়া একান্ত

নির্ভরের সহিত আশ্রয় লইত। আমাদের এই সন্দেহাকুল জীবনে তাঁহার অপূর্ব চরিত্র আমাদের জ্বলন্ত অভিধানের কাজ করিত যেখানে—

"নীরবে মিটিয়া যেত সকল সন্দেহ,
থেমে যেত সহস্র বচন!
তাঁহার চরণে-আসি মাগিত মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যেদিকে ফিরাত তারা দুখানি নয়ন
সেদিকে হেরিত সবে পথ!"

তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে; তাই তিনি আজ "শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশ্যে দুঃখহীন নিকেতনে" চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের মহিমালক্ষ্মী যখন তাঁহার কণ্ঠে সাফল্যের মালাটি পরাইয়া দিবেন, তখন আমরাও হয়ত তাহার আভাস পাইব। স্মৃতি তো যাইবার নহে। সুখে দুঃখে তাঁহার স্মৃতি যে আমাদের হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"তাই স্মৃতি ভারে মোরা পড়ে আছি,
ভারমুক্ত তিনি হেথা নাই।"

স্মৃতিকে বাদ দিলেও আমাদের চলিবে না। তাঁহার স্মৃতিই যে দিবানিশি আলোকে আঁধারে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিবে; সমুদ্রে, সমীরে তাঁহার মহান গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমরা স্মৃতির পানে ফিরিয়া চাহিব—তাঁহার স্মৃতিকে অন্তরে রাখিয়াই সকলকে সুখী করিয়া আমাদিগকে নীরবে একাকী জীবনের কণ্টক পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমাদিগকে যে ক্ষুদ্র দীপটির ক্ষুদ্রতর আলোক রেখা প্রদর্শন করিবে তাহারি কিরণে উদ্ভাসিত অপূর্ব প্রেম-রশ্মির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতার ও সমস্ত অসম্মানের বলিদান কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তখনই আমরা উন্নতমস্তকে জগৎ সমক্ষে দাঁড়াইতে সক্ষম হইব। স্মৃতি চলিয়া যাইবার জিনিস নয় বটে, কিন্তু তাহা বাহিরের নানাপ্রকার অসংবদ্ধ আস্তরণে চাপা পড়িয়া যায়; শুধু সেটাকে ফোটাইয়া তোলাই আমাদের কর্তব্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দের জননীর মতো অপূর্ব স্নেহ ও ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া যদি আমরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে একদিন হয়ত সমগ্র জগৎকে আমরা প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিব ও সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া অক্ষয় ও সুন্দর হইতে পারিব আর তখনই আমরা বলিতে পারিব—

"যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ!
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক
এস সবে যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক!"

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

রসিক পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী ভূমানন্দ

“নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
*　　*　　*　　*
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়মুখে
চলে যাব গান গাহি
কে রহিবে আর দূর পরবাসে।”

অধ্যাত্ম রাজ্যের বিষয় শুনিতে প্রায় হেঁয়ালীর মতোই শুনাইয়া থাকে। অনুভূতির কথা প্রজ্ঞাচক্ষুহীন মানব বুঝতে পারে না। সুতরাং সে রকম কথার মূল্য উপলব্ধিহীন বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর নিকট প্রায় সমান। প্রভেদ—বিশ্বাসী মাথা নাড়িয়া “হাঁ” বলিয়া তাহার কর্তব্য শেষ করে, অবিশ্বাসী ঘাড় বাঁকাইয়া সে কথা “গাঁজা” বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানসপুত্র রাখালের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য আমরা “লীলা-প্রসঙ্গ” হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, ‘এইটি তোমার পুত্র’! —শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—‘সেকি?—আমার আবার ছেলে কি?’ তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়াছিলেন, ‘সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানস-পুত্র’ তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।

“তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন চার বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত সহসা দৌড়াইয়া আসিয়া

ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত! বাড়ি তো দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না!

* * *

"বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, ইতঃপূর্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যেখান হইতে সে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেই জন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন। ঐরূপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে বহুবার বলিয়াছেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ।" বলিয়াছেন, রাখাল, ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণের লীলা সহচর। আরও বলিয়াছেন, "যার যার, তার তার, যুগে যুগে অবতার।"

উক্ত কথাগুলি ছাড়া গঙ্গাবক্ষে "প্রস্ফুটিত কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া রাখাল দাঁড়াইয়া আছে," এই অনুভূতির কথা ঠাকুর তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়া, সে কথা রাখালকে জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দীর্ঘকাল পরে ৮ এপ্রিল, শনিবার রাত ১১টার পর হইতে সে কথার অনেক কথাই নিজেই বলিয়াছিলেন।

বিগত ২৬ চৈত্র, ১৩২৮—ইংরাজি ১০ এপ্রিল ১৯২২, সোমবার রাত ৮.৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ২২ মার্চ, বুধবার মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে বাগবাজার ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে আসেন। সেখানে আসিয়া তিনি মাত্র দুইদিন সুস্থ ছিলেন। শুক্রবার দিন তাঁহার কলেরা হয়। আটদিন পর্যন্ত আক্রমণের জের ছিল। তারপর বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েন। সকল রকম চিকিৎসাই করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ঔষধেই রোগের উপশম হইল না। রোগের তীব্র যন্ত্রণা স্থূল শরীরে তাঁহাকে ১৮ দিন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

১২৬৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে সুখের ক্রোড়ে লালিতপালিত, যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুকী ভালবাসার উত্তরাধিকারিত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবসানে সন্ন্যাস আশ্রয়ে সর্বপ্রকার ভোগসুখ

বিরত, ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদিতে সাধন-ভজন রত, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘের সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারই কর্মকুশলতায় এই অত্যল্পকাল মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন এত যশস্বী হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার লোক চিনিবার এবং উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। প্রতিকারপরায়ণ হইয়া যখন-তখন কাজ করা অপেক্ষা Wait and See এই নীতি অনুসরণ করিয়া দিনকতক চুপ করিয়া থাকাই তিনি সমধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। তাঁহার আঁখিযুগলকে ফাঁকি দিয়া কাজ করিবার সাহস কাহারো ছিল না। আবার সে আঁখি যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কাহারও ভরসা হইত না। সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার উন্নত পবিত্র জীবন কঠোরে কোমলে বাঁধা ছিল। পরবর্তী কালে সঙ্ঘের প্রাণে জীবনীশক্তি প্রদান করিতে যাইয়া তাহা কোমলে ও সহানুভূতিতে মিলিয়া ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুগম্ভীর প্রকৃতির হইয়াও নিরত 'ফষ্টিনষ্টি' করিয়াই আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেন—একথা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

"পুঁই চচ্চড়িতে কুচো চিংড়ি কি চমৎকার জমে," "কচি আমে সরষে ফোড়ন দিয়ে ফটিকজল অম্বল কি মধুর," "গলদা চিংড়ি নারকেলের রসে কেমন সুসিদ্ধ হয়"—ইত্যাদি কথাগুলি তিনি বলিয়া যাইতেন। তা ছাড়া যত রাজ্যের বাজে কথা, আগন্তুকদের সাংসারিক সকল সংবাদ নেওয়া—প্রত্যেকের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পরামর্শ দেওয়া—এগুলি ছিল তাঁর নিত্য কাজের মধ্যে। ভুলেও তিনি যার তার সম্মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন না। ব্রহ্মানন্দ স্বামী যে একটা এত বড় ধর্মসঙ্ঘের নেতা একথা তাঁহার কথাবার্তা হইতে বোঝা বড়ই কঠিন ছিল।

এত বাজে কথা শুনিয়াও লোকের অরুচি হইত না বরং তিনি যখন যেখানে থাকিতেন—দিনের পর দিন লোকের ভিড় লাগিয়া যাইত। একবার তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলে কেহ বড় সহজে উঠিতে চাহিত না। সকলেই প্রাণে প্রাণে একটা বিপুল আনন্দধারা অনুভব করিত।

এই 'আনন্দধারা' আফিমের মৌতাতের ন্যায় ক্রিয়া করিত। যে একবার আসিত—সে আবার না আসিয়া পারিত না। যে বহুবার আসিয়াছে সে বহুবার আসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। সে যেন কি এক অদ্ভুত প্রহেলিকার

রাজ্য—যাহা বাক্যে বলা যাইত না, অথচ তাহার প্রভাব ও আকর্ষণীশক্তি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের একটি গানের শেষ কলিটি আপনা হইতে যেন সেখানে মুখরিত হইয়া উঠিত—সকলকে বুঝাইয়া দিত—

"ওসুখ সায়র লুবধ জগজন মুগধ ইহদিন রাতিয়া
দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখণ বিন্দুকণ আধ লাগিয়া।"

সকলেই আসিত, সকলেই হাসিমুখে বাড়ি ফিরিত। "বিন্দুকণ আধ লাগিয়া" আসিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইত। কি শুনিয়া? সেই পুঁই চচ্চড়ি ও কচি আমের অম্বলের কথা, আর বাজে দশ রকম অবান্তর আলোচনায়? কি পাইয়া ? সে কথা আমরা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু দেখিয়াছি সেখানে সকলেরই অবস্থা এক—মূক আস্বাদনবৎ। শ্রদ্ধাবানের সহিত একান্তে ধর্মালোচনা করিতে তিনি বড়ই উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করিতে তিনি সর্বদাই পশ্চাৎপদ ছিলেন—অথবা অত্যন্ত চাপা ছিলেন। এমনকি, সে প্রসঙ্গ কেহ কখনো উত্থাপন করে ইহা তিনি "যেন" পছন্দ করিতেন না। তবুও যদি কেহ নিবেদন জানাইত—"আমার একটা কথা আছে"—তখনই তাঁহার মুখখানা কেমন হইয়া যাইত—আর তার সঙ্গে বলিয়া উঠিতেন—"শরীরটা আজ ভাল নয় আর একদিন এসো, বাবা।" এমনই করিয়া জিজ্ঞাসু দিনের পর দিন আসিতে লাগিল—তিনিও আজ এটা, কাল ওটা করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন—শেষে একদিন হয়তো বলিয়াই বসিলেন—"কি বলিস রে—আর ভাল দেখায় না?"

তারপর জিজ্ঞাসু নিভৃতে সাক্ষাৎ পাইল—এত দিনের শ্রম তাহার সার্থক হইল।

আগ্রহ না জন্মিলে অযাচিত ভাবে অমৃত দিতে গেলেও মানুষ তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু আগ্রহ জাগিয়া উঠিলে—পাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলে সামান্য কিছু পাইলেই মানুষ আশাতীত তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনব্যাপী লুকোচুরি খেলা ও আত্মগোপন করিবার একান্ত প্রচেষ্টা আমাদিগকে Lincoln-এর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

"You may fool all the people some of the time; You can even fool some of the people all the time; but you can't fool all of the people all the time."

আমরা রোগ শয্যায় তাঁহাকে পনের দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—তিনি দেহ ছাড়িতে ইচ্ছুক ছিলেন না—অথবা দেহ ত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া

কাতরও হয়েন নাই। এবং রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার চির অভ্যস্ত ফষ্টিনষ্টিগুলি ত্যাগ করিতে পারে নাই। ডাক্তারের সহিত কখনো রহস্য করিতেছেন—কখনো আপনি ঔষধ দিন, ভাল হব আমি, বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। আবার কবিরাজ যখন ঔষধ সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছেন—তখন ''শিবই সত্য ঔষধ মিথ্যা'' বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। ডাক্তারি চিকিৎসার পর যখন কবিরাজি চিকিৎসা হইবে শুনিলেন তখন বলিয়াছিলেন—''হাকিমিটাই বা বাকি থাকে কেন?''

রোগের প্রথম দিন হইতে তিন শুক্রবার (১৫ দিন) গত হইল। শনিবার পিপাসা ও গাত্রদাহ বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত দিন ও রাত এগারটা পর্যন্ত—লেমনেড বরফ পান করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলেন।

রাত এগারটার পর তাঁহার মন উচ্চ হইতে উচ্চতম ভূমির দিকে ছুটিয়া চলিল—এ সময়ে তাঁহার যাহা উপলব্ধি হইয়াছিল তাহা আর চাপিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই, প্রথমে শিষ্যগণকে আশীর্বাদ করিলেন। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিলেন—''ওরে আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের সঙ্গে নাচব—ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌—দুম্‌ করে নাচব।''

''আমার কেষ্ট কষ্টের কেষ্ট নয় রে গোপের কেষ্ট।'' ''তমসঃ পরস্তাৎ।''

''একি আমার কষ্টের কেষ্ট রে, এ রাম-কেষ্ট-পূর্ণচন্দ্র।'' ''নরেন—বিবেকানন্দ—বিবেকা—বিবেক ব্রহ্ম।'' ''বাবুরামকে দেখতে পাচ্ছি।'' ''কমলে-কৃষ্ণ।''

''জীবনের লেখা, এবারের লীলা শেষ হলো, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। আহা, তোদের চোখ নেই দেখতে পাচ্ছিস নে, পীত বসনে কৃষ্ণ।''

''ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিশ্বাসের পত্রে ভেসে যাচ্ছি।'' ''ঠাকুরের পা-দুখানি কি সুন্দর! দেখি, দেখি।'' ''একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে, বলচে, আয়।''

এমন মধুর স্বরে তিনি ঐ কথাগুলি বলিতেছিলেন যাহা শুনিয়া সত্যই মনে হইয়াছিল—নামে কতই সুধা, কতই মধু, কতই আরাম!

সে রাত্রি গত হইল। রবিবার সমস্ত দিনরাত কাটিয়া গেল। সোমবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাবসানের ছত্রিশ বৎসর পরে দেবাদিদেবের আদেশে আজ রাখাল রাজা ঘরে ফিরিলেন।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

মহারাজের অকথিত ভালবাসা

শ্রীঈশ্বর

আমাদের মহারাজ কি ছিলেন তা জানি না। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন কি সিদ্ধকোটি ছিলেন, কি শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন, না আর কিছু ছিলেন, এ আলোচনা আর যারাই করুন এ হতবুদ্ধি লেখকের, সে আলোচনা করবার মতো শক্তি ও প্রবৃত্তি—মোটেই নাই। তবে এইটুকু শুনেছি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের বড় আদরের প্রিয়তম মানসপুত্র ছিলেন, আর বুঝেছি তিনি ছিলেন আমাদের পরম ও চরম আশ্রয়স্থল। এইটিই আমরা যতটা বড় করে, যতটা প্রাণের সঙ্গে অনুভব করেছি, এতটা আর কিছুই বুঝি নাই। এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানবার বা ভাববার ইচ্ছা ও উৎসাহ তিনি থাকতে আমরা একটুও অনুভব করি নাই। কারণ স্নেহ ভালবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শে যে তিনি আমাদিগকে সদাই ভুলিয়ে রেখেছিলেন। দুঃখ কষ্ট অভাব অনুযোগের লেশমাত্রও তো তিনি আমাদের অনুভব করতে দেন নাই। আর তাইতে আমরা হৃষ্ট চিত্তে দুরন্ত বালকের মতো তাঁকে ছেড়ে দুনিয়ার হাসিকান্নার ঘরে বিহ্বল হয়ে হেসেছি খেলেছি। আবার অবসন্ন দেহে ফিরে এসে নিদ্রা জড়িত চক্ষুতে তাঁর অমিয় বাণী শুনতে শুনতে অবাধে ঘুমিয়ে পড়েছি। এই ছিল মহারাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। তাই বড় নিদারুণ ভাবেই আমরা আজ মহারাজের অভাব অনুভব করছি। আর ভাবছি কে আর আমাদের সদাই চোখে চোখে রাখবে, স্নেহ ভালবাসার অপূর্ব প্রীতিতে কে আর আমাদিগকে অভিষিক্ত করবে।

তাঁর ভালবাসা অশেষ—আমরা অবোধ তাই তাঁর সে অনুপম ভালবাসার ত্রিবেণী ধারায় নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পারলাম না। কি দুরদৃষ্ট আমাদের! আমরা যদি তাঁর প্রীতি-প্রেমে হৃদয় পেয়ালা পূর্ণ করতে পারতাম তাহলে বোধ হয় দুনিয়ার আর সবাইকেও সে অপূর্ব নিঃস্বার্থ ভালবাসায় বঞ্চিত হতে হতো না। মহারাজ যে নরদেহে আমাদিগকেই সার্থক করবার জন্য, পূর্ণ করবার জন্য

পরম প্রেমাস্পদরূপে এসেছিলেন! হায় প্রেমাস্পদকে চিনলাম না, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকাকে তাঁর প্রেমে ডুবিয়ে দিতে পারলাম না। অসীম সসীম হয়ে—ভালবাসার প্রত্যক্ষ অতি উজ্জ্বল দীপ্ত বিগ্রহ ধরে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন, কত ভালবাসলেন, ভালবাসার অমৃত রসে আমাদের সিক্ত করতে চাইলেন। অচেতন মুগ্ধ আমাদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে তিনি কতই না আবেগ-জড়িত কণ্ঠে ডাকলেন অন্ধ আমরা—অজ্ঞ আমরা তাঁর সে সকরুণ আহ্বানে সাড়া দিলাম না, তাই আমাদের মহারাজ বড় অবেলায় বিমর্ষ বদনে যেন অভিমান ভরেই চলে গেলেন। বিদায় বেলায় সব্বাইয়ের জন্যই আশীর্বাণী উচ্চারণ করে গেছেন, অভয় দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁকে সত্যিকার হৃদয় দিয়ে চাই নাই তাই বোধ হয় তিনি ছোট্ট খোকাটির মতোই অভিমান ভরে চলে গেছেন, অভিমান মুখেই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন। অকথিত তাঁর ভালবাসা। পিতা মাতার ভালবাসা অতুলনীয় সত্য, কিন্তু আমাদের মহারাজের ভালবাসার তুলনা দেব এমন যে দুনিয়াতে আর কিছুই নাই, আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। অমন আপন ভোলা ভালবাসা দুনিয়ার নয়। দুনিয়ার বহু উচ্চে অনেক অনেক দূরের—ঠিক কোথাকার যে সে ভালবাসা তা বলতে পারব না। তবে ইহকাল সর্বস্ব স্বার্থপূর্ণ নশ্বর দুনিয়ার যে সে ভালবাসা নয় এটা অতি স্পষ্ট করেই বলছি। কারণ আজ যে আমরা বড় স্পষ্ট ভাবেই সেটা অনুভব করছি।

আমরা সাধন ভজন, ত্যাগ তপস্যা বা দেনা পাওনার ভেতর দিয়ে মহারাজের ভালবাসা লাভ করি নাই। আমরা হাসিখেলার ঘরে আমাদেরই একটির মতো তাঁকে পেয়েছিলাম। তাঁর অপার ভালবাসার কিছু কিছু উপলব্ধি করেছিলাম। তাঁকে নিয়ে কত হেসেছি, খেলেছি, কত আনন্দ করেছি আবার অভিমান আবদারই বা করেছি কত। তিনি হাসি খেলার ভেতর দিয়ে কত রকমেই না আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—এই সব ছোট বড় ব্যাপারগুলোই শেষ নয়। এর চাইতেও অনেক বড় আরও কত আনন্দের জিনিস আছে। আমরা তাঁকে আশ্রয় করে খেলায় মত্ত—খেলার আনন্দেই মশগুল। তাঁর ওসব কথা শুনবার, তাঁর সে করুণ আবেগ ভরা দৃষ্টিতে মজবার অবসর তখন আমাদের কোথায়? বরং তাঁর ঐরকম ভাবগুলোকে আমরা তখন আনন্দের অন্তরায় বলেই মনে করতাম। তখন আমরা মনে করতাম আমাদের এ আনন্দের হাট কখনও ভাঙবে না। চিরদিন এমনি ধারা মিলনের নেশাতেই ভরপুর থাকব! বিচ্ছেদের দারুণ বেদনায় অস্থির হতে হবে, এটা যে স্বপ্নেও ভাবি নাই! তিনি খেলার ছলে আমাদিগকে একেবারে তাঁরই করে নিতে

চেয়েছিলেন। আমরা খেলাতেই মত্ত রইলাম তাঁকে প্রাণভরে ভালবাসতে পারলাম না, জীবন-পথ ঠিক করে নিতে পারলাম না। তাই বিদায় বেলায় তাঁর অসীম ভালবাসার ডাক "আমার বাবারা তোরা কোথায়, আয়, আয়" শুনে যখন তাঁর কাছে দাঁড়ালাম, তখন অবসন্ন-ক্লান্ত-হৃদয় আমাদের—দুনিয়ার খেলার চিহ্নে তখন আমাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন।

স্তম্ভিত হৃদয়ে তাঁর পাশে, তাঁর অতি কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি অনেক কথা বললেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর সে অজানা দেশের অপূর্ব বাণী শুনলাম। সাধনা বিহীন জীবন, কলুষিত প্রাণ মন, অচেতন হৃদয় দিয়ে, তাঁর সব কথা বুঝতে পারলাম না। তাঁর ভেতরের রূপটা—তাই যখন তিনি একটুখানি প্রকাশ করলেন তখন কিন্তু মনে হলো তিনি শুধু ইহজীবনেরই নন, তিনি আমাদের চির জীবনের সঙ্গী, তিনিই আমাদের চির আপনার লোক। কোন অশুভক্ষণে পথ ভোলা পথিকের মতো দুনিয়ার হাটে এসেছিলাম তা তিনিই জানেন। তাই বোধ হয় আমাদের বিহনে থাকতে না পেরে আমাদের তিনি নিতে এসেছিলেন।

কত মর্মস্পর্শী, কত আদরের, কত মধুমাখা ডাকেই না তিনি আমাদের ডাকলেন। দুনিয়ার কোলাহলে সে ডাক শুনেও শুনলাম না। বহু দূরের দিগন্ত পারের স্নিগ্ধ মধুর সুর যেন কানের কাছ দিয়ে ভেসে চলে গেল। চমকিত হয়ে উঠলাম, আরও ভাল করে শুনবার জন্য হৃদয়টাকে চেপে ধরলাম। কিন্তু আর না, বহুদূরের সে সুর, বহুদূর থেকে এসে কানের কাছ দিয়ে অনেক অনেক দূরে স্বপ্নলোকে মিলিয়ে গেল।

আমাদের শত দুর্বলতা শত অক্ষমতা দেখে তিনি আকুল হৃদয়ে বার বার বলেছেন, "ওরে আমাদের কেষ্ট কষ্টের নয় রে, আমাদের কেষ্ট আলাদা।" তিনি যে আমাদের বড় আপনার, তাই শেষবার তিনি অতি আবেগভরে বলেছেন, "আমাকে একটু ভালবাসিস।"

সব শুনলাম, সন্ধ্যা-মলিন মুখখানার পানে চেয়ে চেয়ে, আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে তাঁর সব কথাই শুনলাম, কিন্তু তিনি তো আর ফিরলেন না—তেমন করে তো আর তাঁকে পেলাম না। তাঁর ওসব কথা আমাদের সত্যই তখন ভাল লাগছিল না। আমাদের মহারাজ যাঁর একটুখানি অসুখ হলে আনন্দের ব্যাঘাত হচ্ছে ভেবে ভয়ে তাঁরই জন্যে আকুল হয়ে তাঁর কাছে বসে থাকতাম। শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুন, আবার আমরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি—এই

বলে কত বিনিদ্র রজনীই না তাঁর জন্য কাটিয়েছি সেই মহারাজ আমাদেরই সামনে দিন-দিন তিল তিল করে শুকিয়ে যেতে লাগলেন। নন্দনকাননের একটি পারিজাত মর্তে এসেছিল—মর্তের মানুষ আমরা সে পারিজাতের মর্ম কি বুঝব। বুভুক্ষিত মন, তৃষিত প্রাণ নিয়ে তাঁর মর্যাদা না বুঝে অসংযত ভাবে ভোগ করতে চাইলাম তাই আমাদের উত্তপ্ত মলিন নিঃশ্বাসে সে দেবপুষ্প অতি শীঘ্র শুকিয়ে গেল, কত মঙ্গল কামনা নিয়ে ঝরে পড়ল—রেখে গেল নব প্রেরণা পূর্ণ বিমল স্মৃতি।

* * *

বিরাট সুরম্য অট্টালিকা, অগণিত দাসদাসী, ফলপুষ্প শোভিত মনোরম উদ্যান, সুশীতল বারিপূর্ণ কুলুকুলুনাদিনী স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী—মালিক স্বয়ং একছত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সৌম্যশান্ত হৃদিবান প্রেমিক "মহারাজ।" সন্তান তাঁর অগণিত, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্বাদিতে প্রাসাদটি সদাই পরিপূর্ণ। প্রীতি প্রেম ভালবাসার বিমল স্পর্শে সে আনন্দ-নিকেতনটির সবাই নিশিদিন অভিষিক্ত।

ঘোর রজনী—নিঝুম! মাঝে মাঝে প্রবল বারিপাত—ভয়ঙ্কর বজ্র দামিনীর অট্টহাস্য বিভীষিকার মতোই সে শান্তি নিকেতনটিকে আজ ভীতিপ্রদ করে তুলেছে। ক্ষুদ্র বালক তাই বড় শঙ্কিতভাবে আজ তার স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীকে আঁকড়ে ধরেছে। ভাবটা শিশুর—একি হলো এমনটা তো কোন দিনই দেখি নাই! প্রকৃতি যেন রুদ্রমূর্তি ধরে পৃথিবীকে গ্রাস করতে এসেছে। জননীর প্রেমপীযূষে সন্তান কিন্তু বড় শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। বালক যখন জাগল তখন সব শূন্য—কেহ নাই—কিছু নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ ধূ কিছু নাই—শূন্য মাঠ। কিছু নাই আছে শুধু বালক—আছে শুধু তার জ্বালাময়ী স্মৃতি—আর কিছু নাই, কিছু নাই—সব শূন্য—সব ফাঁকা, (মহারাজ—!) আছে শুধু উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমি। মহারাজ! মহারাজ!!

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মানন্দ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

সম্মুখে মৃত্যুর ভৈরবী ছবি, পশ্চাতে স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া। একটি একটি করিয়া জীবনপথের আলোক নিভিতেছে, আর আমি স্থির শুষ্ক চক্ষে চাহিয়া আছি! এই চোখেই দেখিয়াছি, আকাশের ঊর্ধ্বতম বিন্দু হইতে মধ্যাহ্ন সূর্যের অন্তর্ধান—শ্রীরামকৃষ্ণের লোকলীলা অবসান। তারপর শ্রীযোগানন্দ, শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীনিরঞ্জনানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ, শ্রীত্রিগুণাতীতানন্দ, শ্রীপ্রেমানন্দ, শ্রীঅদ্ভুতানন্দ, পরমারাধ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা—একে একে সকলের জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশেষে শ্রীব্রহ্মানন্দের বিকশিত ব্রহ্মজ্যোতি পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া গেল। মনে হইল যেন আপনার হইতে আপনার কাহাকে হারাইলাম, কিন্তু চক্ষু ভিজিল না; বুঝি শোকের শেষ সম্বল অশ্রুজল নিঃশেষ হইয়া গেছে; আছে কেবল এই জীবন-সায়াহ্নে অর্ধ জীবনব্যাপী স্মৃতির সুদীর্ঘ ছায়াপাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাখাল আমার ছেলে"—মানসপুত্র। ইহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে শিখা হইতে অনুরূপ শিখার সঞ্চার, যদি একথার তাৎপর্য হয়, পিতা-পুত্র উভয়কে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনিই কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিতেন—রাখাল আমার ছেলে।

যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। বিদ্যুদ্বাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা

যায়, কি অমোঘ শক্তি তাহার অন্তর্নিহিত। শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন! সাধু, ভক্ত, ব্রহ্মচারী নির্মল চিত্ত লইয়া অথবা ব্যথিত, তাপিত, পতিত কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া, যে কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অন্তরে এ সত্য অনুভব করিয়াছেন। তিনিই দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয়, সেই অনাদৃত জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন! আত্মীয়-স্বজন যাহার নাম মুখে আনিতে কুণ্ঠা বোধ করে, কি স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে মহারাজ তার তত্ত্ব লইয়াছেন! যে অভাগা সর্বজন-পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন! যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের দ্বার তার জন্য চির-উন্মুক্ত! এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত, শান্ত, শিবময় পুরুষের অন্তরে কি মহান ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্মানুরক্তি, সংসার-মোহ-হারিণী কি মহাশক্তি উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! ভিক্ষু তাঁহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞান-চর্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না; কর্মী কর্মকৌশলে তাঁহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসার ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বুঝিত; রসিক তাঁহার রস-স্ফূর্তিতে হাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশচিত্ত উৎসাহে, ভগ্নহৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত; অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে বালক হইয়া খেলা করিতেন!

মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, সেথায় দুঃখ দৈন্য শোকের প্রবেশাধিকার ছিল না; রিপুর দল বল প্রকাশ করিতে পারিত না; সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—অমায়িক মহারাজের ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়; অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত, সংসারের বহু ঊর্ধ্বে কোন এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি—যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ্ব স্পন্দহীন, আনন্দ অবাধ। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আধ্যাত্মিকতায় (Spirituality) রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে

বড়।" তাঁহার মাহাত্ম্য যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ধন্য! হায়, এই আধ্যাত্মিকতায় মানব দেবতা হয়, কিন্তু চিরজীবী হয় না! শরীর ধ্বংস হইলেও তাহার স্মৃতি অবিনাশী। দুর্লভ রত্ন যখন সুদুর্লভ হয়, তখন নিভৃত পূজা লইবার জন্য তাহার স্মৃতি আমাদের বুক জুড়িয়া বসে।

(উদ্বোধন ঃ ২৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

নির্ঘণ্ট

অক্ষয় কুমার সিংহ ১৫৪
অখণ্ডানন্দ, স্বামী ৫৩, ১০৫, ২৪৫, ৩১০
অখিলানন্দ, স্বামী ১১৭, ১১৮, ১১৯, ২১৫, ৩৪২, ৩৪৫
অচ্যুতানন্দ, স্বামী ১৪৯, ১৫০, ১৫২,
অজয়ানন্দ, স্বামী ২৫৭
অজামিল ২৬৫
অটল মিত্র ১৭, ১৮, ৪৩, ৪৭, ৯০
অতুল চন্দ্র ঘোষ ৩৬৪, ৫০৫
অদ্ভুতানন্দ, স্বামী ২৯৫, ৫২৭
অদ্বৈতানন্দ, স্বামী ৫২৭
অনঙ্গ মহারাজ ওংকারানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
অনন্তানন্দ, স্বামী ২৭৬
অনুপমানন্দ, স্বামী ২৪৬
অপরেশ চন্দ্র ৫০০, ৫০১
অপরেশ মুখোপাধ্যায় ১৫৩, ৩৪০
অপর্ণানন্দ, স্বামী ২৬২
অপূর্বানন্দ, স্বামী ২২৮
অবতার ১৩, ৫৪, ৫৯, ১২০, ১৭১, ৪৭৭, ৪৯৭, ৫০৪, ৫১০, ৫১৯
অবিনাশ মহারাজ ৪১৮
অবিনাশানন্দ, স্বামী ২৮৫
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ৩৩৮
অভেদানন্দ, স্বামী কালী মহারাজ দ্রষ্টব্যঃ
অমরানন্দ, স্বামী ৩১০
অমলানন্দ, স্বামী ১৫৮, ১৫৯, ৩১০
অমূল্য (ব্রহ্মচারী) শংকরানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় ৪৩৩, ৪৪১
অম্বাপালী ৪৯৮
অম্বিকানন্দ, স্বামী ২৪, ২৭, ৩০, ৩১, ৪৩, ৮৫,৯০, ৯১, ৯৫, ১০২, ১৩৬, ১৬১, ২০৯, ২১০, ২২০, ২২৬, ২৪৮, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৫০১
অমৃতানন্দ, স্বামী ৭৩, ৪৮৯
অমৃতেশ্বরানন্দ, স্বামী ১১০, ১৪৮
অরুণাচলম পিল্লে ৩৮০
অরূপানন্দ, স্বামী ১২৮, ৪৪৬
অর্জুন ৪৭২, ৪৭৫, ৪৮২
অশেষানন্দ, স্বামী ১১৭, ১৩০
অশোক মহারাজ ৩০৯
অশোক (সম্রাট) ৭৩
আইনস্টাইন ১৭৫, ১৭৬
আগমানন্দ, স্বামী ৩৮৯, ৩৯০
আত্মবোধানন্দ, স্বামী ১১৩
আফতাবউদ্দিন মিঞা ৪২২
ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য ৩১০
ঈশা, যীশু দ্রষ্টব্যঃ
ঈশানানন্দ, স্বামী ৩৩০
ঈশ্বর, মুক্তেশ্বরানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
উইলিয়াম ভট্ ২৯, ৮০, ১৫৭
উদ্ধব ১১, ৪৭২

উপনিষদ্ ১৫০, ১৫১
উমানন্দ, স্বামী ৬৯, ৭০
ঋগ্‌বেদ ১৬৫
ওংকারানন্দ, স্বামী ১৫৭, ১৬৭, ৩২৫, ৩২৯
ওমানন্দ, স্বামী ২৪
কথামৃত ৫১, ৫৪, ৫৫, ৯৬, ১০০, ২১০, ২২৯, ৩৪৮, ৪৫৫, ৪৬৩, ৪৬৫
কপিল মহারাজ ১৫৯
কমলাকান্ত ৪৬৪
কমলেশ্বরানন্দ, স্বামী ১৩৩, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৯, ১৬৭
করুণানন্দ, স্বামী ১১৫
কল্যাণানন্দ, স্বামী ৩৭, ১৭৮, ১৭৯, ২৯৫, ২৯৯, ৩০৭, ৩৫৫
কাক-ভুশণ্ডী ১৬৭
কাঞ্জিলাল (ডাঃ) ১৬৮, ৩৭৪, ৪৩৭, ৪৬৯, ৫০৫, ৫০৬
কালিদাস (কবি) ৩৩৮
কালীকৃষ্ণ মহারাজ ১৫৯, ১৭৬
কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ৪৪২
কালীবাবু ১৫৫
কালী মহারাজ ১৪৪, ১৯০, ২১৪, ৩১০, ৩১১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৭৩, ৩৯৯, ৪১৩, ৪১৪
কালীসদয় পশ্চিমা ৪১০, ৪১৬
কাশীখণ্ড ৬০, ১৫১
কাশীশ্বরানন্দ, স্বামী ১৯৮
কিরণ সিংহ ২৩
কুঞ্জলালবাবু ৩৯৮, ৪০৩
কৃষ্ণলাল মহারাজ ২৪, ৩০, ৩১, ৩৬, ৬০, ৭০, ১০৪, ১১৮, ১৫৭, ২৩৯, ২৪০, ৩১৫, ৩২০, ৩৩৩, ৪১৩, ৪৩১, ৪৩৮
কৃষ্ণমেনন ত্যাগীশানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
কুমুদবন্ধু সেন ১৬
কুসুম ৭৮, ৭৯
কেদার বাবা ২৪২
কেদার বাবু (উকিল) ২৩৬, ৪০৪, ৪৩৭
কেশবানন্দ, স্বামী ১৮১, ১৮২, ১৮৩
কোরান ১৬৫
কৌমারী শক্তি ১৬৭
কৌন্তেয় অর্জুন দ্রষ্টব্যঃ
ক্রিস্টিন (সিস্টার) ৪
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১০৫
ক্ষুদুমণি ১০৬
খৃস্ট (খ্রীস্ট) যীশুখৃস্ট দ্রষ্টব্যঃ
খোকা মহারাজ সুবোধানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
গঙ্গাধর মহারাজ অখণ্ডানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
গঙ্গেশানন্দ, স্বামী ১৫৯, ১৬৪, ৪৪৬
গার্ট্রুড সেন ৪
গিরিজা মহারাজ ১৫৬, ৩২৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৩৬৪, ৪৮৮, ৫০০, ৫০৪, ৫০৫
গিরিশ চন্দ্র সেন ৯৭
গীতা ১২, ১৫১, ২৭১, ২৭২, ৩০৯, ৪১৪, ৪৮৪
গোঁসাই মহারাজ ২০, ৭৫, ৭৬, ১১৮, ১৫৮, ৪১৮
গোকুলানন্দ, স্বামী ৪৭
গোপাল গপ্পা ৮০

গোবিন্দ ১২০, ১২১
গোবিন্দ দাস (বৈষ্ণবাচার্য) ৫২১
গোলাপ মা ১৬, ১৬৪, ১৮১, ২২৭
গৌর চৈতন্য দ্রষ্টব্যঃ
গৌরীমা ৪৩১
গ্রন্থসাহেব ১৬৫
চণ্ডী ৪৪, ১০২, ১৫১, ১৬৪, ১৬৭
চন্দ্রকালী (চিকিৎসক) ৪৬৯
চন্দ্র মহারাজ ১০৭, ১৫১, ১৫৭
চামেলী পুরী ৪৫৭
চারুবাবু শুভানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
চিন্ময়ানন্দ, স্বামী ১৭৬
চিৎসুখানন্দ, স্বামী ৩৯৩
চৈতন্য (শ্রীচৈতন্য) ১৩, ১৯১, ২৪৮, ৩০৯, ৪৯১, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০৩, ৫০৮
জগৎকিশোর আচার্য ৪১৭
জগদীশচন্দ্র বসু ২৪৯, ৩৭৩, ৩৭৫
জগাই ৪৯৮
জগদানন্দ, স্বামী ১৮৮, ২৯৯
জন উড্রক, স্যার ১৮৯
জিতেন বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
জিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ৪১৭, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৩, ৪৩৪
জ্ঞান মহারাজ ১৪৮, ২০৭, ৩১০, ৪১৪
জ্ঞানদানন্দ, স্বামী ৩০৯
জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী ৩৪৪
জ্ঞানেশ্বর মহারাজ ১৩৬, ১৩৯
জ্ঞানেশ্বরানন্দ, স্বামী ৩৩১, ৪২১
টমাস অ্যাকুইনাস ১৬৫, ১৬৬
টাবু ৭৯, ৩৭৩
ডগলাস ২৩৩
তারাসার বেদান্ততীর্থ ১৫৭
তারাসুন্দরী দাসী ৪৮৮
তুরীয়ানন্দ, স্বামী ৪, ১১, ৪৩, ৪৮, ৫১, ৫২, ৬৮, ৬৯, ৮৫, ৮৬, ৯১, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১৫, ১২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪, ১৫১, ১৬০, ১৬৫, ১৬৭, ১৯০, ২১৫, ২২৫, ২২৮, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৫, ২৯৫, ২৯৯, ৩০০, ৩১০, ৩২৮, ৩৩৪, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৬০, ৩৯৭, ৪০৫, ৪৪০, ৪৪৬, ৪৯৬
তুলসীদাস ৭৪, ২৮৭
তুলসী মহারাজ ৪৬, ২৫২, ২৭৬, ২৮০, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯৩
তেজসানন্দ, স্বামী ২২০, ৩৩৬, ৩৪৩
তোতাপুরী ৪৫৭
ত্যাগীশানন্দ, স্বামী ১০৯, ৩১৯
ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী ৫৯, ৬০, ৪৯৩, ৫০০, ৫২৭
ত্রিপিটক ১৬৫
দয়ানন্দ, স্বামী ৩০৯
দিব্যানন্দ, স্বামী ১৫০
দিলীপ কুমার রায় ৪৬১, ৪৬৬
দুর্গাপদ ঘোষ (ডাঃ) ৪৬৯, ৪৭৫
দুর্গা সপ্তশতী ১৬৭
দেববাণী ২৫, ২৯
দেবমাতা, ভগিনী ২৪, ২৫
দেবাত্মানন্দ, স্বামী ২০২, ২০৬, ২০৭,

২১০, ২১২, ২১৩, ২১৪
দেবানন্দ, স্বামী ২৯৪, ৩০৭,
দেবী ভাগবত ১৬৭
দেবেন মহারাজ ২০৬, ৩০৯, ৩১৩
দেবেন্দ্র নাথ বসু ৫৩
দেবু ১৮২, ১৮৩
দ্বিজেন (মহারাজ) গঙ্গেশানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪৬৪
ধর্মানন্দ, স্বামী ২৫১
ধীরানন্দ, স্বামী কৃষ্ণলাল মহারাজ দ্রষ্টব্যঃ
ধীরেশানন্দ, স্বামী ৯০, ৯২, ১১৫
নগেন ব্রহ্মচারী ৩০৯, ৩১০
নন্দিনী (মণিমল্লিকের কন্যা) ১৮৫, ২৭১
ননীলাল ৪০১, ৪০৯
নবগোপাল ঘোষ ২২০, ৪৩৮
নরেন (মহারাজ) ১৫৮
নরেন দেব ৭৩
নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
নাগমহাশয় ১০২, ৪২৩, ৪২৪, ৪৪৫
নামদেব ৮২
নারদ ১০২, ২৭৩
নারায়ণ আয়েঙ্গার ১৭৪, ২০৩
নিগমানন্দ, স্বামী ৩০৯
নিতাইবাবু ১৬৪
নিত্যানন্দ ৩০৯, ৪৯১, ৫০৩
নিবারণ চৌধুরী ৪৪৫
নিবেদিতা, সিস্টার ৩৭৩
নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী ৫২৭
নির্বাণানন্দ, স্বামী (সূয্যি) ২০, ২১, ৫১, ৬২, ৬৩, ৯৬, ১১৮, ১১৯, ১২৪, ১৪৩, ১৫৭, ১৬৪, ২১০, ২৪৮, ২৭৬, ২৭৯, ২৮২, ২৯২, ৩৫২
নির্বেদানন্দ, স্বামী ১২১, ২১২
নির্মল কুমার ঘোষ ৪৪৯
নির্মল মহারাজ, মাধবানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী ২৯৫, ২৯৯
নিষ্কলানন্দ, স্বামী ২৪২
নীরদ মহারাজ অম্বিকানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
নীলরতন সরকার (ডাঃ) ৪৬৯
পবিত্রানন্দ, স্বামী ৪
পরেশ মহারাজ ১৪২, ১৫৯
পরমাত্মানন্দ, স্বামী ৩৮৫
পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী ২৩৮, ২৪০
পর্বতবাবু ৩১২
পর্বত, নরেন্দ্রভূষণ ৪২৭
পিটার ১২৬
পুণ্যানন্দ, স্বামী ৩১৯
পুরুষোত্তমানন্দ, স্বামী ১৮৮, ৩৭৭
পুলিন মিত্র ২৬২, ৫০৫
পূর্ণানন্দ, স্বামী ১৯১, ১৯২, ১৯৩
পেতাপুরী ৫০
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ডাঃ) ৪৬১, ৪৬৩, ৪৬৫
প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সরলাদি) ১২৭
প্রভবানন্দ, স্বামী ৪, ৯৩, ১১১, ১১৫, ১১৭, ১২৬, ১৫৯, ২২১, ২৭৯
প্রভাস মহারাজ ৩৭
প্রণবানন্দ, স্বামী ৩৩১
প্রেমঘনানন্দ, স্বামী ৩১০
প্রেমানন্দ স্বামী, বাবুরাম মহারাজ দ্রষ্টব্যঃ
ফণী মহারাজ ১০২, ২০৬, ২১২

বরদানন্দ, স্বামী ২০, ৪৭, ১০২, ১১৬, ১১৮, ১৩৬, ১৬৪, ১৯৮, ২০১, ২০৩, ২৪৭, ২৭৪, ২৭৮, ২৮০, ৩১৩

বরদাবাবু ৩৩৭

বলরাম ১৩৯

বলরাম বসু ৯, ১৪, ৪০, ৫৬, ৫৯, ৭৫, ৯৩, ৯৬, ১১৭, ১১৯, ১২২, ১২৪, ১৩২, ১৫৫, ১৬৪, ২১৫, ২২২, ২৪০, ৩২৯, ৩৩০, ৩৭৫, ৪৩৯, ৪৪৬, ৪৬৩, ৫১৯

বলভদ্রানন্দ, স্বামী ১১৭

বাইবেল ১৬০

বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪২

বাবুরাম মহারাজ ৪১, ৪২, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭৬, ৮৬, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১২২, ১২৯, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৯৮, ২০০, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২৩৮, ২৪০, ২৪৯, ২৫২, ২৫৭, ২৫৮, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৮৭, ২৯১, ২৯৪, ২৯৫, ৩১৬, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩৩, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৯৩, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৬, ৪০৭, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৭, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৫৭, ৪৬৯, ৪৮৯, ৪৯৩, ৫০০, ৫২২, ৫২৭

বামদেবানন্দ, স্বামী ৮

বাসুদেবানন্দ, স্বামী ১৫৮, ১৯৪, ৩১০

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৪০৩

বিজয়ানন্দ, স্বামী (পশুপতি) ২৯২, ৩১৬, ৩১৭

বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী ১৯, ৮৭, ১১৫, ১৬৫, ১৭৫, ১৭৬, ২০৯, ২১০, ২১৬, ২১৭, ২২৬, ২২৭, ৩১০, ৩১৫, ৩২৭, ৩৪৮, ৩৪৯

বিদ্যাসাগর ১২০

বিনোদ ১০২, ১০৩

বিনোদবন্ধু গুপ্ত ১৬৯, ১৭০

বিনোদবাবু ২০৩, ২৩৮

বিনোদিনী দাসী (অভিনেত্রী) ৪৮৮

বিপিন ডাক্তার ৬৭

বিপিন ডাক্তার (জামাই) ১৫৫, ১৬৬, ২০৪, ২৩৮, ৪৬৯, ৪৭০

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি (ডাঃ) ২৫১

বিবিদিষানন্দ, স্বামী ৫, ১১৭, ১১৯, ১২৬, ২২০

বিবেক-চূড়ামণি ৪৯৪

বিবেকানন্দ, স্বামী ৩, ৪, ৮, ১১, ১২, ১৫, ২৫, ৪১, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৭০, ৭১, ৮৫, ৯০, ৯২, ১০০, ১০১, ১০৮, ১১২, ১১৪, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৩৩, ১৪৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৫, ১৭২, ১৭৯, ১৮৪, ২০৩, ২২৮, ২৪১, ২৬২, কাজই পূজা ২৭০, ২৭২, ২৯১, ২৯৮, ৩১০, ৩১৯, ৩২০, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৮,

৩৭৮, ৩৯৯, ৪১২, ৪১৩, ৪২১, ৪২৪, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪৫, ৪৫৫, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৮, ৫০০, ৫০৪, ৫১০, ৫১৪, ৫২০, ৫২২, ৫২৭, ৫২৮
বিবেকানন্দ সোসাইটি ১৬৬
বিভূতি ঘোষ ৩৭৩
বিভূতিবাবু (পুঁটিয়ার) ৪১৮
বিমল (মহারাজ) ১৫৯
বিরূপাক্ষ ১৬৮, ১৫৯
বিল্বমঙ্গল ৪২৩
বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী ২৪, ২৯, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৫০, ৬৩
বিশ্বমহারাজ হরিহরানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
বিশ্বানন্দ, স্বামী ৩২৪, ৩৪৫
বিহারী ভাদুড়ি (ডাঃ) ৪৬৩
বীরেন বসু ১৩৪, ৪১৭, ৪১৮, ৪৩৫
বীরেন মহারাজ ১৫৮, ১৫৯, ২৯৩, ২৯৪
বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী ২৮৪
বুদ্ধ (বুদ্ধদেব) ১৩, ৭৩, ৯৯, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০৩
বুলবুল ১৫২
বেদ ১৬৫, ১৮৩
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ১২৫, ৩২৭
বৈরাগ্য চৈতন্য ২৪
বোস ইন্সিটিটিউট ৩৭৫
ব্রহ্মানন্দ, স্বামী-ঠাকুরের মানসপুত্র ৩, ৮, ৫১, ৫৪, ১১১, বড় শিংওয়ালা মোষ ৫, ৭৯, প্রথম বৃন্দাবন গমন ৯, -কে স্বামীজীর মঠের ভার অর্পণ ১২, ব্রজের রাখাল ১৪, ভুবনেশ্বর মঠের স্থান নির্বাচন ২০, -র কাছে শশী মহারাজের মার্জনা ভিক্ষা ২৬, -র তাসখেলা ২৭, ব্যাঙ্গালোর মঠের দ্বারোদ্ঘাটন ২৮, দেবমাতাকে বরদান ২৯, রামেশ্বর দর্শন ৩০-৩২, মাদুরাতীর্থে ৩৩, অন্তর্যামী ৩৫, বাবার দরবারে ৩৭, অনির্বচনীয় স্নেহ ৩৮, work and worship (৪৯, ১৬৩), -র অনুজ্ঞা ৪০, -র যতীশ্বরানন্দকে উপদেশ ৪৩, মাদ্রাজ মঠে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ৪৬, নিত্যসিদ্ধের থাক ৫২, -ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ৫৯, ১৩২, বালগোপাল মূর্তি ৬৬, যো আয়ে থে সো চলা গিয়া ৬৭, ৭২, ৭৪, বিন্ধ্যাচলে দেবীদর্শন ৮৭, বিন্ধ্যাচলে গুহামন্দিরে ৮৮, মিষ্টিকথা বলা পর্যন্ত বারণ ৯২, ভানুপিসির গান শুনে উদ্দীপন ৯৬, রাখালকে কেউ বোঝেনি ৯৭, আমিই সেতুস্বরূপ ৯৯, বাবুরাম মহারাজের প্রণামমন্ত্র ১০৩, ৺ভবতারিণীকে শাড়ি পরান ১০৫, -র গরুকে কলা খাওয়ান ১০৭, 'No it is a message from the ueaven to the world' ১১৬, সমাধিমান পুরুষ ১২১, ১২৭, -কে সারদানন্দজীর মুড়ি ও বেগুন ভাজা খাওয়ানো ১২৮, ১২৯, বর্ণচোরা আম ১৩৩, ১৩৪, 'সব চেতন দেখছি' ১৩৭, 'জাগনেওয়ালা জাগো, শুননেওয়ালা শোনো' ১৩৯, ১৪২, ১৪৬, ১৫০, spiritual current ১৫৫, ১৬০, ১৬১, বিবেকানন্দ

সোসাইটির অধিবেশনে ১৬৬, ময়ূর চড়া দেবী দর্শন ১৬৭, মহাপুরুষজীকে বাবু সাজান ১৭০, গোপাল নৃত্য ১৭১, -র রাধারাণীকে কৃপা ১৮৫, কন্যাকুমারী দর্শন ১৮৮, তিরুপতি দর্শন ১৮৯, ব্যাঙ্গালোরে বক্তৃতা ১৯০, পাখির ডিমে তা দিবার দৃষ্টি ১৯৫, -র রসভঙ্গের জন্য রাগ ও বকুনি ২১০, শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাওয়া করা ২১৫, সাধুর বিছাকে রক্ষা করা ২২১, 'ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্তকাশী' ২২৭, নর্তকীর ভাবাবেশে নৃত্য ২৪২, নর্মদাতীরে ওংকারনাথে তপস্যা ২৪৮, ২৫০, ২৬৩, ২৬৫, ২৭১, ভগবান কল্পতরু ২৭৩, ২৭৪, সেবক স্বামী বরদানন্দকে ভর্ৎসনা ২৭৮, শব্দের খেলা ২৮০, ২৮২, শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ২৮৪, শশী মহারাজের সঙ্গে মাদুরাই মন্দিরে ২৯০, ২৯২, ২৯৬, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩১২, ৩১৩, ৩১৬, ৩১৭, গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে ৩১৮, আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৩২০, ৩২২, এখানে যা ঘটেছে তা ধ্যানের চেয়ে অনেক বেশি ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, মিটিং-এর নামে আমার জ্বর আসে ৩৬১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৭, ৩৮২, আলওয়াতে প্রদত্ত ভাষণ ৩৯৪, আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে ৪২০, ৪২১, রাখাল ত্রিগুণাতীত ৪২৩, ৪২৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫১, তোমাদিগকে baptise করে দিচ্ছি ৪৪৬, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬৫, মহাসমাধি ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৭, ৪৭৮, তিনি তো খোলটা দেখেন না, ভেতরটা দেখেন ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০২, ৫০৬, ৫০৮, ৫১০, ৫২২

ব্রাহ্মসমাজ ৮, ৩৫৯

ব্যাস ২০১

ভগবান ওস্তাদ (সেতারী) ১০২, ৪২২

ভবানন্দ, স্বামী ৩৫৭

ভবানী মহারাজ বরদানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

ভর্তাভারি ৪৫২

ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত দ্রষ্টব্যঃ

ভানুপিসি ৯৬

ভব মহারাজ রামেশ্বরানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

ভূতেশানন্দ, স্বামী ৩৫৭

ভূপতি দাশগুপ্ত ৪৪২

ভূমানন্দ, স্বামী ৭৭, ৩০৯, ৫১৮

ভূষণ পাত্র ১৮৪

মঙ্গলানন্দ স্বামী ১৯৮, ২০৩

মণি মল্লিক ১৮৫, ২৭১

মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৫০০

মতিবাবু ৪১৯

মনোমোহন মিত্র ৩৫৮

মহম্মদ ৫০৮

মহাপুরুষ মহারাজ, শিবানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

মহাবীর ১২৫, ২৬৯, ২৯১, ৩১২, ৩২৯, ৪৩৪

মহাভারত ১৬৪

মহারাজ, ব্রহ্মানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
মহিমবাবু ৭১
মহীতোষ মহারাজ ৩৯৮
মহেন্দ্রনাথ সরকার ৪৬৩
মাখন অমলানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
মাধবানন্দ, স্বামী ৪৮, ৪৯, ৯৫, ৪১৮, ৪২০, ৪২৯, ৪২২, ৪৪৫
মাধাই ৪৯৮
মাস্টারমশাই (শ্রীম) ৫৪, ৫৯, ১০০, ১০১, ১৬৪, ৪০৭, ৪৬২
মুক্তেশ্বরানন্দ, স্বামী ২০, ২১, ২২, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ১১০, ১১৮, ১৫৮, ২০১, ৩১৪
মোজেস ১২৩
মোহিনীবাবু (মোহিনীমোহন দাস) ২৫৭
যতীন ডাক্তার ১৫৮
যতীন (ব্রহ্মচারী) ১৪১
যতীন্দ্র গুহ ৪৪৫
যতীন্দ্রনাথ দত্ত ১৭০
যতীন্দ্রমোহন দাস ১৭৯
যতীশ্বরানন্দ, স্বামী ৩৬, ৪১, ৩৭৮, ৩৮০
যদু মল্লিক ১০
যীশুখ্রীস্ট ৯৬, ৯৯, ১০৬, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩৯, ২২৯, ২৫০, ৪৭৮, ৪৯৮, ৫০৪, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০
যুগাবতার অবতার দ্রষ্টব্যঃ
যোগবাশিষ্ঠ (রামায়ণ) ১৬৭
যোগানন্দ, স্বামী ৩৬৪, ৫০০, ৫০৪, ৫২৭
যোগী মহারাজ ১৪২
যোগীন ঠাকুর ৯৩
যোগীন মা ১১২, ১৬৪, ২২৭
যোগীন্দ্র সেন ৮৭
রতিকান্ত (ডাঃ) ৬৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬৬
রমণী (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত) ৩১৪
রমেশ দত্ত ১৬৫
রাখাল ব্রহ্মানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
রাজা/রাজা মহারাজ ব্রহ্মানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
রাধা (শ্রীরাধিকা) ৩১৪
রাধু ১৮১, ৩৩০
রাম (রামচন্দ্র) শ্রীরামচন্দ্র দ্রষ্টব্যঃ
রামকৃষ্ণ ৩, ৪, ৮, রাখালের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা ৯, ১৪, ১৫, এরপর এ ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে ৩৭, ৪০, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, রাখাল আমার ছেলে, মানসপুত্র ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৯, তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে ৫৭, এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে ৬৪, ৮৫, ৮৮, ৯৭, ১০১, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬, ১৬৪, ভক্ত ভগবান ভাগবত এক ১৬৫, ১৭২, ১৮৪, ১৯১, ২০৩, ২০৮, ২১০, ২১৪, কাশীতে মৃত্যু হলে মৃত্যুকালে মুক্তিলাভ হয় ২২৭, যে সয় সে রয় ২২৩, রাখালের রাজবুদ্ধি আছে ২২৮, ২২৯, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৫০, ২৬২, ধনীগৃহের দাসী ২৬৪, ময়ূরকে

আফিম খাওয়ান ২৬৫, ২৬৬, ২৭০, ২৭২, তোরা একটাং কর ২৭৩, ২৮৪, ২৯৬, ধ্যান সিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার স্থান ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩১০, ৩১৬, ৩১৯, ৩২২, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৯৯, ৪১২, ৪১৬, ৪১৮, ৪২০, ৪২১, ৪২৩, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫১৫, ৫১৮, ৫১৯, ৫২২, ৫২৩

রামকৃষ্ণবাবু (বসু) ৯৬, ১৬৪, ২২২, ৪০৬

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী, শশীমহারাজ দ্রষ্টব্যঃ

রামপ্রসাদ ৩৯৭

রামবাবু (দত্ত) ৪০৬

রামমূর্তি (পালোয়ান) ১১০

রামলাল ১০, ৫৮, ৬১, ৭৪, ৭৭, ৮১, ১০১, ১১৫, ১৪৬, ১৬১, ১৬৪, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৪, ২৪৫, ২৫৬, ২৫৯, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ৩১৪, ৩৪২, ৩৯৯, ৪০১, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫৫

রামস্বামী আয়েঙ্গার ২৮৭

রামানুজ ৪৫, ২৯১, ৫০১, ৫০৮

রামু ৩২, ২৯১

রামেশ্বরানন্দ, স্বামী ১৭৪, ২০৬

রাসবিহারী মহারাজ অরূপানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

রুদ্রাধ্যায় (রুদ্রী) ১৩৬, ১৪২

রুদ্রানন্দ, স্বামী ২৪

ললিত চট্টোপাধ্যায় (কাইজার) ১০৪, ৩৪০

ললিত মহারাজ কমলেশ্বরানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

লক্ষ্মীদি (লক্ষ্মীদেবী) ৭৭, ৭৮, ১৪৪, ১৬৪, ৪৪৪

লিংকন ৫২১

শংকর (শংকরাচার্য) ১৩, ২৬৬, ৪৯৭, ৫০৮

শংকরানন্দ, স্বামী ১৬, ২৩, ৭৭, ৯৪, ১০২, ১০৬, ১১০, ১২৩, ১৩৬, ১৪৪, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ২১৭, ২৩৮, ২৪২, ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৪১৮, ৪২৪, ৪৩৬

শচীন (ব্রহ্মচারী) ১৪১, ১৫৮

শচীন সেন চিন্ময়ানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

শরৎ মহারাজ সারদানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

শর্বানন্দ, স্বামী ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৮২, ২২৩, ২৬০

শশীমহারাজ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৬৯, ৭০, ৯০, ৯৭, ১১২, ১৩৪, ১৪১, ১৯০, ২৮৯, ২৯০, ৩২৮, ৩৬২, ৩৯২, ৪৯৩, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫২৭

শান্তিরামবাবু ১৬৪, ১৬৭, ২০০, ২০১, ২০২

শিবরাম আয়েঙ্গার অবিনাশানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

শিবানন্দ, স্বামী ৪১, ৫১, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৭৭, ৮১, ৯৬, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৬, ১২৪, ১২৫, ১৪১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭০, ১৯৫, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৬, ২১০, ২১৪, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৮, ২৪২, ২৪৬, ২৫০, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮২, ২৯১, ২৯৩, ৩১৭, ৩২০, ৩২১, ৩২৯, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৭৭, ৩৯৪, ৩৯৮, ৪০৬, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৭, ৪৫১, ৪৭০, ৪৭২

শিবুদা ১৬৪

শুক (শুকদেব) ৪৭১

শুকুলমহারাজ (আত্মানন্দ, স্বামী) ১৫৯, ৩১৫, ৩১৯, ৩৪৯

শুদ্ধানন্দ, স্বামী ৪৮, ৪৯, ৯৬, ১২০, ১৩৯, ১৪৪, ১৫৭, ১৫৯, ২২৬, ২৪০, ২৪২, ২৫২, ২৮৯, ২৯৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৬০, ৩৬১

শুভানন্দ, স্বামী ২৭, ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯

শেষাদ্রি পি ৩৭৭, ৩৯২

শৌর্যেন্দ্র মজুমদার ২৫৯

শ্যাম সেতারী ৪২২

শ্যামাচরণ মহারাজ অচ্যুতানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ

শ্যামাদাস কবিরাজ ৪০১, ৪৬৯, ৪৭০

শ্রীঅনন্ত ৪৯৪

শ্রীঈশ্বর ৫২৩

শ্রীকণ্ঠ ৪৭৭

শ্রীকৃষ্ণ (কৃষ্ণ) ১১, ১৪, ১২২, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ২৭১, ২৭২, ২৭৭, ২৮২, ২৮৩, ৩৫৫, ৩৫৮

শ্রীগোকুল ৪৮২

শ্রীধ্রুব ৪৭১

শ্রীমদ্ভাগবত ১৪২, ১৪৩, ১৫১, ১৬৪, ১৬৫, ১৯৪, ১৯৫

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ২৮

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীরাম) ৩২, ২৮৬, ৪০৬, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৬০, ৫০১, ৫০৮, ৫১৯

শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ দ্রষ্টব্যঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত কথামৃত দ্রষ্টব্যঃ

শ্রীরামানুজাচার্য রামানুজ দ্রষ্টব্যঃ

শ্রীশচন্দ্র মতিলাল ৫০১, ৫০৪

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ দ্রষ্টব্যঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ১২২, ৪৬৩, ৫১৮

শ্রীশ্রীমা ১৬, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৪২, ৪৯, ৯৬, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১২৭, ১২৮, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৯, ১৮১, ১৮৪, ১৯৬, ২০০, ২২৮, ২৩৯, ২৪০, ২৫১, ২৯১, ২৯২, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ৩১০, ৩১৬, ৩২১, ৩২২, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৯৮, ৪২৫, ৪২৯, ৪৩০, ৪৪৩, ৪৪৭, ৪৫৭, ৪৭২, ৫০৬, ৫২৭

সচ্চিদানন্দ, স্বামী ২৭৩, ২৭৪

সৎপ্রকাশানন্দ, স্বামী ১০০
সত্যাত্মানন্দ, স্বামী ২২৬
সদানন্দ, স্বামী ৩৭৩
সম্পূর্ণানন্দ, স্বামী ১৮৮
সম্ভবানন্দ, স্বামী ২৭৫
সরলাবালাদাসী ৪৯২
সাস্থ্যা থিওলজিকা ১৬৫
সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ৯৩, ১০৯, ১৩০, ২১৫
সারদানন্দ, স্বামী ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬৪, ৭৭, ৮৩, ৮৪, ৯১, ৯২, ১০৫, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬, ১৪১, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৬, ১৮১, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৬, ২১৩, ২২২, ২২৬, ২৩০, ২৩৮, ২৪০, ২৪৬, ২৬০, ২৬১, ২৭১, ২৯৯, ৩০০, ৩১০, ৩১৬, ৩২৮, ৩৩০, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৯৮, ৪০৩, ৪৬২, ৪৬৯, ৪৭২, ৫০১
সারদা রায়চৌধুরী ৪২১, ৪২২, ৪২৩
সিদ্ধেশ্বরানন্দ, স্বামী ১০৯, ১১৫
সীতা (দেবী) ৩২
সীতাপতি মহারাজ ৮৩
সুখানন্দ, স্বামী ৩৮২
সুদামা ২৭৭
সুধীর মহারাজ শুদ্ধানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
সুবোধানন্দ, স্বামী ১১, ১৪৩, ১৯৬, ২৯৯, ৩০৩, ৩১০, ৩১৬, ৩২৫, ৪০১
সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী) ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৬
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১৪
সুরেশ, যতীশ্বরানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
স্বামীজী, বিবেকানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
হনুমান মহাবীর দ্রষ্টব্যঃ
হরিপদ মহারাজ ১৫৪, ১৫৯
হরিপ্রসন্ন মহারাজ বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
হরিমতি ৭৮, ৭৯
হরিমহারাজ তুরীয়ানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্যঃ
হরিমোহন সিংহ ৪০৬
হরিহরানন্দ, স্বামী ৪৪, ১০২, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৭৭, ২২৫, ৪১৮, ৪৩৩
হাতি ও পিঁপড়ের গল্প ৪৩৩
হৃদয় ৩৫৮, ৪৩৪
হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮১